নজরুল-পরিক্রমা

আবদুল আজীজ আল্‌-আমান

পরিবেশক :

হরফ প্রকাশনী

এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট

কলিকাতা-১২

প্রকাশক : মোঃ আবদুর রহীম, রাজীবপুর, ২৪ পরগণা। প্রথম প্রকাশ : ১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭০, নজরুলের ৭০তম জন্মদিন। মুদ্রাকর : শ্রীরাজেন্দ্র নাথ দলপতি, শ্রী সারদা প্রেস, ৪এ, বৃন্দাবন বোস লেন, কলিকাতা-৬। প্রচ্ছদ : আমিনুর রহমান।

উৎসর্গ

বেগম মরিয়ম আজীজকে

মণি,

এ-বই লেখার সময় তুমি আমাকে যথেষ্ট বিরক্ত করেছ। কেবল অনেক অধ্যায় নতুন করে লিখিয়ে ছাড়নি, অনেক অধ্যায় বাদ দিতে বাধ্য হ'য়েছি কেবল তোমার জন্যেই। তাই এ বই তোমার থাক্।

—লেখক।

NAZRUL-PARIKRAMA

[A life-sketch of Poet Nazrul]

by

Abdul Aziz Al-Aman M.A.

• ভূমিকা •

'নজরুল-পরিক্রমা'র ভূমিকা লিখতে বসে আজ নানান কথা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে, একদিন ট্রেনে যেতে যেতে এক অপরিচিত ভদ্রলোক পূর্ণতর নজরুল-জীবনীর উপকরণ সংগ্রহের কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, নজরুল-সাহিত্য নিয়ে ব্যাপক ও গভীর আলোচনার অবকাশ সব সময় রয়েছে, কিন্তু বহু বিক্ষিপ্ত নজরুল-জীবনীর পূর্ণতর রূপ দেওয়া সব সময় সম্ভব হবে না। কেন না কবি যাঁদের সঙ্গে মিশেছিলেন, যাঁরা কবি-জীবনের বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনার সাক্ষী—তাঁদের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমে আসছে। প্রকৃতপক্ষে সেদিন থেকেই আমি নজরুল-জীবনীর উপকরণ সংগ্রহের কাজে আত্মনিয়োগ করি। সে আজ আট-ন' বছরের কথা। এবং তারই ফলশ্রুতি 'নজরুল-পরিক্রমা'।

এ কাজে আত্মনিয়োগ করে যখন আমি পরিপূর্ণভাবে এগিয়ে চলেছি তখন দেখলাম ভদ্রলোকের কথা আশ্চর্যভাবে মিলে যাচ্ছে। একদিন ঘুম থেকে উঠে কাগজে দেখলাম সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় মারা গেছেন, সংগীত শাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য দাবীদার সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীও লোকান্তরিত হলেন, দাদাজী কার্মেসীর মালিককে হারালাম অকালে—অথচ এঁরা সকলেই কবি-জীবনের বহু স্মরণযোগ্য ও মধুরতর ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। কবি-পত্নী প্রমীলা নজরুলকে হারানো বোধহয় সব থেকে বড় বেদনার কারণ হলো। বহুবার কথাবার্তায় উনি বলেছিলেন, 'আমি একটু ভাল হয়ে নিই—তারপর আপনার সঙ্গে বসব।' অনেক কথা বলার আছে। কিন্তু এই অনেক কথা আর বলা হলো না—প্রকৃতির অমোঘ নিষ্ঠুর আকর্ষণে চোখের জলে তাঁকে বিদায় দিতে বাধ্য হলাম। পরিপূর্ণ নজরুল জীবনীর উপকরণ দেখতে দেখতে আমরা হারিয়ে ফেলছি।

এই গ্রন্থে কবি-জীবনীর বহু নতুনতর তথ্য পরিবেশিত হয়েছে—যা আজ পর্যন্ত অন্য কোথাও প্রকাশিত হয়নি। 'সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী' অধ্যায়ে বেতারে নজরুল, 'জগৎ ঘটক' অধ্যায়ে সংগীতকার নজরুল, 'শনিবারের চিঠি' অধ্যায়ে

মোহিতলাল-সজনী-নজরুল বিরোধ এবং 'নিতাই ঘটক' পর্বে অভিনেতা নজরুলের পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে। নজরুল একবার ইলেকশনে মেতেছিলেন—সে ঘটনার বিস্তারিত ইতিহাস রয়েছে 'জসিমউদ্দীন' অধ্যায়ে। এ ছাড়া আরো নানা প্রসঙ্গে নানান ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। নজরুল-যুগের বাংলা সাহিত্যের একটি ইতিহাসও পাওয়া যাবে এখানে।

নজরুল-জীবনীর উপকরণ সংগ্রহের জন্যে যখন আমি যাঁর কাছে গিয়েছি তখন কেউ কেউ এমন কথাও বলেছেন যা অন্য সঠিক তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। বলাবাহুল্য এ সকল তথ্য আমি গ্রহণ করিনি। অনেকে মনগড়া কথা বলেছেন, অনেকের স্মৃতি অনেককে বিভ্রান্ত করেছে, আবার কেউ কেউ নথিপত্র দেখে অনেক পরিশ্রমে সঠিক তথ্যও পরিবেশন করেছেন। যা হোক যে সকল তথ্য আমি পেয়েছি তা নির্বিচারে গ্রহণ করিনি—যথা সম্ভব সেগুলিকে অন্যান্য সমসাময়িক ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে যাচাই করে গ্রহণ করেছি। এত সতর্কতা সত্বেও, হতে পারে কিছু ভুল হয়ে গেছে। যখন আমরা নজরুল-যুগের নষ্ট, পরনির্ভরতাই যখন আমাদের সম্বল—তখন সম্পূর্ণটাই সত্য এমন দাবী করব কী করে?

আর একটি কথা এখানে স্পষ্ট করে স্বীকার করে নিতে চাই—কোন কোন ঘটনা এই গ্রন্থে একাধিক জায়গায় একাধিকবার উল্লিখিত হয়েছে। ঘটনাগুলির সঙ্গে বিভিন্ন ব্যক্তির এমনই ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে যে পুনরুল্লিখিত দোষে দুষ্ট হওয়া সত্বেও সেগুলি উল্লেখ করতে বাধ্য হয়েছি। এর উপরেও বিভিন্ন সময়ের ব্যবধানে রচিত সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিটি আমি কখনো এক সঙ্গে হাতে পাইনি। আগামী সংস্করণে এই ত্রুটি যতটা সম্ভব দূর করব।

এই গ্রন্থের অধিকাংশ লেখা উভয় বাংলার পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে পশ্চিম বাংলার যুগান্তর, অমৃত, আনন্দবাজার, দেশ, বসুমতী, দিগন্ত, বসুধারা, কাকেলা, পরিচয় ইত্যাদি এবং পূর্ব বাংলার ইত্তেফাক, আজাদ, সংবাদ, পূর্বদেশ চিত্রালী, ডিটেকটিভ, সওগাত, মাহেনও ইত্যাদি প্রধান। এই প্রবন্ধগুলি যখন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিল, কোন কোন নজরুল জীবনীকার তাঁদের গ্রন্থে ঘটনাগুলি হুবহু গ্রহণ করেছেন। এতে আমার আনন্দই বেড়েছে কিন্তু অবাক হয়েছি যখন দেখেছি সম্পূর্ণ ঘটনা ছাড়াও-

কোন কোন অংশ হুবহু নকল করেও তাঁরা সবত্নে আমার নামটি পরিহার করে গেছেন। জানি না আমরা কবে এই চৌর্যবৃত্তির মনোভাব এবং হীনমন্যতা থেকে মুক্ত হতে পারব।

সমগ্র নজরুল জীবনী, সাহিত্য ও সংগীত নিয়ে বাংলা সাহিত্যে আজ পর্যন্ত কোথাও কোন সুষ্ঠু আলোচনা হয়নি। আমরা তিন খণ্ডে আমাদের পরিকল্পনার পূর্ণতর রূপ দেব। প্রথম খণ্ড আজ প্রকাশিত হল, দ্বিতীয় খণ্ড 'নজরুল-জীবনী'—যার মুদ্রণ কাজ শুরু হয়েছে এবং তৃতীয় অর্থাৎ শেষ খণ্ডটি হল 'নজরুল-সাহিত্য'—যার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতির কাজ শেষ পর্বে এসে পৌঁচেছে। আশা করা যায় এ তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হলে নজরুল সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ও সত্যনিষ্ঠ আলোচনা পেতে বাংলা সাহিত্যের উৎসাহী পাঠকের কোন অসুবিধা হবে না।

বর্তমান গ্রন্থটিকে দুটি খণ্ডে বিভক্ত করেছি। প্রথম খণ্ডটি 'নজরুল যুগ' এবং দ্বিতীয় খণ্ডটি হল 'নজরুল রচনার উৎস'। সমসাময়িক কালের বিভিন্ন ঘটনার আবর্তে নজরুলের অনেক উল্লেখযোগ্য কবিতা রচিত হয়েছে। কোন কবিতা রচনার পিছনে কোন ঘটনা কবি-মানসে বিশেষ বেগ সঞ্চার করেছে তা 'নজরুল রচনা-উৎস'-এর বিভিন্ন প্রবন্ধে দেখাবার চেষ্টা করেছি। ঘটনাগুলি চমকপ্রদ সন্দেহ নেই। নজরুলের কবি মানসের বিভিন্ন মনোভঙ্গির পরিচয় এ সকল ঘটনায় জড়িয়ে রয়েছে।

'নজরুল-পরিক্রমা'র রচনা, মুদ্রণ প্রভৃতির সঙ্গে যাদের নাম জড়িয়ে আছে তাঁরা সকলেই আমার আপনজন। তাদের সকলের নাম এখানে অনুল্লিখিতই থাক।

ইতি—

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড :

দ্বিতীয় খণ্ড :

প্রথম খণ্ড ঃ নজরুল-যুগ

রবীন্দ্রনাথ

১.

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল। বাংলা সাহিত্যের দুই আশ্চর্য নাম। শ্রদ্ধেয় নাম। যতদিন বাংলা সাহিত্যের অস্তিত্ব, ততদিন এ দু'টি নাম একই সঙ্গে উচ্চার্য এবং আলোচ্য। এই দুই মহৎ কবির সম্পর্ক-সম্বন্ধের কথা 'আজ পর্যন্ত বিশেষরূপে কোথাও আলোচিত হয়নি, কিন্তু হওয়া প্রয়োজন।

কখনো কখনো কিছু বিরোধের উদ্ভব হলেও প্রকৃতপক্ষে উভয়ের মাঝে এক হৃদয় ও মধুর সম্পর্ক চিরদিনই বজায় ছিল। তা'ছাড়া মহৎপ্রাণ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিরোধ করে কে কবে দূরে থাকতে পেরেছেন? প্রাণ থাকলেই গান জাগে। সে গানের সুরে-সুরে বিরোধের সকল গ্রন্থি শিথিল হ'য়ে গেছে।

পাঠ্যপুস্তকের সংকলিত কবিতার ভিতর দিয়েই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের শিশু-মনের প্রথম পরিচয়। কবিগুরুর যতগুলি কবিতা তাঁর চোখে পড়েছে, প্রায় সবগুলিই তিনি মুখস্থ করে ফেলেছেন। এক বিচিত্রানুষ্ঠানের কথা। নজরুল তখন ময়মনসিংহ জেলার দরিরামপুর হাই স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। শ্রীমহিমচন্দ্র

খাশনবিশ মহাশয় তখন সহকারী শিক্ষক হিসেবে উক্ত বিদ্যালয়ে যোগদান করেছেন। প্রধানতঃ তাঁরই প্রচেষ্টায় বিচিত্রানুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়েছিল। বিভিন্ন অনুষ্ঠান-সূচীর মহড়াও চলেছিল কয়েকদিন পূর্ব থেকে। যথানির্দিষ্ট দিনে মহা-উদ্দীপনার ভিতর দিয়ে অনুষ্ঠান আরম্ভ হল। কিশোর নজরুলও উপস্থিত। মাঝপথে শিক্ষক মহাশয়ের নিকট আবদার ধরলেন যে, তিনিও একটি কবিতা আবৃত্তি করবেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা। শিক্ষক মহাশয় একটু চিন্তিত না হয়ে পারলেন না। যারা প্রতিদিন মহড়া দিয়েছে তারাও অনুষ্ঠানে বিশেষ সুবিধে করতে পারছে না। সুতরাং বিনা মহড়ায় নজরুলের আবৃত্তি যে কেমন হবে সে সম্পর্কে তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। ওদিকে নজরুলেরও জিদ্ কমে না। শেষ পর্যন্ত শিক্ষক মহাশয় অনুমতি দিলেন। কিশোর নজরুল এগিয়ে গেলেন। শৈশব হতেই তাঁর কণ্ঠে গাম্ভীর্যের ছোঁয়া। তিনি স্পষ্ট উচ্চারণে ছন্দ-যতি-র দিকে লক্ষ্য রেখে উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করে চললেন "পুরাতন ভৃত্য" কবিতাটি। তাঁর আবৃত্তিতে এমনই একটা আবেগ ও আন্তরিকতা ছিল যে, কবিতার অন্তর্নিহিত ভাবসম্পদ স্পষ্ট রূপ ধরে দাঁড়ালো সকল শ্রোতার মানসলোকে। অভাবনীয় ব্যাপার। আবৃত্তির শেষে দেখা গেল, অধিকাংশ শ্রোতার চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠেছে। শিক্ষক মহাশয় আবেগভরে প্রীতির স্পর্শ বুলিয়ে দিলেন মাথায়। কিশোর নজরুল আবার এগিয়ে গেলেন মঞ্চের দিকে। কণ্ঠে আরো দরদ ফুটে এল। আবৃত্তি করলেন "দুই বিঘা জমি"। শ্রোতারা তন্ময়। আবৃত্তি দু'টি গভীর রেখাপাত করে গেল তাঁদের মনে। অনেক কিশোর "পুরাতন ভৃত্য" বা "দুই বিঘা জমি" আবৃত্তি করে—এর মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য কিছু নেই এবং এটা কোন একটা অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। কিন্তু নজরুলের দরদঢালা আবৃত্তিতে সমবেত শ্রোতারা বহুদিনের ভৃত্যের ব্যথায় এবং এক সরল কৃষাণের সর্বস্বান্ত হওয়ার কাহিনীতে তন্ময় হয়ে যে অশ্রুপাত করেছিলেন তাতেই ঘটনাটি মহা-

কালের দরবারে বিশেষ আসনের অধিকারী হয়েছে। বিশেষ বলেই ঘটনাটি হাজার স্মৃতির মধ্যে বিশিষ্ট হয়ে আছে শ্রদ্ধেয় মহিমচন্দ্র খাশনবিশ মহাশয়ের নিকটে। তাঁর নিকট থেকেই ঘটনাটি সংগ্রহ করেছেন জনাব এম, আবদুর রহমান। শ্রীমহিমচন্দ্র খাশনবিশ মহাশয় পরে উক্ত বিদ্যায়তনের প্রধান শিক্ষক হয়েছিলেন।

২.

আরো কয়েক বছর পরের ঘটনা। নজরুল তখন শিয়াড়শোল রাজ হাইস্কুলের ছাত্র। কিন্তু বর্তমান ঘটনাটি বর্ণনার আগে সমশ্রেণীর আর একটি ঘটনা স্মরণ করা যেতে পারে। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে একটি সংবাদ সংগ্রহ করেছিলেন শ্রীসত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা "কল্লোলে" বিবরণটি মুদ্রিত হয়েছিল এভাবে :

"হাওড়া কী অন্য কোথায় ঠিক মনে নেই, একটা ছোট-মতন সাহিত্য সম্মিলনে আমাকে একজন বললেন, আপনি যা লেখেন তা' বুঝতে আমাদের কোন কষ্ট হয় না, আর বেশ ভালোও লাগে। কিন্তু রবিবাবুর লেখা মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারি না—কী যে তিনি লেখেন তা' তিনিই জানেন। ভদ্রলোকটি ভেবেছিলেন, তাঁর এই কথা শুনে নিজেকে অহংকৃত মনে করে আমি খুব খুশি হব। আমি উত্তর দিলুম, রবিবাবুর লেখা তোমাদের তো বোঝবার কথা নয়। তিনি তো তোমাদের জন্যে লেখেন না। আমার মত যারা গ্রন্থকার তাদের জন্য রবিবাবু লেখেন, তোমাদের মত যারা পাঠক তাদের জন্য আমি লিখি।"

অনুরূপ ঘটনা ঘটেছিল নজরুলের জীবনে। পরিপক্ক জ্ঞান ও মার্জিত বুদ্ধি নিয়ে শরৎচন্দ্র যখন তাঁর দেশবাসীর কাছে অমর কথাশিল্পী রূপে প্রতিষ্ঠিত—"কল্লোলে" মুদ্রিত ঘটনাটি ঘটেছিল সে সময়। সুতরাং কবিগুরুর নিন্দায় তিনি ক্রোধকে সংবরণ করে সমুচিত জবাব দিতে পেরেছিলেন। কিন্তু নজরুলের জীবনে যখন ঘটনাটি ঘটে তখন তিনি

কিশোর—শিয়াড়শোল রাজ হাইস্কুলের ছাত্র। জ্ঞান-বুদ্ধি অপরিণত, উত্তেজনায় ভরপুর। সুতরাং বিষয়টির পরিণতি জটিল হয়ে উঠেছিল। ঘটনাটি এই :

স্কুল থেকে ফিরে কবি নেমেছেন খেলার মাঠে। মুখে রবীন্দ্রনাথের গান। মজলিসে তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করেন, বন্ধু-বান্ধবের আড্ডায় সুর যোজনা করেন রবীন্দ্র-সংগীতে। কিশোর নজরুল তখন রবীন্দ্রময়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গুরু—অ-দেখা গুরু। তিনি শিষ্য-একলব্য। খেলার মাঠে তাঁরই এক কিশোর বন্ধু কবিগুরুর নামে অপবাদ দিলেন। অপবাদটা ছিল এই রকম : 'বড় লোকের ছেলে—কেবল টাকার জোরে নোবেল প্রাইজ পেয়েছে। আসলে লেখা উচ্চস্তরের নয় মোটেই।' একবার নিষেধ করলেন নজরুল, কিন্তু পুনরুক্তি করতে তিনি এমনই উত্তেজিত হয়ে পড়লেন যে, যুক্তি-তর্ক দিয়ে তাকে না বুঝিয়ে পড়ে থাকা বাঁশের একটা টুক্‌রো কুড়িয়ে নিয়ে প্রচণ্ড বেগে আঘাত করলেন। লক্ষ্য ছিল মস্তক, লাগল কপালে। কেটে একাকার। ক্ষত দিয়ে রক্ত ঝরে কাপড় চোপড় লালে লাল হয়ে গেল। অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেল ছেলেটি। তার আত্মীয়-স্বজনেরা এল যথা সময়ে। নজরুল তখন সে স্থান ত্যাগ করেছেন। এই নিয়ে মামলার সৃষ্টি। বর্ধমান জেলার আসানসোল কোর্টে। শ্রীপরমেশপ্রসন্ন মজুমদার তখন ডেপুটি মেজিস্ট্রেট। তাঁরই এজলাসে দণ্ড বিধি আইনের ৩২৩ ধারা মতে বিবাদীপক্ষ মামলা রুজু করলেন। মামলার ফলাফল সম্পর্কে মতামত দু'রকম। কেউ বলেছেন, মোকদ্দমার দিনের আগেই আপস-নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছিল, আবার কেউ বলেছেন নির্দিষ্ট দিনে নজরুল কোর্টে হাজির হয়েছিলেন এবং উকিলের জেরার উত্তরে নির্ভীক কণ্ঠে বলেছিলেন যে, তাঁর গুরুর নিন্দা করায় তিনি মেরেছেন। সব কিছু শুনে বিচারক নজরুলকে কয়েক ঘণ্টা আটক থাকার নির্দেশ দিয়ে মামলা সমাপ্ত করেন। এ সম্পর্কে আইনজ্ঞ লেখক জনাব এম, আবদুর রহমান লিখেছেন : "এইরূপ আটক থাকা দণ্ডকে আইনের ভাষায়

Till rising of the court, সংক্ষেপে T. R. C. বলে। নজরুল-জীবনী লেখকদের লিখিত এই ঘটনা সত্য নয়। নজরুলের দূর সম্পর্কীয় মামা অধুনা মৃত উকিল আজীজুর রহমান সাহেব বলেছেন: শুরুতেই উক্ত মোকদ্দমা আপস-নিস্পত্তি হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া দণ্ডবিধি আইনের ৩২৩ ধারায় মামলা, সাধারণতঃ T. R. C. হয় না। কাজেই উকিল সাহেবের উক্তি সত্য বলে মনে হয়।" আমরাও উক্ত মত সমর্থন করি।

ঘটনাটির বেশ কয়েক বছর পর, নজরুল যখন তাঁর জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত, তাঁর বন্ধুটি দেখা করতে এসেছিলেন। কবি থাকেন তখন হুগলীতে। কপালের কাটা দাগ তখনো মিলিয়ে যায়নি। দেখা গেল, ক্ষতচিহ্নটির জন্যে বন্ধুটি গর্বিত। তিনি হেসে ক্ষতচিহ্নটি দেখিয়ে বলেছিলেন: 'তোর হাতের আঘাত আজ আমার কপালের জয়টিকা।'

স্বয়ং নজরুলের লেখায় এই ঘটনাটির উল্লেখ আছে। ১৯২৭ সালের ২য় বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা "আত্মশক্তি" পত্রিকায় "বড়র পিরীত বালির বাঁধ" প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "আমার এই ভক্তির নির্ম্মম প্রকাশ রবীন্দ্র-বিদ্বেষী কোনো একজনের মাথার চাঁদিতে আজো অক্ষয় হয়ে লেখা আছে। এবং এই ভক্তির বিচারের ভার একদিন আদালতের ধর্ম্মাধি-করণের ওপরেই পড়েছিল।"

গুরুভক্তির এই উজ্জ্বলতম নিদর্শনটি আজ ঐতিহাসিকের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৩.

দশম শ্রেণীতে পড়ার সময় কবি সেনাদলে যোগদান করেন—একথা সর্বজনবিদিত। কিন্তু কবি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন রবীন্দ্র-সংগীতের একখানি স্বরলিপি। সৈনিক-জীবনের বিরামহীন কর্মতালিকার ফাঁকে-

ফাঁকে যেটুকু অবসর পাওয়া যেত সেই সময়ে তিনি প্রাণের আকুলতা মিটিয়ে রবীন্দ্র-সংগীত চর্চা করতেন। রবীন্দ্র-সংগীত ছিল তাঁর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। এই সময়ে তিনি যে সকল সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তার প্রত্যেকটিতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব প্রত্যক্ষ এবং সুস্পষ্ট। এমন কি করাচির সেনানিবাস থেকে "সবুজপত্রে" প্রেরিত "আশায়" কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রতিচ্ছবি বলে প্রমথ চৌধুরী মহাশয় নিজ পত্রিকায় মুদ্রিত করেননি। কিন্তু সে আলোচনা আমরা পরে করবো।

সেনাদল ভেঙে দেবার পর নজরুল চলে এলেন কলকাতায়। সেদিনও তাঁর গাট্রি-বোঁচকার মধ্যে পাওয়া গেল হাফিজের 'দিওয়ান," কয়েকটি পত্র-পত্রিকা আর রবীন্দ্র-সংগীতের একখানি স্বরলিপির বই। কবির কণ্ঠে তখন রবীন্দ্র-সংগীতের জোয়ার। রবীন্দ্র-সংগীত ছাড়া তিনি অন্য কোনো সংগীত সে সময় বড় একটা গাইতেন না। খুব অল্প-দিনের মধ্যেই রবীন্দ্র-সংগীত গাইয়ে হিসেবে নজরুলের নাম রসিক সমাজে ছড়িয়ে পড়ল। সভাসমিতি, মেস এমন কি কোন কোন মার্জিত-রুচি হিন্দু পরিবার থেকেও গান গাওয়ার নিমন্ত্রণ পেতে লাগলেন কবি। তাঁর গানে অন্তঃপুরেও কম আলোড়ন ওঠেনি।

"মোসলেম ভারতে" তখন সবেমাত্র নজরুলের কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে, কলকাতার সুধী সমাজের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করতেও তিনি সমর্থ হয়েছেন, কিন্তু রবীন্দ্র-দর্শন তখনো পর্যন্ত হয়নি। রবীন্দ্রনাথের সাথে দেখা করার জন্যে নজরুল তখন আকুল হয়ে উঠেছিলেন, রবীন্দ্রনাথও কম ব্যাকুল হননি। অবশেষে সুযোগ মিলেছিল। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় মারফত গুরুর সঙ্গে শিষ্যের প্রথম পরিচয় হয়; কেবল গুরুর সঙ্গে শিষ্যের মিলন কেন কবির সঙ্গে কবির মিলনও বটে। সুযোগটা আকস্মিকভাবেই এসেছিল।

"মোসলেম ভারত"-এর একমাত্র তুল্য প্রতিযোগী ছিল "বিচিত্রা।" লেখা-নির্বাচন, মুদ্রণ, অঙ্গসজ্জা প্রভৃতি সকল দিক দিয়েই পত্রিকাটি ছিল অত্যন্ত রুচিপূর্ণ ও উচ্চমানের সাহিত্য মাসিকগুলির মধ্যে অভিজাত। প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথের দু'টি লেখা প্রকাশিত হয়। স্নিগ্ধ রুচির জন্যে পত্রিকাটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই রসিক সমাজের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পত্রিকাটির প্রতি বিশেষ রূপে অনুরক্ত হয়ে পড়েন। তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যে শান্তিনিকেতনে যাঁরা যেতেন তাঁদের অনেকের নিকটেই তিনি পত্রিকাটির কথা উল্লেখ করেছেন।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের নিকটেই সর্বপ্রথম পত্রিকাটি সম্পর্কে-অবহিত হন এবং "মোসলেম ভারত"-এ প্রকাশের জন্য লেখা পাঠান। কবিগুরু এই পত্রিকাটির মাধ্যমেই নজরুলের নাম ও তাঁর সাহিত্য সাধনা সম্পর্কে অবহিত হন।

এখানে একটি কথা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য: "মোসলেম ভারত" এর প্রতি সংখ্যায় নজরুলের একাধিক লেখা প্রকাশিত হতো। সেকালে রবীন্দ্রনাথের লেখা ছাড়া যেমন "প্রবাসী" আত্মপ্রকাশ করতো না—"মোসলেম ভারত"-ও তেমনি নজরুলের লেখার জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করতো। "প্রবাসী"র যেমন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল তেমন "মোসলেম ভারত"-এর। কয়েকটি সংখ্যার সূচী দেখলেই তা' বোঝা যাবে।

এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয় হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলামের পত্রোপন্যাস 'বাঁধনহারা', দ্বিতীয় সংখ্যায় 'শাত-ইল আরব' কবিতা এবং 'বাঁধনহারা'র দ্বিতীয় কিস্তি, তৃতীয় সংখ্যায় 'বাদল প্রাতের শরাব' কবিতা এবং 'বাঁধনহারা'র তৃতীয় কিস্তি, চতুর্থ সংখ্যায় 'খেয়াপারের তরণী' কবিতা, 'বাদল বরিষণে' রূপক গল্প এবং 'বাঁধনহারা'র চতুর্থ কিস্তি ইত্যাদি। প্রতিটি লেখা ছিল স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে নজরুলের কবিতাগুলি পড়তেন। এর মধ্যে 'শাত-ইল আরব' এবং 'খেয়াপারের তরণী' কবিতা দু'টি তাঁর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জহুরী জহর চেনে। কবিতা দু'টি কেবল তাঁর ভালই লাগল না, কবিকে দেখার জন্য তিনি ভিতর থেকে একটা আবেগ অনুভব করলেন। এমন সাবলীল কবিতা, বিশেষ করে বাংলা কবিতায় আরবী ফার্সী শব্দের এমন যথাযথ প্রয়োগ তিনি দীর্ঘকাল পরে এই প্রথম দেখলেন। এর থেকেই অদেখা এবং অজানা শিষ্যের প্রতি তাঁর একটা টান পড়ে গিয়েছে।

মনের অবস্থা যখন এই রকম, একদিন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় এলেন কবির সঙ্গে দেখা করতে। প্রয়োজনীয় কথার পর কবির সম্মুখে "মোসলেম ভারত" দেখে পত্রিকাটি সম্পর্কে কথা তুললেন পবিত্র বাবু। "মোসলেম ভারত" মানেই নজরুল। রবীন্দ্রনাথ নজরুলের কথাই জিজ্ঞেস করলেন। পবিত্র বাবু জানালেন যে, নজরুল তাঁর বিশেষ বন্ধু। কবি যদি অনুমতি দেন তা' হলে তিনি নজরুলকে নিয়ে আসবেন একদিন।

কবি বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে নজরুলকে নিয়ে আসার আহ্বান জানালেন।

পবিত্র বাবুর মুখে সকল কথা শুনে নজরুল তো বিশ্বাসই করতে পান না। শেষে যথা নির্দিষ্ট দিনে নজরুলকে নিয়ে পবিত্র বাবু রবীন্দ্রনাথের সম্মুখে হাজির হলেন। কবিগুরু বহুক্ষণ ধরে এক দৃষ্টিতে তরুণ কবির দিকে তাকিয়ে রইলেন। প্রত্যক্ষদর্শী পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের বর্ণনা থেকে জানা যায়, বেশ কিছুক্ষণ নীরবতার পর কবিগুরু কেবল একটি মাত্র কথা বললেন, "বস"। তারপর বহুক্ষণ তাঁরা নীরবেই বসে রইলেন। সেদিন আর বিশেষ কোন কথা হয়নি।

এই-ই প্রথম দর্শন।

এরপর বহুবারই তিনি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে গেছেন। কবিগুরুর সঙ্গে দেখা করেছেন। কিন্তু সে অন্য কথা।

রবীন্দ্রনাথের যেমন 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ', নজরুলের তেমনি 'বিদ্রোহী'। কবিতাটি সর্বপ্রথম জনসমক্ষে প্রকাশিত হ'লো নলিনীকান্ত সরকার সম্পাদিত 'বিজলী'তে ১৩২৮ সালের ২২শে পৌষ মোতাবেক ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী তারিখে, যদিও কবিতাটি প্রথম মুদ্রিত হয়েছিল 'মোসলেম ভারতে'। মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে কবিতাটি আরো দু'টি পত্রিকায় প্রকাশিত হলো—"মোসলেম ভারত" এবং "প্রবাসী"-তে কবিতাটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন বাংলায় তুমুল আলোড়ন উঠল। কবি এক সঙ্গে পেলেন অসংখ্য দোস্ত এবং দুষমন, প্রশংসা এবং নিন্দা। হট্টগোল বলা যেতে পারে—তুমুল হট্টগোল, সমর্থক ও বিরুদ্ধাচারীদের হট্টগোল। তার ফলে তৎকালীন বাংলার আপামর জনসাধারণের কাছে পরিচিত এবং বিশেষরূপে চিহ্নিত হয়ে গেলেন নজরুল। বায়রনের মত তিনিও বলতে পারলেন, "I woke up one morning and found myself famous" অথবা বীরযোদ্ধা নেপোলিয়নের মত, "VINI VIDI VICI"—এলাম, দেখলাম, জয় করলাম। প্রকৃতপক্ষে বাংলা সাহিত্যে নজরুলের স্বীকৃতি সম্পর্কে উদ্ধৃতিগুলি অতিশয়োক্তি নয় মোটেই। এত অল্পকালের মধ্যে এমন বিপুল জনপ্রিয়তা আর কেউ অর্জন করেননি।

এই কবিতাটি প্রকাশের অল্পকাল পরেই নজরুল কবিগুরুর সঙ্গে দেখা করেন। 'দেখা'টি সম্পর্কে অনেকে অনেক কথাই লিখছেন, কিন্তু তার মধ্যে অনেকগুলিই সত্য নয়। একটি লেখার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। 'বিজলী'র তদানীন্তন ম্যানেজার অবিনাশ ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর "পুরানো কথায়" ১৩৬২ সালের কার্তিক সংখ্যা মাসিক বসুমতীতে লিখেছেন: ...."পরের দিন সকালে এসে কবি চার খানা 'বিজলী' নিয়ে গেল, বললে, "গুরুজীর কাছে নিয়ে যাচ্ছি।"—"বেশ, ফিরে এসে বোলো তিনি দেখে কি বললেন।" বিকেলে এসে রবীন্দ্রনাথের বাড়ীতে যাওয়ার ঘটনাটা সবিস্তারে বর্ণনা করল। তাঁর

বাড়ীতে গিয়ে 'গুরুজী' 'গুরুজী' বলে চেঁচাতে থাকে। ওপর থেকে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'কী কাজী, অমন ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছ কেন, কী হয়েছে?' 'আপনাকে হত্যা করবো, গুরুজী, আপনাকে হত্যা করবো।' —'হত্যা করবো, হত্যা করবো কি, এস ওপরে এসে বোস।' —'হ্যাঁ, সত্যিই বলছি আপনাকে হত্যা করবো, বসুন শুনুন।'

কাজী তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে অঙ্গভঙ্গী সহকারে 'বিজলী' হাতে নিয়ে উচ্চৈঃস্বরে 'বিদ্রোহী' কবিতাটি তাঁকে শুনিয়ে দিলো। তিনি স্তব্ধবিস্ময়ে কাজীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে উঠে কাজীকে জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন, বললেন, "হ্যাঁ কাজী, তুমি আমায় সত্যিই হত্যা করবে। আমি মুগ্ধ হয়েছি তোমার কবিতা শুনে। তুমি যে বিশ্ববিখ্যাত কবি হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তোমার কবি প্রতিভায় জগৎ আলোকিত হোক, ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি।"

উক্তিটি সর্বত্র অতিশয়োক্তি দোষে দুষ্ট। প্রথমতঃ নজরুল ঠাকুর বাড়ীতে গিয়ে বেদ গরুর গা ধুইয়ে' ধুয়ো তুললেও রব অনেকখানি সংযত থাকত। তা' ছাড়া 'আপনাকে হত্যা করব' এমন কথা নজরুল কোন দিনই চীৎকার করে বলেননি বা বলতে পারেন না। ব্যাপারটি ঘটেছিল অন্যভাবে—সেকথা আমরা পরে উল্লেখ করছি। 'অমন ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছ কেন'—এমন কথা রবীন্দ্রনাথের মুখ দিয়ে না বেরুনই সম্ভব, বিশেষতঃ নজরুলের সঙ্গে তাঁর চাক্ষুষ পরিচয় যখন দীর্ঘ দিনের নয়। অবশেষে কবিতাটি শুনে কবিগুরু বললেন "তুমি আমাকে হত্যা করবে"—এ মত মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। "পুরানো কথা"র মধ্যে আরও একটি ভুল তথ্য আছে। অবিনাশ বাবু লিখেছেন যে, "একটা পাদটীকায় কিংবা মস্তিকটীকায় লিখে দিচ্ছি—এই কবিতাটি মাসিক পত্রিকা হইতে গৃহীত"। 'বিদ্রোহী' কবিতাটি 'মোসলেম ভারত' পত্রিকা থেকে নেওয়া; কিন্তু 'বিজলী'র যে সংখ্যায় কবিতাটি প্রকাশিত হয়, তার কোথাও পাদটীকায় বা মস্তিকটীকায় অমন কথা লেখা নেই।

'বিদ্রোহী' কবিতাটি নিয়ে কবিগুরুর সঙ্গে নজরুলের যে আলাপ-আলোচনা হয়েছিল তা এই: কবিতাটি 'বিজলী'তে প্রকাশিত হবার পর বিভিন্ন স্থান হতে প্রশংসা আসতে থাকে; কিন্তু কবিতাটি সম্পর্কে কবিগুরুর মত কী সেটা জানার জন্যে নজরুল বিশেষরূপে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। তাই তিনি জোড়াসাঁকোয় এসে একদিন কবিতাটি রবীন্দ্রনাথকে শোনান। শুনে কবি-রাজ মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু যাঁরা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মিশেছেন তাঁরা জানেন, কারো সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা তিনি বড় একটা করতেন না। কিন্তু নজরুলের কবিতা শুনে তিনি এমনই আবেগ অনুভব করেছিলেন যে, কিশোর কবিকে পরম আদরে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন এবং নীরবে তাঁর মাথায় স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিয়েছিলেন। আর সামান্য দু'একটি কথায় তাঁর প্রাণের সমর্থন জানিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে নজরুল নিজেই রবীন্দ্রনাথের 'অশীতিবার্ষিকী' জন্মোৎসবে নিবেদিত তাঁর 'অশ্রু-পুষ্পাঞ্জলি' কবিতায় লিখেছেন:

…"বক্ষে ধরি তুমি
ললাট চুমিয়ে মোর দানিলে আশিষ।"

'বিদ্রোহী' কবিতার কথা রবীন্দ্রনাথ অনেকের কাছেই বলেছেন। পবিত্র বাবু এবং আফজাল-উল-হক সাহেবের মুখে শুনেছি, কবিগুরু অনেকের নিকট বলেছেন যে, কাজীর 'বিদ্রোহী'তে যে বাঁধন ভাঙা উচ্ছ্বাস এবং আবেগ আছে তিনি তাঁর যৌবনে ঠিক এই ধরনের আবেগ অনুভব করতেন। বলা বাহুল্য, কবিগুরুর কবিতায় এই আবেগ অনেকখানি পরিশীলিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে আর নজরুলের কাব্যে আছে তারই অকৃত্রিম প্রকাশ। উচ্ছ্বাস এবং আবেগে তা' কূলপ্লাবিত করেছে।

হত্যা সম্পর্কিত যে ঘটনাটির কথা উপরে উল্লেখ করেছি, সে ঘটনাটি ঘটেছিল 'বিদ্রোহী' প্রকাশের অল্পকাল পরে। একদিন নজরুল তাঁর স্বভাব-সুলভ ভঙ্গীতে কবিগুরুর সামনে বসে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করছেন। হঠাৎ কথার মাঝখানে কিছুক্ষণ

নীরব থেকে তিনি হেসে উঠলেন। কবিগুরু কিছুটা অবাক হলেন এবং জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে হাসির কারণটি জানার জন্তে কাজীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। নজরুল বললেন যে, তিনি এই মুহূর্তে ইচ্ছে করলে পৃথিবী-বিখ্যাত হয়ে উঠতে পারেন। মুখে তখনো নীরব হাসির ছোঁয়া সুস্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আবার জিজ্ঞাসু হল। নজরুল বললেন যে, এই মুহূর্তে তিনি যদি রবীন্দ্রনাথকে হত্যা করেন তা হলে বিশ্ব-বিখ্যাত হওয়া তাঁর পক্ষে খুবই সহজসাধ্য।

রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে জানতেন। সে জন্তে তিনি কিছু বললেন না। কেবল একটুখানি হাসলেন মাত্র।

৭.

সাংবাদিকতার দিকে নজরুলের একটা বিশেষ অনুরাগ ছিল। তাঁর সাহিত্য-জীবনের শুরুতে তিনি সান্ধ্য দৈনিক "নবযুগ" পত্রিকার (১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি পত্রিকাটির ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয়) যুগ্ম-সম্পাদক নিযুক্ত হন। কিছুকাল পরেই তিনি একাজ ছেড়ে দিয়ে "মোসলেম ভারত"-এর সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে তিনি কিছুকালের জন্য 'দৈনিক সেবকের' সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করেন; কিন্তু কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতের মিল না হওয়ায় তিনি কাজ ছেড়ে দেন।

উল্লিখিত পত্র-পত্রিকাগুলির কোনটিই তাঁর নিজস্ব ছিল না। শেষে একটি ক্ষীণ সূত্র ধরে তিনি একটি পত্রিকা প্রকাশের জন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েন। হাফিজ মসউদ আহমদ নামে এক ভদ্রলোক মাত্র আড়াই শ' টাকা সম্বল করে সর্ব প্রথম একটি পত্রিকা প্রকাশের প্রস্তাব করেন জনাব মুজফফর আহমদের নিকটে। কিন্তু এত অল্প টাকায় একটি পত্রিকা প্রকাশে এগিয়ে যাওয়া দুঃসাহসিকতার কাজ মনে করে তিনি এ প্রস্তাব নাকচ করে দেন। পরে মসউদ সাহেব নজরুলের কাছে গিয়ে প্রস্তাব করতেই তিনি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই রাজী

হলেন। মাত্র আড়াই শ' টাকা সম্বল করে সাপ্তাহিক নয়—একেবারে অর্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের তোড়জোড় আরম্ভ করে দিলেন। পত্রিকার নাম ঠিক করলেন "ধূমকেতু"। সঙ্গে সঙ্গে সকল বিষয় জানিয়ে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের নিকটে পত্রিকাটির জন্যে আশীর্বাণী চেয়ে টেলিগ্রাম পাঠালেন। নজরুলের টেলিগ্রাম পেয়েই তিনি তৎক্ষণাৎ 'ধূমকেতু'র জন্যে এই অবিস্মরণীয় আশীর্বাণীটি লিখে পাঠালেন :

"আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন!

অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোক না লেখা,
জাগিয়ে দে রে চমক মেরে,
আছে যারা অর্ধ চেতন!"

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আশীর্বাণীটি যেন 'ধূমকেতু'র মর্মনির্যাস নিয়ে লিখিত। এই কবিতাটি সেকালে অনেকেরই মুখে মুখে ফিরত। কবিতাটির সুর নজরুলের প্রাণের সুর-তরঙ্গের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল। তিনি ঠিক করলেন সম্পূর্ণ কবিতাটি ব্লক করে নিয়ে 'ধূমকেতু'র প্রথম পৃষ্ঠায় ঠিক সম্পাদকীয় স্তম্ভের উপরে মুদ্রিত করবেন। করেও ছিলেন তাই। প্রতি সংখ্যাতেই কবি-সম্রাটের হাতের লেখার ব্লকটি 'ধূমকেতু'র পৃষ্ঠাকে অলঙ্কৃত করত।

কবিগুরুর আশীর্বাণী মাথায় নিয়ে "ধূমকেতু"র মাধ্যমে নজরুল যেন অগ্নিবর্ষণ শুরু করলেন। তৎকালীন সরকারপক্ষ হলেন ক্রোধান্বিত। ১৯২২ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বরের 'ধূমকেতু'র পূজা সংখ্যায় নজরুলের বিখ্যাত কবিতা "আনন্দময়ীর আগমনে" প্রকাশিত হয়। এই

কবিতাটিকে কেন্দ্র করেই নজরুলের নামে গ্রেফতারীর পরোওয়ানা বার হয়।

'ধূমকেতু'র অফিসে নজরুলকে পাওয়া গেল না, কিন্তু ক'দিন পর পুলিস তাঁকে গ্রেফতার করল কুমিল্লা থেকে। বিচারাধীন বন্দী হিসাবে তাঁকে ক'দিন কলকাতা প্রেসিডেন্সী জেলে রাখা হলো। তারপর তাঁর বিচারের শুনানি আরম্ভ হলো কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ সুইনহোর আদালতে। শেষ রায় বার হল ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী তারিখে। কলকাতার তরুণ সমাজ সেদিন ভেঙে পড়েছিল আদালত প্রাঙ্গণে। রাজদ্রোহের অপরাধে নজরুলের এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড হলো। সাহিত্য সেবার মাধ্যমে নজরুলই সর্বপ্রথম জেলে গেলেন। ইতিপূর্বে বাংলার কোন কবি-সাহিত্যিক কেবল সাহিত্য সাধনায় লিপ্ত থেকে জেলে যাননি। এই বিচার প্রসঙ্গে আর একটি কথা বিশেষরূপে স্মরণীয়: নজরুল তাঁর নিজের পক্ষ অবলম্বনের জন্য কোন উকিলকে স্বয়ং নিযুক্ত করেন নি; বহু নামজাদা উকিল বিনা পারিশ্রমিকে স্বেচ্ছায় নজরুলের পক্ষ সমর্থন করলেন। শ্রীযুক্ত মলিন মুখোপাধ্যায় হলেন প্রধান উকিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। বিচারের দিন নজরুল নিজেই তাঁর নিজের কথা বিবৃতির মাধ্যমে জানিয়েছিলেন। তাঁর সেই অবিস্মরণীয় বিবৃতি "রাজবন্দীর জবানবন্দী" নামে ছাপা হয় এবং মাত্র এক সপ্তার মধ্যেই কয়েক হাজার খণ্ড বিক্রি হয়ে যায়। কবির এই 'জবানবন্দী' বাংলা সাহিত্যে অমর খ্যাতি লাভ করেছে। গদ্যে এমন অপূর্ব সাহিত্য-সৃষ্টি নজরুল তাঁর জীবনে আর দ্বিতীয়টি করেছেন কিনা সন্দেহ।

নজরুলের এই জেল-জীবনের সঙ্গে কবিগুরুর ঘনিষ্ঠ যোগ আছে বলেই বিষয়টিকে আমাদের বিশদরূপে বর্ণনা করতে হচ্ছে। বিচারাধীন বন্দী হিসেবে কবিকে রাখা হয়েছিল প্রেসিডেন্সী জেলে, কিন্তু রায় বেরনোর পর তাঁকে অন্যত্র বদলির প্রয়োজন হলো। সে সময় সাধারণ কয়েদীদের রাখা হতো হুগলী জেলে আর বিশেষ কয়েদীদের

জন্য নির্দিষ্ট ছিল বহরমপুর ডিস্ট্রিক্ট জেল। প্রেসিডেন্সী জেলে নজরুল এবং আরো অনেককে জানানো হলো যে, তাঁদের বিশেষ কয়েদী হিসেবে বহরমপুর ডিস্ট্রিক্ট জেলে বদলি করা হবে। জেলের বাইরে এনে তাঁদের ভদ্রপোশাকও (বাড়ীতে যেমন আমরা পাজামা-পাঞ্জাবী পরি) দেওয়া হলো। কিন্তু বহরমপুরে যাওয়ার পথে তাঁদের হুগলী স্টেশনে নামিয়ে নেওয়া হলো। জেলে নিয়ে গিয়ে তাঁদের পরিয়ে দেওয়া হলো খাটো কোর্তা আর জাঙ্গিয়া। এইভাবে বিশেষ কয়েদী থেকে অকস্মাৎ সাধারণ কয়েদীতে অবনমিত করায় নজরুল মনে তীব্র আঘাত পেয়েছিলেন। তাছাড়া জেলের মধ্যে তিনি যে দুর্ব্যবহার পেলেন, তার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ না করে উপায় ছিল না। দুর্ব্যবহার ছাড়াও সে সময় যে খাদ্য-দ্রব্য দেওয়া হতো, তা মানুষের উপযোগী নয়। 'খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে ৩য় বর্ষের ২৪ সংখ্যা মোতাবেক ১৪ই বৈশাখ, ১৩৩০ সালের 'বিজলী' পত্রিকা লিখেছেন: "এই জেলখানায় খাদ্যদ্রব্য বলে যে সব পদার্থ দেওয়া হয়, তাতে নাকি নানাজাতীয় ঘাসপাতা, এমনকি নানাজাতীয় কীটপতঙ্গাদিরও সমাবেশ থাকে। এই অপূর্ব আহারে অনেকেরই স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় শরীরের ওজন ১০ থেকে ৩০ পাউণ্ড পর্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। এই খাদ্যকে বলা হোত ফরেস্ট ফিডিং"। জেলের এই এই কদর্য আহার, দুর্ব্যবহার এবং বিশেষ কয়েদী হতে সাধারণ কয়েদীতে অবনমন ইত্যাদি ব্যাপারের প্রতিবাদে নজরুল অন্য কয়েদীদের নিয়ে অনশন ব্রত অবলম্বন করেন। এই অনশন ব্রত নজরুলের জীবনে এক ঐতিহাসিক ঘটনা। 'বিদ্রোহী' কবিতা লিখে তিনি যে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন; অনশন ব্রত উদযাপনে তার থেকে কিছুমাত্র কম যশ অর্জন করেননি।

প্রথম দিকে এই অনশন ব্রতকে বিশেষ একটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এমন কি, সংবাদপত্রসমূহেও সংবাদটি বিশেষ প্রচারিত হয়নি। কিন্তু পনের দিন পরে যখন নজরুলের শরীরে দুর্বলতার চিহ্ন ফুটে উঠতে লাগল তখন কিছু কিছু লোক উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন—বিশেষতঃ তাঁর বন্ধু-

বর্গ। বন্ধু-বান্ধবেরা প্রথম দিকে নিজেরাই অনশন ভঙ্গের জন্য কবিকে অনুরোধ জানান, কিন্তু কোন ফল হয়নি। সংবাদটি রবীন্দ্রনাথের নিকট পূর্বেই পৌঁছেছিল, কিন্তু প্রথম দিকে তিনিও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন বলে মনে হয় না। তিনি তখন শিলঙের শৈলাবাসে অবস্থান করছেন। সকলের সকল রকম অনুরোধ যখন ব্যর্থ হলো তখন নজরুলের বন্ধু-বান্ধবেরা ঠিক করলেন, রবীন্দ্রনাথকে ধরলে হয়তো বিষয়টির একটা মীমাংসা হয়ে যেতে পারে। কেননা কবিগুরুর অনুরোধ নজরুল উপেক্ষা করবেন এমন হৃদয়হীন ও অবিবেচক তিনি নন। ফলে ঠিক হলো সকল ঘটনা জানিয়ে শিলঙেই কবিগুরুকে তার করা হবে। যথাসময়ে তার করা হলো। কিন্তু কবিগুরু যে উত্তর দিলেন তাতে খুব একটা উৎসাহ পাওয়া গেল না। তিনি নিজে ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ আদর্শবাদী। কারও আদর্শের ওপর হস্তক্ষেপ করা তাঁর নীতির বাইরে। তাই তিনি জানালেন যে কাজী অনশন করছেন একটি আদর্শকে অবলম্বন করে। আদর্শ ভাঙতে বলা মানেই একজনকে আত্মহত্যায় সাহায্য করা। এবং তিনি তা করতে পারবেন না।

কবিগুরুর নিকট থেকে এ রকম উত্তর পেয়ে সকলেই বেশ নিরুৎসাহ হয়ে পড়লেন। তবু চেষ্টা চলতে লাগল। বিভিন্ন সভা-সমিতিতে কলকাতার বুকে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি হুগলী জেলে নজরুলকে অনশন ভঙ্গের অনুরোধ জানাবার জন্যে গিয়েছিলেন। এই সময়ে কানপুর প্রবাসী মহিলা সাহিত্যিক শ্রীমতী লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র এই মূল্যবান চিঠিখানি লেখেন :

বাজে শিবপুর, হাওড়া
১৭ই মে, ১৯২৩।

"পরম কল্যাণীয়াসু,

কিছুকাল এখানে ছিলাম না। ঘণ্টা তিনেক হইল বরিশাল হইতে বাটী আসিয়া পৌঁছিয়া তোমার পোষ্ট কার্ড পাইলাম। এই জন্যেই যথাসময়ে চিঠির জবাব দেওয়া হয় নাই।....

হুগলী জেলে আমাদের কবি কাজী নজরুল উপোস করিয়া মর-মর হইয়াছে। বেলা ১টার গাড়ীতে যাইতেছি, দেখি যদি দেখা করিতে দেয় ও দিলে আমার অনুরোধে যদি সে আবার খাইতে রাজী হয়। না হইলে আর কোন আশা দেখি না। একজন সত্যকার কবি। রবিবাবু ছাড়া বোধহয় এখন কেহ আর এত বড় কবি নাই।

....দাদা।"

অনশন ভঙ্গের জন্য নলিনীকান্ত সরকার, বেসরকারী জেল পরিদর্শক স্যার আবদুল্লা সুরওয়ার্দি, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখ অনেকে অনেকভাবে চেষ্টা করেছিলেন—কিন্তু সে অন্য কথা।

কবিগুরু কী ঐ একটি মাত্র চিঠি দিয়েই তাঁর কর্তব্য শেষ করলেন?

না। এমন অবহেলায় রবীন্দ্রনাথ কোন দিনই তাঁর কর্তব্য শেষ করেন নি। প্রথম দিকে তিনি বিষয়টির প্রতি বিশেষ একটা গুরুত্ব দেন নি সত্য কথা, কিন্তু দীর্ঘ ত্রিশ দিনের পরও যখন নজরুলের আমরণ অনশন ব্রত সমানে চলছে জানতে পারলেন, তখন তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। তাঁর মধ্যে চিত্তচাঞ্চল্য দেখা গেল। সর্বতোভাবে নজরুলের জীবনরক্ষা তাঁর কাছে প্রধানতম কর্তব্য হয়ে দাঁড়াল। এই সময় কাজীর জীবন রক্ষার জন্যে কবিগুরু কী করেছিলেন সে-সম্পর্কে তিনি তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে একটি পত্রে জানিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলের পারস্পরিক সম্পর্ক জানার জন্যে পত্রটি নিঃসন্দেহে মূল্যবান। 'বিদ্রোহী কাজী নজরুল জন্মোৎসব কমিটি'র সম্পাদককে লেখা রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি মূল্যবান চিঠির মধ্যে কবিগুরুর চিঠিটি আছে। সুতরাং কবিগুরুর চিঠি সমেত আমরা রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পূর্ণ চিঠিটি এখানে উদ্ধৃত করলাম। রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

"কবি নজরুল ইসলাম আমার পূজনীয় পিতৃদেব রবীন্দ্রনাথের পরম স্নেহভাজন ছিলেন। ১৯২৩ সালে প্রকাশিত "বসন্ত" ঋতুনাট্যখানি পিতৃদেব উৎসর্গ করেছিলেন নজরুলকে—সে সংবাদ আপনাদের অজানা নয় বোধহয়। কিন্তু এই উপলক্ষ্যে আর একটি সংবাদ জানাই, যা

আপনারা অনেকেই হয়তো ইতিপূর্বে জানবার সুযোগ পান নি। পিতৃদেব কী গভীর স্নেহ ও শ্রদ্ধা করতেন নজরুলকে তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ স্বরূপ আমাকে লেখা পিতৃদেবের একখানি পুরাতন পত্র উদ্ধৃত করলাম। অসহযোগ আন্দোলনের যুগ তখন, নজরুল সরকারী জেলে রাজবন্দী, বাইরে কেমন করে জানি না খবর বেরিয়ে পড়েছে যে, তিনি সেখানে কঠোর প্রায়োপবেশন শুরু করেছেন।

'কল্যাণীয়েষু, রথী, নজরুল ইসলামকে প্রেসিডেন্সী জেলের ঠিকানায় টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলুম। লিখেছিলুম, give up hunger strike, our literature claims you. জেল থেকে memo এসেছে, the addressee not found অর্থাৎ ওরা আমার বার্তা ওকে দিতে চায় না, কেন না নজরুল প্রেসিডেন্সী জেলে না থাকলেও ওরা নিশ্চয় জানে সে কোথায় আছে। অতএব নজরুল ইসলামের আত্মহত্যায় ওরা বাধা দিতে চায় না—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।' কী অপরিসীম উদ্বেগ ও আগ্রহের মধ্যে বিশ্বকবি সেদিন আহ্বান জানিয়েছিলেন বিদ্রোহী-কবি নজরুলকে—our literature claims you—শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

রবীন্দ্রনাথ যে নজরুলকে অত্যধিক স্নেহ করতেন ও গভীরভাবে ভালবাসতেন তা কোনো তর্কের অপেক্ষা রাখে না। এই চিঠিটি তার উজ্জ্বলতম প্রমাণ। অবশ্য পরে প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথ ও দেশবন্ধুর যুগ্ম হস্তক্ষেপে বিষয়টির একটি মিটমাট হয়ে গিয়েছিল। তৎকালীন সরকার জেলের মধ্যে নানাবিধ দুর্নীতির সংশোধন করবেন—এমন কথা দেওয়ায় এবং নজরুলের প্রধান দাবীগুলির অধিকাংশ মেনে নেওয়ায় তরুণ কবি কুমিল্লার বিরজাসুন্দরী দেবীর হস্তে লেবুর রস পান করেন। এইরূপে সুদীর্ঘ চল্লিশ দিন পরে নজরুলের ঐতিহাসিক অনশন ধর্মঘটের সমাপ্তি ঘটে।

স্বর্গত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রের মধ্যেই "বসন্ত" নাটিকার কথাটি উল্লিখিত হয়েছে। নজরুলের প্রায়োপবেশনে রবীন্দ্রনাথ যে বিশেষ রূপে চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন সেই মানসিক ক্ষত-বিক্ষত অবস্থাটি উপলব্ধির জন্যে এই উৎসর্গীকরণ ব্যাপারটি আমাদের বিশেষরূপে সাহায্য করবে। জেল থেকে "addressee not found" বলে তাঁদের memo ফেরত আসতেই রবীন্দ্রনাথ ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। নতুন কোন্ পন্থা অবলম্বন করে কাজীকে শান্ত করা যাবে সে কথা ভাবতে লাগলেন।

হঠাৎ আকস্মিকভাবেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে ডাক পড়ল পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের। রবীন্দ্রনাথ ডেকে পাঠিয়েছেন। মনের মধ্যে 'কী ব্যাপার, কী ব্যাপার' তোলপাড় করতে করতে নির্দিষ্ট সময়ে পবিত্র বাবু কবিগুরুর সামনে এসে হাজির হলেন। টেবিলের ওপর থেকে "বসন্ত" নাটিকাখানি তিনি হাতে তুলে নিলেন। বইখানি তিনি তরুণ কবি নজরুলের নামেই উৎসর্গ করেছেন। উৎসর্গ পত্রে লেখা ছিল: "শ্রীমান কবি কাজী নজরুল ইসলাম স্নেহভাজনেষু। তারিখ ১৩২৯ সালের ৯ই ফাল্গুন।" তার নীচে তিনি কাঁচা কালি দিয়ে নিজের নাম সই করলেন। তারপরই বইখানি এগিয়ে দিলেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে।

এ প্রসঙ্গে বিশেষরূপে স্মরণযোগ্য এই যে, কবি নিজের আত্মীয়স্বজন ছাড়া আর কোন কবিকে নিজের বই উপহার দেননি। বইখানি পবিত্র বাবুকে দিয়ে কবি নির্দেশ দিলেন যে, এখনই হুগলী জেলে নজরুলের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। কাল বিলম্ব না করে পবিত্র বাবু তখনই ছুটলেন হুগলীর পথে। জেল কর্তৃপক্ষ অন্যান্য নজরুল-দর্শনপ্রার্থীর মত পবিত্র বাবুর দর্শন প্রার্থনা প্রথমে নাকচ করে দিলেন। কিন্তু যখন তাঁরা শুনলেন যে, নোবেল প্রাইজ পাওয়া কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নজরুলের নামে বই 'ডেডিকেট' করেছেন এবং

সে বই দেওয়ার জন্তেই পবিত্র বাবু তাঁদের অনুমতি-প্রার্থী তখন তাঁরা বিস্মিত না হয়ে পারলেন না। সেদিনের বর্ণনা পবিত্র বাবু দিয়েছেন এই ভাবে : "একটা সাধারণ 'কনভিক্টকে' 'পোয়েট টেগোর' বই 'ডেডিকেট' করেছেন, একথা শুনে তাজ্জব বনে গেল জেলের সাহেব ও ফিরিঙ্গি অফিসার ও পাহারাদার মহল। সসম্ভ্রমে প্রশ্ন করল : 'ইজ হি রীয়েলী সো এ গ্রেট ম্যান? থ্যাঙ্ক হেভেন্স!"

তাজ্জবের ব্যাপারই বটে—নজরুলের নিকটেও। এ সম্মান আকস্মিক এবং আশাতীত! নজরুল তো বিশ্বাসই করতে চান না। কবিগুরু তাঁকে স্নেহ করেন এই পর্যন্ত। কিন্তু সে স্নেহ যে এত গভীর, এত নিবিড় তা উপলব্ধি করে তিনি নির্বাক হলেন। "বড়র পিরীত বালির বাঁধ" প্রবন্ধে নজরুল এ সম্পর্কে লিখেছেন, "তখন আমি আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে রাজ-কয়েদী। অপরাধ, ছেলে খাওয়ার ঘটা দেখে রাজার মাকে একদিন রাগের চোটে, ডাইনী বলে ফেলে ছিলাম!........এরি মধ্যে একদিন এ্যাসিষ্টেণ্ট জেলার এসে খবর দিলেন, আবার কি মশাই, আপনি তো নোবেল প্রাইজ পেয়ে গেলেন, 'আপনাকে রবি ঠাকুর তাঁর "বসন্ত" নাটক উৎসর্গ করেছেন!'

"আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন আরো দু'একটি কাব্য বাতিকগ্রস্ত রাজকয়েদী। আমার চেয়েও বেশী হেসেছিলেন তাঁরা, আনন্দে নয়—যা নয় তাই শুনে। কিন্তু ঐ আজগুবি গল্পও সত্যি হয়ে গেল। বিশ্বকবি সত্যি-সত্যিই আমার ললাটে 'অলক্ষণের তিলক রেখা' এঁকে দিলেন!"

প্রকৃতপক্ষে কবিগুরুর নিকট থেকে কোন বই উৎসর্গ পাবার মত মানসিক পটভূমি তাঁর তখনো তৈরী হয়নি। কিন্তু তিনি পেলেন।

নজরুল তাঁর জীবনে এই স্নেহাশিষের কথা কোন দিনই ভুলেননি। অন্য একটি প্রবন্ধে এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :

"তখন আমার বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ মাত্র। এই সম্মান পাওয়ার কারণ সাহিত্যিক ও কবিদের মধ্যে আমি প্রথম জেলে যাই, জেলে গিয়ে

চল্লিশ দিন অনশনব্রত পালন করি, রাজবন্দীদের উপর অত্যাচারের জন্যও এই অপরাধে আমাকে জেলের নানারকম শৃঙ্খল-বন্ধন—লিঙ্ক ফেটার্স, বার ফেটার্স, ক্রশ ফেটার্স প্রভৃতি লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বসন্ত' নাটক আমায় উৎসর্গ করেন। তাঁর এই আশীর্বাদী-মালা পেয়ে আমি জেলের সর্বজ্বালা, যন্ত্রণা অনশন-ক্লেশ ভুলে যাই।"

অন্যত্র :

"হে সুন্দর, বহ্নি-দগ্ধ মোর বুকে তাই
দিয়েছিলে 'বসন্তে'র পুষ্পিত মালিকা।"

বিশ্বকবির এই উদারতার কথা, এই মহৎ হৃদয়ের কথা শত-কণ্ঠে নজরুল তাঁর কবিতায় ব্যক্ত করেছেন। কিছু উদ্ধৃতির প্রয়োজন। এ উদ্ধৃতি আজো বিশেষ প্রচলিত হয়নি :

"দেখেছি তোমারে যবে হইয়াছে মনে
তুমি চিরসুন্দরের পরম বিলাস!
মানুষ এ পৃথিবীতে অন্তরে বাহিরে
কত সে উদার, কত নির্মল মধুর,
কত প্রিয়-ঘন, প্রেম-রস-সিক্ত তনু,
কত সে সুন্দর হতে পারে সর্বরূপে
তাই প্রকাশের তরে পরম সুন্দর
বিগ্রহ তোমার গড়েছিল ওগো কবি।"

কিন্তু এই উৎসর্গের ব্যাপারটা অনেকের কাছে তিক্ত মনে হয়েছিল। সে দিন যে উন্নাসিকের দল কবিগুরুর চারপাশে ঘিরে থাকতেন। তাঁরা বিশেষ খুশী হতে পারেননি। কেউ-কেউ মৃদু আপত্তিও তুলেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ—রবীন্দ্রনাথই। তিনি নজরুলের ভিতর মহৎ কবি প্রতিভা দেখেছিলেন এবং নির্ভুল ভাবে দেখে ছিলেন—তাই শেষ পর্যন্ত তাঁর মত অপরিবর্তিত ছিল। কিন্তু কী কারণে জানিনা,

নাটিকাটির দ্বিতীয় সংস্করণে উৎসর্গ পত্রটি উহ্য ছিল—অবশ্য পরে (এবং গ্রন্থাবলীতেও) আবার তা সংযোজিত হয়েছে।

উন্নাসিকের দল নজরুলকে ব্যঙ্গ করে লিখেছিলেন:

"বসন্ত দিল রবি
তাইতো হয়েছ কবি।"

ভাবখানা কতকটা এই রকম যে, রবীন্দ্রনাথ বই উৎসর্গ করেছেন বলেই নজরুল কবি বলে গণ্য হয়েছেন। আসলে তিনি সত্যকার কবি নন। তিনি পদ্যকার মাত্র। অবশ্য নজরুল এ সকল ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ধর্তব্যের ভিতর আনেননি।

এই সময়ে নজরুলের কবিতা সম্পর্কে বিস্ময়মুগ্ধ ভাবে কবিগুরু যা লিখেছিলেন তা আজকের দিনে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়: "অরুগ্ন বলিষ্ঠ, হিংস্র নগ্ন বর্বরতা তার অনবদ্য ভাব-মূর্তি রয়েছে কাজীর কবিতায় ও গানে। কৃত্রিমতার কোনো ছোঁয়াচ তাকে কোথাও ম্লান করেনি, জীবন ও যৌবনের সকল ধর্মকে কোথাও তা অস্বীকার করে না। মানুষের স্বভাব ও সহজাত প্রকৃতির অকুণ্ঠ প্রকাশের ভিতর নজরুল ইসলামের কবিতা সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে তার আসন গ্রহণ করেছে। তাই আবির্ভাব মাত্রেই অসামান্য লোকপ্রিয়তা অর্জন করেছেন তিনি।" বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিকে নিত্যকালের রসলোকের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে বলেছেন। যে নির্মল জ্যোতির্মালা নিখিল বিশ্বকে জ্যোতির্ময় করতে পারে, সেই জ্যোতিকে কেবলমাত্র অগ্নিরূপে পার্শ্বে রেখে 'উত্তেজনার আগুন পোহানো' নিতান্ত নির্বোধের কাজ। কবির বিনীত উপদেশ ছিল 'অমৃতের পেয়ালায় উত্তেজনার মদ' যেন কাজী পান না করে। এই উপদেশের কথা নজরুল নিজে এই ভাবে লিখেছেন:

"মনে পড়ে? বলেছিলে হেসে একদিন,
তরবারি দিয়ে তুমি চাঁচিতেছ দাড়ি।
যে জ্যোতিঃ করিতে পারে জ্যোতির্ময় ধরা,
সে জ্যোতিরে অগ্নি করি হলে পুচ্ছ-কেতু?'

হাসিয়া কহিলে পরে, 'এই যশঃখ্যাতি
মাতালের নিত্য সান্ধ্য নেশার মতন।...
মধু-র ভৃঙ্গারে কেন কর মদ্যপান ?"

কবি-বন্ধু জনাব মুজফফর আহমদের মতে তরবারি দিয়ে দাঁড়ি চাঁচার কথা রবীন্দ্রনাথ কাজীকে বলেছিলেন ১৯২০ খৃষ্টাব্দের কোন সময়—কিন্তু আমাদের মনে হয় এটি আরো পরের ঘটনা, সম্ভবত 'বিদ্রোহী' প্রকাশের পরের ব্যাপার। নজরুল 'আমার কৈফিয়ত' কবিতায় স্পষ্ট রূপে উল্লেখ করেছেন: "গুরু কন, তুই করেছিস শুরু তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁচা।" যা' হোক মুজফ্ফর সাহেব এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন: "তিনি (রবীন্দ্রনাথ) সম্ভবতঃ নজরুলের কাব্য-সাধনা ও রাজনৈতিক সংগ্রামে সমন্বয়ের চেষ্টা দেখে এই কথাটি বলে থাকেবন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, জনগণের হাততালি বা সস্তায় বাজি মাত করা থেকে দূরে থাকা এবং সুমার্জিত নিটোল কাব্য রচনার দিকে কাজী কবিকে আকৃষ্ট করার জন্যেই কবিগুরুর এই উক্তি। তাঁর সম্পূর্ণ উক্তিটি ছিল এই রকম: ওহে কাজী, তুমি যে তরবারি দিয়ে দাড়ি চাঁচা আরম্ভ করেছ কিন্তু আমাদের শাস্ত্রকারেরা ক্ষৌর কর্মের জন্য ক্ষুরকেই শ্রেয় মনে করেন।

'তরবারি' অপেক্ষা 'ক্ষুরের' মধ্যেই বুদ্ধির দীপায়ন ও কাব্যে পরিশীলনের কথাটি ব্যক্ত হয়ে ওঠে। স্থূল হ'তে সূক্ষ্ম জিনিসের দিকেই তিনি কাজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

এ প্রসঙ্গের পূর্ণতর এবং স্পষ্টতর ব্যাখ্যা পাই গজেন্দ্রকুমার মিত্রর বর্ণনায়। উল্লিখিত ঘটনার বেশ কিছুকাল পরে (বর্তমান ব্যাধিগ্রস্ত হবার কিছু পূর্বে) আলমোড়ায় নজরুল-জয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানে স্বয়ং নজরুল, গজেন্দ্রকুমার মিত্র এবং অন্যান্য সুধী আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এখানে অভিভাষণ দানের সময় নজরুল নিজে তরবারি দিয়ে দাঁড়ি চাঁচার ঘটনা উল্লেখ করে বলেছিলেন, 'কবিগুরু আমাকে তরবারি দিয়ে দাড়ি চাঁচতে নিষেধ করেছেন, বলেছেন পূর্ণের সাধনা

করতে। সেই থেকে আমার দৃষ্টিভঙ্গী নতুনতর রূপ নিয়েছে। সেই থেকে আমি অখণ্ডের দিকে এগিয়ে চলেছি। এখন আমার সাধনা পূর্ণের সাধনা, আমি পূর্ণের সাধানা করে চলেছি।' কবি এই পূর্ণের সাধনা কথাটার ওপর অত্যন্ত জোর দিয়ে তিন-চার বার বলেছিলেন। তাঁর চোখ দিয়ে তখন অবিরল ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল।

'দাড়ি চাঁচার' ঘটনাটি কবির জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা সন্দেহ নেই। এ সম্পর্কে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন: "সেদিন সকালে আমি আর নজরুল দু'জনে গিয়েছিলাম রবীন্দ্রনাথের কাছে। নজরুলকে তার স্বরচিত গান শোনাতে বললেন রবীন্দ্রনাথ। নজরুল গাইলো 'চল-চঞ্চল বাণীর দুলাল,' 'ধ্বংস পথের যাত্রীদল' আর 'শিকলপরা ছল'। রবীন্দ্রনাথ খুশী হলেন গানশুনে। নজরুল চলে যাবার পর আমাকে বললেন—নজরুলের নিজস্ব একটি জোরালো ধরণ আছে। সেদিন দু'চারটি কথার পর নজরুলকে বললেন—শুনেছি তুমি নাকি মনযোগানো লেখা লিখতে শুরু করেছো। বিধাতা তোমাকে পাঠিয়েছেন তরোয়াল হাতে, সে তরোয়াল কী তিনি তোমার হাতে দিয়েছেন দাড়ি চাঁচার জন্যে? রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলো নিয়ে নজরুল একটি কবিতা লিখেছিল। তার কবিতা প্রমাণ করল যে সে রবীন্দ্রনাথের কথার অর্থ ধরতে পারে নি।"

এ সম্পর্কে নজরুল নিজে লিখেছেন, "অনেক দিন তাঁর কাছে না গেলে নিজে ডেকে পাঠিয়েছেন। কত দিন তাঁর তপোবনে গিয়ে থাকবার কথা বলেছেন। হতভাগা আমি, তাঁর পায়ের তলায় বসে মন্ত্র গ্রহণের অবকাশ করে উঠতে পারলাম না। বনের মোষ তাড়িয়েই দিন গেল।....এই নিয়ে কতদিন আমায় কতভাবে অনুযোগ করেছেন —'তুমি তলোয়ার দিয়ে দাড়ি চাঁচছ—তোমাকে জনসাধারণ একেবারে থানায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে'।"

কেবল রবীন্দ্রনাথ কেন, সেকালে অনেকেই নজরুল সম্পর্কে এই প্রশ্ন তুলেছিলেন। নজরুলের কাছে তাঁদের দাবী ছিল অমর কবিতার।

কিন্তু নজরুল তাঁদের সে কথায় কর্ণপাত করেন নি। 'আমার কৈফিয়ত' কবিতায় তিনি এ সকলের জবাব দিয়েছিলেন :

"পরোয়া করি না বাঁচি বা না বাঁচি যুগের হুজুগ কেটে গেলে,
মাথার উপর জ্বলিছেন রবি, রয়েছে সোনার শত ছেলে।"

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে চিনেছিলেন। তাই তিনি তাঁকে শান্তিনিকেতনে আহ্বান করেছিলেন। প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে, নজরুল লাইব্রেরীতে বসে পড়াশুনা করবেন, দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট গান শিখবেন আর সময়মত ছেলেদের কিছু কিছু ড্রিল শেখাবেন। বলাবাহুল্য, এ আমন্ত্রণ গভীর স্নেহ হতে উৎসারিত।

প্রস্তাব শুনে নজরুল তো রীতিমত বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি সে প্রস্তাব তো গ্রহণ করলেনই না, এমনকি কিছুটা আশঙ্কায় কিছুটা সভ্রমে সাময়িকভাবে কিছুদিনের জন্য কবিগুরুর নিকট যাওয়াই বন্ধ করে দিলেন। বন্ধু-বান্ধবদের (জনাব আফজাল-উল হক প্রমুখ) নিকট তিনি বলতেন যে, কবিগুরুর নিকট গেলে তিনি তাঁর নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলবেন। উদাহরণ স্বরূপ ছন্দ যাদুকার সত্যেন্দ্র নাথ দত্তের কথা উল্লেখ করতেন। বলতেন যে সত্য কবি এমন দুর্লভ প্রতিভার অধিকারী হয়েও রবীন্দ্র-সর্বস্ব হ'য়ে উঠেছেন। তিনি নিজেও গেলে রবির উজ্জ্বল কিরণে খাদ্যোতের মত হারিয়ে যাবেন। তার থেকে এই ভাল—তিনি দূরে থেকে স্বতন্ত্র হয়ে বাঁচতে চান।

৯.

কিন্তু এই হৃদ্য সম্পর্ক ও স্নেহ-প্রীতি ক্ষণিকের জন্য হলেও ১৩৩৪ সালে কেমন যেন বেসুরো হয়ে উঠেছিল। একটা তপ্ত ও অপ্রীতিকর আবহাওয়া সমগ্র বিষয়টাকে জটিল করে তুলেছিল। কেবল রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল নন—সেকালের কমবেশী সকল সাহিত্যিক প্রতিপক্ষের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছিলেন। সম্ভবত সে জের

এখনো চলছে। সুতরাং বিবরটি একটু গুছিয়ে বলা প্রয়োজন। কিন্তু তার আগে আমাদের বিশেষরূপে স্মরণ রাখতে হবে : রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের এই অপ্রীতি নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী। একটি উত্তেজনায় মধ্যে তার জন্ম, উত্তেজনার শেষে তার লয়। আসলে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল উভয়েই ছিলেন সকল প্রকার দ্বন্দ্বের বিরোধী। অন্যান্য অনেক সাহিত্যিক সেকালে 'সাহিত্যিক ঝগড়া'র নামে ব্যক্তিগত 'ঝাল' মিটিয়েছেন। কিন্তু এই দু'জন মহৎ কবি সর্বতোভাবে সকল প্রকার আবর্জনাকে পরিহার করে চলতেন।

সেকালে কেবল (সেকালে কেন, সকল কালেই) সাহিত্যিকদের মধ্যে স্পষ্টরূপে দু'টি দলের সৃষ্টি হয়েছিল—নবীন ও প্রবীন। একদল প্রাচীনপন্থী, তাঁদের ভাবধারার মধ্যে কিছুটা রক্ষণশীলতার পরিচয় ছিল। অন্যদল নবীন, সাহিত্যের নতুনতর রীতি-নীতি ও ভাবধারা প্রকাশের দিকে তাঁরা বিশেষ রূপে আগ্রহশীল ছিলেন। কলহ বাধল উভয় দলের রীতি-নীতি নিয়ে। কলহ কিন্তু মহৎ কলহ। তাতে বাংলা সাহিত্যের হয়তো কিছুটা মঙ্গলই হয়েছিল। এই কলহের মধ্যে সর্বপ্রথম এগিয়ে আসেন সজনীকান্ত দাস। আধুনিক সাহিত্যের রীতি-নীতি সম্পর্কে তিনি সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন একটি পত্রের মাধ্যমে। ১১, ইউরোপিয়ান এ্যাসাইলাম হতে ১৩৩৩ সালে ২৩শে ফাল্গুন তারিখে লিখিত পত্রটির সামান্য অংশ উদ্ধৃত করলে কলহের মূল বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হবে :

"শ্রীচরণকমলেষু

প্রণামনিবেদনমিদং

সম্প্রতি কিছুকাল যাবৎ বাঙলা দেশে এক ধরনের লেখা চলছে, আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন। প্রধানতঃ 'কল্লোল' ও 'কালি-কলম' নামক দু'টি কাগজেই এগুলি স্থান পায়। ....এই লেখা দুই আকারে প্রকাশ পায়—কবিতা ও গল্প। কবিতা ও গল্পের যে প্রচলিত রীতি

আমরা এতাবৎকাল দেখে আসছিলাম, লেখাগুলি সেই রীতি অনুসরণ করে চলে না। কবিতা stanza, অক্ষর, মাত্রা অথবা মিলের কোনো বাঁধন মানে না। গল্পের form সম্পূর্ণ আধুনিক। লেখার বাইরেকার চেহারা যেমন বাধা-বাঁধনহারা, ভেতরের ভাবও তেমনি উচ্ছৃংখল। যৌনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব অথবা এই ধরনের কিছু নিয়েই এগুলি লিখিত হচ্ছে। ....Realistic নাম দিয়ে এগুলিকে সাহিত্যের একটা বিশেষ অঙ্গ বলে চালাবার চেষ্টা হচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নরেশ বাবুর কয়েকখানা বই, 'কল্লোলে' প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর 'রজনী হল উতলা' নামক একটি গল্প, ...'কালি কলমে' নজরুল ইসলামের 'মাধবী প্রলাপ' ও 'অনামিকা' নামক দু'টি কবিতা ও অন্যান্য কয়েকটি লেখার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ....আপনার মতামতের জন্য, আমি এই চিঠি দিচ্ছি। বিরুদ্ধে বা পক্ষে যে দিকেই আপনি মত দেন, আপনার মত সাধারণের জানা প্রয়োজন। ....ক্ষুদ্র লেখকের লেখনীতে সত্য প্রতিবাদও অনেক সময় ঈর্ষা বলে হেলা পায়। আপনি কথা বললে আর যাই বলুক, ঈর্ষার অপবাদ কেউ দেবে না। আমার প্রণাম জানবেন।

প্রণত—শ্রীসজনীকান্ত দাস।"

সজনী বাবুর এই চিঠি সম্পর্কে অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্তের মন্তব্য বিশেষ মূল্যবান। তাঁর মন্তব্যের মধ্যেই আসল ব্যাপারটি প্রকাশ পেয়েছে: "শনিবারের চিঠি'র সজনীকান্ত দাস রবীন্দ্রনাথের কাছে আর্জি পেশ করলেন। যেন তিনি কত বড় অধিকারী, সমাজের পক্ষ থেকে কত বড় ভার দেওয়া হয়েছে তাঁকে—এই মামলায় এইটুকুই আসল রসিকতা। ....রসিকতাটা বুঝতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাই সরাসরি খারিজ করে দিলেন আর্জি। লিখলেন:

কল্যাণীয়েষু

কঠিন আঘাতে একটা আঙুল সম্প্রতি পঙ্গু হওয়াতে লেখা সহজে সরচে না। ফলে বাকসংযম স্বতঃসিদ্ধ। ....আলোচনা করতে-

হ'লে সাহিত্য ও আর্টের মূলতত্ত্ব নিয়ে পড়তে হ'বে। এখন মনটা ক্লান্ত, উদভ্রান্ত, পাপগ্রহের বক্রদৃষ্টির প্রভাব—তাই এখন বাগবাত্যায় ধুলো দিগদিগন্তে ছড়াবার সখ একটুও নেই। সুসময় যদি আসে, তখন আমার যা বলবার বলব। ইতি। ২৫শে ফাল্গুন, ১৩৩৩।

শুভাকাঙ্ক্ষী—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

একদিন রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' আর 'ঘরে-বাইরে' নিয়েও এমনি রোষ প্রকাশ করা হয়েছিল।....সে যুগের সজনীকান্ত ছিলেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। কিন্তু এ-যুগের সজনীকান্ত 'নষ্টনীড়'আর 'ঘরে-বাইরে' সম্বন্ধে দিব্যি সার্টিফিকেট দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথকে। ঐ চিঠিতেই তিনি লিখেছিলেন: 'ঠিক যতটুকু পর্যন্ত যাওয়া প্রয়োজন, ততটুকুর বেশী আপনি কখনো যাননি। অথচ যে সব জিনিস নিয়ে আপনি আলোচনা করেছেন, সেই সব জিনিসই আধুনিক এই লেখকদের হাতে পড়লে কি রূপ ধারণ করত, ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। 'একরাত্রি', 'নষ্টনীড়' ও 'ঘরে-বাইরে' এরা লিখলে কি ঘটত—ভাবতে সাহস হয় না।' যুগে যুগে সজনীকান্তদের এই একই রকম প্রতিক্রিয়া, একই রকম কাণ্ডজ্ঞান।"

দীর্ঘ উদ্ধৃতির ভিতর দিয়ে বিবাদমান দলের মূল কারণ ও গতি-প্রকৃতি হয়তো আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি। কিন্তু চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বাগবাত্যায় ধুলো দিগন্তে ছড়ানো থেকে নিরস্ত থাকার যে ইংগিত দিয়েছিলেন তা থেকে তিনি দীর্ঘদিন দূরে থাকতে পারেননি। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় উভয় দলের তপ্ত মনোভাব দাবানলের মতো জ্বলে ওঠার অপেক্ষা করছিল। আগুন জ্বালালেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। ১৩৩৪ সালের শ্রাবণে সদ্যপ্রকাশিত অভিজাত সাহিত্য পত্রিকা 'বিচিত্রা'র প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হলো তাঁর "সাহিত্য-ধর্ম" প্রবন্ধটি। সজনী বাবুর ভাষায় প্রবন্ধটি 'ঐতিহাসিক' এবং 'আণবিক বোমা'। সত্য সত্যই প্রবন্ধটির প্রকাশ আণবিক বোমা বিস্ফোরণের মতই মারাত্মক হয়ে উঠেছিল। এই প্রবন্ধটিকে কেন্দ্র করে সকল সাহিত্যিক মহলে প্রকাশিত

হলেন। ভাদ্রের (১৩৩৪) 'বিচিত্রা'র (প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা) শ্রীনরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত "সাহিত্য-ধর্মের সীমানা" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের প্রতিবাদ জানালেন। আধুনিকদের সমর্থনের জন্য শরৎচন্দ্র এগিয়ে এলেন। তিনি ১৩৩৪ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'বঙ্গবাণী'তে লিখলেন "সাহিত্যের রীতি ও নীতি"। মোহিতলাল মজুমদারও পিছিয়ে থাকলেন না। তিনি 'আধুনিক সাহিত্য ও শরৎচন্দ্র প্রবন্ধে যুগপৎ শরৎ-চন্দ্র ও নজরুলের বিরুদ্ধে আঘাত হানলেন। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩৪ সালের ১৩ই আশ্বিনের 'আত্মশক্তি'তে। বিবাদ অনেকদূর গড়িয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বিশেষ বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি সাধারণীকরণ প্রচেষ্টায় লিখলেন 'সাহিত্যে নবত্ব'—প্রকাশের বাহন হলো ১৩৩৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসের 'প্রবাসী।' এ সকল প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য সাহিত্যের চিরন্তন রীতি-নীতি কি হবে, সে সম্পর্কে আলোচনা—নবীন প্রবীণের দ্বন্দ্ব একটি মাধ্যম মাত্র।

রবীন্দ্রনাথের সকল প্রবন্ধে 'সাহিত্য ধর্ম' বা 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রভৃতিতে আর্টের মূল রীতি-নীতির আলোচনাই প্রাধান্য পেয়েছিল, সঙ্গে ছিল উগ্র আধুনিকদের উগ্র ভাবধারার প্রতিবাদ। তিনি কোথাও কারও নাম ধরে কোনো আলোচনা করেননি। তবুও নজরুল বিচলিত হয়েছিলেন। অবশ্য কারণ আছে। নজরুল এতাবৎকাল কোনো আলোচনায় যোগ দেননি। তথাপি সকল কিছু প্রধানতঃ তাঁকেই কেন্দ্র করে এগিয়ে চলছিল। কেননা তিনি এবং নরেশ সেনগুপ্ত ছিলেন আধুনিক নবীন-দলের প্রতিনিধিস্থানীয়। কমবেশী সকলের প্রবন্ধে এমন কিছু ইঙ্গিত ছিল—যেগুলি নজরুলের গাত্রদাহের কারণ হয়েছিল। আধুনিকদের সম্পর্কে "সাহিত্য ধর্ম" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন...."সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে বিদেশের আমদানী যে একটা বে-আব্রুতা এসেছে, সেটাকেও এখানকার কেউ-কেউ মনে করবেন নিত্য পদার্থ; ভুলে যান যা নিত্য, তা অতীতকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না।....এই ল্যাংগট-পরা গুলি-পাকানো ধুলোমাখা আধুনিকতারই একটা স্বদেশী দৃষ্টান্ত দেখেছি

হোলিখেলার দিনে চিৎপুর রোডে। সেই খেলায় আবির নেই, গুলাব নেই,—পিচকারি নেই, গান নেই, লম্বা লম্বা ভিজে কাপড়ের টুকরো দিয়ে রাস্তার ধুলোকে পাঁক করে তুলে তাই চিৎকার শব্দে পরস্পরের গায়ে ছড়িয়ে দিয়ে পাগলামি করাকেই জনসাধারণ বসন্ত উৎসব বলে গণ্য করছে। পরস্পরকে মলিন করাই তার লক্ষ্য, রঙীন করা নয়।"

"সাহিত্যে নবত্ব" প্রবন্ধের বক্তব্য আরো স্পষ্ট, ইঙ্গিত লক্ষ্যভেদী। তিনি লিখলেন: "—শক্তির একটা নতুন স্ফূর্তির দিনেই শক্তিহীনের কৃত্রিমতা সাহিত্যকে আবিল করে তোলে। সন্তরণপটু যেখানে অবলীলাক্রমে পার হয়ে যাচ্ছে, অপটুর দল সেখানেই উদ্দাম ভঙ্গীতে কেবল জলের নীচেকার পাঁককে উপরে আলোড়িত করতে থাকে। অপটুরাই কৃত্রিমতা দ্বারা নিজের অভাব পূরণ করতে প্রাণপণে চেষ্টা করে; সে রূঢ়তাকে বলে শৌর্য, নির্লজ্জতাকে বলে পৌরুষ।"

মোহিতলাল তো স্পষ্টরূপেই লিখলেন: "... তিনি (শরৎচন্দ্র) নজরুল-কল্লোল-কালি-কলমের সাহিত্য সৃষ্টিতে আস্থাবান—যাহাদের রচনার প্রতি অক্ষরে কৃত্রিমতা চীৎকার করিয়া উঠিতেছে।"

রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রবন্ধের একটি স্থানে আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে যে সুস্পষ্ট উক্তি নজরুলকে বিশেষরূপে বিচলিত করেছিল, তা এই: "....মোহিতলাল সাধারণের কাছে খ্যাতিলাভ করেছেন। এই খ্যাতির কারণ তাঁর কাব্যের অকৃত্রিম পৌরুষ। অকৃত্রিম বলছি এই জন্যে, তাঁর লেখায় তাল-ঠোকা পাঁয়তারা-মারা পালোয়ানি নেই। যথার্থ যে বীর, সে সার্কাসের খেলোয়াড় হতে লজ্জাবোধ করে। পৌরুষের মধ্যে শক্তির আড়ম্বর নেই, শক্তির মর্যাদা আছে; সাহস আছে, বাহাদুরী নেই।"

কবিগুরুর এ সকল ইঙ্গিত আধুনিক সাহিত্যের নামে লেখা হলেও মূল লক্ষ্য যে নজরুল—এরূপ একটি ধারণা কাজী কবির হয়েছিল। সে ধারণা তাঁর ভ্রান্তও হতে পারে। কেন না, এরূপ একটি নৈর্ব্যক্তিক

আলোচনাকে নিজের সম্পর্কে বলে গ্রহণ করে ক্ষুব্ধ হওয়ার কোনো সংগত কারণ নেই। তবুও নজরুল এই ইংগিতকে নিজের বলে গ্রহণ করে বিচলিত হয়েছিলেন। কিন্তু তখনো পর্যন্ত তিনি কোথাও কিছু লিখিতভাবে প্রকাশ করেননি। তিনি মনে-প্রাণে বিরোধকে এড়িয়ে চলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু 'শনিবারের চিঠি' ১৩৩৪ সালের মাঘ সংখ্যায় মুদ্রিত শ্রীসুনীতি কুমারকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি প্রকাশিত হতেই নজরুল বিশেষরূপে ক্ষুব্ধ হলেন। এই সময় তরুণদের আহ্বান করে নজরুল অনেকগুলি প্রবন্ধ ও কবিতা লিখেছিলেন। সে সকল কবিতা ও প্রবন্ধে নজরুল বলতে চেয়েছেন যে, পৃথিবীতে যা কিছু মঙ্গলময়. যা কিছু নতুন, যা কিছু প্রগতিশীল, তার সবার মূলে প্রধানতঃ রয়েছে অগ্রপথিক তরুণদের উদ্যম ও সৎকর্ম প্রচেষ্টা। নজরুল ছিলেন তরুণদলের নিশানবর্দার, পতাকাবাহী। তাই তাঁর কবিতায় ও গানে তারুণ্যের বিজয় ঘোষণা অনিবার্য হয়ে উঠেছে। 'ছাত্রদলের গান', 'তরুণের সাধনা' ইত্যাদি কবিতা ও প্রবন্ধগুলি লক্ষ্য করলেই তা বোঝা যাবে। এই সময় বিভিন্ন সভাসমিতিতেও তিনি তারুণ্যের বিজয় ঘোষণা করছিলেন বক্তৃতায় ও গানে।

মুদ্রিত চিঠিতে তরুণদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্রোক্তি সুস্পষ্ট। চিঠির এক স্থানে আছে ঃ "তারুণ্য নিয়ে যে একটা হাস্যকর বাহ্বাস্ফোটন আজ হঠাৎ দেখতে দেখতে মাসিক-সাপ্তাহিকের আখড়ায় আখড়ায় ছড়িয়ে পড়ল, এটা অমরাবতীবাসী ব্যঙ্গ-দেবতার অট্টহাস্যের যোগ্য। শিশু যে আধো আধো কথা কয়, সেটা ভালই লাগে, কিন্তু যদি সে সভায় সভায় আপন আধো আধো কথা নিয়েই গর্ব করে বেড়ায়, সকলকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চায় "আমি কচি খোকা," তখন বুঝতে পারি কচি ভাব অকালে ঝুনো হয়ে উঠেছে। তরুণের স্বভাবে উচ্ছৃংখলতার একটা স্থান আছে। স্বাভাবিক অনভিজ্ঞতা ও অপরিণতির সঙ্গে সেটা খাপ খেয়ে যায়, কিন্তু সেইটেকে নিয়ে যখন সে স্থানে অস্থানে বাহাদুরী করে বেড়ায়, 'আমরা তরুণ, আমরা তরুণ' করে আকাশ মাত

করে তোলে, তখন বোঝা যায় সে বুড়িয়ে গেছে, বুড়ো-তারুণ্যের অজ্ঞানকৃত প্রহসনে হেসে উঠে জানিয়ে দিতে হবে যে, এটাকে আমরা মহাকালের মহাকাব্য বলে গণ্য করি নে!"....

এ ইঙ্গিত যে সরাসরি নজরুলকে করা হয়েছে, কাজীর অনেক বন্ধু-বান্ধব সে-কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, নজরুলও কিছুটা বিশ্বাস করলেন। তবুও রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কিছু করতে তিনি ঠিক মন থেকে সমর্থন পাচ্ছিলেন না। কিন্তু যেটুকু সংকোচ ছিল, তা কেটে গেল রবীন্দ্রনাথের একটি ভাষণের মুদ্রিত কপি পাঠ করে। ভাষণটি ১৯২৭-এর ১৩ই ডিসেম্বরে রবীন্দ্র-পরিষদে প্রদত্ত হয়েছিল। এই ভাষণে এমন একটি অংশ ছিল, সম্ভবতঃ যেটি সরাসরি একমাত্র নজরুল সম্পর্কে-ই প্রযোজ্য। ফলে, নজরুল রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে সরাসরি প্রতিবাদে লিপ্ত হলেন।

১০

বাংলা সাহিত্যে তখন সোনালী সমৃদ্ধির যুগ। রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-নজরুল তিন জনেই সক্রিয়। ফলে আঙ্গিক-প্রকরণ, ভাব-সম্পদ, শব্দ-সৌন্দর্য সকল দিক থেকেই উন্নতির জোয়ার এসেছিল। তাই বিবাদটি কেবল সাহিত্যের রীতিনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি—ভাষার অন্তপুরেও অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। নতুন ভাবধারা ও রীতি-নীতির সঙ্গেও নতুন শব্দের আমদানীর প্রচেষ্টা চলছিল। বিশেষ করে ইংরাজী, আরবী, ফার্সী ও উর্দু থেকে নতুন নতুন শব্দ তখন বাংলায় বিশেষরূপে প্রচলিত হচ্ছে। এ-বিষয়ের পুরোধা নজরুল। তাঁর কবিতার মাধ্যমে এ সকল ভাষার শব্দসম্পদ নতুনতর গরিমায় বাংলা ভাষায় স্থান লাভ করেছে। এর জন্যে তিনি প্রশংসা পেয়েছিলেন প্রচুর।

এমনি একটি বিদেশী শব্দ 'খুন' (রক্ত)। নজরুল তাঁর অনেক প্রবন্ধ ও কবিতায় এ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। স্মরণীয় 'মোহরম' কবিতায় 'আম্মা লাল তেরি খুনকিয়া খুনিয়া' অথবা 'নিশান বর্দার' প্রবন্ধে: "....আমাদের বিজয়-পতাকা তুলে ধরবার জন্যে এসো সৈনিক। পতাকার রং হবে লাল, তাকে রং করতে হবে খুন দিয়ে...."

এই 'খুন' শব্দটি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ আপত্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মুসলমান-সমাজ তাঁদের দৈনন্দিন কর্ম-জীবনে খুন শব্দটিকে যে অর্থে ব্যবহার করেন সম্ভবতঃ ঠিক সেই অর্থটা রবীন্দ্রনাথের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। একথা স্বীকার করতেই হবে, প্রত্যেক সমাজে এমন কতকগুলি নিত্য ব্যবহার্য শব্দ ও 'ইডিয়ম' থাকে যে গুলির অর্থ এবং ব্যবহার অন্য সমাজের নিকট ঠিক সহজবোধ্য ও সাবলীল হয়ে ওঠে না। বহু ভাষাবিদ মনীষীদের কথা অবশ্য আলাদা।

যা হোক, এই 'খুন' শব্দটিকে কেন্দ্র করে বিবাদ ঘনতর হয়ে উঠল। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বরে রবীন্দ্র-পরিষদে কবিগুরু যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তার সমাপ্তিতে 'খুন' সম্পর্কে কিছু তিক্ত মন্তব্য ছিল। আমরা এখানে সেটি উদ্ধৃত করলাম: "সৃষ্টিশক্তির যখন দৈন্য ঘটে তখনি মানুষ তাল ঠুকে নূতনত্বের আস্ফালন করে। পুরাতনের পাত্রে নবীনতার অমৃত-রস পরিবেশন করবার শক্তি তাদের নেই, তারা শক্তির অপূর্বতা চড়া গলায় প্রমাণ করবার জন্যে সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুতের সন্ধান করতে থাকে। সেদিন কোনো একজন বাঙালী কবির কাব্যে দেখলুম, তিনি রক্ত শব্দের জায়গায় ব্যবহার করেছেন "খুন"। পুরাতন "রক্ত" শব্দে তাঁর কাব্যে রঙ যদি না ধরে তা হলে বুঝব সেটাতে তাঁরই অকৃতিত্ব। তিনি রঙ লাগাতে পারেন না বলেই তাক লাগাতে চান। নতুন আসে অকস্মাতের খোঁচা দিতে, নবীন আসে চিরদিনের আনন্দ দিতে। সাহিত্যে এই রকম নতুন হয়ে ওঠবার জন্যে যাঁদের প্রাণপণ চেষ্টা তাঁরাই উচ্চৈঃস্বরে নিজেদের তরুণ বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু আমি তরুণ বলব তাঁদেরই যাঁদের কল্পনার আকাশ চিরপুরাতন

রক্তরাগে অরুণরঙে সহজে নবীন, চরণ রাঙাবার জন্যে যাঁদের উষাকে নিউমার্কেটে "খুন" ফরমাস করতে হয় না। আমি সেই তরুণদের বন্ধু, তাঁদের বয়স যতই প্রাচীন হোক।"

এই ভাষণটিও নৈর্ব্যক্তিক আলোচনার শামিল। তথাপি একমাত্র "খুন" শব্দটির ওপর অত্যধিক জোর পড়ায় আলোচনার কেন্দ্রীয় ব্যক্তি যে নজরুল তা' সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। ফলে, নজরুল ক্ষুব্ধ হলেন। তা ছাড়া আরও একটি অপ্রধান কারণ ছিল—সেটি রাজনৈতিক মতবাদের পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের রাজনৈতিক মতবাদের কোনই মিল ছিল না।

কোলাহল পূর্ব হ'তেই ঘনীভূত হ'য়ে উঠেছিল—এইবারই সর্বপ্রথম নজরুল একটি প্রবন্ধ লিখলেন রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে। প্রবন্ধটি ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ২য় বর্ষ, ৩৭ সংখ্যা 'আত্মশক্তি' কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল। নাম "বড়র পিরীত বালির বাঁধ"। প্রবন্ধটির নামকরণ দেখেই বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের স্নেহপ্রীতিকে তিনি তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের 'বসন্ত' নাটকের উৎসর্গের ব্যাপারটি উল্লেখ করা হয়েছে আর এতে আছে তিনি কেন 'রক্ত' শব্দের বদলে "খুন" শব্দটি ব্যবহার করেছেন তার ব্যাখ্যা। এ ছাড়াও সম্পূর্ণ প্রবন্ধে কিছু তিক্ত মন্তব্য আর ক্ষুব্ধ মনের অভিমান ছড়িয়ে আছে। আমি এখানে প্রবন্ধটির প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করলাম :

....."হঠাৎ একদিন দেখি ঝড় উঠেছে সাহিত্যের বেণুবনে। এবং দেখতে দেখতে সুরের বাঁশী অসুরের কোঁৎকা হ'য়ে উঠেছে। ছুট ছুট! যত মোলায়েম করেই বেণুবন বলি না কেন, তাতে ঝড় উঠ্‌লে যে তা চিরন্তন বাঁশবনই হ'য়ে ওঠে তা কোন পাষণ্ড অবিশ্বাস করবে ?....

জানতে পারলাম, আমার অপরাধ, আমি তরুণ! তরুণেরা নাকি আমায় ভালবাসে, তারা আমার লেখার ভক্ত।........

এই অভিমন্যুর রক্ষী মনে করে কবিগুরু আমায়ও বাণ নিক্ষেপ

করতে ছাড়েননি। তিনি বলেছেন, আমি কথায় কথায় "রক্ত"-কে খুন বলে অপরাধ করেছি।

কবির চরণে ভক্তের সশ্রদ্ধ নিবেদন, কবি ত' নিজেও টুপি পায়জামা পরেন, অথচ আমরা পরলেই তাঁর এত আক্রোশের কারণ হ'য়ে উঠি কেন বুঝতে পারিনে।

এই আরবী ফার্সী শব্দ প্রয়োগ কবিতায় শুধু আমিই করিনি—আমার বহু আগে ভারতচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি করে গেছেন।

আমি একটা জিনিস কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করে আসছি, সম্ভ্রান্ত হিন্দু বংশের অনেকেই পায়জামা শেরওয়ানী টুপি ব্যবহার করেন এমন কি লুঙ্গিও বাদ যায় না। তা'তে তাদের কেউ বিদ্রূপ করে না, তাদের ড্রেসের নাম হ'য়ে যায় তখন ওরিয়েণ্টাল। কিন্তু ঐগুলোই মুসলমানেরা পরলে তারা হ'য়ে যায় মিঞা সাহেব! মৌলানা সাহেব আর নারদ মুনির দাড়ির প্রতিযোগিতা হ'লে কে যে হারবেন বলা মুশকিল—তবুও ও নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপের অন্ত নেই।

আমি টুপি পায়জামা শিরওয়ানী দাড়িকে বর্জন করে চলেছি শুধু ঐ "মিঞা সাহেব" বিদ্রূপের ভয়েই। তবুও নিস্তার নেই।

এইবার থেকে আদালতকে না হয় বিচারালয় বলব, কিন্তু নাজির পেশকার উকিল মোক্তারকে কি বলব?

কবিগুরুর চিরন্তনের দোহাই নিতান্ত অচল। তিনি ইটালীকে উদ্দেশ্য করে এক কবিতা লিখেছেন, তাতে "উতারো ঘোমটা" তাঁকেও ব্যবহার করতে দেখেছি। 'ঘোমটা খোলা' শোনাই আমাদের চিরন্তন অভ্যাস। 'উতারো ঘোমটা' আমি লিখলে হয়তো সাহিত্যিকদের কাছে অপরাধী হতাম। কিন্তু 'উতারো' কথাটা যে জাতেরই হোক, ওতে এক অপূর্ব সঙ্গীত ও শ্রীর উদ্বোধন হয়েছে ও জায়গাটায় তা ত' কেউ অস্বীকার করবে না। ঐ একটু ভাল শোনবার লোভেই ঐ একটু ভিন্ দেশী কথার প্রয়োগে অপূর্ব রূপ ও গতি দেওয়ার আনন্দেই আমিও

আরবী ফার্সী শব্দ ব্যবহার করি। কবিগুরুও আলাপ আলোচনায় এর সার্থকতার প্রশংসা করেছেন।

আজ আমাদেরও মনে হচ্ছে, আজকের রবীন্দ্রনাথ আমাদের সেই চিরচেনা রবীন্দ্রনাথ নন, তাঁর পেছনের বৈয়াকরণ পণ্ডিত এসব বলাচ্ছে তাঁকে।

"খুন" আমি ব্যবহার করি আমার কবিতায়—মুসলমানী বা বলশেভিক রং দেওয়ার জন্য নয়। হয়ত কবি ও দুটোর একটারও রং আজকাল পছন্দ করবেন না, তাই এত আক্ষেপ তাঁর।

আমি শুধু "খুন" নয়—বাংলার চলতি আরো অনেক আরবী ফার্সী শব্দ ব্যবহার করেছি আমার লেখায়। আমার দিক থেকে ওর একটা জবাবদিহি আছে। আমি মনে করি, বিশ্ব কাব্যলক্ষ্মীরও একটা মুসলমানী ঢং আছে। ও-সাজে তাঁর শ্রীর হানি হয়েছে বলেও আমার জানা নেই। বাংলা কাব্যলক্ষ্মীকে দু'টো ইরাণী "জেওর" পরালে তার জাত যায় না, বরং তাকে আরও খুব সুরতই দেখায়।

আজকের কলা-লক্ষ্মীর প্রায় অর্ধেক অলঙ্কারই ত মুসলমানী ঢং-এর। বাইরের এ ফর্মের প্রয়োজন ও সৌকুমার্য সকল শিল্পীই স্বীকার করেন। পণ্ডিত মালবীয়া স্বীকার না করতে পারেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ স্বীকার করবেন।

তা' ছাড়া যে খুনের জন্য কবিগুরু রাগ করেছেন তা' দিনরাত ব্যবহৃত হচ্ছে আমাদের কথার "কালার বক্সে" (Colour Box-এ) এবং তা' 'খুন করা' "খুন হওয়া" ইত্যাদি খুনোখুনি ব্যাপারেই নয়—হৃদয়েরও খুনখারাবী হ'তে দেখি আজো এবং তা' শুধু মুসলমান পাড়া লেনেই হয় না।

আমার একটা গান আছে—"উদিবে সে রবি আমাদেরই খুনে রাঙিয়া পুনর্বার"। এই গানটি সেদিন কবিগুরুকে দুর্ভাগ্যক্রমে শুনিয়ে ফেলেছিলাম এবং এতেই হয়ত তাঁর ও কথার উল্লেখ, তিনি রক্তের পক্ষপাতী। অর্থাৎ ও লাইনটাকে "উদিবে সে রবি মোদেরই রক্তে

রাঙিয়া পুনর্বারও" করা চলত। চলত কিন্তু ওতে ওর অর্ধেক জোর কমে যেত। আমি যেখানে খুন শব্দ ব্যবহার করেছি, সে ঐ রকম জ্বালাময়ী সঙ্গীতে বা রুদ্ররসের কবিতায়। যেখানে "রক্তধারা" লিখবার, সেখানে জোর করে "খুনধারা" লিখি নাই। তাই বলে "রক্ত খারাবী"ও লিখি নাই, হয় 'রক্তারক্তি" না হয় "খুনখারাবী" লিখেছি।

কবিগুরু মনে করেন রক্তের মানেটা আরো ব্যাপক। ওটা প্রেমের কবিতাতেও চলে, কিন্তু তখন ওতে "রাগ" মেশাতে হয়। প্রিয়ার গালে যেমন "খুন" ফোটে না নেহাত দাঁত না ফুটালে। প্রিয়ার সাথে 'খুনা খুনী" খেলি না কিন্তু "খুন সুড়ি" হয়ত করি।

কবিগুরু কেন, আজকালকার অনেক সাহিত্যিক ভুলে যান, যে, বাংলার কাব্য লক্ষ্মীর ভক্ত অর্ধেক মুসলমান। তারা তাঁদের কাছ থেকে টুপি আর চাপকান চায় না, চায় মাঝে মাঝে বেহালার সাথে সারেঙ্গীর সুর শুনতে, ফুলবনের কোকিলের গানের বিরতিতে বাগিচায় বুলবুলির সুর।

এতেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল যাঁরা মনে করেন, তাঁরা সাহিত্য সভায় ভিড় না করে হিন্দু সভারই মেম্বার হোন গিয়ে।"......

১১.

আমরা পূর্বেও বলেছি এবং এখনও স্মরণ করছি পরস্পরের এই মনোমালিন্য নিতান্ত সাময়িক উত্তেজনার ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথ তো এ সব ব্যাপার কোনদিনই মনে রাখতেন না, কিন্তু অন্যান্য কয়েকজন তরুণ সাহিত্যিকের সঙ্গে নজরুল তাঁর নিকটে আসা বন্ধ করেছেন দেখে তিনি ব্যথিত হলেন। এবং মনে মনে একটা মীমাংসার প্রয়োজন অনুভব করলেন। বস্তুতঃ, কেবল নজরুলের জন্যই নয়, বাংলা সাহিত্যে তখন যে ঝড় উঠেছিল এবং যার ফলে অনেক আবিলতার সৃষ্টি হয়েছিল সেটিকে নির্মূল করার প্রয়োজন অনুভব করলেন। কেননা এই ঝগড়াঝাঁটি চলতে থাকলে একটি অপ্রীতিকর আলোচনাকে জিইয়ে রাখা

হ'বে মাত্র এবং তা'তে কোনো পক্ষের লোকসান ছাড়া লাভের আশা নেই। তা' ছাড়া উভয় কবি উভয়ের ভুলটাও বুঝেছিলেন। শান্তি-নিকেতন "নিজাম বক্তৃতা প্রদানকালে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কাজী আবছুল ওদুদকে বলেছিলেন যে, তিনি মুসলমানদের ব্যবহৃত বিদেশী শব্দ মিশ্রিত প্রবাদগুলির যথাযথ অর্থ ঠিক মত বোঝেন না। নজরুল তো অনু-শোচনায় দগ্ধে যাচ্ছিলেন। ফলে একটা দ্রুত মীমাংসা সম্ভব হ'য়েছিল।

তা' ছাড়া একথা আমাদের বিশেষরূপে স্মরণ রাখ্‌তে হ'বে রবীন্দ্র-নাথ কোনদিনই কোনো নতুন সম্ভাবনার পথে বাধা হ'য়ে দাঁড়াননি। তিনি নিজে যোগ দিতে না পারলেও নতুনের আগমন সম্ভাবনার পথ করে দিয়েছেন সাগ্রহে। এখানেই রবীন্দ্র-চিত্তের বিশ্ববিথারি বিহার। সাহিত্যের যে পথে বিচরণ করতে তিনি অক্ষম তার জন্যে তাঁর অনু-শোচনার অন্ত নেই। তাঁর "ঐকতান" কবিতার সেই বিখ্যাত লাইন:

"এই স্বর-সাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক
রয়ে গেছে ফাঁক।...

পাইনে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার;
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবন-যাত্রার।"

রবীন্দ্রাত্মা এখানে দিবালোকের মত স্পষ্ট।

তাই রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে মীমাংসা-সভা বসল একদিন। এই সভায় চরম কথা বলেছিলেন শ্রদ্ধেয় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আজকের দিনেও কোনো বাদ-প্রতিবাদ হ'লে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করা যেতে পারে:

"এদের লেখা যদি খারাপ হবে তা' পড়ো কেন বাপু। খারাপ লেখা না পড়লেই হয়।"

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের কল্যাণময় রূপের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে নবীনদের স্বাগত জানালেন, আধুনিকতাকেও অভিনন্দিত করতে কুণ্ঠিত হলেন না। তরুণের দল তাঁর আশীর্বাদ পেলেন। সে আশীর্বাদ শাশ্বত কালের বিশ্বচিন্তায় মিলে গেল:

"নিম্নে সরোবর স্তব্ধ হিমাদ্রির উপত্যকাতলে ;
ঊর্ধ্বে গিরিশৃঙ্গ হ'তে শ্রান্তিহীন সাধনার বলে
তরুণ নির্ঝর ধায় সিন্ধুসনে মিলনের লাগি
অরুণোদয়ের পথে। সে কহিল, "আশীর্বাদ মাগি,
হে প্রাচীন সরোবর।" সরোবর কহিল হাসিয়া,
"আশীষ তোমার তরে নীলাম্বরে উঠে উদ্ভাসিয়া
প্রভাত সূর্যের করে ; ধ্যানমগ্ন গিরি তপস্বীর
নিরন্তর করুণায় বিগলিত আশীর্বাদ-নীর
তোমারে দিতেছে প্রাণধারা। আমি বনচ্ছায়া হ'তে
নির্জনে একান্তে বসি, দেখি তুমি নির্ঝরিত স্রোতে
সংগীত-উদ্বেল নৃত্যে প্রতিক্ষণে করিতেছ জয়
মসীকৃষ্ণ বিঘ্নপুঞ্জ পথরোধী পাষাণ সঞ্চয়
গূঢ় জড় শত্রুদল। এই তব যাত্রার প্রবাহ
আপনার গতিবেগে আপনাতে জাগাবে উৎসাহ।"

এ আশীর্বাদ তরুণদের চলার পথে দুরন্ত গতিবেগ দান করেছিল।

এই সময় (১৩৩৫) প্রকাশিত হয় নজরুলের শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলন "সঞ্চিতা"। উৎসর্গ পৃষ্ঠায় তিনি লিখলেন :

"বিশ্বকবি সম্রাট শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীশ্রীচরণারবিন্দেষু।"

গুরুর প্রতি শিষ্যের দীনতম কৃতজ্ঞতা-স্বীকার। বিরোধের অবসান পূর্বেই হয়ে গিয়েছিল—তিনি একখানা "সঞ্চিতা" নিয়ে ছুটলেন রবীন্দ্রনাথের নিকট। আবার গুরুর সঙ্গে শিষ্যের মোলাকাত হ'ল, কবির সঙ্গে কবির মিলন হ'ল, সে মিলনের গাঢ়তা আর কোন দিনই উত্তেজনার ভাপে হাল্‌কা হয়ে ওঠেনি।

জনাব আফজালুল হকের সম্পাদনায় ১৩৩৪ সালের আষাঢ় মাসে "নওরোজ" পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। উদ্যোক্তারা প্রথমেই ঠিক করে নিয়েছিলেন যে, নজরুলের সকল লেখা সর্বপ্রথম "নওরোজে" প্রকাশিত হবে এবং তার জন্যে তাঁকে মাসিক এক'শ পঁচিশ টাকা করে দেওয়া হবে। নজরুল এতে সম্মত হয়েছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি এ প্রস্তাবও করেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথকে এ পত্রিকার অন্যতম লেখক হিসেবে নিতে হবে। তাঁর এ প্রস্তাব পরিচালকবর্গ মেনে নিয়েছিলেন।

এর অল্প কিছুকাল পরে নজরুল গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত হন। H.M.V-র রিহার্সাল রুমের সংলগ্ন একটি কামরা কবির জন্য নির্দিষ্ট ছিল। তিনি অধিকাংশ সময় ঐ কামরার দরজা বন্ধ করে সঙ্গীত রচনা করতেন। কখনো কখনো রিহার্সাল রুমে লোকের ভিড়ের মধ্যে বসেও গান লিখতেন। এই সময়ের একটি ঘটনা স্মরণীয়। ঘটনাটির ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতি নজরুলের যে কী অপরিসীম ভক্তি ছিল, তাঁর সঙ্গীতের প্রতি কাজী কবির যে কী গভীর শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা ছিল তা উপলব্ধি করা যাবে। ঘটনাটি বিবৃত করেছেন প্রত্যক্ষদর্শী শ্রীসুধীররঞ্জন গুহ।

কবির সঙ্গে কবির মিলন হয় ভাবের মধ্য দিয়ে, অনুভূতির মধ্য দিয়ে। নজরুল রবীন্দ্রনাথকে উপলব্ধি করেছিলেন এই অনুভূতির মধ্য দিয়েই। ঘটনাটি সেই অনুভবময় জগতের কথা।

একদিন H.M,V-র রিহার্সাল রুমে সংগীতের মহড়া চলছিল। অনেকের সঙ্গে কবি নজরুল সেদিন উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সামনে ছিল গানের খাতা। শত কোলাহলের মাঝে বসেও তিনি মাঝে মাঝে গান লিখতেন—হয়তো সে চেষ্টাই করছিলেন। হঠাৎ পাশের ঘর থেকে একটা মধুর সুরগুঞ্জন ভেসে এল। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের সুর। গানের কলিটি এই :

"শ্রাবণ তুমি কার আভাস
পেলে বাতাসে।"

সুর ভেসে আসছেই সুর-পাগল উৎকর্ণ হলেন। সমগ্র প্রাণ-মন গানের কলির সঙ্গে যুক্ত করলেন। নীরবে বাইরের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। শ্রাবণ মেঘের সঙ্গে মিতালি করে তাঁর মন যেন সুরের স্বপ্নরাজ্যে উধাও হয়ে গেছে। ধ্যানমগ্ন তন্ময়তা। তিনি স্বপ্নময় ধ্যানদৃষ্টিতে তাকিয়েই রইলেন। এমনিভাবে কয়েক মিনিট কেটে গেল। তিনি ধীরে ধীরে স্বরচিত অর্ধ সমাপ্ত গানের পৃষ্ঠাটি তুলে নিলেন হাতে। তারপর অতি ধীরভাবেই টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললেন। চোখে তাঁর তখনো স্বপ্নের মায়া।

যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেন, এ কী করছেন কাজী দা।

কবি ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন, শুনলে তো কবিগুরুর গান! এর পরে কী আর কিছু লেখা চলে?

১৩.

একটা যুগ এসেছিল যখন মুসলিম সমাজের অনেকেই নজরুলকে 'মুসলিম রবীন্দ্রনাথ' ভাবতে আরম্ভ করেছিলেন। এমন ভাবার পিছনে হুজুগ এবং হাততালি অনেকাংশে ক্রিয়াশীল ছিল। কাজি কবির প্রথম বিবাহ হয় কুমিল্লার দৌলতপুর অধিবাসী আলী আকবর খানের এক ভাগ্নীর সঙ্গে। এই বিবাহের জন্য নিমন্ত্রণ পত্র মুদ্রিত হয়েছিল। সম্প্রতি সেই বিয়ের একখানি নিমন্ত্রণ পত্র আমার হাতে এসেছে। তাতে দেখছি নজরুলকে "মুসলিম-বঙ্গের "রবি-কবি" বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। বলাবাহুল্য এই বিশেষণ নিতান্ত অবিবেচনা প্রসূত। নজরুল তখন যে কটি কবিতা লিখেছেন তাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়, এমনকি 'বিদ্রোহী' কবিতাও তখন তিনি লেখেন নি।

যা হোক, এর অল্প কিছুকাল পরে কবির এ-ভুল ভেঙেছিল। একদিনের ঘটনা। নজরুল তখন মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন সম্পাদিত "সওগাতে"র নিয়মিত লেখক। তৎকালীন সারা বাংলায় কোটি মুখে তখন নজরুলের নাম ধ্বনিত। তাঁর কবিতার গুণগ্রাহী অগণন। এমনই একদিনে কবি বসেছিলেন "সওগাত" অফিসে। তাঁর এক অনুরাগী পাঠক তালমাত্রা হারিয়ে তাঁর প্রশংসায় মত্ত হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে চললো রবীন্দ্রনাথের প্রতি কিছু অশোভন ও তিক্ত মন্তব্য। তাঁর মতে কবি হিসেবে নজরুলের স্থান কবিগুরুর উপরে। নজরুল এমন উক্তি করতে নিষেধ করলেন একবার, দু'বার। তৃতীয় বারেও অনুরূপ উক্তি বার হতেই তিনি নীরবে এমন কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন যে, উক্ত গুণগ্রাহী সামান্য কিছু অজুহাতে ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হতে বাধ্য হলেন। ঘটনাটি বিবৃত করেছেন প্রত্যক্ষদর্শী জনাব এম, আবদুর রহমান।

১৪.

আর একদিনের ঘটনা। সওগাত অফিসেই ঘটেছিল ঘটনাটি। নজরুল নাসিরউদ্দিন সাহেবের লাইব্রেরীটি তন্ন তন্ন করে দেখছিলেন। অনেক মূল্যবান পুঁথি-পুস্তকই সেখানে ছিল। নজরুল সবগুলি দেখে মন্তব্য করলেন: ছাই ওড়ালে অমূল্য রতন পাওয়া যেতে পারে এমন প্রবাদ আছে; কিন্তু এ ছাই ঘেঁটে ছাই-ই পেলাম, 'রতন' কই? নাসিরউদ্দিন সাহেব সবিস্ময়ে তাকালেন। নজরুল জানালেন যে, কবিগুরুর বইয়ের অভাব তিনি বিশেষরূপে অনুভব করছেন। মৃদু হেসে নাসিরউদ্দিন সাহেব জানালেন যে, এবার এসে কবি ওখানে রতনই দেখবেন—ছাইগুলি অপসারিত হবে। কবি জানিয়েছিলেন যে, ছাইগুলি অপসারণের প্রয়োজন নেই—ছাইয়ের সঙ্গে কিছু 'রতন' থাকলে তাঁদের ছাই ঘাঁটা সার্থক হবে। "চলমান জীবনে" এই ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা আছে।

কবিগুরুর তুলনায় নিজের প্রতিভাকে তিনি সর্বদা নগণ্য ভাবতেন। উভয়ের তুলনা করে নিজের সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :

"ধ্যান শান্ত মৌন তব কাব্য-রবিলোকে
সহসা আসিনু আমি ধূমকেতু সম
রুদ্রের দুরন্ত দূত, ছিন্ন হর-জটা,
কক্ষচ্যুত উপগ্রহ।···
তোমার বিচ্যুত-ছটা আমি ধূমকেতু।"

বিভিন্ন প্রবন্ধ ও বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে টুকরো টুকরো কথা থাকলেও কেবলমাত্র তাঁকে কেন্দ্র করে নজরুল যে সকল প্রবন্ধ-কবিতা গান লিখেছেন সেগুলি হ'ল: 'অশ্রু-পুষ্পাঞ্জলি', 'কিশোর-রবি', 'রবিহারা', 'রবির জন্মতিথি', 'বিদায়' শীর্ষক গান, 'বড়র পিরীত বালির বাঁধ' ইত্যাদি।

এগুলোর মধ্যে 'অশ্রুপুষ্পাঞ্জলি' কবিতাটি কবির 'অশীতি বার্ষিকী' জন্মোৎসব উপলক্ষে, 'বড়র পিরীত বালির বাঁধ' প্রবন্ধটি তাঁর সঙ্গে কবিগুরুর বিরোধ উপলক্ষে, 'রবিহারা' ও 'বিদায়' শীর্ষক গান গুরুদেবের তিরোধানে রচিত হয়েছিল। একমাত্র 'বড়র পিরীত বালির বাঁধ' প্রবন্ধটি ছাড়া অন্য সকল রচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর বিনীত ও মুগ্ধমনের শ্রদ্ধা ভক্তিভরে নিবেদিত হয়েছে। 'অশ্রু পুষ্পাঞ্জলি', 'রবির জন্মতিথি' এবং 'কিশোর রবি' কবিতা তিনটি কবির "নতুন চাঁদ" গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানে যে 'রবি-হারা' কবিতাটি রচিত সে কথা আমরা পূর্বেই জেনেছি। কবিতাটি সঙ্গে সঙ্গে বেতার-যোগে সর্বত্র প্রচারিত হয়েছিল এবং এই সুদীর্ঘ কবিতাটিকে তিনি নিজ কণ্ঠে হিজ মাষ্টার্স ভয়েস-এ রেকর্ড করেছেন। রেকর্ড নাম্বার N-27188, উৎসাহী পাঠকেরা রেকর্ডটি সংগ্রহ করে শুনতে পারেন। কবিতাটি সর্ব প্রথম মুদ্রিত হয় ১৩৪৮ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'সওগাতে'। এতকাল কবিতাটি কবির কোন গ্রন্থে অন্তর্ভূক্ত হয়নি। সম্প্রতি আবদুল কাদির সম্পাদিত "নজরুল রচনা-সম্ভার" গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। 'বিদায়'

শীর্ষক যে গানটি কবি রচনা করেছিলেন সেটি রেকর্ড করেছিলেন স্বনামধন্যা গায়িকা যূথিকা রায়। যতদূর জানি, কবিতাটি আজ পর্যন্ত কবির কোন গ্রন্থে সংকলিত হয়নি, একটি স্তবক আমরা এখানে উদ্ধৃত করলাম :

ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবিরে জাগায়োনা, জাগায়োনা,
সারা জীবন যে আলো দিল ডেকে তার ঘুম ভাঙায়োনা।

(যে) সহস্র করে রূপ-রস দিয়া
জননীর কোলে পড়িল ঢলিয়া
তাহার শ্রান্তি-চন্দন দাও, ক্রন্দনে রাঙায়োনা,
ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবিরে জাগায়োনা, জাগায়োনা।...

"বড়র পিরীত বালির বাঁধ" প্রবন্ধটি 'আত্মশক্তি'র পৃষ্ঠা থেকে পুনর্মুদিত করে সংরক্ষিত করা প্রয়োজন। নইলে এই মূল্যবান প্রবন্ধটি চিরতরে লুপ্ত হয়ে যাবে। 'রবির জন্মতিথি' কবিতাটি রচিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের একাশী বছর জন্মোৎসব উপলক্ষে। যত দূর মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের প্রতি এইটিই নজরুলের শেষ প্রণাম। এরপর তিনি আর বিশেষ কিছু লিখতে পারেন নি। বর্তমানে যে দুরারোগ্য ব্যাধিতে কাজী কবি সম্বিতহারা হয়ে আছেন তাঁর দেহে মনে তখন তার সূচনা ও লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এছাড়াও রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে নজরুল হয়তো আরো প্রবন্ধ কবিতা-গান রচনা করেছিলেন এবং হয়তো সেগুলি বিভিন্ন সাময়িকীতে মুদ্রিতও হয়েছিল, কিন্তু আজ পর্যন্ত সেগুলি সংগৃহীত হয়নি। অনুরাগী পাঠকেরা তৎপর হলে এটি করা সম্ভব হবে।

রবীন্দ্রনাথের অলোক-সামান্য প্রতিভায় যখন বাংলা সাহিত্য ভারে ভারে 'সোনার ধান' ঘরে তুলছে, রবীন্দ্রালোকে যখন বাঙালী চিত্ত সম্পূর্ণ অভিভূত এবং যখন এমন একটা ধারণা বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে যে, কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত এ প্রতিভার প্রভাবকে কোন কবি-সাহিত্যিক কাটিয়ে উঠ্‌তে পারবেন না, ঠিক সেই স্বপ্নাচ্ছন্ন দিনগুলিতে এলো মোহভঙ্গের পালা। বাঙালী পাঠকেরা হঠাৎ চমকিত হলেন। বিস্ময়-ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলেন, আকাশ-স্পর্শী কাঞ্চনজংঘার পাশে আর একটি গিরিশৃংগ মাথা উত্তোলিত করেছে। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র নিশ্চয়ই, কিন্তু চোখে পড়ে, তার স্বরূপ-স্বাতন্ত্র্য আপন মহিমায় সমুজ্জল, প্রাণবন্ত। সুতরাং কয়েক শতাব্দী নয় রবীন্দ্র-যুগেই, এমন কি রবীন্দ্রনাথের জীবিত কালেই, রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রভাবপুষ্ট গণ্ডী কাটিয়ে বেরিয়ে এলেন নজরুল সম্পূর্ণ নতুন স্রোতে গা ভাসিয়ে। সুতরাং রবীন্দ্র-যুগে লালিত হয়েও নজরুল হলেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, একক এবং অনন্য। এই স্বতন্ত্র্য সুরের কবি হিসেবেই তিনি আমাদের কাছে পরিচিত এবং এটাই হয়তো নজরুলের সত্যিকার পরিচয়।

কিন্তু এ-সব কথা মনে রেখেও বিনীতভাবে প্রশ্ন করা চলে, নজরুল-সৃষ্টিতে কি রবীন্দ্রনাথের কোন প্রভাব নেই? সমকালীন বাংলার কম বেশী সকল সাহিত্যিক যখন রবীন্দ্র-সুরে প্রভাবিত, নজরুল কি সে সুর-সত্তা থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন? না, একেবারে বিচ্ছিন্ন হতে পারেন নি নজরুল। তাঁর বেশ কিছু সৃষ্টিতে রবীন্দ্র-প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এখানে সে-প্রভাব নিয়ে আলোচনা করলাম। কিন্তু এ আলোচনা থেকে এমন ধারণা যেন কেউ না করেন যে, আমরা নজরুলকে রবীন্দ্র প্রভাবের ফসল বলার চেষ্টা করেছি—করলে ভুল করবেন।

নজরুল-মানসের কিছু অংশ যে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ প্রভাবে গঠিত হয়েছে, এমন মন্তব্য অনেকের নিকটেই আকস্মিক মনে হতে পারে। কিন্তু মন্তব্যটির মধ্যে যে সত্য নিহিত রয়েছে, তাকে

কোনমতেই উপেক্ষা করা চলে না। নজরুল তাঁর প্রথম জীবনের কয়েকটি কবিতায় (এই কবিতাগুলি প্রধানতঃ 'অগ্নিবীণা', 'বিষের-বাঁশি' কাব্যগ্রন্থ দ্বয়ে মুদ্রিত) এক বিশেষ স্বাতন্ত্র্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর পরবর্তী বহু কবিতার ভাবধারায় রবীন্দ্র-প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

ছাত্র জীবনে রবীন্দ্রনাথের কবিতা নজরুলের মানসলোকে যে কি গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার বিস্তারিত পরিচয় আমরা পেয়েছি। এখন তাঁর লিখিত কবিতা-গল্পাদির দিকে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে।

নজরুলের সর্বপ্রথম মুদ্রিত কবিতার নাম 'মুক্তি'। কবিতাটি ১৩২৬ সালের শ্রাবণ সংখ্যার 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় মুদ্রিত হয়। কবিতাটিতে যে অধ্যাত্ম চিন্তা আছে তাতে 'গীতাঞ্জলি'র (১৩১৭) প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ছন্দের মধ্যেও রবীন্দ্র-প্রভাব লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠেছে। সমিল মুক্তক স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত রবীন্দ্রনাথের 'পলাতকা' এর পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছিল, 'মুক্তি' কবিতাটিতে 'পলাতকা'র ছন্দ অনুসৃত হয়েছে। কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃতি দিই :

> "রাণীগঞ্জের অর্জ্জনপটির বাঁকে,
> যেখান দিয়ে নিতুই সাঁঝে ঝাঁকে ঝাঁকে
> রাজার বাঁধে জল নিতে যায় শহুরে বৌ কলস কাঁখে।
> ...গাছের মোটেই ছিল না'ক পাতা,
> উলঙ্গ এক প্রেত সে যেন কঙ্কালসার তুলেছিল মাথা...
> ভুলে যাওয়ার সে কোন নিশি ভোর,
> 'আজান' যখন শহুরেদের ভাঙ্গাল ঘুমের ঘোর,
> অবাক হয়ে দেখলে সবাই চেয়ে,
> শুকনো নিমের গাছটা গেছে ফলে ফুলে ছেয়ে।"...ইত্যাদি।

'মুক্তি'র ছন্দ সম্পর্কে এ-ধরনের কিছু আলোচনা কবির সজ্ঞান অবস্থাতেই হয়েছিল এবং তিনি পড়ে সেটি সমর্থন করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, 'মুক্তি' নজরুলের প্রথম মুদ্রিত কবিতা। কিন্তু কবিতাটি

আজ পর্যন্ত তাঁর কোন পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। প্রথম প্রকাশিত কবিতা বলেই এর একটি ঐতিহাসিক মর্যাদা আছে।

সুতরাং কবিতাটি সংরক্ষিত হওয়া উচিত।

কবির প্রথম প্রকাশিত পত্রোপন্যাস "বাঁধন-হারা" রচনার সূত্রপাত হয়েছিল নজরুলের সৈনিক জীবনে "আরব সাগরের জীবন বেলায়"। এই উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর মুখে অনর্গল রবীন্দ্র-সংগীত শোনা গেছে। পাত্রপাত্রীদের অনেক চিন্তা-ভাবনা রবীন্দ্র-সংগীতকে কেন্দ্র করেই পল্লবিত হয়েছে। অথবা বিষয়টা এইভাবে বলা যায়ঃ রবীন্দ্র-সংগীতের ভাবধারায় নজরুল এমনই বিভোর ছিলেন যে, তাঁর নিজের জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে সেই বিভোরতা পাত্র-পাত্রীদের চিন্তা ও মনকে রাঙিয়ে দিয়েছে। কিছু অংশ উদ্ধৃতি দিই। এই উপন্যাসের অন্যতম নায়িকা সাহসিকাদি এক পত্রে রেবাকে জানাচ্ছেঃ "গুরুদেবের 'কে নিবি গো কিনে আমাকে কে নিবি গো কিনে' শীর্ষক কবিতাটি পড়েছিস তো? তাতে তিনি দিনরাত তাঁর পসরা হেঁকে হেঁকে বেড়াচ্ছেন—ওগো আমায় কে কিনে নেবে? কত লোকই এল,—রাজা এলো, বীর এলো, সুন্দরী এলো, কিন্তু হায় সকলেই 'ধীরে ধীরে গেল বনছায়ার দেশে। সকলেরই চোখের জল মিলিয়ে এল শেষে।' কিন্তু ধূলো নিয়ে খেলা-নিরত একটি ছোট্ট ন্যাংটা শিশু তুড়ুক করে লাফিয়ে ওঠে তার কচি ছোট্ট দু'টি হাত ভরিয়ে ধুলো-বালি নিয়ে বল্‌লে—আমি তোমায় 'অমনি কিনে নেব!' তখন কবিও তাঁর পসরা ঐখানে ঐ সহাজিয়া সহজ চাওয়ার কাছে বিনামূল্যে বিকিয়ে দিয়ে মুক্তি পেলেন। আমাদের নয়ন-পাতা তখন এই সহজের আনন্দে আপনিই ভিজে ওঠে। এমনি সহজ করে চাওয়া চাই, এমনি সহজ হয়ে দেওয়া চাই যে বোন, আর তবেই যে পায় সেও বুক ভরে নেয়, যে দেয় তারও "বুক ভরে যায়।"

কেবল রবীন্দ্রসঙ্গীতের উদ্ধৃতি ও বিশ্লেষণ নয়, এই উপন্যাসের ভাবধারাও গড়ে উঠেছে কবিগুরুর ভাবধারায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "প্রাচীন সাহিত্য" পুস্তকের বিভিন্ন প্রবন্ধে বিরহের জয়গান গেয়েছেন। দৈহিক

মিলন অপেক্ষা বিরহের মাধ্যমে নিবিড়তরভাব পাওয়াই চরম পাওয়া। কবিগুরুর এই চিন্তাই "বাঁধন-হারার" কেন্দ্রীয় ভাব। কামজ প্রেমের মৃত্যুতেই এই উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার মুক্তি মিলেছে।

"রিক্তের বেদনের" গল্পগুলি সম্পর্কেও ঐ একই কথা। এগুলিতে রবীন্দ্র-প্রভাব কতটুকু তা নিয়ে আজ পর্যন্ত বিস্তারিতভাবে কোনো আলোচনাই হয়নি। "রিক্তের বেদন" 'সাঁজের তারা' এবং 'সালেক' গল্প দু'টিতে রবীন্দ্র-প্রভাব এত স্পষ্ট যে, এ গল্পগুলি পড়ার সময় অতি অসাবধান পাঠকেরও "লিপিকা"র কথা মনে পড়বে। "লিপিকা"র 'পায়ে চলা পথে' রবীন্দ্রনাথ একটি পথকে' কেন্দ্র করে সূক্ষ্ম ভাবনাজাল বিস্তার করেছেন এবং পরিশেষে মানবজীবনের সঙ্গে তার সম্বন্ধ খুঁজে পেয়েছেন। অনুরূপভাবে আরব সাগরের বিজন বেলায় ছোট্ট পাহাড়ের উপর সাঁজের তারাকে কেন্দ্র করে কাজী কবির চিন্তাজাল ছড়িয়ে পড়েছে এবং অবশেষে সেই তারার সঙ্গে মানব মনের নিবিড় পরিণয় সম্পর্ক আবিষ্কৃত হয়েছে।

"ব্যথার দান" নজরুলের চিরস্মরণীয় গল্প। এ গল্পটিতেও কামজ মোহের হত্যায় নায়ক-নায়িকার প্রকৃত মিলন সংঘটিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই কাব্যধর্মী গল্পটির অন্তরাত্মা রবীন্দ্রসুরে বেজে উঠেছে। গল্পটির মধ্যে কিছু রবীন্দ্র উদ্ধৃতি আছে। সর্বশেষ অংশটি এই:

> "এই দু'পারে থেকে আমাদেরই দু'জনেরই বিরহ-গীতি দুইজনকে ব্যথিয়ে তুলবে। আর ঐ ব্যথার আনন্দেই আমরা দু'জনে দু'জনকে আরও বড়—আরও বড় করে পাব।"
>
> সেইদিন থেকে আমি নির্ঝরটার এপারে।
>
> আমারও অশ্রুভরা দীর্ঘশ্বাস হু-হু করে ওঠে, যখন মৌনবিষাদ-নীরব সন্ধ্যায় তাঁর ভারী চাপা কণ্ঠ ছেপে একটা ক্লান্ত রাগিনী ও-পার হতে কাঁদতে কাঁদতে এ-পারে এসে বলে,
>
> "আমার সকল দুখের প্রদীপ জেলে
> দিবস গেলে
> করব নিবেদন,
> আমার ব্যথার পূজা হয়নি সমাপন!"

"ব্যথার দান" গ্রন্থের আরো কতকগুলি গল্পের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এই গল্পগুলির হ'ল 'হেনা', 'বাদল বরিষণে', 'ঘুমের ঘোরে', ইত্যাদি। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এ সকল গল্পের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু কবিতার উদ্ধৃতি আছে। আরো একটু গভীর রূপে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে উদ্ধৃত কবিতাগুলির ভাব গল্পগুলির মূল চিন্তার সঙ্গে এক হ'য়ে মিশেছে।

সান্ধ্য-দৈনিক 'নবযুগ' প্রকাশের সময়েও নজরুল রবীন্দ্র ভাবে ভাবিত হয়েছিলেন। এমন কী সংবাদে হেডিং পরিবেশনে রবীন্দ্রভাব সুস্পষ্ট। যথা:

"কালাতে ধলাতে লেগেছে এবার
মন্দ মধুর হাওয়া
দেখি নাই কভু দেখি নাই ওগো,
এমন ডিনার খাওয়া।"

বা:

"এ দেশ ছাড়বি কিনা বল্
নইলে কিলের চোটে হাড় করিব জল।"

এই যুগে নজরুল-সৃষ্টিতে রবীন্দ্রপ্রভাব সুস্পষ্ট। এ সময় সভা-সমিতিতে, গৃহ-মজলিসে, বন্ধু-বান্ধবের আড্ডায় তিনি হয় রবীন্দ্রনাথের গান গাইছেন নয় রবীন্দ্র-কবিতা আবৃত্তি করছেন। এ সম্পর্কে কবি-বন্ধু নলিনীকান্ত সরকার লিখেছেন: নজরুল সেই আড্ডায় এসে 'রবীন্দ্র-সংগীত গাইতেন'। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন: "হার্মো-নিয়ম টেনে নিয়ে নজরুল শুরু করে দিল: "এতদিন যে বসেছিলেম পথ চেয়ে আর কালগুণে।" কবির অন্যতম বন্ধু মুজফ্ফর আহমদ লিখেছেন: "রবীন্দ্রনাথ তখন জীবিত, তাঁর প্রতিভা দিকে দিকে বিকীর্ণ। নজরুলের কণ্ঠে তখন গীত হচ্ছিল রবীন্দ্র-সংগীত। প্রসিদ্ধ রবীন্দ্র-সংগীত গায়ক শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সে তখন পরিচিত হ'য়েছে এবং তাঁর সঙ্গে একত্রে গানও গাইছে। সে মুখে আবৃত্তি

করছে রবীন্দ্রনাথের কবিতা। এমনকি রবীন্দ্র-কবিতার প্যারোডি করে সে "নবযুগ"-এর হেডিং পর্যন্ত দিচ্ছে।"

শুধু কী তাই? জেলে গিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্যারোডি আরম্ভ করে দিলেন:

তোমারি জেলে পালিছ ঠেলে
তুমি ধন্য, ধন্য হে।
আঁকাড়া চালের অন্ন লবণ
করেছে আমার রসনা লোভন
বুড়ো ডাঁটা ঘাঁটা 'লাপ্‌সী' শোভন
তুমি ধন্য, ধন্য হে।"·········ইত্যাদি।

সাধারণে নজরুলকে হয়তো কিছু ভুল বুঝে থাকবেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে ঠিকই চিনেছিলেন। বিদ্রোহাত্মক্ মনোভংগী যে নজরুলের স্বকীয় ভূমিকা নয়, গীতিধর্মিতাই যে তাঁর নিজস্ব লীলাক্ষেত্র, একথা বোধহয় রবীন্দ্রনাথের আগে আর কেউ বোঝেননি। নজরুল লিখেছেন:

"দেখেছিল যারা শুধু মোর উগ্ররূপ,
অশান্ত রোদন সেথা দেখেছিলে তুমি!
হে সুন্দর, বহ্নিদগ্ধ মোর বুকে তাই
দিয়াছিলে 'বসন্তের' পুষ্পিত মালিকা।"

নজরুলের "ঝিলিমিলি" ইত্যাদি সাংকেতিক নাটকে অথবা নজরুল-সঙ্গীতে রবীন্দ্রপ্রভাব সম্পর্কে স্বতন্ত্র আলোচনার প্রয়োজন। কবির শেষ জীবনটা আধ্যাত্মিকতার যুগ—এই জীবনে রবীন্দ্রনাথের গান ও চিন্তা নজরুলের মর্মমূলকে আলোড়িত করেছিল। এ কথা আমরা সকলেই জানি যে, নজরুলের জীবনের শ্রেষ্ঠতম অংশটি সংগীত রচনায় ব্যয়িত হয়েছে—এ সময় তিনি আর বিদ্রোহাত্মক কোনো গান বা কবিতা লেখেননি বরং লিখেছেন প্রেম-সঙ্গীতের সাথে অসংখ্য ভক্তিমূলক গান। নজরুল চরিত্রের এই যে বিশাল পরিবর্তন, 'অগ্নি'

হতে 'জ্যোতিতে' রূপায়ণ এখানেও রবীন্দ্রপ্রভাব বর্তমান। হাতের 'খর তরবারি' হয়ে উঠেছে 'যমুনার বারি' এবং সেটি সম্ভব হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'মধুর পরশে'। নজরুলের স্মরণীয় কবিতা 'অশ্রু পুষ্পাঞ্জলির' নিম্নোদ্ধৃত অংশটি প্রণিধানযোগ্য :

হে রস-শেখর কবি, তব জন্মদিনে
আমি কয়ে যাব মোর নবজন্ম কথা।
আনন্দ সুন্দর তব মধুর পরশে
অগ্নি গিরি গিরি-মল্লিকার ফুলে ফুলে
ছেয়ে গেছে। জুড়ায়েছে সব দাহজ্বালা।
আমার হাতের সেই খর-তরবারি
হইয়াছে খরতর যমুনার বারি।
দ্রষ্টা তুমি দেখেছিলে আমাতে যে জ্যোতি :
সে জ্যোতি হয়েছে লীন কৃষ্ণ-ঘন-রূপে।"

আমাদের আলোচনার লক্ষ্য 'নজরুল সাহিত্যে রবীন্দ্রপ্রভাব' নয়— উভয় কবির ব্যক্তিগত সম্পর্কটুকুর উল্লেখ। সেই স্নেহ সম্পর্কটুকু উত্তমরূপে উপলব্ধির জন্যে যেটুকুর প্রয়োজন আমরা সেই প্রভাবটুকু নিয়েই আলোচনা করলাম। আমাদের মনে হয় "নজরুল সাহিত্যে রবীন্দ্রপ্রভাব" নিয়ে সুচিন্তিত আলোচনার অবকাশ আছে। সুধীজন তা করবেন।

দীর্ঘপথ ভ্রমণ করে রবীন্দ্র-নজরুল পরিক্রমা এখানে শেষ করলাম। উভয়ের মধ্যকার সম্পর্কটুকু যদি যথাযথ উপলব্ধি করা যায় তা হ'লেই ধন্য হবো। এই দীর্ঘায়তন প্রবন্ধে তথ্যগত যে কোন অসংগতি নেই এমন কথা বলার ধৃষ্ঠতা আমার নেই—তবে আমার জ্ঞাতসারে কোন ভুল তথ্যের অবতারণা হয়নি। কারো কাছে কোন তথ্যের অসঙ্গতি ধরা পড়লে আমার সঙ্গে যোগাযোগের অনুরোধ জানাই।

নার্গিস আসার খানম

[ওরফে সৈয়দা খাতুন]

সবই ছিল। লোকোত্তর প্রতিভা, মহৎ প্রাণ, উদার ধর্মমত, লোকরঞ্জনের অসাধারণ ক্ষমতা। ছিল না কেবল সুষ্ঠুবিবেচনা আর সংযম। এবং এ জন্যেই নজরুল-জীবনের অনেকগুলি অধ্যায় দুঃখের দীর্ঘশ্বাসে মর্মরিত হ'য়ে উঠেছে। কোন কাজ করার পূর্বে তিনি কোন দিন পশ্চাৎ-পার্শ্ব বিবেচনা তো দূরের কথা, তাকিয়ে পর্যন্ত দেখেননি। এই অবিবেচনার গরল তাঁকে সারা জীবন ধরে নীলকণ্ঠের মত রয়ে রয়ে পান করতে হ'য়েছে।

এমনি একটি বেদনাতুর ঘটনা।

নজরুল জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সম্পর্কে এই সেদিন পর্যন্ত আমাদের কিছু জানা ছিল না। এ বিষয়ে ইতিপূর্বে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কিছু কিছু আলোচনা হলেও 'সর্বপ্রথম আলোকপাতের চেষ্টা করেছেন জনাব আবদুল কাদির তাঁর 'নজরুল জীবনের এক অধ্যায়' প্রবন্ধে। কবির অন্তরঙ্গ বন্ধু জনাব মুজফ্‌ফর আহমদ সাহেবও তাঁর "কাজী নজরুল প্রসঙ্গে" পুস্তকের 'আলি আকবর খানের সঙ্গে নজরুলের পরিচয় ও নজরুলের তথাকথিত প্রথম বিবাহ প্রবন্ধে' এ প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করেছেন। এ ছাড়াও বহু নতুন উপকরণ আমাদের হস্তগত হ'য়েছে। সুতরাং এ বিষয়ে এখন একটা পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করা যেতে পারে।

একাধিক কারণে এই অধ্যায়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার উৎস-ভূমি হিসেবে এই অধ্যায়টির একটা বিশেষ যোগ আছে—প্রবন্ধের শেষাংশে তার বিস্তারিত আলোচনা করব। কেবল 'বিদ্রোহী' কবিতা নয়—নজরুলের সমগ্র বিদ্রোহ সত্তার মূলে এই অধ্যায়টির যোগ সুনিবিড়। এই অজ্ঞাতবাস কালে কাজী কবি নিজের জীবনে এমন নিদারুণ আঘাত পেয়েছিলেন যার ফলে তার সমগ্র জীবন-সত্তায় বিদ্রোহ-চেতনা জমাট বেঁধে উঠেছিল। দ্বিতীয়তঃ এই অধ্যায়টির সঙ্গে কবির জীবনের যোগ এত ঘনিষ্ঠ যে অধ্যায়টির পরিপূর্ণ আলোচনা না হলে নজরুল-জীবনী কখনই সম্পূর্ণ হতে পারে না। সুতরাং নজরুল জীবনের উপকরণ হিসেবে এর একটা স্বতন্ত্র মূল্য আছে।

'বাঙ্গালী পল্টন' ভেঙ্গে দেবার পর নজরুল ইসলাম করাচী সেনানিবাস ত্যাগ করে সোজা চলে আসেন কলকাতায়—শৈলজানন্দের বাসায়। ওখান থেকে এসে ওঠেন ৩২ নং কলেজ স্ট্রীটে,—বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির কার্যালয়ে। বন্ধুবর মুজফ্ফর আহমদের সঙ্গে একই কামরায় তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়। করাচী থাকা কালীন পত্র মারফৎ তাঁদের মধ্যে যে মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল সহ-অবস্থানকালে তা' গভীর আন্তরিকতায় পরিণত হয়। নজরুল সাহিত্য-সমিতির কার্যালয়ে আসার পর থেকে আগন্তুকদের পক্ষে বসবার জন্যে সামান্যতম এতটুকু স্থান সংগ্রহ করা রীতিমত সৌভাগ্যের কারণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। মানুষকে আকর্ষণ করার এক অদ্ভুত শক্তি ছিল সদাহাস্যালাপী দিলখোলা নজরুলের। যার ফলে তিনি যেখানেই গেছেন গড়ে উঠেছে মজলিস—নজরুল তার প্রাণ কেন্দ্র। কাজী কবির সুগঠিত দেহ, অপরিমিত স্বাস্থ্য, প্রাণ-খোলা হাসি এবং সর্বোপরি উদাত্ত কণ্ঠের সংগীত—এ সবই ছিল সমবয়সীদের দারুণ আকর্ষণের বস্তু। তাই বেঙ্গলী রেজিমেণ্টের সাত হাজার সৈনিকদের মধ্যে প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে দু'টি লোককে চিনতেন—এঁদের একজন জমাদার শম্ভু রায় আর অপরজন কোয়ার্টার

মাষ্টার হাবিলদার কাজী নজরুল ইস্‌লাম। সাহিত্য সমিতির অফিসে আসার পর সংগীত-সাহিত্য-আলাপের মাধ্যমে নজরুলের জনপ্রিয়তা এত বেড়ে গিয়েছিল যে তা' যে কোন মানুষের পক্ষে ছিল রীতিমত গর্বের। সাহিত্য-সাধনা, সংগীত, মজলিস ইত্যাদি ছাড়াও এ সময় (১৯২০ সালের মাঝামাঝি) জনাব মুজফ্‌ফর আহমদ ও নজরুল ইস্‌লামের সম্পাদনায় দৈনিক "নবযুগ" প্রকাশিত হয়। সুতরাং একুশ বছরের যুবক কবির দিনগুলি ছিল কর্মমুখর। অবকাশ বা অবসরের কথা স্বপ্নের বাহিরে। কিন্তু হঠাৎ কলকাতার কোলাহলপূর্ণ ও কর্মমুখর জীবন থেকে বিদায় নিয়ে কবি নিজেকে নির্বাসিত করলেন ত্রিপুরা জেলার কুমিল্লা মহকুমার অধীনস্থ এক নির্জন গ্রামে—দৌলতপুরে। সময়টা ১৯২১ খ্রীঃ এপ্রিলের শেষ দিক। এই দৌলতপুরে থাকাকালীন কলকাতার কোন কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে যে তাঁর পত্র বিনিময় চলেনি এমন নয় এবং সেই পত্র বিনিময়ই ছিল কবির সাথে তার কিছু সংখ্যক বন্ধুদের একমাত্র ক্ষীণ যোগসূত্র। প্রকৃতপক্ষে কুমিল্লার জীবনটা ছিল নজরুলের কর্ম কোলাহল-পূর্ণ জীবনের মাঝে স্বল্প-স্থায়া অজ্ঞাতবাস। কিন্তু এই স্বল্পস্থায়ী নির্বাসিত অধ্যায়ের সাথে এক চিরস্থায়ী বিষাদ-করুণ অধ্যায় কবির জীবনে বেদনার ম্লান ছায়া ফেলেছে। কুমিল্লার দিনগুলি তাই কবির জীবনে দুঃখের দীর্ঘশ্বাসের সাথে গাঁথা।

এই অজ্ঞাতবাস ও বিষাদ করুণ অধ্যায়ের নায়ক হ'লেন দৌলৎপুরের আলী আকবর খান। জনাব মুজফ্‌ফর আহমদ এই ভদ্রলোকটির চরিত্রের যে চিত্র এঁকেছেন তা থেকে এইটুকু বোঝা যায় যে, লোকটি ছিলেন দাম্ভিক, অসৎ, প্রবঞ্চক এবং চরিত্রহীন। মুজফ্‌ফর আহমদের সাথে খান সাহেবের যখন প্রথম পরিচয় হয় তখন তিনি ঢাকা কলেজের ছাত্র মুখে ইংরাজী সংলাপ এবং পরনে বিদেশী পরিচ্ছদ। কিন্তু দীর্ঘ দিন পর দ্বিতীয় সাক্ষাতের সময় খান সাহেব আবির্ভূত হলেন ধুতি শার্ট পরে এবং মুখে বাংলা সংলাপ নিয়ে। "কি করেন জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, তিনি যাদব চক্রবর্তীর (বিখ্যাত পাটীগণিত প্রণেতা) পুস্তক-

প্রকাশন ব্যবসায়ের ম্যানেজার। পরে আমরা জেনেছিলাম যে, তিনি ওখানকার ম্যানেজার ইত্যাদি কিছুই নন! তাঁর এক বন্ধু শ্রীউমেশ চক্রবর্তী ওখানে চাকুরি করতেন। সেই উপলক্ষেই তিনি যাদব চক্রবর্তীর বাড়ীতে যাতায়াত করতেন।"১

এই খান সাহেব প্রথমে বিভিন্ন জেলার ভৌগোলিক বিবরণ লিখে প্রকাশ করতেন পরে ছোটদের স্কুল পাঠ্য বই লিখে ক্যানভাসিং করে সেগুলি বিক্রয় করতেন। এবং এই উপলক্ষে তিনি কাজী কবিকে দিয়ে বাংলার সকল শিশুদের পরম-প্রিয় 'লিচু চোর' কবিতাটি লিখিয়ে নেন। কেবল 'লিচু চোর' নয়, নজরুলের সকল শ্রেষ্ঠ শিশু কবিতাগুলি এ সময় লিখিত। 'ছায়ানট' ও 'পূবের হাওয়া'র অনেকগুলি গান এবং 'খোকার বুদ্ধি', 'খোকার গল্প বলা', 'মা', 'চিঠি', 'লাল সালাম' ইত্যাদি কবিতাগুলিও সম্ভবত এই অজ্ঞাতবাস কালেই রচিত হয়েছিল। নজরুলের উদ্দেশ্যে মিঃ খান ঘন ঘন সমিতির কার্যালয়ে যাতায়াত আরম্ভ করেন এবং সকলের সাথে রীতিমত আলাপ জমিয়ে তোলেন। সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় একদিন তিনি কাকেও কিছু না বলে সমিতির একটি ঘরে বিছানা বিছিয়ে নিজের স্থায়ী আস্তানা গেড়ে নিলেন। চক্ষুলজ্জার খাতিরে কেউ তাঁকে কিছু বল্লেন না। ইতিমধ্যে তিনি একটা কঠিন কুৎসিত রোগে আক্রান্ত হন এবং নজরুল তাঁর সেবায় অংশ গ্রহণ করেন। এই রোগ থেকে বাহ্যতঃ সেরে ওঠার পর তিনি কবিকে কুমিল্লায় তাঁর নিজের গ্রাম দৌলতপুরে যেতে অনুরোধ করেন। প্রথমে মুজফ্‌ফর সাহেব কবিকে যেতে কঠোরভাবে নিষেধ করেন—কিন্তু ভাগ্য-লিপি বোধহয় অদৃশ্যলোক হ'তে নির্মমভাবে কবিকে আকর্ষণ করছিল। সামান্য কয়েকদিন পর তিনি কাকেও কিছু না বলে প্রায় আকস্মিকভাবে খান সাহেবের সঙ্গ নিয়ে কলকাতা হতে অন্তর্ধান হলেন। এ সম্পর্কে কবির অন্তরঙ্গ গায়ক-বন্ধু শ্রীনলিনীকান্ত সরকার বর্ণনা করেছেন :

---

১ "কাজী নজরুল প্রসঙ্গে"—মুজাফ্‌ফর আহমদ।

....'নজরুলের প্রাত্যহিক গতিবিধি ও কার্যসূচীর সন্ধান আগে থেকেই আমার জানা থাক্‌তো। একদিন সারা বিকালটা নজরুলের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে ঠিক তার পরদিন সকাল বেলায় দেখি নজরুল ঘরে নেই। তাঁর একজন সহকক্ষবাসী বন্ধু হাস্‌তে হাস্‌তে বলেন: সে তো কাল রাত্তিরে কুমিল্লায় চলে গেছে।'

আমি বললাম: 'কই, কাল তো কিছুই বললে না।

বলবে কি করে? কাল সন্ধ্যার পরে একজন ভদ্রলোক এসে কি সব কথাবার্তা কয়ে কুমিল্লা যাবার প্রস্তাব করলেন, প্রস্তাব অনুমোদন, সমর্থন, সব মুহূর্তের মধ্যে—সঙ্গে সঙ্গে শিয়ালদহ ষ্টেশনে যাত্রা।....

নজরুলের এই সহকক্ষবাসী বন্ধুটি 'মোসলেম ভারত'-এর কর্ণধার আফজাল উল্ হক।........

কুমিল্লায় তো তিনি গেলেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে যায়—না চিঠি-পত্তর, না খোঁজ খবর। লোক-মুখে ভালো-মন্দ সত্য-মিথ্যা নানা গুজব রটতে লাগল তার সম্বন্ধে।"২

২.

নজরুলকে নিয়ে দৌলৎপুর যাবার পথে আলী আকবর খান প্রথমে গিয়ে উঠলেন কুমিল্লার বিখ্যাত সেনগুপ্তের পরিবার, শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাসায়। এই ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের পুত্র শ্রীবীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত ছিলেন কুমিল্লা জেলা স্কুলের আলী আকবর খানের সহপাঠী। প্রাথমিক আলাপেই এই পরিবারের সকলের সঙ্গে নজরুল অন্তরঙ্গ

২ নলিনীবাবুর এই তথ্যটি সম্পূর্ণ ঠিক নয়। নিতান্ত আকস্মিক ভাবে নজরুল কুমিল্লায় যাননি—এ ব্যাপারে নজরুলের সঙ্গে মুজফ্‌ফর আহমদ ও আলী আকবর খানের বেশ কিছুদিন ধরে আলাপ-আলোচনা চলছিল।

শ্রীবুদ্ধদেব বসুর সম্পাদিত কবিতা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৫১।

ভাবেই মিশে গিয়েছিলেন। বলাবাহুল্য অনেকগুলি কারণেই তা সম্ভব হয়েছিল। প্রথমতঃ এই পরিবারটি ছিল অনেকাংশে সংস্কার মুক্ত। দ্বিতীয়তঃ এই পরিবারে সর্বত্রই একটা সাহিত্যিক আবহাওয়া বিরাজ করতো। রবীন্দ্র সংগীতের গুঞ্জরণে সমগ্র বাড়ীটা একেবারে মুখরিত হ'য়ে থাকতো। কলকাতার কোলাহল হ'তে দূরে কুমিল্লা শহরের এক নির্জন গৃহে সুস্থ সাহিত্যিক আবহাওয়ার মধ্যে নজরুল নিজেকে একেবারে সম্পূর্ণ ডুবিয়ে দিলেন। সেনগুপ্ত পরিবারের মধ্যে ছিলেন শ্রীবীরেন সেন, তাঁর মা শ্রীযুক্তা বিরজাসুন্দরী দেবী, তাঁর দুটি ছোট বোন বাচ্চি (শ্রীমতী কমলা দাশগুপ্তা) ও জটু (শ্রীমতী অঞ্জলি সেন), তাঁর এক জেঠীমা শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবী ও একমাত্র সন্তান প্রমীলা (শ্রীমতী প্রমীলা নজরুল)—ডাক নাম দুলি, বীরেন সেনের স্ত্রী ও ছোট ছেলে রাখাল। নজরুল বিরজা সুন্দরী দেবীকে মা বলে ডাকতেন এবং তিনিও কবিকে যথার্থ পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন।

এই পরিবারের সাহিত্য-সংগীত আবহাওয়ার মধ্যে কয়েকদিন কাটিয়ে কবি চলে এলেন দৌলৎপুরে—আলী আকবর খানের নিজ বাড়ীতে। এই খান পরিবারের মোটামুটি একটি পরিচয় পাওয়া প্রয়োজন। খান্দানী বংশ বলতে যা' বোঝায় খান সাহেবরা তা' ছিলেন না—তবে পরিবারটি মোটামুটি নামীয় ও স্বচ্ছল ছিল। আলী আকবর খানের এক বিধবা বড় বোন ছিলেন পরিবারের কর্তৃস্বরূপা—সমগ্র সংসারটি পরিচালনা করতেন তিনিই। নজরুলের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকেই তিনি কবিকে গভীর স্নেহের চোখে দেখতেন। খান সাহেবের আর এক বড়-বোনের বিবাহ হয় একই গ্রামে। তিনিও বিধবা ছিলেন। তাঁর ছিল এক ছেলে ও এক মেয়ে। ছেলেটি জাহাজে চাকরি নিয়ে দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়াত আর মেয়েটি হ'য়ে উঠেছিল বিবাহযোগ্যা। এই মেয়েটির সঙ্গে নজরুলের পরিচয় সম্পর্কে মুজফ্ফর সাহেব লিখেছেন :...."সত্যই নজরুলের লোক আকর্ষণ করার অসাধারণ শক্তি ছিল। এই সূত্রে বিবাহযোগ্যা মেয়েটির সঙ্গে নজরুলের পরিচয় হয়। তিনি নাকি

নজরুলের বাঁশীর সুরে মুগ্ধা হ'য়েছিলেন। আফ্‌তাবুদ্দীন খানের দেশে কোনো মেয়ের নজরুলের বাঁশীর সুরে মুগ্ধা হওয়া যে-সে কথা নয়। গুণী লোকেরা বল্‌তে পারেন নজরুল কেমন বাঁশী বাজাত!"

প্রাথমিক পরিচয়ের পর অতি অল্প দিনের মধ্যেই মেয়েটির সঙ্গে নজরুলের অন্তরঙ্গতা অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পায় এবং কবি তাকে সর্বান্তঃকরণে ভালবেসে ফেলেন। সে কথা তিনি চিঠিতে কলকাতায় তাঁর কোনো কোনো বন্ধুকে জানান। কিন্তু কলকাতার বন্ধুরা এ বিবাহে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেন নি—বরং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ প্রকারান্তরে নিষেধই করেছিলেন। মুজফ্‌ফর আহমদ তো এ বিবাহের ঘোর বিরোধী ছিলেন। প্রথমতঃ প্রবঞ্চক আলী আকবর খানকে তিনি খুব ভাল চোখে দেখতেন না, দ্বিতীয়তঃ এই অল্প দিনের মধ্যে নজরুলের সঙ্গে মেয়েটির কি এমন পরিচয় হয়েছে যাতে মন দেওয়া-নেওয়ার পর্ব সমাপ্ত হতে চলেছে।

মেয়েটির পক্ষ থেকে ভালবাসায় সংশয় ও গলদ থাকলেও কবির ভালবাসা ছিল একেবারে আন্তরিক ও গভীর। কবির বহু কবিতা, গানে ও চিঠিতে আমরা এর সমর্থন পাব। কোন্ তরফ থেকে বিয়ের প্রস্তাব উঠেছিল তা' আজ নিশ্চিত করে বলার কোন উপায় নেই। যা' হোক বিয়ের প্রস্তাব চলছে এ কথা জানাতে পেরে কবিবন্ধু পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ১৯২১ সালের ৫ই জুনে একটি চিঠিতে লেখেন:

"ভাই নুরু, এইমাত্র তোর চিঠি পেয়ে আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছি। কারণ, এই সুদীর্ঘ দিনগুলো কী ব্যাকুল প্রতীক্ষা নিয়েই না তোর চিঠির প্রতীক্ষা করে আসছিলুম।........যখন আজ তোর চিঠিতে জানলুম যে, তুই স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে তা'কে বরণ করে নিয়েছিস, তখন অবশ্য আমার কোনো দুঃখ নেই। তবে একটা কথা তোর বয়েস আমাদের চাইতে ঢের কম, অভিজ্ঞতাও তদনুরূপ; feeling-এর দিকটা অসম্ভব রকম বেশী। কাজেই ভয় হয়, হয়ত বা দু'টা জীবনই ব্যর্থ হয়। এ-বিষয়ে তুই যদি Conscious তা' হলে অবশ্য কোনো কথা নেই।

যৌবনের চাঞ্চল্যে আপাতত: মধুর মনে হলেও, ভবিষ্যতে না পস্তাতে হয়। তুই নিজে যদি সব দিক ভেবে-চিন্তে বরণ করাই ঠিক করে থাকিস্, তা' হ'লে আমি সর্বান্তঃকরণে তোদের মিলন কামনা করছি।....

বিয়ের দিন ঠিক হ'য়েছে? কবে? সত্বর পত্র দিস্।"

বিয়ের দিন ঠিক হয় ৩রা আষাঢ় ১৩২৮ সাল। বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক হ'য়ে যেতেই আলী আকবর খান রাত-দিন যৌবনবতী গ্রাম্য ভাগ্নীটিকে গড়ে-পিঠে কবির উপযুক্ত করে (?) তোলার দায়িত্ব নেন। "তিনি মেয়েটিকে নানান্ রকম পুঁথি-পুস্তক পড়ে বোঝাতে লাগলেন। শরৎ-সাহিত্যের নারী চরিত্র ইত্যাদি কিছুই, তা' থেকে বাদ গেল না।" এবং যুবতী ভাগ্নীকে এই গড়ে-পিঠে মানুষ করার দায়িত্ব তিনি এমন প্রকটভাবে পালন করতে লাগলেন, যেটা অনেকের চক্ষে বিসদৃশ ঠেকল। "সংসারের সমুদয় ভার নিয়ে খান সাহেবের যে বিধবা বোনটি সংসারে ছিলেন, তিনিও মনে মনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠলেন। কিন্তু ভয়ে গ্রাজুয়েট ভাইকেও কিছু বলতে পারলেন না। অবস্থা দিনের পর দিন অবনতির দিকে এগিয়ে চলল।"

বিয়ের পাকাপাকি বন্দোবস্তের কথা শুনে ১৩২৮ সালের ২৫ জ্যৈষ্ঠ তারিখে পবিত্রবাবু কাজী কবিকে যে চিঠি লেখেন, তা'তে দেখা যাচ্ছে কবি এই পল্লীবালিকার কাছে যথেষ্ট বিব্রত ও অসাবধান হয়ে পড়েছিলেন।

ভাই নুরু,

যাকে পেয়েছিস, তিনিই যে তোর "গত জনমের হারানো গৃহলক্ষ্মী," এ-কথা সত্যি যদি এতটুকু সত্য হয়, তাহলে তোর সৌভাগ্যে আমার সত্যিই ঈর্ষা হ'চ্ছে। অবশ্য ইংরেজী, ফরাসী উপন্যাসে এরূপ নায়ব-নায়িকার সঙ্গে ঢের পরিচয় হ'য়েছে, কাজেই তোর এ-কথা আমি সত্যি বলে মেনে নিতে গররাজী নই।....তোর বিয়েটা আমাদের একটা গল্পের প্লট হ'বে, এতে আর আশ্চর্য কি! লিখেছিস্: "এক অচেনা পল্লী-বালিকার কাছে এত বিব্রত আর অসাবধান হ'য়ে পড়েছি, যা কোন

নারীর কাছে কখনো হইনি।....জেনে খুশীই হলাম যে তাঁর বাইরের ঐশ্বর্যও যথেষ্টই" আছে।....

তোর বিয়েতে উপস্থিত থাকার ইচ্ছে যে আমার কত প্রবল তা' জানিয়ে কোন লাভ নেই। তুই যে এরূপ একটা আজগুবি কাণ্ড বাধিয়ে বসবি, তা' সকলে আমরা জানতুম।"....

এখানে আরো কতকগুলি পত্রের প্রতিলিপি তুলে দিলুম। পত্রগুলি একাধিক কারণে মূল্যবান। প্রথমতঃ এই অজ্ঞাতবাসের দলিল হিসেবে, দ্বিতীয়তঃ পত্রগুলি হ'তে বিয়ের ঘটনাটিও যথেষ্ট পরিষ্কার হ'বে। "মোহাম্মাদী অফিস, ১৯নং আপার সার্কুলার রোড, কলকাতা" থেকে ১৩ই জুন, ১৯২১ তারিখে জনাব মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী লেখেন:

"অভিন্নহৃদয়েষু,

ভাই নজরুল, আপনার ৭ই তারিখের চিঠিখানা আজ বিকেলে পেয়ে কয়েকবার পড়েছি, আর অশান্তির মধ্যেও খুব হেসেছি।....

নিভৃত পল্লীর যে কুটির-বাসিনীর (দৌলতপুরের দৌলৎখানার শাহাজাদী বলাই বোধহয় ঠিক, না?) সাথে আপনার মনের মিল ও জীবনের যোগ হ'য়ে গেছে, তাঁকে আমার শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ণ আদাব জানাবেন।....আমার বোধহয় আপনার বন্ধুরা অসন্তুষ্ট হ'য়েছেন একটা কারণে। আপনি 'নারায়ণে' 'দহন-মালা' লিখে নারীর কাছে ক্ষমা চাইলেন; তার পরেই এত সত্বর প্রেমের ফাঁদে ধরা পড়লেন। 'যৌবনের জোয়ার' বড় সাংঘাতিক; তাকে ঠেলে রাখা বড় দায়—এ আমি স্বীকার করছি।"....

ওয়াজেদ সাহেব উক্ত চিঠির ৩ দিন পর "মোহাম্মাদী অফিস" থেকে কবিকে যে চিঠি লেখেন, সেটি এই:

"ভাই নজরুল,

আপনার আগের চিঠিটার জওয়াব আগেই দিয়েছি।... আজ, এই কতক্ষণ হ'ল, রবিবারের চিঠিটাও পেলাম।....আপনার বিয়ের খবরটা তাড়াতাড়ি এই সপ্তাহের কাগজে বের করে দিয়েছি। কিন্তু ভয় নেই,

আপনার শ্রীমতীর কোনো নামই কাগজে ছাপা হয়নি।....মোহাম্মাদী আজ আপনাকে একখানা পাঠিয়েছি।....আপনি শিগ্গীর কলকাতায় আসছেন শুনে সত্যি বড় খুশী হ'য়েছি।"....

৫১নং মির্জাপুর ষ্ট্রীট থেকে ১৯২১ সালের ১৫ই জুনে জনাব মুজফ্ফর আহমদ দৌলতপুরে কবিকে যে চিঠি লেখেন তার কিয়দংশ এই—এখানে বিয়ের তারিখটা স্পষ্ট উল্লেখিত হ'য়েছে :

"ভাই নজরুল,

ইতিমধ্যে আপনার কোন পত্রাদি পাইনি। ওয়াজেদ মিয়ার চিঠিতে জানলুম যে, ৩রা আষাঢ় তারিখেই আপনাদের বিয়ে হচ্ছে।....সময় খুব সংকীর্ণ। কাজেই আমার আর যাওয়া হ'চ্ছে না। তবে ভালয় ভালয় সব মিটে যাক্—এ প্রার্থনা জানাচ্ছি খোদার দরগাহে। আমার আগের লেখা দু'খানা চিঠি বোধহয় পেয়েছেন এতদিনে।"....

জনাব আহমদ সাহেব ২৬শে জুন নজরুলকে যে "অত্যন্ত গোপনীয়' পত্র লেখেন, নজরুল-জীবনীর জন্যে তার মূল্য ও গুরুত্ব অনেকখানি। জনাব আহমদ সাহেব কেবল যে নজরুলের বন্ধু নন অভিভাবক, কেবল সঙ্গী নন, আদর্শ পরামর্শদাতাও, তা অত্যন্ত সুন্দররূপে ব্যক্ত হ'য়েছে এই চিঠিতে। আদর্শ চরিত্র গঠনের জন্যে তিনি কবিকে বহু দোষদুর্বলতা হ'তে মুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। বিয়েতে যে নিমন্ত্রণপত্র ছাপা হ'য়েছিল, তাতে কবি নিজেকে 'মুসলিম-বঙ্গের রবি-কবি' (জনাব মুজফফর আহমদ তাঁর গ্রন্থে 'মুসলিম রবীন্দ্রনাথ' কথাটির উল্লেখ করেছেন এটি তিনি পেলেন কোথায় ? তিনি কী মূল নিমন্ত্রণ-পত্রটি দেখেছেন ? যদি না দেখে থাকেন তা'হ'লে এমন ভুল শব্দ লিখলেন কেন ? তিনি তো অনেক লেখকের অনেক তুচ্ছ বিষয়কে অনেক বড় ভুল বলে তুলে ধরেছেন) এবং পিতা মরহুম কাজী ফকির আহমদকে চুরুলিয়ার "আয়মাদার" বলে পরিচয় দেন।* এই অসত্য ভাষণে জনাব আহমদ সাহেব অত্যন্ত ব্যথিত হন। এ প্রসঙ্গে বিশেষরূপে স্মরণীয় এই যে কবিরা আয়মাদার

* নিমন্ত্রণ পত্রটি "আফজাল-উল্-হক" প্রসঙ্গে মুদ্রিত হ'য়েছে।

ছিলেন ঠিকই কিন্তু তা' নামে মাত্র। প্রকৃতপক্ষে আয়মাদার বলে নিজের নামে কবি ধনসম্পদের ও আভিজাত্যের যে.ছাপ দিতে চেয়েছেন তা তখন তাদের আদৌ ছিল না। তাই তিনি লেখেন:

"পরম প্রীতিভাজনেষু,

কাজী সাহেব, আপনার পত্রাদি যে আর মোটেই পাওয়া যাইতেছে না, তার কারণ কি? খান সাহেবের নিমন্ত্রণপত্র পাইয়াছিলাম। পত্রখানা আপনারই মুসাবিদা করা দেখলাম। পত্রের ভাষা দু'-এক জায়গায় বড় অসংযত হইয়াছে। একটু যেন কেমন দাম্ভিকতা প্রকাশ পাইয়াছে। আপনার হাত দিয়া অমন লেখা বাহির হওয়া কিছুতেই ঠিক হয় নাই। আমার বড় ভয় হইতেছে যে, খান সাহেবের সংস্রবে থাকিয়া আপনিও না শেষে দাম্ভিক হইয়া পড়েন। অন্যে বড় বলিলে গৌরবের কথা হয় আর নিজেকে নিজে বড় বলিলে অগৌরবের মাত্রাই বাড়িয়া যায়। "মোহাম্মাদী"তে বিবাহের কথা ছাপিতে অনুরোধ করাটা ঠিক হইয়াছে কি? তাঁরা ত নিজ হইতেই ও-খবর ছাপিতে পারিতেন!....বাস্তবিক আমার প্রাণে বড় লাগিয়াছে বলিয়া আমি এত কথা বলিলাম। এই নিমন্ত্রণপত্র আবার 'অপূর্ব নিমন্ত্রণপত্র' শিরোনামে 'বাঙালী'তে মুদ্রিত হইয়াছে দেখিলাম। 'বাঙালী'কে এই নিমন্ত্রণপত্র কে পাঠাইল?....আপনার অঙ্কলক্ষ্মীকে এই অপরিচিতের বিনয়-সম্ভাষণ জানাইবেন।"...

জনাব আহমদ সাহেবের এই কথাগুলি ভবিষ্যৎ-বাণীর মত সত্যে পরিণত হ'য়েছিল।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, আলী আকবর খানের আচরণ সহজ-সীমা অতিক্রম করে প্রকট হয়ে উঠেছিল। বিয়ের দিন প্রায় এসে গিয়েছিল —নিমন্ত্রণপত্র গিয়েছে চার দিকে। নিমন্ত্রণপত্র পেয়েছেন কুমিল্লার সেনগুপ্ত পরিবারের সকলেও। এমন সময় নজরুলের মন গেল বিষিয়ে। তিনি পরিপূর্ণ অন্তরে এ-বিয়েকে আর সমর্থন করতে পারছিলেন না। এই মন বিষিয়ে ওঠার কারণ সম্পর্কে অনেকেই "কোন এক অজ্ঞাত

কারণের" কথা উল্লেখ করেছেন। বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ এ সম্পর্কে লিখেছেন—"তাঁর আপনভোলা স্বভাব ও বিষয়-বিরাগ নিয়ে তাঁর দৌলতপুরের শ্বশুরালয়ে দাস-দাসীরা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতে ছাড়েনি। নব-পরিণীতা বালিকাবধূর' অবজ্ঞা তাঁকে হেনেছিল সবচেয়ে বড় আঘাত। আহত অভিমানে বিবাহবাসর ত্যাগ করে নজরুল সঙ্গে সঙ্গে কুমিল্লায় চলে যান।" ষষ্ঠ বর্ষ, বৈশাখ সংখ্যা 'জাগরণে' 'বিদ্রোহীর প্রথম বিবাহ' প্রবন্ধে জনাব এম আবদুর রহমান লিখেছেন: "বিবাহের দু'-একদিন আগে কবি তাঁর ভাবী বধূ এবং বধূর সম্পর্কিত কোন ব্যক্তির কথা ও কার্যে এবং আচরণে ভীষণভাবে অপমানে আহত হ'য়েছিলেন।" এ-প্রসঙ্গে জনাব আহমদ সাহেবের মন্তব্য সর্বাপেক্ষা মূল্যবান: "আলী আকবর খানের কোনো কোনো ব্যবহারে নজরুল নিজেকে অপমানিত বোধ করল, তার বাগদত্তার, দু-একটি আচরণেও সে মনে মনে আহত হ'লো। মেয়েটিকে সে ভালও বেসেছিল। তা' না হ'লে সে বিয়েতে কিছুতেই রাজী হ'ত না। সব মিলিয়ে সে হতভম্ব হয়ে পড়ল।"....

মোট কথা এখন আমরা নিঃসঙ্কোচে এইটুকু বলতে পারি যে, খান সাহেবের পক্ষে কোন কাজই অসাধ্য ছিল না। তাই বাগদত্তা ও খান সাহেবের আচরণে আহত হওয়া কবির পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক। পরে এ সম্পর্কে কাজী কবি জনাব আহমদকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তার মর্মার্থ এই যে, তিনি আলী আকবর খানের দ্বারা অপমানিত ও প্রতারিত হ'য়েছেন।

বিয়ের দিন এসে গেলেও তার এতটুকু আকর্ষণ কবির প্রাণে অবশিষ্ট ছিল না। জান্তব আচরণের সবটুকু দেখেশুনে নজরুল একেবারে পাথরের মত হয়ে গিয়েছিলেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গ আসতে লাগলেন ধীরে ধীরে। যথাসময়ে সেনগুপ্ত পরিবারের ছোট-বড় সকলেই নিমন্ত্রণ বাড়ীতে এসে হাজির হলেন। এ সম্পর্কে শ্রীযুক্তা বিরজাসুন্দরী দেবীর একটি দুষ্প্রাপ্য রচনা আমাদের হস্তগত হ'য়েছে। তিনি লিখেছেন: "আমার একটি পথে পাওয়া মুসলমান ছেলের বিয়েতে যাচ্ছি।....আমাদের

নৌকায় মেয়েমানুষ আমি, আমার বিধবা জা (শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবী), বৌ আর তিনটি ছোট মেয়ে, আর পুরুষ আমার স্বামী (শ্রীইন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত) ও দুই ছেলে 'বী' (বীরেন্দ্রকুমার) ও "অ" এবং আমার বোনপো 'স' আর ছোট্ট একটি নাতি (শ্রীরাখালচন্দ্র সেন) ।....

সকলের বড় 'খান' আর সকলের ছোট 'আ-খান' (আলী আকবর খান) এই দুইটির সঙ্গে আমার অনেক দিন থেকে জানাশোনা। 'আ' আমার পুত্র 'বী'র সহপাঠী, তার সঙ্গেই আগে পরিচয়। সে আমাকে মা বলে ও যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে, তার জন্যেই তার ভাগ্নীর.... বিয়েতে তাদের বাড়ী গিয়েছিলেম।" (৩)

বিরজাসুন্দরীকে নিকটে পেয়েই নজরুল সকল কথা তাঁকে খুলে বললেন। বুকের অতলে জমাট-বাঁধা কথাগুলো বলে তিনি তাঁর বিচলিত চিত্তে শান্তি পেতে চেয়েছিলেন। প্রবীণা মহিলা সকল কথা শুনে বিয়েটা যে নজরুলের পক্ষে কোন অবস্থাতেই শান্তির ও শুভ হ'তে পারে না, তা স্পষ্ট করেই জানিয়েছিলেন। নজরুলের পক্ষে সে সময় বিবাহ বাসর ত্যাগ করে চলে যাওয়াই ছিল মঙ্গলের। কিন্তু বিয়ের লগ্ন এসে গিয়েছিল—নিমন্ত্রিত সকলেই 'বিয়ে পড়ান'র জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। ফলে নজরুলকে বাধ্য হয়ে 'নওশাহ' (বর) সেজে বিবাহ-আসরে বসতে হল এবং ইজাব কবুল (বিবাহ-চুক্তি স্বীকার) করতে হয়েছিল। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। অতি প্রত্যুষে শ্রীবীরেন্দ্রকুমার সেনের সঙ্গে পদব্রজে চিরদিনের মত দৌলতপুর ত্যাগ করে কবি কুমিল্লায় চলে আসেন।

'আমি তোমাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করলাম'—বিয়ের এই চুক্তিতেই বিয়ের সব কিছু শেষ হয়ে গেল। ফুলশয্যা বা স্বামী-স্ত্রীরূপে একত্রে বসবাস আর তাঁদের কোনদিনই হয়নি, এমন কি দূর থেকে চাক্ষুষ

---

(৩) "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা"র পঞ্চম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় শ্রীযুক্তা বিরজাসুন্দরী দেবীর এই লেখাটি "নৌকা-পথে" শিরোনামায় প্রকাশিত হ'য়েছিল।

দেখাটুকুও আর ঘটেনি কোনদিন। ভদ্র মহিলার তখনকার নামটি ছিল 'সৈয়দা খাতুন'—'নার্গিস আসার খানম' নামটি নজরুলের দেওয়া এবং বর্তমানে তিনি নার্গিস খানম নামে পরিচিতা।

দৌলতপুর থেকে চলে এসে কবি বেশ কিছুদিনের জন্যে কান্দির-পাড়ে সেনগুপ্ত পরিবারে ছিলেন। শ্রীইন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত ছিলেন কুমিল্লার কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের ইন্‌সপেক্টর। এখানেই নজরুলের বর্তমান-পত্নী মিসেস প্রমীলা নজরুল ওরফে আশালতা সেনগুপ্ত ওরফে দুলির সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয় ঘটে।

কান্দিরপাড় থেকে বিয়ের এক মাস পর নজরুল তাঁর মামাশ্বশুর আলী আকবর খানকে 'বাবা শ্বশুর' সম্বোধন করে যে চিঠি লেখেন তাতে অপমানাহত নজরুলের বিদ্রোহ-কোমল মনের অপরূপ প্রকাশ ঘটেছে। মনোমালিন্য ঘটলেও এ সময়ে তিনি বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা চিন্তা করেননি—বরং একটা আপোষ মনোভাবের সুরই ফুটে উঠেছে:

কান্দিরপাড়, কুমিল্লা
২৩শে জুলাই, ১৯২১
(বিকেলবেলা)

বাবা শ্বশুর!

আপনাদের এই অসুর জামাই পশুর মতন ব্যবহার করে এসে যা কিছু কসুর করেছে, তা ক্ষমা করো সকলে, অবশ্য যদি আমার ক্ষমা চাওয়ার অধিকার থাকে। এইটুকু মনে রাখবেন, আমার অন্তর-দেবতা নেহায়েৎ অসহ্য না হয়ে পড়লে আমি কখনো কাউকে ব্যথা দিই না। যদিও ঘা খেয়ে খেয়ে আমার হৃদয়টাতে ঘাঁটা বুজে গেছে, তবু সেটার অন্তরতম প্রদেশটা এখনো শিরীষ ফুলের পরাগের মতই কোমল আছে। সেখানে খোঁচা লাগলে আর আমি থাকতে পারিনে। তা ছাড়া আমিও আপনাদেরই পাঁচ জনের মত মানুষ, আমার গণ্ডারের চামড়া নয়,—কেবল সহ্যগুণটা কিছু বেশী। আমার মান-অপমান

সম্বন্ধে কাণ্ডজ্ঞান ছিল না বা 'কেয়ার' করিনি বলে আমি কখনও এত বড় অপমান সহ্য করিনি, যাতে আমার 'ম্যানলিনেসে' বা পৌরুষে গিয়ে বাজে—যাতে আমাকে কেউ কাপুরুষ হীন ভাবতে পারে। আমি সাধ করে পথের ভিখারী সেজেছি বলে, লোকের পদাঘাত সইবার মতন 'ক্ষুদ্র-আত্মা' অমানুষ হয়ে যাইনি। আপনজনের কাছ হতে পাওয়া অপ্রত্যাশিত এত হীন ঘৃণা, অবহেলা আমার বুক ভেঙে দিয়েছে। বাবা! আমি মানুষের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। দোওয়া করবেন যেন আমার এ ভুল দু'দিনেই ভেঙে যায়!

বাকী উৎসবের জন্য যত শীগ্‌গির পারি বন্দোবস্ত করব। বাড়ীর সকলকে দস্তুর মতো সালাম দোওয়া জানাবেন। অন্যান্য যাদের কথা রাখতে পারিনি, তাদের ক্ষমা করতে বলবেন। তাকেও ক্ষমা করতে বলবেন, যদি এ ক্ষমা চাওয়া ধৃষ্টতা না হয়।

আরজ—ইতি।

চির-সত্য স্নেহ-সিক্ত—নুরু।"

জনাব মুজফ্‌ফর আহমদ নানান তথ্য দিয়ে প্রমাণ করাতে চেষ্টা করেছেন যে এই 'বাবা শ্বশুর মার্কা' চিঠিখানি জাল এবং আলী আকবর খানই নিজের ইজ্জত ও মুখ বাঁচানোর জন্যে এ চিঠিখানি জাল করেছেন। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি—পত্রটি নজরুলের নিজেরই রচনা। পত্রের মধ্যে ভুলভ্রান্তি ও তথ্যগত যে অসংগতিই থাক না কেন—সমগ্র পত্রটির মধ্যে যে কাব্যিক 'দ্যুতি' আছে তা' একমাত্র কোন সুলেখক ও কবির হাত দিয়ে বেরুনই সম্ভব—শিশুদের জন্যে 'ভৌগোলিক বিবরণ রচয়িতা' আলী আকবর খানের পক্ষে কোনকালেই এমনটি লেখা সম্ভব নয়। চিঠির মধ্যে যে 'স্ববিরোধের' কথা জনাব মুজফ্‌ফর সাহেব উল্লেখ করেছেন—তেমন ঘটনা কবির জীবনের সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। এছাড়া ভাষার যে দুর্বলতার কথা মুজফ্‌ফর সাহেব উল্লেখ করেছেন

ও ধরণের দুর্বলতা কবির বহুতর রচনায় ছড়িয়ে আছে। যে পরিমার্জনায় ভাষা ও সৃষ্টি সর্বাঙ্গসুন্দর হ'য়ে ওঠে সে পরিমার্জনার পথে কবি কোনদিনই পা বাড়ান নি। এর মানে এই নয় যে নজরুল বাংলা ভাষার শুদ্ধ রূপ জানতেন না—বরং কবির জীবনের এ একটি বড় বৈশিষ্ট্য। যাক—চিঠিখানি যে নজরুলের, এ বিষয় আমার কোন সন্দেহ নেই। অন্ততঃ এ চিঠিখানি সম্পর্কে আমি কোন সন্দেহ পোষণ করি না। জনাব আবদুল কাদির—যিনি ঢাকা হতে পত্রখানি সর্বপ্রথম জনসমক্ষে প্রকাশ করেছেন তিনিও আমার মতই সমর্থন করেন। কেবলমাত্র মনগড়া ও অনুমানের উপর নির্ভর করে মুজফফর সাহেব কেন যে এই ধরণের বিভ্রান্তিকর উক্তি করলেন তা আমাদের বোধের অগম্য।

যা হোক, এই চিঠি লেখার পর দারুণ মানসিক অশান্তির জন্যে নজরুল খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সে সংবাদ কলকাতার বন্ধু-বান্ধবদের জানান হয়। সকলেই জনাব আহমদ সাহেবকে কলকাতায় নজরুলকে নিয়ে আসার পরামর্শ ও চাপ দিলেন। কিন্তু যত সব ভাঙা তরীর ভিড় এক জায়গায়। কারো কাছে টাকা নেই। কলকাতার সংস্কৃত কলেজের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন শ্রীযুক্ত ফকিরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—তিনি ছিলেন কবির জন্মভূমি চুরুলিয়ার আশপাশের লোক এবং নজরুলের সাথে তাঁর পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ। সকল কথা অবগত হয়ে তিনি কবিকে আনার জন্যে যাতায়াতের খরচ বাবদ ত্রিশ টাকা দেন। সেই সামান্য টাকার ওপর ভরসা করে সুদূর কুমিল্লা থেকে নজরুলকে আনার জন্যে জনাব আহমদ বেরিয়ে পড়েন। কুমিল্লায় গিয়ে সেনগুপ্ত পরিবারের সাথে নজরুলের ঘনিষ্ঠ পরিচয় দেখে মুজফ্‌ফর সাহেব অবাক হয়ে যান। বিশেষ করে শ্রীযুক্তা বিরজাসুন্দরী দেবীর স্নেহ ও ভালবাসার কথা তিনি তো মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন। তাঁর প্রদত্ত মনোজ্ঞ বিবরণের অংশতঃ এখানে উল্লেখযোগ্য :.... 'শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাসায় নজরুল তাদের পরিবারে একজন হয়ে গিয়েছিল। আলী আকবর খানের

বাড়ীর ঘটনার পরে এই বাসায় নজরুলের যত্ন আরও অনেক পরিমাণে বেড়ে গিয়েছিল। পাখা বিস্তার করে পাখী-মা যেমন ছানাদের আশ্রয় দেয় তেমনি আশ্রয় দিয়েছিলেন শ্রীযুক্তা বিরজাসুন্দরী দেবী নজরুলকে।"

কবিকে নিয়ে কুমিল্লা থেকে ফেরার পথে চাঁদপুরে এসে আহমদ সাহেব দেখলেন যে টাকার অঙ্ক কমে এসেছে। ওঁরা চাঁদপুরের ডাক বাংলায় আশ্রয় নিয়ে টাকা পাঠাবার জন্যে কলকাতায় জনাব আফজালুল হক সাহেবকে টেলিগ্রাম করেন। হক সাহেবের নিকট হতে কথাটা অবগত হয়ে জনাব আশরাফ উদ্দীন চৌধুরী চাঁদপুরে হরদয়াল নাগ মহাশয়কে ডাক বাংলায় কিছু টাকা পাঠাবার জন্যে টেলিগ্রাম করে দেন। এই টেলিগ্রাম পেয়ে বারটি টাকা শ্রীযুক্ত কুলচন্দ্র সিংহ রায় ডাক বাংলায় দিয়ে যান। তারপর নজরুলকে নিয়ে জনাব আহমদ সাহেব কলকাতায় ফিরে আসেন।

কলকাতায় আসার পরের ঘটনাটি আরো চমকপ্রদ। নজরুল কলকাতায় আছেন শুনে আলী আকবর খানের ভাই-ঝি এবং বাড়ীর অন্যান্য অনেক বাচ্চা ছেলে-মেয়ে কবির কাছে পত্র লিখতে থাকে কিন্তু কবি একটি পত্রেরও জবাব দেননি। তারপর একদিন অকস্মাৎ আলী আকবর খান কলকাতায় এলেন। কবিকে অনেক বোঝালেন এবং প্রত্যক্ষদর্শীর (জনাব মুজফ্‌ফর আহমদ) বর্ণনা থেকে জানা যায় একটা বড় মত টাকার বাণ্ডিল ঘুষ দিয়ে কবিকে বশ করতে চেয়েছিলেন খান সাহেব কিন্তু কবিকে বশ করা তখন সাধ্যের বাইরে। অবশেষে বিফল-মনোরথ হয়ে কলকাতা ত্যাগ করে চলে গেলেন। এই টাকার কথা উল্লেখ করে নজরুল পরদিন বিরজাসুন্দরীকে এক চিঠিতে লেখেন, "মা আলী আকবর খান আমাকে নোটের তাড়া দেখিয়ে গেল।" শোনা গেছে এর পর নার্গিস খানম আবার পড়াশুনোয় আত্মনিয়োগ করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে কলেজে ভর্তি হন। বর্তমানে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকায় অবস্থান করছেন।

কিন্তু বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে গেলেও কবি আজীবন মনে রেখেছেন তাঁর এই প্রথম প্রিয়ার কথা। কেবল মনে রাখাই নয়—আঘাতে আঘাতে হৃদয়ের একটা ক্ষত দিয়ে রুধির বেরিয়েছে অবিশ্রান্ত আর সেই রুধিরের স্পর্শে কবির সৃষ্টিতে নতুনতর 'রং' ধরেছে। কবির বীণাতে বেজেছে দীপক রাগিণী। জীবনের ঊষা-লগ্নে এই প্রচণ্ড আঘাত হৃদয়-দুয়ারের বন্ধ আগল খুলে দিয়েছে—কবির বান ডাকা সৃষ্টিতে শোনা গিয়েছে অসীম উদাত্ত সমুদ্রকল্লোল। মহিমাময় ভাস্বর সৃষ্টির জন্যে বুঝি এ আঘাতের প্রয়োজন ছিল। এই আঘাত কবির সৃষ্টিতে কেমন ভাবে বেগ সঞ্চার করেছে তা আলোচনা করার পূর্বে আমরা নার্গিস খানমের নিকট লেখা কবির প্রথম ও শেষ চিঠিখানির অনুলিপি নিম্নে উদ্ধৃত করতে চাই। এই চিঠিখানি কেবল ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে মূল্যবান নয়, আদর্শ পত্র-সাহিত্য হিসেবেও এর মূল্য অনেকখানি। বাংলা পত্র-সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ পত্রগুলির মধ্যে এটি নিঃসন্দেহে একটি। তা ছাড়া এই চিঠির মধ্যেই আমরা দেখতে পাব কবি তাঁর প্রথমা প্রিয়াকে কিভাবে গ্রহণ করেছিলেন। সম্পূর্ণ চিঠিখানি এই ঃ

106, Upper Chitpur Road
"Gramophone-Rehearsal Room"
Calcutta.
1-7-39

কল্যাণীয়াবু!

তোমার পত্র পেয়েছি—সেদিন নববর্ষার নবঘন-সিক্ত প্রভাতে। মেঘ-মেদুর গগনে সেদিন অশান্ত ধারায় বারি ঝরছিল। পনের বছর আগে এমনি এক আষাঢ়ে এমনি বারিধারার প্লাবন নেমেছিল—তা তুমিও হয়তো স্মরণ করতে পারো। আষাঢ়ের নব মেঘপুঞ্জকে আমার নমস্কার। এই মেঘদূত বিরহী যক্ষের বাণী বহন করে নিয়ে গিয়েছিল কালিদাসের

যুগে, রেবা নদীর তীরে, মালবিকার দেশে, তাঁর প্রিয়ার কাছে। এই মেঘপুঞ্জের আশীর্বাণী আমার জীবনে এনে দেয় চরম বেদনার সঞ্চয়। এই আষাঢ় আমায় কল্পনার স্বর্গলোক থেকে টেনে ভাসিয়ে দিয়েছে বেদনার অনন্ত স্রোতে। থাক, তোমার অনুযোগের অভিযোগের উত্তর দিই।

তুমি বিশ্বাস করো, আমি যা লিখছি তা সত্য। লোকের মুখের শোনা কথা দিয়ে যদি আমার মূর্তির কল্পনা করে থাকো, তা হলে আমায় ভুল বুঝবে—আর তা মিথ্যা।

তোমার উপর আমি কোন জিঘাংসা পোষণ করি না—এ আমি সকল অন্তর দিয়ে বলছি। আমার অন্তর্যামী জানেন, তোমার জন্য আমার হৃদয়ে কি গভীর ক্ষত, কি অসীম বেদনা। কিন্তু সে বেদনার আগুনে আমিই পুড়েছি—তা দিয়ে তোমায় কোনদিন দগ্ধ করতে চাইনি। তুমি এই আগুনের পরশমাণিক না দিলে আমি অগ্নিবীণা বাজাতে পারতাম না। আমি ধূমকেতুর বিস্ময় নিয়ে উদিত হতে পারতাম না। তোমার যে কল্যাণ রূপ আমি আমার কিশোর বয়সে প্রথমে দেখেছিলাম, যে রূপকে আমার জীবনের সর্বপ্রথম ভালবাসার অঞ্জলি দিয়াছিলাম সে রূপ আজো স্বর্গের পারিজাত মন্দারের মত চির অম্লান হয়েই আছে আমার বক্ষে। অন্তরের আগুন বাইরের সে ফুলহারকে স্পর্শ করতে পারেনি।

তুমি ভুলে যেও না আমি কবি—আমি আঘাত করলেও ফুল দিয়ে আঘাত করি। অসুন্দর কুৎসিতের সাধনা আমার নয়। আমার আঘাত বর্বরের, কাপুরুষের আঘাতের মত নিষ্ঠুর নয়। আমার অন্তর্যামী জানেন (তুমি কি জান বা শুনেছ, জানি না) তোমার বিরুদ্ধে আজ আমার কোন অনুযোগ নেই, অভিযোগ নেই, দাবীও নেই।

আমি কখনো কোন 'দূত' প্রেরণ করিনি তোমার কাছে। আমাদের মাঝে যে অসীম ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে তার 'সেতু' কোন লোক ত নয়ই—স্বয়ং বিধাতাও হতে পারেন কিনা সন্দেহ। আমায় বিশ্বাস কর,

আমি সেই 'ক্ষুদ্র'দের কথা বিশ্বাস করিনি। করলে পত্রোত্তর দিতাম না। তোমার উপর আমার কোন অশ্রদ্ধাও নেই, কোন অধিকারও নেই—আবার বলছি। আমি যদিও গ্রামোফোনের ট্রেড মার্ক 'কুকুরের' সেবা করছি, তবুও কোন কুকুরকে লেলিয়ে দিই নাই। তোমাদেরই ঢাকার কুকুর একবার আমায় কামড়েছিল আমার অসাবধানতায়, কিন্তু শক্তি থাকতেও আমি তার প্রতিশোধ গ্রহণ করিনি—তাদের প্রতি আঘাত করিনি। সেই কুকুরদের ভয়ে ঢাকায় যেতে আমার সাহসের অভাবের উল্লেখ করেছ, এতে হাসি পেল। তুমি জান, ছেলেরা (যুবকেরা) আমায় কত ভালবাসে। আমারই অনুরোধে আমার ভক্তরা তাদের ক্ষমা করেছিল। নইলে তাদের চিহ্নও থাকত না এই পৃথিবীতে! তুমি আমায় জানবার যথেষ্ট সুযোগ পাওনি, তাই এ কথা লিখেছো।.... যাক, তুমি রূপবতী, বিত্তশালিনী, গুণবতী, কাজেই তোমার উমেদার অনেক জুটবে—তুমি যদি স্বেচ্ছায় স্বয়ম্বরা হও, আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। আমি কোন অধিকারে তোমায় বারণ করব—বা আদেশ দেব? নিষ্ঠুরা নিয়তি সমস্ত অধিকার থেকে আমায় মুক্তি দিয়েছেন। তোমার আজিকার রূপ কি, জানিনা। আমি জানি তোমার সেই কিশোরী মূর্তিকে। যাকে দেবী মূর্তির মত আমার হৃদয়-বেদীতে অনন্ত প্রেম, অনন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলাম। সেদিনের তুমি সে বেদী গ্রহণ করলে না। পাষাণ দেবীর মতই তুমি বেছে নিলে বেদনার বেদী-পীঠ।...জীবন ভরে সেইখানেই চলেছে আমার পূজারতি। আজকার তুমি আমার কাছে মিথ্যা, ব্যর্থ; তাই তাকে পেতে চাইনে। জানিনে হয়ত সে রূপ দেখে বঞ্চিত হব, অধিকতর বেদনা পাব—তাই তাকে অস্বীকার করে চলেছি।

দেখা? না-ই হ'ল এ ধূলির ধরায়! প্রেমের ফুল এ ধূলিতলে হয়ে যায় ম্লান, দগ্ধ হতশ্রী। তুমি যদি সত্যই আমায় ভালবাস, আমাকে চাও ওখান থেকেই আমাকে পাবে। লাইলী মজ্‌নুঁকে পায়নি, শিরি

ফরহাদকে পায়নি তবু তাদের মত করে কেউ কারো প্রিয়তমকে পায়নি। আত্মহত্যা মহাপাপ, এ অতি পুরাতন কথা হলেও আত্মা অবিনশ্বর, আত্মাকে কেউ হত্যা করতে পারে না। প্রেমের সোনার কাঠির স্পর্শ যদি পেয়ে থাক তাহলে তোমার মত ভাগ্যবতী কে আছে! তারই মায়াস্পর্শে তোমার সকল কিছু আলোয় আলোময় হ'য়ে উঠবে। দুঃখ নিয়ে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে গেলেই সেই দুঃখের অবসান হয় না। মানুষ ইচ্ছা করলে সাধনা দিয়ে, তপস্যা দিয়ে ভুলকে ফুলরূপে ফুটিয়ে তুলতে পারে। যদি কোন ভুল করে থাক জীবনে, এ জীবনেই তার সংশোধন করে যেতে হবে; তবেই পাবে আনন্দ, মুক্তি; তবেই হবে সর্ব দুঃখের অবসান। নিজেকে উন্নত করতে চেষ্টা কর, স্বয়ং বিধাতা তোমার সহায় হবেন। আমি সংসার করছি, তবু চলে গেছি এই সংসারের বাধাকে অতিক্রম করে ঊর্ধ্বলোকে—সেখানে গেলে পৃথিবীর সকল অসম্পূর্ণতা, সকল অপরাধ ক্ষমা-সুন্দর চোখে পরম মনোহর মূর্তিতে দেখা দেয়।....

হঠাৎ মনে পড়ে গেল পনের ষোল বছর আগেকার কথা। তোমার জ্বর হয়েছিল, বহু সাধনার পর আমার তৃষিত দু'টি কর তোমার শুভ্র-সুন্দর ললাট-স্পর্শ করতে পেরেছিল, তোমার সেই তপ্ত ললাটের স্পর্শ যেন আজও অনুভব করতে পারি। তুমি কি চেয়ে দেখেছিলে? আমার চোখে ছিল জল, হাতে সেবা করার আকুল স্পৃহা, অন্তরে শ্রীবিধাতার চরণে তোমার আরোগ্য লাভের জন্য করুণ মিনতি। মনে হয় যেন কালকার কথা। মহাকাল সেই স্মৃতি মুছে ফেলতে পারলেন না। কী উদগ্র অতৃপ্তি, কী দুর্দমনীয় প্রেমের জোয়ারই সেদিন এসেছিল! সারা দিনরাত আমার চোখে ঘুম ছিল না।

যাক্—আজ চলেছি জীবনের অস্তায়মান দিনের শেষ রশ্মি ধরে ভাঁটার স্রোতে। তোমার ক্ষমতা নেই সে পথ থেকে ফেরানোর। আর তার চেষ্টা করো না।

তোমাকে লেখা এই আমার প্রথম ও শেষ চিঠি হোক। যেখানেই

থাকি, বিশ্বাস করো, আমার অক্ষয় আশীর্বাদী কবচ তোমায় ঘিরে থাকবে। তুমি সুখী হও, শান্তি পাও....এই প্রার্থনা। আমায় যত মন্দ বলে বিশ্বাস কর আমি তত মন্দ নই—এই আমার শেষ কৈফিয়ৎ।

ইতি—

নিত্যশুভার্থী

নজরুল ইসলাম

P.S.

আমার 'চক্রবাক্' নামক কবিতাপুস্তকের কবিতাগুলো পড়েছ? তোমার বহু অভিযোগের উত্তর পাবে তাতে। তোমার কোনো পুস্তকে আমার সম্বন্ধে কটূক্তি ছিল।

ইতি—

Gentleman

কবি তাঁর এই মূল্যবান চিঠিখানি লেখেন এই বেদনাতুর ঘটনার (বিবাহ যেখানে সিদ্ধ হয়নি সেখানে বিবাহ বিচ্ছেদের কথা ওঠে না) ষোল বছর পর। বিবাহ বিচ্ছেদের প্রথম অবস্থাতে নার্গিস খান কবির প্রতি বিরূপ ছিলেন। এমন কি নজরুল সম্বন্ধে বক্রোক্তি দিয়ে কোন পুস্তক রচনা করেন। এই বক্রোক্তির প্রতি কবির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন জনাব আবদুল কাদির। কবি সেই বক্রোক্তি অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে পড়েন এবং তার উত্তরস্বরূপ সওগাত অফিসে বসে ২৯-৩-১৯২৮ সালে 'হিংসাতুর' কবিতাটি রচনা করেন। এই কবিতাটি ১৩৩৫ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'সওগাতে' প্রকাশিত হয় এবং পরে 'চক্রবাক' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। উপরোক্ত চিঠিতে কবির অন্তঃবীণার যে সুর ধ্বনিত হয়েছে 'হিংসাতুর' কবিতাটিতে আছে তারই অনবদ্য কাব্যরূপ। 'হিংসাতুর' কবিতাটির কয়েকটি লাইন এই :

"অপরাধ শুধু মনে আছে তার,
মনে নাই কিছু আর?
মনে নাই, তুমি দলেছ দু'পায়ে
কবে কার ফুলহার?

কাঁদায়ে কাঁদিয়া সে রচেছে তাঁর
অশ্রুর গড়খাই,
পার হ'তে তুমি পারিলে না তাহা,
সে-ই অপরাধী তাই ?
সে-ই ভালো, তুমি চির সুখী হও,
একা সে-ই অপরাধী।
কি হ'বে জানিয়া, কেন পথে পথে
মরুচারী ফেরে কাঁদি ?"…

প্রথমাবস্থাতে কবির প্রতি বিরূপ থাকলেও নার্গিস খানমের এই অহমিকা শীঘ্র ভেঙ্গে যায় এবং পরবর্তী জীবনে তিনি বিরহ-কাতরা লাইলী ও অশ্রুমুখী শকুন্তলার মত কবির আশা-পথ চেয়ে বিষণ্ণ দিনগুলি যাপন করেন। অন্তত: শেষবারের মত কবির সাথে একটুখানি চাক্ষুষ সাক্ষাৎ লাভের জন্যেও তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়েন। কিন্তু তখন সকল আশার সমাধি-পর্ব সমাপ্ত হয়ে গেছে।

এই আঘাত না পেলে কবি যে 'ধুমকেতুর বিস্ময় নিয়ে' উদিত হতে পারতেন না তা তিনি স্পষ্টভাবে চিঠিতে স্বীকার করেছেন। জনাব মুজফ্ফর আহমদ লিখেছেন, এই ঘটনার পর, আবার নজরুলের কবিতার বান ডাকল।….প্রায় ছয় মাস নজরুলের বীণা থেমে ছিল। দৌলৎপুর গ্রামে পাওয়া আঘাতের পরে সেই বীণা আবার বেজে উঠেছিল।" এই বিচ্ছেদের পর হতেই কবির সৃষ্টি বিদ্রোহের রঙে রঙীন হ'য়ে উঠেছে, দীপক তানে বাংলার আকাশ-বাতাস মুখরিত করেছে। স্বাধীনতার মরণ যুদ্ধে জয়ডঙ্কা বাজিয়ে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বানে কবিতাগুলি অনবদ্য হয়ে উঠেছে:

এ কোন পাগল পথিক ছুটে এলো
বন্দিনীমা'র আঙিনায়।
ত্রিশ কোটি ভাই মরণ হরণ
গান গেয়ে তাঁর সঙ্গে যায়।

অধীন দেশের বাঁধন-বেদন
কে এলোরে করতে ছেদন ?
শিকল দেবীর বেদীর বুকে
মুক্তি-শঙ্খ কে বাজায় !!…

॥ পাগল পথিক ॥

আলী আকবর খানের দ্বারা প্রতারিত হ'য়ে কুমিল্লায় এসেই এক উত্তেজনাপূর্ণ রাজনৈতিক মিছিলে কবি গেয়েছিলেন :

আজি রক্ত-নিশি ভোরে
একি এ শুনি ওরে
মুক্তি-কোলাহল বন্দী-শৃঙ্খলে,
ঐ কাহারা কারাবাসে
মুক্তি হাসি হাসে,
টুটেছে ভয়-বাধা স্বাধীন হিয়া তলে।

সব থেকে বড় কথা কবি তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতাটি রচনা করেন এই বিবাহ-বিচ্ছেদের অতি অল্প দিন পরেই। ৩রা আষাঢ় ছিল বিয়ের তারিখ আর বিদ্রোহী কবিতাটি রচিত হ'য়েছিল নজরুলের কুমিল্লা থেকে কলকাতায় আসার পর ঐ একই সালের বড়দিনের কাছাকাছি সময়ে। রাজনৈতিক আবহাওয়ার কথা বাদ দিলেও এই প্রচণ্ড আঘাত কবি-চিত্তকে যে বিদ্রোহাভিমুখী করেনি তাই বা কে বলবে ? আমার তো মনে হয় এই আঘাতের দহন জ্বালায় কবির সমগ্র চিত্ত-মানস বিদ্রোহের দীপক রাগিণীতে দুর্মদ হয়ে উঠেছিল। এই মানসিক আঘাতের মধ্যেই তাঁর বিদ্রোহ সত্তার সঞ্চারণ-ভূমি গড়ে উঠেছে। 'বিদ্রোহী' কবিতার নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলির মধ্যে স্পষ্টভাবেই এই নিদারুণ ঘটনার ছায়াপাত ঘটেছে :

আমি অবমানিতের মরম-বেদনা, বিষ-জ্বালা, প্রিয়-লাঞ্ছিত বুকে গতি ফের।'
'আমি অভিমানী চির-ক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা',
'আমি ছিনিয়া আনিব বিষ্ণু-বক্ষ হইতে যুগল কন্যা !'

'আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দিই পদ-চিহ্ন !'
আমি স্রষ্টা-সূদন, শোক-তাপ-হানা খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন !'
'আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান-বুকে এঁকে দেব পদ-চিহ্ন !'
'আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন !'

বিবাহ-বিচ্ছেদের মর্মন্তুদ ঘটনার তীব্রতম আঘাত হয়ত কবির জীবনে দরকার ছিল। পৃথিবীর কমবেশী সকল শ্রেষ্ঠ কবির ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে প্রিয়জনের নিকট হ'তে পাওয়া সুতীব্র আঘাতেই তাঁদের বীণায় বিচিত্র রাগিণীর সুরালাপন ঘটেছে। নজরুলের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। জীবনের প্রথম প্রভাতে প্রেমের এই ব্যর্থতা ও অপমানহত অভিমান কবিকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল। কেবল কবিতায় নয় 'বাঁধন-হারা' পত্রোপন্যাসেও এই বিদ্রোহাত্মক মনোভঙ্গী ধরা পড়েছে। এই উপন্যাসের সূচনা হয়েছিল করাচীর সৈনিক জীবনে, কিন্তু সমাপ্ত হ'য়েছিল বিচ্ছেদের অনেক পরে। এই পত্রোপন্যাসের নায়িকা মিস সাহসিকা বোসের পত্রে বিদ্রোহের যে বর্ণনা আছে তার উৎপত্তি প্রেমের ব্যর্থতা থেকে—এবং যে সুর এই উপন্যাস সমাপ্ত হওয়ার অতি অল্প দিন পরে লেখা 'বিদ্রোহী' কবিতার মধ্যে প্রধূমিত হ'য়ে উঠেছে।

এই মর্মন্তুদ ঘটনা কেবল কবির বিদ্রোহাত্মক মনোভঙ্গী সৃষ্টি করেনি—কবির বহু কবিতায়, গানে, ছোটগল্পে তার ছায়া পড়েছে। কোন কোন কবিতা ব্যথার স্নিগ্ধভারে নম্রকোমল হয়ে উঠেছে। 'ছায়া নট'-এর 'চৈতি হাওয়া'র দুটি পংক্তি :

উদাস দুপুর কখন গেছে,
　　　　এখন বিকাল যায় ;
ঘুম জড়াল ঘুমতি নদীর
　　　　ঘুমুর পরা পায়।

স্বল্পাক্ষর দু'টি পংক্তি অথচ বেদনার কোমল পরশে একটি দুর্লভ চিত্র মনোরম হ'য়ে উঠেছে।

অন্যত্র :

হারিয়ে গেছে অন্ধকারে—
পাইনি খুঁজে আর,
আজ্‌কে তোমার আমার মাঝে
সপ্ত পারাবার
আজকে তোমার জন্মদিন
স্মরণ-বেলায় নিদ্রাহীন…
কোন পূজারী নিল ছিঁড়ে ?
ছিন্ন তোমার দল
ঢেকেছে আজ কোন্ দেবতার
কোন্ সে পাষাণ তল ?

"দোলন-চাঁপা"র 'অভিশাপ' কবিতায় কবি তাঁর প্রিয়াকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন :

যেদিন আমি হারিয়ে যাবো
বুঝবে সেদিন বুঝবে,
অস্তপারের সন্ধ্যাতারায়
আমার খবর পুছবে—
বুঝবে সেদিন বুঝবে।

কবি চিঠিতে লিখেছেন যে, 'চক্রবাক' কাব্যগ্রন্থে নার্গিস খানম তাঁর অনেক অভিযোগের উত্তর পাবেন। এ কথা যে কত সত্য তা' যাঁরা 'চক্রবাক' পড়েছেন তাঁরা উপলব্ধি করবেন। আঘাতে কবির মানস-ভূমিতে যে দুঃখ, বেদনা ও উত্তেজনার সঞ্চার ঘটেছিল কবি তা' অদ্ভুতভাবে আত্মস্থ করেছেন। উত্তেজনার মরসুম পার করে আত্মস্থ মনের অনুভূতিতে কাব্যের মোহাঞ্জন স্পর্শে কবি যা সৃষ্টি করলেন তা' আপন স্বরূপ-স্বাতন্ত্র্যে একক ও অনন্য হ'য়ে উঠেছে। 'এ মোর অহংকার' কবিতার সূচনা এই :

নাইবা পেলাম আমার গলায়
তোমার গলার হার,
তোমায় আমি করব সৃজন—
এ মোর অহঙ্কার।
এমনি চোখের দৃষ্টি দিয়া
তোমায় যারা দেখল প্রিয়া,
তাদের কাছে তুমি তুমিই।
আমার স্বপনে
তুমি নিখিল-রূপের রাণী
মানস আসনে!
যেদিন আমি থাকব নাক'
থাকবে আমার গান,
বলবে সবাই, 'কে সে কবির
কাঁদিয়েছিল প্রাণ?'

'নিশীথ প্রতিম' কবিতার কয়েকটি পংক্তি :

মোদের দুইজনেরই জনম ভরে
কাঁদতে হবে গো
শুধু এমনি করে সুদূর থেকে,
একলা জেগে রাতি।...
আকাশ-বাতাস থমথমাবে
সব হ'বে নিঝ্‌ঝুম,
তখন দেবো দু'হু দোঁহার
চিঠির নামে চুম।

বিয়ের মাত্র কয়েকদিন পর আষাঢ়ের শেষ দিকে (১৩২৮ সাল) "পরশপূজা' কবিতা রচিত হয়—তার শেষ দু'টি পংক্তি :

আমি এদেশ হ'তে বিদায় যেদিন
নেবো প্রিয়তম,

আর কাঁদবে এ বুক সঙ্গীহারা
কপোতিনী সম।

১৩২৮ সালে শ্রাবণ মাসের প্রথম দিকে "অকরুণ প্রিয়া" কবিতাটিতে কবির এই বিবাহ-বিচ্ছেদের সুর অভিনবরূপে ধ্বনিত হয়েছে :

তখন মোদের কিশোর বয়স
যেদিন মোদের টুটল বাঁধন
সেই হ'তে কার বিদায়-বেণুর
জগৎ-জুড়ে শুনছি রোদন।
সেই কিশোরীর হারা মায়া
ভুবন ভরে নিল কায়া
ফুলে আজো তারি ছায়া
আমার সকল পথে আসি।

'গানের আড়াল' কবিতার সমাপ্তিতে পাই এক ব্যাকুল আবেদনের ছবি :

আমার গানের মালার সুবাস
ছুঁ'ল না হৃদয়ে আসি ?
আমার বুকের বাণী হ'ল শুধু
তব কণ্ঠের ফাঁসি ?...
ভোলো মোর গান, কি হ'বে লইয়া
এইটুকু পরিচয়,
আমি শুধু তব কণ্ঠের হার,
হৃদয়ের কেহ নয়!
জানায়ো আমারে, যদি আসে দিন,
এইটুকু শুধু যাচি—
কণ্ঠ পারায়ে হ'য়েছি তোমার
হৃদয়ের কাছাকাছি।

কবির এ ব্যাকুলতা সত্যে পরিণত হ'য়েছিল। যৌবনের শেষ সীমান্তে দাঁড়িয়ে প্রথম দিনের অহঙ্কারী প্রিয়া অশ্রুসজল চোখে কবির চরণে

প্রেমাঞ্জলি দিতে চেয়েছেন। তাঁর সে অহঙ্কার চোখের জলে দেউলিয়া হ'য়ে গেছে।

আমরা উপরে যে সকল কবিতা-গানের কথা উল্লেখ করলাম—এগুলির প্রেরণা রূপে অন্য কিছু কিছু ঘটনার সংযোগ থাকতে পারে কিন্তু আলোচ্য মর্মন্তুদ ঘটনা যে বিশেষ রূপে বেগ সঞ্চার করেছে সে কথা অনস্বীকার্য।

এই হৃদয়-বিদারক ঘটনা কবির জীবনে যত দুঃখবহ হোক না কেন আমাদের, বাংলা পাঠক-পাঠিকাদের পক্ষে, তা নিঃসন্দেহে একটি মূল্যবান লভ্য হয়ে উঠেছে। আঘাতের সব হলাহলটুকু কবি নীলকণ্ঠের মত আকণ্ঠ পান করেছেন—যেটুকু দান করেছেন তা সুধা, খাঁটি সুধা। এবং সে সুধা পানের সৌভাগ্য আমাদের মত নগণ্য জনের হয়েছে। নজরুলের সব সৃষ্টি উৎকৃষ্ট নয়, কিন্তু যেগুলি উৎকৃষ্ট তাদের মধ্যে অনেকগুলি এই নিষ্ঠুর আঘাতের বেদনায় ভারাক্রান্ত। সুতরাং এ কথা এখন আমার দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলতে পারি এই আঘাত কবির হৃদয়ের স্তব্ধ স্রোতস্বিনীর উৎস-মুখ খুলে দিয়েছিল—এবং পরবর্তীকালে জ্যোৎস্না-স্বচ্ছ জলধারার মত তাই তাঁর সৃষ্টির সর্বত্র জল সিঞ্চন করেছে।*

*এই প্রবন্ধটির কিছু তথ্য জনাব আবদুল কাদিরের প্রবন্ধ থেকে নেওয়া হ'য়েছে।

শনিবারের চিঠি

[মোহিতলাল ও সজনীকান্ত]

১০

'শনিবারের চিঠি'র জন্মের সঙ্গে নজরুল ইসলামের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ এবং ঘনিষ্ঠ। আজ যদি কেউ মন্তব্য করেন যে নজরুলকে কেন্দ্র করেই 'শনিবারের চিঠি'র জন্ম, লালন এবং বর্ধন তা' হ'লে কথাটা একটু বাড়িয়ে বলা মনে হ'তে পারে, কিন্তু অত্যুক্তি নয় মোটেই। শনিমণ্ডলীর অন্যতম শনি স্বর্গীয় সজনীকান্ত দাস তাঁর 'আত্মস্মৃতি'তে নিজেই একথা স্বীকার করে গেছেন: "রাজনীতির ক্ষেত্রে দেশবন্ধু এবং সাহিত্য ক্ষেত্রে কাজী নজরুল ইস্‌লাম....সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র প্রত্যক্ষ লক্ষ্য ছিলেন।" আত্মস্মৃতির দ্বিতীয় খণ্ডে শনিবারের চিঠির সঙ্গে নজরুলের সম্পর্ক-সম্বন্ধটি উপভোগ্য ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে: "সত্য কথা বলিতে গেলে 'শনিবারের চিঠি'র জন্মকাল হইতেই সাহিত্যের ব্যাপারে একমাত্র নজরুলকে লক্ষ্য করিয়াই প্রথম উদ্যোক্তারা তাক করিতেন। তখন আমি আসিয়া জুটি নাই। অশোক-যোগানন্দ-হেমন্ত এলাইয়া পড়িলে ওই নজরুলী রন্ধ্র-পথেই আমি 'শনিবারের চিঠি'তে

প্রবেশাধিকার পাইয়াছিলাম।" প্রকৃতপক্ষে 'শনিবারের চিঠি'র একমাত্র প্রধান লক্ষ্য ছিল নজরুল এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে তাঁকে ধরাশায়ী করাই ছিল সে লক্ষ্যের সঞ্চরণ ক্ষেত্র।

২০শে ফাল্গুন, ১৩৬৮ সাল মোতাবেক ৪ঠা মার্চের (১৯৬২ খ্রীঃ) 'যুগান্তর সাময়িকী'তে 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক শ্রদ্ধেয় যোগানন্দ দাস মহাশয় "সব রকম বোগাসিটি বা ভেজাল নকল ও ধাপ্পাবাজির বিরুদ্ধে যে স-চাবুক অভিযানের উদ্দেশ্য নিয়ে" 'চিঠির জন্মের কথা' বলেছেন, সেটি উদ্দেশ্য হিসাবে নিশ্চয়ই মহৎ কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাঁরা ওপথে বিশেষ পদচারণা করেননি। একমাত্র মোহিতলালের তথ্য ও যুক্তি নির্ভর রচনায় তার কিছুটা ছাপ পড়েছে। বর্তমানেও কি সাহিত্যে, কি রাজনীতিতে বোগাসিটি বা ভেজালের পরিমাণ অত্যন্ত বেড়ে গেছে। এই নোংরামি থেকে সাহিত্য-রাজনীতিকে উদ্ধার করতে হ'লে হিমাদ্রির মত অটুট মনোবল নিয়ে বলিষ্ঠ হাতে কলম ধরার জন্যে যে প্রচণ্ড শক্তির প্রয়োজন তা' ক'জনের মধ্যে আছে? বর্তমানে আমরা নির্ভেজাল প্রশংসার রোদ পোহাতে এমনই রপ্ত হ'য়ে পড়েছি যে একে অপরের পিঠ চুলকানিতেই সময় কেটে যাচ্ছে—বোগাসিটি তাড়াবার মত ক্ষমতা কারো মধ্যে আদৌ আছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। যদি ধৃষ্টতা না হয় তা হ'লে বলা যেতে পারে শনিমণ্ডলীর কারো মধ্যে সে ক্ষমতা ছিল না। ঐতিহাসিক তথ্যের দিক থেকে তাঁদের উদ্দেশ্য মহৎ, প্রচেষ্টা সৎ—কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাঁরা নিছক ছেলেমানুষীর প্রবর্তনা করেছেন।

একটা উদাহরণ নেওয়া যাক্। কবিগুরু শিশুদের উপযোগী যতগুলি কবিতা লিখেছেন তার মধ্যে "খোকার সাধ" কবিতাটি বিশেষ রূপে উল্লেখযোগ্য। এ কবিতায় শিশু মনের উদ্দাম কল্পনা সুন্দর রূপে ব্যক্ত হয়েছে। 'শনিবারের চিঠি'র একাদশ সংখ্যায় সজনীবাবু 'যদি' শিরোনামায় এর প্যারডি করলেন এই ভাবে :

'আমি যদি হ'তেম বেড়াল ছানা
কোলের পাশে শুতেম তুমি করতে না ক' মানা।
আদর করে চুমো খেতে মুখে
গলা ধরে নিতে আমায় বুকে
মেরে ঠোনা বল্‌তে "সোনা রাগ করনা না না।
আমি যদি হ'তেম বেড়াল ছানা।" ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের মূল কবিতায় সজনীবাবু কি 'বোগাসিটি' দেখতে পেয়েছিলেন জানি না এবং এই বিকৃত ব্যঙ্গের ভিতর দিয়ে তিনি কি এবং কিসের প্রতিবাদ জানালেন তাও আবিষ্কারের অপেক্ষা রাখে।

'শনিমণ্ডলী'র লক্ষ্য-কেন্দ্রের কবি নজরুল ইসলামের একটি কবিতাকে উদাহরণ স্বরূপ নিলে বিষয়টা আরো পরিষ্কার হবে। 'অ-নামিকা' বিদ্রোহী কবির একটি বিখ্যাত প্রেমের কবিতা। কবিতাটি প্রথমে প্রকাশিত হ'য়েছিল "কালি-কলম" মাসিক পত্রিকার প্রথম বর্ষের ষষ্ঠ সংখ্যায় (আশ্বিন, ১৩৩৩ সাল) এবং পরে "সিন্ধু হিন্দোল" কাব্য গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এ সুদীর্ঘ কবিতাটিতে কবির প্রেম-সম্পর্কীয় মনোভাব সুন্দররূপে ব্যক্ত হয়েছে। এই মহৎ কবিতাটির প্যারডি করেছেন 'গাজী আব্বাস বিটকেল' নামের আড়ালে 'শনিমণ্ডলী'র নায়ক সজনীকান্ত দাস। কবিতাটির প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য নজরুল-ব্যঙ্গ। নজরুল-ব্যঙ্গের সাথে সাথে 'কল্লোল' ও 'কালি-কলম'-এর তরুণতর লেখক গোষ্ঠীও আক্রান্ত হয়েছেন। এই ব্যঙ্গ কবিতাটির নাম 'অঙ্গুষ্ঠ'। ১৩৩৪ সালে ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত এই সুদীর্ঘ কবিতাটির মাত্র কয়েকটি পংক্তি :

তোমারে পেয়ার করি
কপ্‌নি-লুঙ্গি পরি'
লো আমার কিশোরী নাতিনী,
অনাগত প্রেয়সী আমার

তোমারে চেয়েছি বারম্বার
বর্ষা হ'য়ে আসিয়াছ সাথে
ছাতি হয়ে কভু তুমি আসিলে না হাতে,
পিলে হ'য়ে আসিলে উদরে
পিলো (Pillow) হ'য়ে আসিলে না ঘরে
শিশিতে আসিলে তুমি ফিবার মিকশ্চার—
পেয়ালায় নাহি এলে দ্রাক্ষারস সার।···

এই কবিতাটির শেষে নজরুলের ব্যক্তিগত জীবনকে আক্রমণ করা হয়েছে :

···আজ আর থাকলো নাতিনী···
ঘুম দিল পেঁচা পেঁচী—নদেতে
ঘুমাল নেড়া নেড়ী।

সুতরাং বোগাসিটির বিরুদ্ধে হাতিয়ার ধরতে গিয়ে 'শনিবারের চিঠি' নিজেই বেসামাল হয়ে পড়েছে। এ সব প্যারডি কবিতায় তার কুৎসিত রূপ উলঙ্গ হ'য়ে প্রকাশিত হ'য়েছে। তাই 'শনিবারের চিঠি' সম্পর্কে আমরা একসময় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে বলতে শুনেছি :

"আমার নিজের বিশ্বাস 'শনিবারের চিঠি'র শাসনের দ্বারা অপর পক্ষে সাহিত্যের বিকৃতি উত্তেজনা পাচ্ছে। যে সব লেখা উৎকট ভংগীর দ্বারা নিজেদের সৃষ্টিছাড়া বিশেষত্বে ধাক্কা মেরে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সমালোচনার খোঁচা তাদের সেই ধাক্কা মারাকেই সাহায্য করে। সম্ভবতঃ ক্ষীণজীবীর আয়ু এতে বেড়েই যায়। তাও যদি না হয়, তবু সম্ভবত এতে বিশেষ কিছু ফল হয় না।" (কালি-কলম ; ২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা ; ফাল্গুন, ১৩৩৪)।

'শনিবারের চিঠি'র এই ব্যঙ্গাত্মক মানোভাবকে আমি পাগলামি বলেছি বলে কেউ যেন মনে না করেন নজরুল-কাব্যে সমালোচনার বিষয় কিছুই নেই। বরং ব্যাপারট সম্পূর্ণ বিপরীত। সকল দিক দিয়ে সমালোচিত হওয়ার মত উপাদান নজরুল-কাব্যে অজস্র পরিমাণ রয়েছে। কম বেশী নজরুলের সকল কাব্যেই অযত্ন-অবহেলার ছাপ বর্তমান। মার্জিত ভাব ও ভাষার প্রয়োগে একটি কবিতা সুন্দর হয়ে উঠছে—হঠাৎ কবি এমন একটি গ্রাম্য শব্দ প্রয়োগ করলেন যাতে সমগ্র কবিতাটির সম্ভ্রম ও সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গেল। এমন ঘটনা নজরুল-কাব্যে ভুরি ভুরি রয়েছে। Art-এর নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি তিনি বহু ক্ষেত্রেই মানেন নি—নিজের মত করে ভেঙে চুরে-পথ করে নিয়েছেন। ভাবের দীনতা বহু স্থলেই প্রকট। সুতরাং সমালোচকের দৃষ্টিতে নজরুল কাব্য সহজেই আক্রান্ত হবে। আক্রান্ত হওয়া ভাল—আক্রমণ করার মধ্যে বলিষ্ঠ মনোবলের প্রয়োজন। কিন্তু তার একটা সীমা আছে। সেই সীমা নিয়েই কথা। 'শনিবারের চিঠি'র কম-বেশী সকলেই সে সীমা লঙ্ঘন করেছেন। অবশ্য—পূর্বেই বলেছি—মোহিতলালের কথা স্বতন্ত্র। একমাত্র তাঁর লেখাতেই কিছুটা সংযম ও নীতির পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। তিনি আড়াল থেকে অতর্কিতে ঢিল ছোঁড়েন নি—বীরের মত সদর্পে কাছে এগিয়ে এসে প্রতিদ্বন্দ্বীকে মল্লযুদ্ধে সাড়ম্বর আহ্বান জানিয়েছেন।

একটি উদাহরণে আমাদের মন্তব্যটিকে স্পষ্ট করে নেয়া যাক।

নজরুলের 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থের উল্লেখযোগ্য কবিতা 'সাম্যবাদী'। 'সাম্যবাদী' কবিতাটি দীর্ঘ এবং বহু উপশিরোনামায় বিভক্ত। এই কবিতা গুলি ১৯২৫ সালের ২৫শে ডিসেম্বর 'শ্রমিক প্রজা স্বরাজ সম্প্রদায়ের' মুখপাত্র সাপ্তাহিক 'লাঙল'-এ প্রকাশিত হয়েছিল। 'সাম্যবাদী'

কবিতাসমষ্টি প্রথমে 'সাম্যবাদী' নামে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল পরে ১৩৩৩ সাল মোতাবেক ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে। 'সর্বহারা' প্রকাশিত হ'লে কবিতাগুলি এই কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়। এই কবিতাগুলি প্রকাশিত হওয়ার পর বাংলা সাহিত্যে রীতিমত আলোড়ন পড়ে যায়। কবিতাগুলির সুর বাংলা সাহিত্য পাঠকের কাছে সম্পূর্ণ নতুন নয়—সত্যেন দত্ত, মোহিতলাল, যতীন সেনগুপ্ত ইতিপূর্বেই এ সুরে বীণায় ছড় টেনেছেন, কিন্তু নজরুলের মত এমন স্পষ্ট করে কেউ কিছু বলেন নি। তাই নজরুলের 'সাম্যবাদী' অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জনের সাথে সাথে তীক্ষ্ণ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল। সমালোচনা করেছিলেন 'শনিবারের চিঠি'র লেখকবৃন্দ ও 'শনিমণ্ডলী'র অন্যান্য লেখকের সাথে মোহিতলালও এগিয়ে এসেছিলেন—সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু এই উভয়বিধ সমালোচনার আদর্শ ও রীতি-নীতির দিকে তাকালে অবাক হয়ে যেতে হয়। একজন সমালোচনার নামে করেছেন পাগলামি। কিন্তু অন্যজন একাধারে নিষ্ঠাবান পাঠক ও সমালোচক।

আলোচনার সুবিধার জন্যে 'সাম্যবাদী'র কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হল। নজরুল 'সাম্যবাদী'র 'পাপ' উপশিরোনামায় লিখেছেন ঃ

"সাম্যের গান গাই!
যত পাপী তাপী সব মোর বোন, সব হয় মোর ভাই।
এ পাপ মুলুকে পাপ করেনি ক' কে আছে পুরুষ নারী?
আমরা তো ছার;—পাপে পঙ্কিল পাপীদের কাণ্ডারী।
তেত্রিশ কোটি দেবতার পাপে স্বর্গ যে টলমল,
দেবতার পাপ পথ দিয়ে পশে স্বর্গে অসুর দল।..."

মানুষ উপশিরোনামায় ঃ

"ও কে? চণ্ডাল? চম্‌কাও কেন? নহে ও ঘৃণ্য জীব!
ওই হ'তে পারে হরিশ্চন্দ্র, ওই শ্মশানের শিব।"...

সর্বাধিক সমালোচিত "বারাঙ্গনা" উপশিরোনামায় ঃ

"কে বলে তোমায় বারাঙ্গনা মা, কে দেয় থুতু ও গায়ে ?
হয় তো তোমায় স্তন্য দিয়াছে সীতাসম সতী মায়ে।...
অসতী মাতার পুত্র সে যদি জারজ পুত্র হয়,
অসৎ পিতার সন্তানও তবে জারজ সুনিশ্চয় !"...

'নারী' কবিতায় ঃ

"সাম্যের গান গাই !
আমার চক্ষে পুরুষ রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।..."

মোটকথা 'সাম্যবাদী' কবিতা রচনার কালে নজরুল উদার দৃষ্টি ভংগীতে সকল পাপ কলঙ্কের দিকে তাকিয়েছেন। এ সব কবিতায় কবির হৃদয়াবেগ অত্যন্ত প্রবল ভাবে দেখা দিয়েছে। মানুষে মানুষে প্রভেদ সৃষ্টি করে পাপের গণ্ডী আমরা যে ভাবে বাড়িয়ে চলেছি তার বিরুদ্ধ-অভিযানে কবি খড়গহস্ত। 'মহামানবের মহাউত্থান' ও 'মহামিলনের' দিনে কবি তাই কুলি-মজুর, কৃষাণ-দম্পতি ও সমাজের অন্যান্য অবহেলিত ঘৃণ্যদের 'এক মহফিলে' আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর এ কবিতায় উদার মানবিকতা অত্যন্ত সুন্দর রূপে ব্যক্ত হয়েছে। অথচ ১৩৩৪ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে কবির এই মহামিলনের স্বপ্ন বিশেষ ভাবে আক্রান্ত। "নবযুগান্তর" নামক বন্দনা কবিতায় শ্রীসনাতন দেবশর্মার উক্তি এই ঃ

ধন্য তুমি বাংলার আধুনিক বরপুত্র
নবযুগ ধুরন্ধর সাহিত্য সারথি।
...হে নবীন
পড়িয়াছ শরীর-বিজ্ঞান পুঁথি হ'তে
কিম্বা কোনো ঔষধের লাগি'
বিনামূল্যে বিতরিত অমূল্য পাতায়,

জানিয়াছ সার কথা—
'শোণিত ঘনায়ে হয় আদিরস ধারা।'

এর পরের অংশে 'কুলি-মজুর' কবিতার প্রতি ব্যঙ্গ :

এস আজি ঘর ছাড়ি বিশ্বভরা তরুণ-তরুণী
এস এক সাথে ভাসুর-দেবর ভ্রাতৃবধূ,
শ্বশ্রূ ও জামাতা,
পথ হ'তে লয়ে এস যত মজুরাণী,
অন্ধ, খঞ্জ, মূক ও বধিরে দলে দলে,
সঙ্গে যেন থাকে খেঁদি
এস সবে শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে মূঢ় সম
অঞ্জলি ভরিয়া বল
নমো, নমঃ—''

'শনিবারের চিঠি'র উক্ত সংখ্যায় [ভাদ্র, ১৩৩৪ সাল] 'তোমাদের প্রতি' কবিতায় শ্রীমধুকরকুমার কাঞ্জিলাল নজরুলের 'সাম্যবাদী' কবিতাটির ভাবধারাকে ব্যঙ্গ করেছেন :

ওগো বীর,
ফেলে দিয়ে কাঁথা আর খাটিয়া তাকিয়া
ওঠো, জাগো, গা ঝাড়িয়া, চক্ষু রগড়িয়া।...
অকস্মাৎ হেরি তব চিরুণী চর্ব্বিত দিব্য বেশ—
কাতর হউক সূর্য্য, নাসিকাগ্রে উড্ডীন হেরিয়া তব কেশ।...

সুদীর্ঘ চার পৃষ্ঠার এই কবিতাটির শেষাংশে নজরুলের প্রেমধারণা ও তাঁর বহু আলোচিত 'বারাঙ্গনা' কবিতাটি আক্রান্ত। 'বারঙ্গানা' কবিতায় কবি বারাঙ্গনাকে 'মা' সম্বোধন করার উপযুক্ত সাজা পেলেন এখানে :

হে কবি—'কেমিষ্ট'।...
মল দিয়া চিত্রাঙ্কন, রং দিয়া বাঁধা কপি চাষ!

একি সর্বনাশ!

মাতৃস্তনে মত্তলাভ আশে তুমি ধাইতেছ সদা,

কেন গো সর্বদা,

তোমার কৃপাতে

বারাঙ্গনা সতী হয়, চোর হয় শিব

জন্মায় কল্পনা ঔরসে তব, শতকোটি বীর্যবান ক্লীব!

হে বীর যেত না আর সাহিত্য ও সত্যের নিপাতে॥

এ সব ব্যঙ্গ কবিতার কোথাও যুক্তি বা তথ্য নেই। অথচ এরই পাশে মোহিতলালের রচনা আপন ঔজ্জ্বল্যে অনন্য হয়ে উঠেছে। মোহিতলালও নজরুলের 'বারাঙ্গনা' কবিতাটিকে আক্রমণ করেছেন কিন্তু তাঁর সমালোচনায় সত্যিকার সমালোচকের পরিচয় রয়েছে। ১৩৩৪ সালের আশ্বিন মোতাবেক ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর সংখ্যায় শ্রীসত্যসুন্দর দাস নামের আড়ালে শ্রীমোহিতলাল মজুমদার 'সাহিত্যের আদর্শ' প্রবন্ধে নজরুলের 'বারাঙ্গনা' কবিতা সম্পর্কে লেখেন:

আর একটি কবিতায় নব সাম্যবাদ প্রচারিত হইয়াছে। এই কবিতাটি 'বারাঙ্গনা' নাকি কবির একটি উৎকৃষ্ট কীর্তি। ইহাতে একপ্রকার Nihilism বা নাস্তিক্য নীতির উল্লাস আছে—ইহা বর্তমান যুগের রসপিপাসু পাঠক-পাঠিকার বড়ই আদরের সামগ্রী। কবিতাটির যতটুকু মনে আছে, তাহাতে ইহাই কবির বক্তব্য বলিয়া মনে হয় যে, জগতে সকলেই অসাধু, সকলেই ভণ্ড, চোর এবং কামুক; অতএব জাতিভেদের প্রয়োজন নাই; আইস আমরা সকলে ভেদাভেদ দূর করিয়া মহানন্দে নৃত্য করি। এই সাম্যমৈত্রীর আবেগে কবি বেশ্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—'কে তোমায় বলে বারাঙ্গনা মা? বিদ্রোহের চরম হইল বটে কিন্তু কথাটা দাঁড়াইল কি? এই উক্তিতে সমগ্র নারী জাতিকে অপমান করা হইয়াছে, অথচ বেশ্যার মর্যাদাও এতটুকু বাড়ে নাই। বারাঙ্গনা মা নয়, বারাঙ্গনা নারী বটে, তাহার সেই সুপ্ত নারীত্বের মহিমা রবীন্দ্রনাথের 'পতিতা' কবিতায় অপূর্ব কাব্য সৃষ্টি করিয়াছে।....

বারাঙ্গনাকে 'মা বলিতে আপত্তি নাই—যদি নারীর মাতৃত্ব ব্যতীত আর সকল সম্পর্ক অস্বীকার করা হয়, এইজন্য রামকৃষ্ণের মাতৃসম্বোধন অতিশয় সত্য ও সার্থক হইয়াছিল। নতুবা কবি প্রচারিত নব সাম্যবাদ অনুসারে ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে—তুমিও বারাঙ্গনা, মাও বারাঙ্গনা, অতএব মাতে ও তোমাতে কোনো প্রভেদ নাই। এ ব্যাখ্যায় বেশীদূর অগ্রসর হইতে হইলে অন্তরাত্মা কলুষিত হয়।...

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে এ আলোচনায় অতর্কিতে ঢিল ছোড়ার মনোবৃত্তি নেই। অবশ্য এই সঙ্গে এও স্বীকার করতে হ'বে নজরুলের হৃদয়াবেগকে অস্বীকার করে সমালোচনা করায় মোহিতলাল এ আলোচনায় নজরুলের প্রতি সুবিচার করেননি। কিন্তু সে স্বতন্ত্র কথা। 'শনিবারের চিঠি'র পাতায় এ ধরণের আলোচনা খুব বেশী স্থান পায়নি। পেলে বোগাসিটি বিতাড়নের স্বপ্ন সার্থক হত। আমি 'শনিবারের চিঠি'র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপকে ছেলেমানুষী ও পাগলামি বলেছি। শ্রদ্ধেয় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'কল্লোল যুগে' আমার এ মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে। স্বর্গীয় সজনীকান্ত দাস নিজেই একে বলেছেন 'খেলা'—"আমাদের ছিল স্রেফ খেলা।" [আত্মস্মৃতি ২য়, পৃঃ ১৭৫]। 'শনিবারের' চিঠি'র জন্মের পিছনে যে মহৎ উদ্দেশ্যই থাক—প্রথম যুগের 'চিঠিতে' তা পাগলামি, খেয়ালিপনা ও খেলার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। সজনীবাবু তাঁদের এ ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। তাই ১৩৫০ সালের আশ্বিন সংখ্যায় 'শনিবারের চিঠি'র পঞ্চদশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে সংবাদ-সাহিত্যে তিনি যে সুরে কথা বললেন সে সুর 'চিঠি'র অজানা। নিছক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অসারতা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই লিখলেন : 'সমধর্মীদের ভুল ত্রুটি লইয়া সরস রহস্যাঘাত অথবা কঠিন লগুড় প্রহার যখন করা হইত তখন কাজটা সহজ ছিল। আজ দেশ ও জাতির বৃহত্তর পটভূমিকায় এই সকল ব্যক্তিগত ত্রুটি বিচ্যুতি অতিশয় তুচ্ছ ঠেকিতেছে।....যে বস্তু অসার, যাহা স্বভাবতঃই মরণশীল তাহার উপর নিপুণ অথবা স্থূল অস্ত্রাঘাত করিয়া সময় ও শক্তির

অপব্যবহারে কোনই লাভ নাই ; যাহা স্থায়ী, যাহা নিত্য, তাহার গৌরব প্রচারে ব্যক্তিগত লাভ না থাকিলেও আত্মপ্রসাদ আছে।....পৃথিবীর বহু পণ্ডিত এবং মনীষী ইহাদের সম্বন্ধে স্ব স্ব বিচার বুদ্ধি লিপিবদ্ধ করিয়া ভুল করিবার অল্প অবকাশই আমাদের দিয়াছেন। এই সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের রচনা লইয়া আমরা যদি মাসে মাসে আলোচনা করি, তাহা হইলে একদিকে যেমন মানসিক গঙ্গাস্নানের পুণ্য সঞ্চয় হইতে পারে, অন্যদিকে তেমনি বহু ভ্রান্ত ও দ্বিধাগ্রস্ত মানুষকে পথের সন্ধানও আমরা দিতে পারি। আমরা এবারে তাহাই করিব।'

এবং তাই করেছিলেন। ফলে ১৩৫০ এর আশ্বিন হতে শনিবারের চিঠির স্বতন্ত্র্য মূল্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৩.

নওয়াবজাদী মেহেরবানু খানম অঙ্কিত একটি ত্রিবর্ণ ছবির পরিচিতি উপলক্ষে নজরুল তাঁর বিখ্যাত কবিতা "খেয়াপারের তরণী" রচনা করেন। কবিতাটি ১ম বর্ষের ৪র্থ সংখ্যা মোতাবেক ১৩২৭ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যা "মোসলেম ভারতে" প্রকাশিত হয়। কবিতাটি আপন স্বরূপস্বাতন্ত্র্য মাধুর্যে তৎকালীন বহু কবি-সাহিত্যিকের মনে দোলা দিয়ে গিয়েছিল। মোহিতলাল মজুমদার কবিতাটি পড়ে এমনই প্রশংসার আবেগ অনুভব করেন যে, তিনি সে দিনই "মোসলেম ভারত"-এর সম্পাদককে একটি সুদীর্ঘ পত্র লেখেন। পত্রটির অর্ধেকেরও বেশী অংশ নজরুলের প্রতি অকৃপণ প্রশংসায় ব্যয়িত হ'য়েছে। তখনও মোহিতলাল-নজরুল পরস্পর চাক্ষুষ পরিচয়ে পরিচিত হননি। শ্রদ্ধেয় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর বিখ্যাত "কল্লোল--যুগে" মোহিত-নজরুলের পরিচয় সম্পর্কে লিখেছেন : "নজরুলের গুরু ছিলেন মোহিতলাল। গজেন ঘোষের বিখ্যাত আড্ডা থেকে কুড়িয়ে পান নজরুলকে।" এ

কথা সত্য নয়। নজরুলকে মোহিতলাল কুড়িয়ে পাননি, নজরুলকে তিনি আবিষ্কারও করেননি। নজরুলের কবিতাই তাঁকে তীব্র আকর্ষণে আকৃষ্ট করেছিল। "মোসলেম ভারত" এর সম্পাদককে লেখা চিঠিখানিই হ'য়েছিল তাঁদের প্রাথমিক আলাপের সংযোগ-সেতু। চিঠিখানি মুদ্রিত হয়েছিল ১ম বর্ষের ৫ম সংখ্যা মোতাবেক ১৩২৭ সালের (১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ) ভাদ্র সংখ্যা "মোসলেম ভারতে।" চিঠিখানির প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করলেই পরিচয়ের পূর্বে মোহিতলাল নজরুলকে কোন্ দৃষ্টিতে দেখেছিলেন তা' স্পষ্ট হয়ে উঠবে :...."কিন্তু যাহা আমাকে সর্বাপেক্ষা বিস্মিত ও আশান্বিত করিয়াছে, তাহা আপনার পত্রিকার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি-লেখক হাবিলদার কাজী নজরুল ইস্‌লাম সাহেবের কবিতা। বহুদিন কবিতা পড়িয়া এত আনন্দ পাই নাই, এমন প্রশংসার আবেগ অনুভব করি নাই। বাঙ্গলা ভাষা যে এই কবির প্রাণের ভাষা হইতে পারিয়াছে তাঁহার প্রতিভা যে সুন্দরী ও শক্তিশালিনী—এক কথায়, সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা যে তাঁহার মনোগৃহে সত্যই জন্মলাভ করিয়াছে তাহার নিঃসংশয় প্রমাণ তাঁহার ভাব, ভাষা ও ছন্দ। আমি এই অবসরে তাঁহাকে বাঙ্গলার সারস্বত-মণ্ডপে স্বাগত জানাইতেছি।....কাজী সাহেবের কবিতায় কি দেখিলাম বলিব? বাঙ্গলা কাব্যের যে অধুনাতন ছন্দ ঝঙ্কার ও ধ্বনি বৈচিত্র্যে এক কালে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু অবশেষে নিরতিশয় পীড়িত হইয়া যে সুন্দরী মিথ্যারূপিণীর উপর বিরক্ত হইয়াছি, কাজী সাহেবের কবিতা পড়িয়া সেই ছন্দ ঝঙ্কারে আবার আস্থা হইয়াছে।....কাজী সাহেবের ছন্দ তাঁহার স্বতঃউৎসারিত ভাব-কল্লোলিনীর অবশ্যম্ভাবী গমনভঙ্গী। "খেয়াপারের তরণী" শীর্ষক কবিতায়....ছন্দ যেন ভাবের দাসত্ব করিতেছে—কোনোখানে আপন অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে নাই।....বিস্ময়, ভয়, ভক্তি, সাহস, অটল বিশ্বাস এবং সর্বোপরি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটা ভীষণ গম্ভীর অতি প্রাকৃত কল্পনার সুর, শব্দ বিন্যাস ও ছন্দ ঝঙ্কারে মূর্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমি কেবল একটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিব,—

আবুবকর উস্‌মান উমর্‌ আলী-হাইদর
দাঁড়ী যে এ তরণীর নাই ওরে নাই ডর।
কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি-মাল্লা
দাঁড়ি-মুখে সারি গান 'লা শরীক আল্লাহ্‌'!

এই শ্লোকে মিল, ভাবানুযায়ী শব্দবিন্যাস এবং গভীর গম্ভীর ধ্বনি, আকাশে ঘনায়মান মেঘপুঞ্জের প্রলয় ডম্বরু-ধ্বনিকে পরাভূত করিয়াছে—বিশেষ ঐ শেষ ছত্রের শেষ বাক্য—'লা শরীক আল্লাহ্‌' যেমন মিল তেমনি আশ্চর্য প্রয়োগ। ছন্দের অধীন হইয়া এবং চমৎকার মিলের সৃষ্টি করিয়া এই আরবী-বাক্য যোজনা বাঙ্গলা কবিতায় কি অভিনব ধ্বনি-গাম্ভীর্য লাভ করিয়াছে!"....

এই চিঠি পেয়ে নজরুল নিজে শ্রদ্ধেয় পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে মোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গে দেখা করতে যান। মোহিতলাল তখন তাঁর এক আত্মীয়ের সঙ্গে আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়ীতে থাকতেন। পরিচয়ের পূর্বেই নজরুল মোহিতলালের স্নেহধারায় অভিষিক্ত হ'য়ে উঠেছিলেন। পরিচয়ের পর সে স্নেহ 'স্নেহান্ধের' পর্যায়ে উঠেছিল। বহু সভা-সমিতিতে নিয়ে গিয়ে মোহিতবাবু সগর্বে নজরুলকে সর্বজন-শ্রদ্ধেয় কবি-সাহিত্যিকের সঙ্গে পরিচিত করে দিয়েছেন। নজরুল বয়ঃ-কনিষ্ঠ হওয়ায় আদর-সোহাগ স্নেহের-আশীর্বাদী ধারা তাঁর ওপর নিরন্তর বর্ষিত হ'য়েছিল। পরিচয়ের পর হ'তেই মোহিতবাবু নজরুলকে সম্পূর্ণ রূপে নিজের মত করে গড়ে নিতে চেয়েছিলেন। এবং এখানেই মোহিতবাবু মস্ত বড় ভুল করেছিলেন।

৪.

মোহিতলাল-নজরুল দু'জনে দুই ভিন্নমুখী স্বভাবের লোক ছিলেন। মোহিতবাবু ছিলেন অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক। তাঁর পরিচয়ের গণ্ডীও ছিল সীমাবদ্ধ। তাঁর রুচিবোধ তাঁর শিক্ষা অনুযায়ী গড়ে উঠেছিল। সাহিত্যিক মহলের অনেকের সম্পর্কে তিনি রূঢ় ও বিরূপ মনোভাব

পোষণ করতেন। 'প্রবাসী' কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে তিনি যেমন ভাষা ব্যবহার করতেন তা বহু ক্ষেত্রে শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে যেত। কিন্তু নজরুল ছিলেন দিলদরিয়া মানুষ। 'বটতলা-তে-তলায়' তাঁর সমান গতিবিধি। জনাব মুজফ্ফর আহমদ তাঁর "নজরুল প্রসঙ্গে" এই উভয় কবির স্বভাবগত পরিচয় দিতে গিয়ে তাই ঠিক বলেছেন: "নজরুল সর্বস্তরের মানুষের—বহু মানুষের কবি হ'তে পেরেছে; আর মোহিতলাল শুধু বিদগ্ধ সমাজের অর্থাৎ গণিত সংখ্যক মানুষের কবি। নজরুল জনগণের প্রতিনিধি ছিল। মোহিতলাল তা' ছিলেন না এবং চেষ্টা করলেও তাঁর স্বভাবের দোষে তিনি তা' হতে পারতেন না।"

মোহিতলালের আত্মকেন্দ্রিকতা পরিমল গোস্বামী তাঁর বিখ্যাত "স্মৃতিচিত্রণে" সুন্দররূপে ব্যক্ত করেছেন: "তিনি (মোহিতলাল) একটি বিশেষ মতবাদের মধ্যে নিজেকে কঠিনভাবে বেঁধে রেখেছিলেন বলেই তাঁকে যথেষ্ট দুঃখ পেতে হ'য়েছিল। অন্য কোনো মতের সঙ্গে তাঁর কোনো রফা ছিল না।....তাঁর নিজের ধারণার বাইরে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, আর ঠিক এই কারণেই সম্ভবত তিনি অত্যন্ত নিঃসঙ্গ বোধ করতেন। নির্বান্ধবও হয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত।"

মোহিতলাল নজরুলকে 'প্রবাসী'তে কবিতা পাঠাতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন এবং কয়েকজন বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক থেকেও দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। জ্ঞানের পরিধি বাড়াবার জন্যে শেলী, বায়রণ, কীটস্ পড়ার উপদেশ দিয়ে ছিলেন। নজরুল যতটা সম্ভব তা মেনে চলতেন। এমন কি বিচ্ছেদের পূর্ব পর্যন্ত তিনি প্রবাসীতে লেখা পাঠান নি। কিন্তু অনেক নির্দেশই নজরুলের পক্ষে মেনে চলা সম্ভব হয় নি। নজরুল যখন হিন্দু দেবদেবীদের নিয়ে লেখা শুরু করেন তখন মোহিত-বাবু তাঁকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন: "স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।" কিন্তু উদারপ্রাণ নজরুলের পক্ষে সে উপদেশ মানা সম্ভব ছিল না। নজরুলের মানসভূমি এত সঙ্কীর্ণ হ'য়ে গঠিত হয় নি। আর এ উপদেশ মেনে চললে নজরুল-বৈশিষ্ট্যই ধ্বংস হ'য়ে যেত।

মোহিতবাবুর সঙ্গে পরিচয়ের পর হ'তে নজরুল তাঁর (মোহিতলাল) সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে পড়ে শত স্নেহধারা বর্ষণেও মনের দিক হতে হাঁফিয়ে উঠছিলেন। উদার আকাশে গান গাওয়া বনের পাখীকে খাঁচায় আবদ্ধ করলে যে অবস্থা হয় আর কি।

স্বভাবের এই বৈপরীত্য নিয়ে দীর্ঘ দিন একত্রে থাকা সম্ভব নয়। নজরুলের পক্ষেও সম্ভব হয়নি। তাঁদের এ হৃদয় মিলন মাত্র দেড় বছরের মধ্যেই ছিন্ন হয়ে যায়।

পূর্ব হ'তেই দৈনন্দিন ব্যবহারে একটু একটু করে অসন্তোষ ও মনোমালিন্য ঘনীভূত হ'য়ে উঠছিল কিন্তু তখনো তা' ছিল গোপন মনের দ্বন্দ্বের বিষয়। ধীরে ধীরে কিন্তু অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে সেই দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ শুরু হ'লো।

নজরুল তখন মুজফ্‌ফর আহমদের সঙ্গে ৩/৪-সি তালতলা লেনের বাড়ীতে অবস্থান করছেন। এই সময় (১৩২৮ সালের আশ্বিন) দুর্গাপূজার ছুটিতে একদিন সদ্যলিখিত একটি কবিতা নজরুলকে শোনাবার জন্যে মোহিতলাল তাঁর শ্বশুরবাড়ী ব্যারাকপুর থেকে এলেন তালতলা লেনে। যথারীতি তিনি কবিতাটি নজরুলকে শোনালেন। দিলদরিয়া মানুষ নজরুল। এ সকল ক্ষেত্রে বিশেষ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করাই ছিল তাঁর স্বভাব কিন্তু সেদিন তিনি একেবারে নিশ্চুপ থাকলেন। মোহিতলাল এটা একেবারেই আশা করেননি। তিনি মনে মনে নজরুলের উপর ক্ষুব্ধ হ'লেন। আসলে নজরুল তখন মোহিতলালের সংসর্গকে সহ্য করতে পারছিলেন না অথচ একেবারে মুখের ওপর কোন কিছু বলে দেওয়াও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। যা হোক, কবিতা পাঠের পর বেশ কিছু সময় মোহিতলাল নজরুল-সান্নিধ্যে থাকলেন—নানান বিষয়ে তাঁদের মধ্যে আরো অনেক কথা হলো। কিন্তু এই কথাবার্তার মধ্যে নজরুলের নির্লিপ্ততার ভাবটা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হলো। মোহিতলাল পূর্বেই আহত হয়েছিলেন—বর্তমানের এই ঔদাসীন্য তাঁকে আরো ক্ষুব্ধ করল। ফেরার পথে তিনি মুজফ্‌ফর সাহেবকে জানালেন

যে ট্রেনের ভাড়া খরচ করে তিনি ব্যারাকপুর থেকে নজরুলকে কবিতা শোনাতে এলেন অথচ কবিতা শোনার পর নজরুল কোন প্রশংসা বা আনন্দ প্রকাশ করলেন না। স্পষ্টতই এটা 'ঝড়ের পূর্বলক্ষণ'। এরপর নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশের পর এই ক্রমঘনায়মান অসন্তোষ হাওয়াইবাজির মত উর্ধ্বোত্থিত আলোকবর্তিকা নিয়ে বাইরে প্রকাশ পেল। ঘটনাটা এই :

নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতাটি প্রকাশিত হ'য়েছিল ১৩২৮ সালের কার্তিক সংখ্যা 'মোসলেম ভারতে'। কবিতাটি একই সঙ্গে নলিনীকান্ত সরকার সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'বিজলী'তে (১৩২৮ সালের ২২শে পৌষ মোতাবেক ১৯২২ সালের ৬ই জানুয়ারি) মুদ্রিত হয়েছিল। এই কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একাধারে কবির অগণিত বন্ধু ও শত্রু জুটে গেল। যেমন নাম তেমনি বদনাম। দুর্নাম রটাতে প্রথমেই এগিয়ে এলেন স্বয়ং মোহিতলাল। তিনি সর্বত্র বলে বেড়াতে লাগলেন যে, নজরুল তাঁর লেখা "আমি" কথিকার ভাবাবলম্বনে 'বিদ্রোহী' কবিতা রচনা করেছেন অথচ কোথাও তাঁর ঋণ স্বীকার করেন নি। মোহিতলালের "আমি" কথিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২১ সালের পৌষ সংখ্যা 'মানসী' পত্রিকায়।

জনসাধারণ ও অনুসন্ধিৎসু পাঠকের সুবিধার জন্য ও নিজ নিজ বিবেক অনুযায়ী বিচারের জন্য আমি এখানে ১৩২১ সালের পৌষ সংখ্যা মোতাবেক ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যা "মানসী" হ'তে মোহিতলাল মজুমদারের "আমি" এবং ১৩২৮ সালের ২২শে পৌষ মোতাবেক ১৯২২ সালের ৬ই জানুয়ারির সাপ্তাহিক "বিজলী" হ'তে নজরুল ইস্‌লামের "বিদ্রোহী" কবিতাটি নিয়ে উদ্ধৃত করলাম। "বিদ্রোহী" কবিতার কোন কোন অংশ বর্তমানে কী ভাবে সংশোধিত বা পরিত্যাজ্য হ'য়েছে তাও শেষে দেখান হ'লো। নজরুলের এই ঐতিহাসিক কবিতাটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ও আলোচনা আমার পরবর্তী গ্রন্থ "নজরুল-জীবনী"তে দেওয়া হ'য়েছে।

আমি

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার বি. এ.

(১)

আমি বিরাট্। আমি ভূধরের ন্যায় উচ্চ, সাগরের ন্যায় গভীর, নভো-নীলিমার ন্যায় সর্ব্বব্যাপী। চন্দ্র আমারই মৌলিশোভা, ছায়াপথ আমার ললাটিকা, অরুণিমা আমার দিগন্তসীমান্তের সিন্দুরচ্ছটা, সূর্য্য আমার তৃতীয় নয়ন এবং সন্ধ্যারাগ আমার ললাট-চন্দন।

বায়ু আমার শ্বাস, আলোক আমার হাস্য জ্যোতি। আমারই অশ্রুধারায় পৃথিবী শ্যামলীকৃত। অগ্নি আমার বুভুক্ষা-শক্তি, মৃত্তিকা আমার হৃৎপিণ্ড, কাল আমার মন, জীব আমার ইন্দ্রিয়। আমি মেরুতারকার মত অচপল।

আমি ক্ষুদ্র। প্রত্যুষের শিশিরকণা আমার মুখ-মুকুর, সাগর-গর্ভের শুক্তিমুক্তা আমার অভিজ্ঞান, পতঙ্গের পক্ষপত্র আমারই নামাঙ্কিত: অশ্বত্থবীজে আমার শক্তিকণা, তৃণে আমার রসপ্রবাহ, ধূলি আমার ভস্মাঙ্গরাগ।

আমি সুন্দর। শিশুর মত আমার ওষ্ঠাধর, রমণীর মত আমার কটাক্ষ, পুরুষের মত আমার ললাট, বাল্মীকির মত আমার হৃদয়। সূর্য্যাস্তশেষ প্রায়ন্ধকারে আমি শশাঙ্কলেখা, আমি তিমিরাবগুণ্ঠিতা ধরণীর নক্ষত্রস্বপ্ন। আমার কান্তি উত্তরঊষার (Aurora Borealis) ন্যায়।

আমি ভীষণ,—অমানিশীথের সন্দ্র, শ্মশানের চিতাগ্নি, সৃষ্টি-নেপথ্যের ছিন্নমস্তা, কালবৈশাখীর বজ্রাগ্নি, হত্যাকারীর স্বপ্নবিভীষিকা, ব্রাহ্মণের অভিশাপ, দম্ভান্ধ পিতৃরোষ। আমি ভীষণ,—রণক্ষেত্রে রক্তোৎসবের মত, আগ্নেয়গিরির ধূমাগ্নিবমনের মত, প্রলয়ের জলোচ্ছ্বাসের মত, কাপালিকের নরবলির মত, সত্যশোকের মত, অখণ্ডনীয় প্রাক্তনের মত, দুর্ভিক্ষের সচল নরকঙ্কালে আমাকে দেখিতে পাইবে, যোগভ্রষ্ট সন্ন্যাসীর ভোগলালসায় আমারই জিহ্বা লক্‌লক্‌ করিতেছে। আমিই মহামারী। রুধিরাক্তকৃপাণ ঘাতকের অট্টহাসিতে, মৃত-জনের শূন্যদৃষ্টি চক্ষুতারকায় আমার পরিচয় পাইবে।

আমি মধুর—জননীর প্রথম পুত্রমুখচুম্বনের মত, তৃষিত বনভূমির উপর নববরষার পুষ্পকোমল ধারাস্পর্শের মত; দিব্যমাল্যাম্বরধরা ব্রীড়াবেপথুমতী বিবাহধমারুণ লোচনশ্রী নববধূর পাণিপীড়নের মত, যমুনাপুলিনে বংশীধ্বনির মত, প্রণয়িনীর সরমসঙ্কোচের মত, কৈশোর ও যৌবনের বয়ঃসন্ধির মত। আমি ম্যাডনা—বক্ষে নিমিলীত নয়ন স্তনন্ধয় শিশু; আমি সাবিত্রী অঙ্কে মৃত পতি। আমি বিদর্ভরাজ তনয়ার প্রণয়দূত—হংস; আমি তাপসী মহাশ্বেতার নয়নসলিলার্দ্র তন্ত্রী বীণা; আমি স্বামীর সহিত সপত্নীর মিলনে স্মিতমুখী বাসবদত্তা; আমি পতিপরিত্যক্তা "ত্বমেব ভর্ত্তা ন চ বিপ্রয়োগ"—বচনা জানকী। সান্ধ্য আকাশের মেঘস্তরে আমার বসনাঞ্চল ঘুরিয়া যায়, উষায় আরক্ত কপোলে আমারই লজ্জারাগ। আমি করুণার অশ্রুজল, প্রেমের আত্মত্যাগ, স্নেহের পরাজয়। আমার মত নেত্রের কিরণ সম্পাতে রজনী জ্যোৎস্নাময়ী, আমারই সুগোপন নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে ধরণীর উপবন কুসুমিত হইয়া উঠে; আমিই সুখসপ্তের নয়ন-পল্লবে মৃণাল-বর্ত্তিকায় স্বপ্নাঞ্জন পরাইয়া দিই। আমি হৃদয়-সীমায় চুম্বনের মত জাগিয়া উঠি এবং নেত্রপ্রান্তে অশ্রুর মত ঝরিয়া যাই।

আমি আনন্দ—শরৎ প্রভাতের স্বর্ণালোক। পত্রপুষ্পে

শৃঙ্খলিতায় সে আনন্দ শিহরিয়া উঠিতেছে; ক্ষুদ্র মৃত্যু, তুচ্ছশোক, অজ্ঞান-অশ্রুর উপরে আমার আনন্দ বৃহৎ অসীম অনন্ত আকার ধারণ করিয়াছে। আমি শনির উপরে বৃহস্পতি, শয়তানের পার্শ্বে জেহোবা, আহ্রিমান-শত্রু ওরমজদ, মারবিজয়ী নির্ব্বাণ দেবতা। শ্মশানকূলবাহিনী জাহ্নবী, নিশীথ অন্ধকারে প্রস্ফুটিত ফুলদল, অসহায় ক্রন্দনের উপাসনা। আমি ধ্বান্তারি হিরণ্যজ্যোতি, গিরিশিলার কলনির্ঝরিণী, ধূসর মৃত্তিকার শ্যাম রোমাঞ্চ। আকাশ আমার আনন্দ ধরিয়া রাখিতে পারে না, আলোক কাঁপিয়া উঠিতেছে, গ্রহজগৎ অপূর্ব সঙ্গীতে তালে তালে নৃত্য করিতেছে। ধরণী ষড়ঋতুর নৃত্যচক্রে কখনও অবশ কখনও অশ্রুপ্লাবিত, কখনও হিন্দোলোৎসবে মাতিয়া উঠিতেছে। নিখিলের অশ্রুশিশির আমারই হাস্যকিরণে অরুণায়মান।

আমি রহস্যময়, আমি দুর্জ্ঞেয়। অন্ধকার চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়াছে, ঊর্দ্ধে আকাশ ও নিম্নে জলস্থল আমার সত্তায় স্তম্ভিত হইয়া আছে। দিগন্তে মৃত্যুর চক্রনেমি সুষুপ্তির রাজ্য। আকাশে অমৃত আলোকের দীপালি-উৎসব, পৃথিবীপৃষ্ঠে জীবন-মরণের আলোছায়া। আমিই আলোক, আমিই অন্ধকার; আমিই নির্বাণোন্মুখ প্রাণশিখা, আমি অনির্ব্বাণ স্থির রশ্মি। আমি বৈতরণীর নাবিক, স্বচ্ছ অন্ধকারে রজতচিক্কণ খরস্রোতে আমার প্রতিবিম্ব অস্পষ্ট দেখাইবে, জ্যোৎস্নালোকে আমার মুখ গুণ্ঠনাবৃত।

আমি জগতে চেতনা দিয়া নিজে অচেতন। অস্তির মধ্যে আমি নাস্তি। আমিই বিশ্বচিত্র, আমিই তাহার চিত্রকর। আমিই হোম, আহুতি এবং হোতা। আমি এই বিশ্বপ্রপঞ্চের মধ্যে আপনাকে আপনি অন্বেষণ করিতেছি। আমি অমৃত আস্বাদনের জন্য বিষ পান করিয়াছি, জীবনের জন্য মৃত্যু এবং ধ্বংসের জন্য সৃষ্টি বিধান করিয়াছি। ভোগের জন্য আমি এক হইতে বহু হইয়াছি। পূজা লইবার জন্য আপনি পূজারী হইয়াছি; পরমানন্দের জন্য দুঃখানুভূতি

এবং সত্যের জন্য মিথ্যার সৃষ্টি করিয়াছি। আমি মহাচেতনা—ক্ষুদ্রচেতনায় বিভক্ত! আমি এক অদ্বৈত শ্বাসত মহাসঙ্গীত—বিশ্ববীণার অসংখ্য তন্ত্রীর মধ্যে বাজিয়া উঠিতেছি। এই গ্রহ-উপগ্রহময় বিশ্বরচনা আমার কন্দুক-ক্রীড়া। আমি জড় জগতের আকর্ষণ শক্তি, প্রাণী জগতের ক্ষুধা, এবং মানব জগতের প্রেম। পরমাণুর বিবাহে বিশ্বসৃষ্টি হইয়াছে—আমি সেই বিবাহে প্রজাপতি, আমি স্রষ্টা, আমি ব্রহ্মা। আমি সর্বভূতে আত্মরক্ষণ ধর্ম বিষ্ণুরূপে অবস্থিত। আমি মানব হৃদয়ে প্রেম—মৃত্যুঞ্জয়, আমি মহাদেব। দয়িতের জন্য, প্রিয়জনের জন্য আত্মবিসর্জন: সন্তানের জন্য মাতৃরূপার প্রাণত্যাগ, নবীনের জন্য পুরাতনের উচ্ছেদ—আমি সেই মধুর মৃত্যু, সেই মহাপ্রেমিক, মহাকাল। আমিই জীবন, আমিই মৃত্যু, আমিই আবার অমৃত: আমিই সুখ, আমিই দুঃখ, আমিই আবার আনন্দ: আমিই ষড়রিপু, আমিই আবার প্রেম।

(২)

আমি মৃতপুত্তল, ধরণী আমার প্রসূতি, পশু আমার সহোদর। ঊর্দ্ধে নক্ষত্রমালিনী নিশীথিনী, নিম্নে অযুত তরঙ্গ-কোলাহল-বিক্ষুব্ধ মহাসাগর, আমি বাতাহতপক্ষ বিহঙ্গ। আকাশে সুবর্ণ-চূর্ণমুষ্ঠি ছিটাইয়া পড়িয়াছে, সেদিকে চাহিলে নিদ্রালস চক্ষু ঢুলিয়া পড়ে। নিম্নে গভীর বজ্রনাদী সাগর গর্জ্জনে কর্ণ বধির হয় এবং ঝটিকান্দোলিত পক্ষ দুইটি ব্যথার ভরে অবসন্ন হইয়া পড়ে।

পৃথিবী শ্যামল, আকাশ নীল ও রৌদ্র হিরণ্ময়—আমি সদ্যোদ্গতপক্ষ পতঙ্গ। পত্রপুষ্প দুলিতে থাকে, বায়ু মধুময় বোধ হয়, এবং বসন্তদিনের কুসুম-সঙ্গীত চিত্তহরণ করে; কিন্তু

আসন্ন সন্ধ্যার তিমিরাবরণে যখন সকলই ঢাকিয়া যাইবে, তখন হিমসিক্ত পক্ষ দুইটি বায়ুভরে আর কাঁপিবে না। পৃথিবীর পুষ্প বীথিকায় আমার হাসি-অশ্রুর মেলা। রজনীর হিমকণা আমার বক্ষ ও আনন অভিষিক্ত করে, কখনও তাহা হইতেই সুরভির সৌরভের সঞ্চার হয়; তখন মর্ত্যের বায়ুমণ্ডল একটি প্রদোষ বা একটি প্রভাত ব্যাপিয়া আমোদিত হইয়া থাকে। শুক্লাযামিনীর কৌমুদী-কিরণ ও শারদ প্রভাতের অরুণিমা যখন হৃদয়ের সহস্রদলকে পূর্ণ বিকশিত করে, যখন পাখী পঞ্চমে গায়িতে থাকে, বসন্ত বায়ুর আতপ্তশ্বাসে নয়নের অশ্রু শুকাইয়া যায়, তখনই অসহ্য পুলকে ঝরিয়া যাই। নিম্নে ধূলিতলে কি অপূর্ব সমাধি-শয়ন। আবার কখন প্রবল বাত্যা অশনিসম্পাতেও করকা-বৃষ্টি অর্দ্ধ-মুকুলিত পুষ্প-জীবন ছিন্নবৃন্ত হইয়া যায়, কালরাত্রির অন্ধকারে অকালে হারাইয়া যাই।

আমি সৃষ্টি-গ্রন্থের প্রহেলিকা। আমার হাসি ক্রন্দনের ন্যায় শোকোদ্দীপক, এবং ক্রন্দন হাসির ন্যায় চিত্তহারী। আমি নক্ষত্রলোকের গান গাই, সমগ্র বিশ্বরচনা আমার মানসপটে প্রতিবিম্বিত; আমি নূতন কল্পলোক সৃজন করিতে পারি, কিন্তু পৃথিবীর কঙ্কর কণ্টকে আমার পদতল রক্তাক্ত, পবনতাড়িত ধূলিজালে আমি অন্ধ, ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য আমি আম-মাংসভোজী। আমি মৃত্যু জলধির উপর শয়ন করিয়া অমৃত-ইন্দুর স্বপ্ন দেখি। কিন্তু কোথায় আকাশের স্থিররশ্মি নক্ষত্রমালা, কোথায় আমার গৃহকোণের তৈলনিষেকপুষ্ট বায়ুবিকম্পিত ধূমমলিন দীপশিখা! আমি তাহারই আলোকে ছায়া ধরাধরি করিতেছি।

আমি দুর্ব্বল অসহায়। আমার ক্ষুদ্র তনুযষ্টি মাধবী মদিরায় ঘুরিয়া পড়ে, অসহ্য শীতবাতে আমার হস্তপদ যূপবদ্ধ পশুর মত কাঁপিতে থাকে। কিন্তু আমার হৃদয়তলে যে বহ্নি জ্বলিতেছে,

তাহাও নির্ব্বাপিত হয় না—সে অগ্নিকুণ্ডে বহ্নিবিক্ষু পতঙ্গের মত ভস্মসাৎ হইয়া যাই। আপনার হৃদ্‌পিণ্ড আপনি ছিঁড়িয়া ফেলি, আকাশে দেবতা হাসিয়া উঠে। খধূপের মত ঊর্দ্ধে উঠিতে যাই, কিন্তু ভস্মাবশেষ হইয়া ধূলিচুম্বন করি। আমি কালস্রোতে অম্বুবিম্ব, প্রবল ঘূর্ণাবর্তে তৃণখণ্ড, স্রোতোবেগ কম্পিত বেতসলতা।

আমি কখনও তন্দ্রাতুর—স্বপ্নবিলাসী, কখনও কর্ম্মবীর্যের অবতার। কখনও নিদ্রোত্থিত সিংহের মত জীবন-বাগুয়ার গ্রন্থিচ্ছেদনের নিস্ফল প্রয়াস করিয়া আপনার অহঙ্কারে আপনি মত্ত হইয়া উঠি, শেষে মৃত্যু নিষাদের অব্যর্থশরে আহত হইয়া ক্লিষ্ট জীবন বিসর্জন করি। কখনও স্থির নির্বিকার হইয়া মনোরাজ্যে অধিষ্ঠান করি; তখন সোমসূর্য্য, লোকলোকান্তর, গ্রহ উপগ্রহ কিছুই আমার মনোরথের অনধিগম্য নয়। তখন বিশ্বস্রষ্টার অপূর্ব কৌশল ভেদ করিতে পারি, সৃষ্টি ও প্রলয়ের কথা অনুষ্টুপ ছন্দে গাঁথিয়া যাই।

আমি মূর্খ, আমি নির্বোধ। বৃথা বুদ্ধির গর্বে স্ফীত হইয়া সরল আনন্দ ও সহজ উপভোগ হইতে বঞ্চিত হই। পুষ্পাকুল যে সৌরভস্বপ্নে বিভোর হইয়া থাকে, তাহাতেই তাহার পুষ্পজীবন কাটিয়া যায়। একটু আলোক, একটু বায়ুজীবন ভিন্ন সে আর কিছুই চায় না। পাখী তাহার বসন্তগীত শেষ হইলে কোথায় চলিয়া যায়, আর দেখিতে পাওয়া যায় না। সুপক্ক, নিটোল স্বর্ণাভ ফল, নীল আকাশতলে পক্ষ মুক্ত করিয়া সন্তরণ, দুটি গান ও সরসী জলে পুচ্ছসংস্কার—সে আর কিছুই চায় না। কিন্তু আমি ভোগের অনন্তউপকরণ কোলে করিয়া কাঁদিতেছি, অতীত স্মৃতি ও ভবিষ্যৎ ভয় আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছে। নিস্ফল স্বপ্ন ও কুতর্কজাল বিস্তার করিয়া আমি আপনাকে আপনি বন্দী

করিয়াছি। জীবন আমার জন্য শোক করিতেছে, মৃত্যু অলক্ষ্যে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে।

আমি উন্মাদ। পর্ণকুটীরে হোমাগ্নি জ্বালিয়াছি, সাগর বালুকায় গৃহরচনা করিয়াছি, আমি নিদাঘ ঝটিকায় তুলসীমূলে সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়াছি—আমি ভালবাসিয়াছি। হায় উন্মাদ! ক্ষয়িতমূল নদীতটে আসন্ন আঁধারে কার হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়াছ? ধূলি ধূলিকে আলিঙ্গন করিতেছে। মৃত্যু-পুরোহিত বিবাহমন্ত্র উচ্চারণ করিতেছে। উহার নাম কি? প্রেম! মৃত্যুরোগের অব্যর্থ ঔষধ? একা থাকিলে মরিয়া যাইব, তাই আর একজনের হাত ধরিতে হইবে। এক ভিখারী আর এক ভিখারীকে অন্ন দিবে, একজন অন্ধ আর একজন অন্ধকে পথ দেখাইবে? বর্ষারাত্রে বজ্রবিদ্যুৎময় আকাশতলে গৃহহারা আমি কাহাকে জড়াইয়া ধরি? যখন মস্তকের উপর কৃতান্তের শাণিত কৃপাণ ঝুলিতেছে, তখন নিমীলিত নয়নে কার অধর সুধা আস্বাদন করিতেছি।

কিন্তু পারি না। জ্ঞান-সত্যের লৌহকবচ এই মুহ্যমান-হৃদয়কে আশ্বস্ত করিতে পারে না, কিন্তু এই পুষ্পময় অঙ্গাবরণ পরিধান করিলে মৃত্যু-বিভীষিকা পলায়ন করে। অমৃত কি তাহা জানি না, কিন্তু যেন তাহার আভাস পাইয়াছি। জননীর পয়োধর, শিশুর অধরপুট ও প্রণয়িনীর বাহুবেষ্টন অন্য জীবনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়; তখন ধরনীর ধূলি হইতে আকাশের পানে চাহিতে ইচ্ছা করে; অন্তরের মধ্যে যে বাসনা জাগিয়া উঠে, তাহা মৃত্যুঞ্জয় বলিয়া বোধ হয়। কে বলিবে সে কি মোহ—সে কি ভ্রান্তি? কিন্তু আর একজনের অশ্রু দেখিলে, আমার অশ্রু শুকাইয়া যায়, আর একজনের হাসি দেখিলে মৃত্যুভয় থাকে না। আর একজনের হাত ধরিলে অনায়াসে অদৃষ্টকে পরিহাস করিতে পারি। এ মদিরা

পান করিলে সকল দুঃখ বিস্মৃত হই। তখন কুটীরাঙ্গণে পৌর্ণমাসীর জ্যোৎস্নালোক ব্যর্থ মনে হয় না। একটি চাহনি, একটি চুম্বন, একটু হাসি, একটু অশ্রুজল পাগল করিয়া দেয়। পৃথিবী ঘুরিয়া যাক, আকাশ চন্দ্রতারকা লইয়া ছিঁড়িয়া পড়ুক, আমার আবেগ প্রশমিত হইবার নয়। আমি তখন কণ্ঠে কালকূট ধারণ করিয়া মহানন্দে নৃত্য করি।

আমি ক্ষুদ্র, কিন্তু বিরাটকে আমি ধারণা করিতে পারি। আমি মরণশীল, কিন্তু অমৃত আমাকে প্রলুব্ধ করিতেছে। আমি দুর্ব্বল, কিন্তু আমার চিন্তা-শক্তি ধরণীকে নবকলেবর প্রদান করে। আমি অন্ধ, কিন্তু ঊর্দ্ধ হইতে আমার মুখে যে আলো আসিয়া পড়ে তাহাতে ত্রিভুবন আলোকিত হইয়া যায়। কে বলিবে, আমি কে? এ সমস্যার কে সমাধান করিবে।

মানসী, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা
পৌষ ১৩২১, পৃষ্ঠা ৫৭২।

বিদ্রোহী

কাজী নজরুল ইসলাম

[বিজলী, ২২শে পৌষ, ১৩২৮ সাল মোতাবেক
৬ই জানুয়ারী, ১৯২২ খৃষ্টাব্দ হ'তে উদ্ধৃত]

বল বীর—
বল উন্নত মম শির !
শির নেহারি আমারি, নত-শির ওই শিখর হিমাদ্রির !
বল বীর—
বল মহাবিশ্বের মহাকাশ ফাড়ি'
চন্দ্র সূর্য গ্রহতারা ছাড়ি',
ভূলোক দ্যুলোক গোলোক ভেদিয়া,
খোদার আসন 'আরশ' ছেদিয়া
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাত্রীর !
মম ললাটে রুদ্র ভগবান জ্বলে রাজ-রাজটীকা দীপ্ত জয়শ্রীর
বল বীর
আমি চির-উন্নত শির !

আমি   চিরদুর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস,
মহা-প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস,
আমি   মহাভয়, আমি অভিশাপ পৃথ্বীর !
আমি দুর্বার ,
আমি   ভেঙে করি সব চুরমার !
আমি   অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল,
আমি   দলে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম-কানুন শৃঙ্খল !
আমি মানিনাকো কোন আইন,
আমি   ভরা-তরী করি ভরা-ডুবি, আমি টর্পেডো, আমি ভীম
ভাসমান মাইন,
আমি   ধূর্জটি, আমি এলোকেশে ঝড় অকাল-বৈশাখীর,
আমি   বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী-সুত বিশ্ব-বিধাত্রীর !
বল বীর—
চির উন্নত মম শির !

আমি ঝঞ্ঝা, আমি ঘূর্ণি,
আমি   পথ-সম্মুখে যাহা পাই যাই চূর্ণি' ।
আমি নৃত্য-পাগল ছন্দ,
আমি   আপনার তালে নেচে যাই, আমি মুক্ত জীবনানন্দ !
আমি হাম্বীর, আমি ছায়ানট, আমি হিন্দোল,
আমি চল-চঞ্চল, ঠমকি' ছমকি'
পথে যেতে যেতে চকিতে চমকি'
ফিং দিয়া দিই তিন দোল্ !
আমি চপলা-চপল হিন্দোল !
আমি   তাই করি ভাই যখন চাহে এ মন যা',
করি   শত্রুর সাথে গলাগলি, ধরি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা,
আমি উন্মাদ, আমি ঝঞ্ঝা !

আমি মহামারী, আমি ভীতি এ ধরিত্রীর।
আমি শাসন-ত্রাসন, সংহার, আমি উষ্ণ চির-অধীর।
বল বীর—
আমি চির-উন্নত শির।

আমি চির-দুরন্ত দুর্মদ,
আমি দুর্দম, মম প্রাণের পেয়ালা হর্দম হ্যায় হর্দম ভরপুর-মদ
আমি হোম শিখা, আমি সাগ্নিক জমদগ্নি,
আমি যজ্ঞ, আমি পুরোহিত, আমি অগ্নি!
আমি সৃষ্টি, আমি ধ্বংস, আমি লোকালয়, আমি শ্মশান,
আমি অবসান, নিশাবসান!
আমি ইন্দ্রাণী-সুত হাতে-চাঁদ ভালে সূর্য,
মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণ-তূর্য।
আমি কৃষ্ণ-কণ্ঠ, মন্থন-বিষ পিয়া ব্যথা-বারিধির!
আমি ব্যোমকেশ, ধরি' বন্ধন-হারা ধারা গঙ্গোত্রীর।
বল বীর—
চির উন্নত মম শির!

আমি সন্ন্যাসী, সুর-সৈনিক,
আমি যুবরাজ, মম রাজবেশ ম্লান গৈরিক!
আমি বেদুইন, আমি চেঙ্গিস্,
আমি আপনারে ছাড়া করিনা কাহারে কুর্নিশ!
আমি বজ্র, আমি ঈশান-বিষাণে ওঙ্কার,
আমি ইস্রাফিলের শিঙ্গার মহা-হুঙ্কার,
আমি পিনাক-পাণির ডমরু ত্রিশূল, ধর্মরাজের দণ্ড,
আমি চক্র মহাশঙ্খ, আমি প্রণব-নাদ প্রচণ্ড!
আমি ক্ষ্যাপা দুর্বাসা-বিশ্বামিত্র-শিষ্য
আমি দাবানল-দাহ, দাহন করিব বিশ্ব!

আমি প্রাণ-খোলা হাসি উল্লাস, আমি সৃষ্টি-বৈরী মহাত্রাস,
আমি মহা-প্রলয়ের দ্বাদশ রবির রাহু-গ্রাস!
আমি কভু প্রশান্ত,—কভু অশান্ত দারুণ স্বেচ্ছাচারী,
আমি অরুণ খুনের তরুণ আমি বিধির দর্পহারী!
আমি প্রভঞ্জনের উল্লাস আমি বারিধির মহাকল্লোল,
আমি উজ্জ্বল, আমি প্রোজ্জ্বল,
আমি উচ্ছল জল-ছল-ছল, চল উর্মির হিন্দোল্-দোল্।

আমি বন্ধন-হারা কুমারীর বেণী, তন্বী-নয়নে বহ্নি,
আমি ষোড়শীর হৃদি সরসিজ প্রেম-উদ্দাম, আমি ধন্যি!
আমি উন্মন-মন উদাসীর,
আমি বিধবার বুকে ক্রন্দন-শ্বাস, হা-হুতাশ আমি হুতাশীর!
আমি বঞ্চিত ব্যথা পথবাসী চির-গৃহহারা যত পথিকের,
আমি অবমানিতের মরম-বেদন, বিষজ্বালা, প্রিয়-লাঞ্ছিত বুকে
গতি ফের।
আমি অভিমানী চির-ক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা, ব্যথা সুনিবিড়,
চিত- চুম্বন-চোর-কম্পন আমি থর-থর-থর প্রথম পরশ কুমারীর!
আমি গোপন-প্রিয়ার চকিত চাহনি, ছল-করে দেখা-অনুখন,
আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা, তার কাঁকন চুড়ির কন-কন্।
আমি চির-শিশু, চির-কিশোর,
আমি যৌবন ভীতু পল্লীবালার আঁচর কাঁচলি নিচোর!
আমি উত্তরী বায়ু, মলয় অনিল, উদাস পূরবী হাওয়া,
আমি পথিক-কবির গভীর রাগিণী, বেণু বীণে গান গাওয়া।
আমি আকুল নিদাঘ-তিয়াসা আমি রৌদ্র-রুদ্র রবি,
আমি মরু-নির্ঝর ঝর-ঝর, আমি শ্যামলিমা ছায়া ছবি—
আমি তুরীয়ানন্দ ছুটে চলি একি উন্মাদ, আমি উন্মাদ!
আমি সহসা আমারে চিনেছি, আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ।

আমি উত্থান, আমি পতন, আমি অচেতন-চিতে চেতন,
আমি বিশ্ব-তোরণে বৈজয়ন্তী, মানব-বিজয়-কেতন,
ছুটি ঝড়ের মতন করতালি দিয়া,
হাসি হাহা হাহা হি হি হি হি !
তাজি বোর্‌রাক আর উচ্চৈঃশ্রবা বাহন আমার
হাঁকে চিঁহিঁ হিঁহিঁ চিঁহিঁ হিঁহিঁ !
আমি বসুধা-বক্ষে আগ্নেয়াদ্রি, বাড়ব-বহ্নি কালানল,
আমি পাতালে মাতাল অগ্নি-পাথার কলরোল-কল-কোলাহল !
আমি তড়িতে চড়িয়া উড়ে চলি জোর তুড়ি দিয়া, দিয়া লম্ফ,
আমি ত্রাস সঞ্চারি ভুবনে সহসা সঞ্চারি' ভূমিকম্প !
ধরি বাসুকির ফণা জাপটি'-
ধরি স্বর্গীয় দূত জিব্রাইলের আগুনের পাখা সাপটি' !
আমি দেব-শিশু, আমি চঞ্চল,
আমি ধৃষ্ট, আমি দাঁত দিয়া ছিঁড়ি বিশ্ব-মায়ের অঞ্চল !
আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরী,
মহা-সিন্ধু উতলা ঘুম ঘুম
ঘুম চুমু দিয়ে করে নিখিল বিশ্বে নিঝ্‌ঝুম
মম বাঁশরীর তানে পাশরি' !
আমি শ্যামের হাতের বাঁশরী।
আমি রুষে উঠে' যবে ছুটি মহাকাস ছাপিয়া,
ভয়ে সপ্ত নরক, হাবিয়া দোজখ নিভে নিভে যায় কাঁপিয়া !
আমি বিদ্রোহ বাহী নিখিল অখিল ব্যাপিয়া !
আমি শ্রাবণ প্লাবন বন্যা,
কভু ধরণীরে করি বরণীয়া, কভু বিপুল ধ্বংস ধন্যা—
আমি ছিনিয়া আনিব বিষ্ণু বক্ষ হইতে যুগল কন্যা !
আমি অন্যায়, আমি উল্কা, আমি শনি,
আমি ধূমকেতু জ্বালা, বিষধর কাল ফণী !

আমি ছিন্নমস্তা চণ্ডী, আমি রণদা সর্বনাশী,
আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি !

আমি মৃন্ময়, আমি চিন্ময়,
আমি অজর অমর অক্ষয়, আমি অব্যয় !
আমি মানব দানব দেবতার ভয়,
বিশ্বের আমি চির দুর্জয়,
জগদীশ্বর ঈশ্বর আমি পুরুষোত্তম সত্য,
আমি তাথিয়া তাথিয়া মথিয়া ফিরি এ স্বর্গ পাতাল মর্ত্য !
আমি উন্মাদ, আমি উন্মাদ !!
আমি চিনেছি আমারে, আজিকে আমার খুলিয়া
গিয়াছে সব বাঁধ !!

আমি উত্তাল, আমি তুঙ্গ, ভয়াল, মহাকাল,
আমি বিবসন আজ ধরাতল নভঃ ছেয়েছে আমারি
জটাজাল !

আমি ধন্য ! আমি ধন্য !!
আমি মুক্ত, আমি সত্য, আমি বীরবিদ্রোহী সৈন্য
আমি ধন্য ! আমি ধন্য !!

আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার,
নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার !
আমি হল বলরাম-স্কন্ধে,
আমি উপাড়ি' ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নব সৃষ্টির
মহানন্দে।

মহা-বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত,

যবে উৎপীড়িতে ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে
ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণ ভীম রণ ভূমে রণিবে না,
বিদ্রোহী রণ ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত!
আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দেই পদ চিহ্ন,
আমি স্রষ্টা-সূদন, শোক-তাপ-হারা খেয়ালী
বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন!

আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দেবো পদ-চিহ্ন!
আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন!!
আমি চির বিদ্রোহী বীর—
আমি বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির!

বিজলী, ২২শে পৌষ, ১৩২৮ সাল
মোতাবেক ৬ই জানুয়ারী, ১৯২২ খৃষ্টাব্দ

বর্তমানে 'সঞ্চিতা'য় "বিদ্রোহী"র যে পাঠ পাওয়া যায় তার সঙ্গে এই "বিদ্রোহী"র বেশ পার্থক্য রয়েছে। বর্তমানে "আমি দুর্দম, মম প্রাণের পেয়ালা হর্দম হ্যায় হর্দম ভরপুর-মদ" আছে কিন্তু প্রথম প্রকাশের সময় ছিল "আমি দুর্দম, মম প্রাণের পেয়ালা হর্দম হেয় হর্দম ভরপুর-মদ। পূর্বে ছিল "আমি প্রভাঞ্জনের উল্লাস" বর্তমানে "আমি প্রভাঞ্জনের উচ্ছ্বাস" হ'য়েছে। বর্তমান পাঠে আমরা পাই:

"ছুটি ঝড়ের মতন করতালি দিয়া
স্বর্গ মর্ত্য করতলে,
তাজী বোর্‌রাক আর উচ্চৈঃশ্রবা বাহন আমার
হিম্মৎ হ্রেষা হেঁকে চলে।"

প্রথম প্রকাশের সময় ছিল ঃ

"ছুটি ঝড়ের মতন করতালি দিয়া
হাসি হাহা হাহা হিহি হিহি,
তাজি বোর্‌রাক আর উচ্চৈঃশ্রবা বাহন আমার
হাঁকে চিঁহি হিঁহি চিঁহি হিঁহি।"

সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় "আমি চিনেছি আমারে আজিকে আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ"—এর পর নিম্নোদ্ধৃত পাঁচটি পংক্তি যা প্রথম প্রকাশের সময় ছিল তা' বর্তমানে তুলে দেওয়া হ'য়েছে ঃ

আমি উত্তাল, আমি তুঙ্গ, ভয়াল, মহাকাল,
আমি বিবসন, আজ ধরাতল নভঃ ছেয়েছে আমার জটাজাল।
আমি ধন্য! আমি ধন্য!!
আমি মুক্ত, আমি সত্য, আমি বীরবিদ্রোহী সৈন্য!
আমি ধন্য! আমি ধন্য!!

নজরুলের এই বিখ্যাত কবিতাটি কার দ্বারা এবং কী ভাবে এরূপ পরিবর্তিত হ'য়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ এবং আরো বহুতর তথ্য আমার পরবর্তী গ্রন্থ "নজরুল-জীবনী"-তে পাওয়া যাবে।

যা হোক গদ্যের লেখা "আমি" কথিকাটি নাকি মোহিতলাল একদিন নজরুলকে পড়ে শুনিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত 'বিদ্রোহী' কবিতা সম্পর্কে মোহিতলালের এ ধরনের উক্তি শুনে নজরুল বিশেষরূপে মর্মাহত হলেন। অবস্থা যখন এইভাবে চরমে উঠেছে, সে সময় 'শনিবারের চিঠি'র একাদশ বা পূজা সংখ্যায় (১৯২৪ সালের ৪ঠা অক্টোবর) প্রকাশিত হ'ল 'বিদ্রোহী'র মারাত্মক প্যারডি 'ব্যাঙ'। কবিতাটি প্রকাশিত হ'য়েছিল ছদ্মনামে—ছদ্মনামের আড়ালে 'কামস্কাট্‌কীয় ছন্দে' যিনি কবিতাটি রচনা করেছিলেন তিনি হ'লেন সজনীকান্ত দাস। সেই বিখ্যাত প্যারডির কয়েকটি পংক্তি এই ঃ

আমি ব্যাঙ্
লম্বা আমার ঠ্যাং
ভৈরব রভসে বরষা আসিলে
ডাকি যে গ্যাঙোর গ্যাঙ্।
আমি ব্যাং.........
দুইটা মাত্র ঠ্যাং।...

'কামস্কাট্‌কীয় ছন্দে' সূচিত কবিতাটির শেষ কিন্তু 'অসম ছন্দে'। পূর্বোক্ত ব্যাঙ তাল-ফেরতায় কবিতাটির শেষাংশে এসে কখন সাপে পরিণত হয়েছে তা' বোঝাই যায়নি ঃ

আমি সাপ, আমি ব্যাঙেরে গিলিয়া খাই,
আমি বুক দিয়া হাঁটি
ইঁদুর-ছুঁচোর গর্তে ঢুকিয়া যাই।
আমি ভীম ভুজঙ্গ
ফণিনী দলিত ফণা,
আমি ছোবল মারিলে
নরের আয়ুর মিনিট যে যায় গণা—
আমি নাগ-শিশু, আমি ফণিমনসার জঙ্গলে বাসা বাঁধি,
আমি 'বে অব বিস্কে',
'সাইক্লোন' আমি, মরু-সাহারার আঁধি।—
...আমি খোদার ষণ্ড
নিখিলের নীল খিলানে যে ক্ষুর হানি।......ইত্যাদি।

কবিতাটি পড়ে নজরুলও রীতিমত বিচলিত হ'য়ে পড়লেন। মোহিতলালের সঙ্গে তাঁর মনকষাকষি পুরামাত্রায় চলছিল, তারপরে 'শনিবারের চিঠি'তে এ ধরনের ব্যঙ্গ প্রকাশিত হওয়ায় তিনি মনে করলেন এ কীর্তি মোহিতলালের। কবির অন্যান্য বন্ধুরাও তাই মনে করলেন এবং এর একটা সমুচিত জবাব দেবার জন্যে তাঁরা তাঁকে উত্তেজিত করতে লাগলেন। নজরুলের স্বভাবেও ছিল উদ্দামতার মিশেল। তিনি দৃঢ় হস্তে কলম ধরলেন। কিন্তু ব্যাপারটি ঘটে চলেছিল সম্পূর্ণ ভুল

বোঝাবুঝির ওপর। প্রকৃতপক্ষে মোহিতলাল তখনও 'শনিবারের চিঠি'র সঙ্গে যুক্ত হননি। "বিদ্রোহী" কবিতার 'ব্যাঙ' নামক সুদীর্ঘ প্যারডি যে সজনীকান্ত দাস রচনা করেছিলেন সে কথা পূর্বেই বলেছি। বস্তুতঃ এর সঙ্গে মোহিতলালের কোনই সম্পর্ক ছিল না।

অবশ্য এই প্যারডির মাধ্যমেই মোহিতলালের সঙ্গে শনি-গোষ্ঠীর আলাপ হয় এবং পরে সে আলাপ আন্তরিকতায় পরিণত হ'য়েছে। এ সম্পর্কে সজনীকান্ত দাস তাঁর আত্মস্মৃতির প্রথম খণ্ডের ১৩৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন :

> …"একদিন প্রাতে আমার ঘরে বেশ ঘটা করিয়া বসিয়া দুই-চারিজন বন্ধুর নিকট কামস্কাটকীয় ছন্দ এবং বিশেষ জোর দিয়া আমি ব্যাঙ পাঠ করিতেছি, মোহিতলাল ধীরে ধীরে আমার দরজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সেই 'পুরূরবা' পাঠের পর তাঁহার আর এই অধীনের দিকে নজর দেওয়ার অবকাশ হয় নাই—কবিতা শোনা তো দূরের কথা। পরে বুঝিতে পারিয়াছিলাম, তিনি তখন নজরুল ইসলামের প্রতি অপ্রসন্ন তাই 'বিদ্রোহী'র প্যারডি কানে প্রবেশ করিতেই আত্মবিস্মৃত ভাবে আমার ঘরে চলিয়া আসিয়াছেন।…এই সময় মোহিতলালের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হইবার সুযোগ লাভ করিলাম। আমার খাতাখানি যতই ব্যঙ্গ কবিতায় বোঝাই হইতে লাগিল, তিনি ততই খাতা-বগলে আমাকে লইয়া পরিচিত মহলে প্রদর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তিনি প্রথমটা গিয়া আমার পরিচয়-পর্বটা শেষ করিলেই আমি দম দেওয়া ঘড়ির মতন বাজিতে থাকিতাম—কাজী নজরুলের প্যারডিটাই বেশি বাজাইতে হইত।"

কিন্তু এই ভুলবোঝাবুঝির ভিতর দিয়ে ব্যাপারটা এগিয়ে চলল। "দে গরুর গা ধুইয়ে"—ধুয়ো তুললেন নজরুল। গায়ে তখন বিষের জ্বালা। অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করার সময় ছিল না। 'কল্লোল'-অফিসের এক বৈঠকে আক্রমণকারীকে সমুচিত জবাব দিয়ে নজরুল লিখলেন সুদীর্ঘ কবিতা—"সর্বনাশের ঘণ্টা"। কবি-বন্ধু অচিন্ত্যকুমার

সেনগুপ্তের মতে কবিতাটি ছাপা হ'য়েছিল ১৩৩১ সালের কার্তিক সংখ্যা "কল্লোলে"; কিন্তু স্বর্গীয় সজনীকান্ত দাস তাঁর 'আত্মস্মৃতি'র ১ম খণ্ডে লিখেছেন: নজরুল কর্তৃক নিক্ষিপ্ত "এই গদার বাহন হইল 'কল্লোল' নামক মাসিক পত্রের দ্বিতীয় বর্ষের (১৩৩১) ষষ্ঠ বা আশ্বিন সংখ্যা।" নজরুল-জীবনীকারগণ সকলেই (জনাব আজহারউদ্দীন খান, শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত, কবি-বন্ধু জনাব মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ) শ্রদ্ধেয় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের "কল্লোল যুগ" অনুকরণে কার্তিক সংখ্যার কথা উল্লেখ করেছেন—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কবিতাটি কোন্ সংখ্যায় ছাপা হ'য়েছিল—আশ্বিনে না কার্তিকে? এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে আসার প্রয়োজন আছে। আমার সন্ধানে "কল্লোলে"র পুরানো সংখ্যা না থাকায় সঠিক সংখ্যার নাম দেওয়া সম্ভব হ'ল না। শ্রদ্ধেয় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'শনিবারের চিঠি'র "সজনীকান্ত স্মরণ সংখ্যা"য় 'রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত' নামক প্রবন্ধে অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য মহাশয় নজরুলের কবিতাটির নাম দিয়েছেন "সর্বনাশের নেশা।" এ তথ্যটি ঠিক নয়। 'সর্বনাশের ঘণ্টা' নামে কবিতাটি 'কল্লোলে' ছাপা হয়েছিল কিন্তু "ফণিমনসা" কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হওয়ার সময় কবিতাটির নামকরণ হয় "সাবধানী ঘণ্টা"। এই কবিতায় নজরুল মোহিতলালকে আক্রমণ করেছেন এবং আক্রমণকারীদের উদ্দেশে ঘোষণা করেছেন তাঁর আপোসহীন সংগ্রামের কথা। এই ঐতিহাসিক কবিতাটির কয়েকটি বিশেষ পংক্তি এখানে উদ্ধৃত করা হ'ল:

রক্তে আমার লেগেছে আবার সর্বনাশের নেশা,
রুধির-নদী পার হ'তে ঐ ডাকে বিপ্লব হ্রেষা।...
চিরদিন তুমি যাহাদের মুখে মারিয়াছ ঘৃণা-ঢেলা
যে ভোগানন্দ দাসেদেরে গালি হানিয়াছ দুই বেলা,
আজি তাহাদের বিনামার তলে আসিয়াছ তুমি নামি,
বাঁদরেরে তুমি ঘৃণা করে ভালবাসিয়াছ বাঁদরামি।

হে অস্ত্র-গুরু! আজি মম বুকে বাজে শুধু এই ব্যথা,
পাণ্ডবে দিয়া জয়-কেতু—হ'লে কুকুর কুরু নেতা।
ভোগ-নরকের নারকীর দ্বারে হইয়াছ তুমি দ্বারী,
ব্রহ্ম অস্ত্র ব্রহ্মদৈত্যে দিয়া হে ব্রহ্মচারী!

…তুমি পাও কোন্ সুখ

দগ্ধমুখ সে রাম-সেনাদলে নাচিয়া হে সেনাপতি!
শিবসুন্দর সত্য তোমার লভিল একি এ গতি?…
তুমি ভিড়িওনা গো-ভাগাড়ে-পড়া চিল শকুনের দলে
শতদল দলে তুমি যে মরাল শ্বেত সায়রের জলে।…
…কেমন করে যে রটায় এসব ঝুটা বিদ্রোহী দল!
সখী গো আমায় ধর ধর! মাগো কত জানে এরা ছল!…
যত বিদ্রূপই কর গুরু তুমি জান এ সত্য-বাণী
কারুর পা চেটে মরিব না, কোনো প্রভু পেটে লাথি হানি
ফাটাব না পিলে, মরিব যেদিন্ মরিব বীরের মত
ধরা-মা'র বুকে আমার রক্ত রবে হ'য়ে শাশ্বত।
আমার মৃত্যু লিখিবে আমার জীবনের ইতিহাস,
ততদিন গুরু সকলের সাথে করে নাও পরিহাস!

নজরুলের এ কবিতায় যথেষ্ট শালীনতাবোধ আছে। তিনি উত্তেজনায় সংযম হারিয়ে ফেলেননি। গুরুর প্রতি শিষ্যের (পরিহাস-ছলে কবিতার মধ্যে নজরুল নিজেই গুরু-শিষ্য সম্পর্ক স্থাপন করেছেন) চাপা মনের বিদ্রোহ প্রকাশ পেয়েছে মাত্র। তবে নজরুলের অনুমান সত্য ছিল না।

যা' হোক, নজরুলের এই ভুল অনুমানের ওপর লেখা কবিতা পড়ে গুরু ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। ক্রোধে উত্তেজনায় মোহিতলাল সংযম হারিয়ে ফেললেন এবং শিষ্যকে "হীন জাতি-চোর" বলে সম্বোধন করলেন। যে 'শনিবারের চিঠি'কে মোহিতলাল ইতিপূর্বে গালি-গালাজ করতেন, "কল্লোলে" নজরুলের কবিতা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে

তিনি সেই পত্রিকার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করলেন। "সর্বনাশের ঘণ্টা"র উত্তরে তিনি লিখলেন এক দীর্ঘ কবিতা "দ্রোণ-গুরু"। কবিতাটি 'শনিবারের চিঠি'র বিশেষ "বিদ্রোহ সংখ্যা"র (৮ই কার্তিক, ১৩৩১ সাল) "ক্রোড়পত্রে" ছাপা হ'য়েছিল। এই সংযমহীন 'অভি-সম্পাতি' কবিতার সবটুকু এখানে উদ্ধৃত করলাম। কবিতাটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। জনাব মুজফ্ফর আহমদ তাঁর গ্রন্থে সম্পূর্ণ কবিতাটি উদ্ধৃত করেছেন। কবিতাটি দুষ্প্রাপ্য ব'লে আমিও সমস্ত অংশটুকু তুলে দিলাম। বাংলা-সাহিত্যে এমন অভিশাপের কবিতা আর দ্বিতীয় রচিত হয়নি।

দ্রোণ-গুরু

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

[কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধকালে দ্রোণাচার্য কুরু সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলে, তিনি প্রাচীন ও অকর্মণ্য বলিয়া দ্রোণ-বিদ্বেষী কর্ণের বিদ্বেষ আরও বাড়িয়া যায়। এদিকে দ্রোণ-শিষ্য অর্জুনের কৃতিত্বও কর্ণের দুঃসহ হইয়া উঠে। এই বিদ্বেষের কথা মহাভারতে উল্লিখিত আছে। কিন্তু নিম্নলিখিত ঘটনাটির কথা মূল মহাভারতে নাই। কর্ণাটদেশে প্রচলিত মহাভারতের তামিল-সংস্করণের একটি গাথা অবলম্বনে এই কবিতা রচিত হইয়াছে। দ্রোণাচার্যের মনে অর্জুনের প্রতি আন্তরিক স্নেহ নষ্ট করিবার জন্য, এবং তাঁহার উপর যাহাতে গুরুর নিদারুণ অভিশাপ বর্ষিত হয় এই উদ্দেশ্যে, অর্জুন কর্তৃক লিখিত বলিয়া একখানি গুরুদ্রোহসূচক কুৎসাপূর্ণ পত্র দ্রোণাচার্যের নিকট প্রেরিত হয়। বলাবাহুল্য, এই কৌশল সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছিল।]

কি বলিস্ তুই অশ্বত্থামা! আমি মরে যাই লাজে!
আমি ব্রাহ্মণ, তবু বলিব না—ক্ষত্রিয়কুল মাঝে

হেন কাপুরুষ আছে কোনো ঠাঁই—ভীরু, আত্মম্ভরি—
মিথ্যা দম্ভ গর্বের ভরে আপনারে বড় করি'
আপনার পূজা ষোড়শ উপচার মাগে যে গুরুর কাছে !
অনুষ্ঠানের ত্রুটি পাছে হয়, সদা সেই ভয় আছে !—
তাহারি লাগিয়া আক্রোশ করি' শিষ্য হইয়া বীর
বন্যবরাহ হনন করা সে ঘৃণ্য ব্যাধের তীর
চীৎকার সহ নিক্ষেপি' করে বাতাসের সনে রণ—
বলে পাণ্ডব-কৌরব গুরু আমারি সে প্রিয়জন !
পাণ্ডব সেকি ? কোন পাণ্ডব ? কে বা সে ছন্নমতি ?
আমার নিকটে অস্ত্রশিক্ষা !—হায় একি দুর্গতি !
বলে, সে পার্থ !—কৃষ্ণ সারথি ! নব-অবতার নর !
মহাবিপ্লব যুগান্তরের নবীন যুগন্ধর !
যার পৌরুষে যত মহারথী দ্রুপদের সভাতলে,
মুগ্ধ হইল লক্ষ্যভেদের অপূর্ব কৌশলে ;
যার বীরত্বে বিস্মিত নিজে শঙ্কর ত্রিপুরারি—
দানিল দিব্য পাশুপত যারে দাত্যদহনকারী,
যার প্রতিভায় ব্রাহ্মণ-দ্রোণ ব্রহ্মণ্যের চেয়ে
মানিয়াছে বড় ক্ষাত্র-মহিমা শিষ্য যাহারে পেয়ে,
—এই লিপি তার ! —অশ্বত্থামা ! হয়েছিস্ উন্মাদ ?
কি কথা বলিস্ ? কে শুনাল তোরে এ হেন মিথ্যাবাদ ?

—অর্জুন ?—আরে ছিছি, ছিছি, ছিছি ! তার হেন দুর্মতি !
তার মুখে হেন অনার্য্য বাণী !—আপন গুরুর প্রতি,
মিথ্যা রটনা—এই অপবাদ মিথ্যার অভিনয়ে
পটু হবে সেই ! অসি ছেড়ে শেষে মসীর পাত্র লয়ে
—ছিটাইছে কালি, রণ-অঙ্গনে অঙ্গনা-রীতি ধরে !—
রমণীর মত বাতাসে ভেজায়ে কোন্দল সুরু করে !

বিরাটপুরীর অজ্ঞাতবাসে বৃহন্নলার কথা
মনে আছে বটে—অকীর্তিকর !—সেথাকার বাচালতা
পুরন্ধ্রীদের কুৎসা-কলহ, সেই নট-নটী লীলা
স্বভাব নষ্ট করেছিল বুঝি ? আজো অন্তঃশীলা
নপুংসকের বিকৃত শোণিত কিণাঙ্ক—করমূলে
বহিছে নাড়ীতে ? হায়, হতভাগা এখনো যায়নি ভুলে।
গুরু নিন্দার পাতকের ভয় এতটুকু মনে নাই !
আজ তুমি বড় ! গুরু মারা চোর ! তুমি মহাবীর, তাই
একটা ক্ষুদ্র মশকের হুল সহিতে পারো না তুমি !
—অত্যাচারীর খড়্গ ভাঙ্গিবে, রাখিবে ভারত-ভূমি !
হুলের আঘাতে, কুরুক্ষেত্রে ফেলি দিয়া গাণ্ডীব,
রথ হতে নামি' মৃত্তিকা'পরে মাথা ঠোকে ঢিব্ ঢিব্ !
নারায়ণী সেনা হাসিছে অদূরে, রঙ্গ দেখিছে তারা,
আমার মাথা যে হেঁট হয়ে যায়, পশ্চিমে ওই কারা—
ফেরুপাল বুঝি—হর্ষিত চিতে চীৎকার করি' ওঠে,
সূর্যের মুখে অস্তমলিন হাসি বুঝি ওই ফোটে !

* * *

কেন তোর এই অধঃপতন বল্ দেখি, ফাল্গুনি !
এই বিদ্বেষ ঈর্ষ্যার জ্বালা কার তরে বল্ শুনি ?
আমি গুরু তোর, একা তোরি গুরু ?—আর কেহ নাহি রবে ?
আজিকার এই সমরাঙ্গণে যদি কেউ যশ লভে—
রণ-কৌশলে আর কেহ যদি আমারে প্রণাম করি'
দূর হ'তে পায় আমারি শিক্ষা-সাধনার কারিগরি—
ধর্মক্ষেত্রে সে কি অধর্ম ? তোমারি হইবে জয় ?
তোমার দর্পে আর কেহ যদি হেসে কুটি-কুটি হয়,
সে কি তার মহা ধর্ম-দ্রোহ ?—হয় যদি তাই হোক্,
তার লাগি' মোর অপরাধ কিবা—কেন তায় এত শোক !

আজ দেখিতেছি, একদিন সেই নিষাদের নন্দনে
করেছিনু ঘোর অবিচার আমি মমতা অন্ধ মনে ।—
তোমারি লাগিয়া অঙ্গুলি তার চেয়েছিনু দক্ষিণা,
সে পাপের সাজা কেবা দিবে আর ক্রূর অর্জুন বিনা
আজ পুনরায় নবধানুকীর অঙ্গুলি কাটি' লয়ে
পাঠাতাম যদি তোমার সকাশে—হর্ষে ও বিস্ময়ে
গুরুদেব বলি' কত বাখানিতে বৃদ্ধের বীরপনা !—
সে আর হবে না—আর করিবনা ধর্ম্মেরে বঞ্চনা ।
এতকাল ধরি' দিয়াছ যে গুরু-ভক্তির পরিচয়,
সেই ভালো ছিল, তার বেশী এ যে হয়ে গেল অতিশয় !
মনে ভেবে দেখ, কিবা মানে তার, কি বুঝিবে রাজগণ,—
ধিক্কারে আজ মুখরিত হ'ল কুরুদের প্রাঙ্গণ !

* * *

না-না, না-না, না-না, একি এ প্রলাপ বকিতেছি বার বার !
অশ্বত্থামা ! ফের পড়, লিপি,—হয়নি পরিষ্কার !
মোর প্রাণাধিক প্রিয়তম সেই কিরীটীর নহে লিপি,
এ লিখেছে কোন্ কুলশীলহীন পরের প্রসাদজীবী !
লেখার মাঝারে ওঠে না ফুটিয়া সেই মনোহর মুখ,
আজানু-দীর্ঘ সেই বাহু তার, বিরাট বিশাল বুক !
হ্রস্ব খর্ব এ কোন্ বামন উপানৎ পরি' উচা
হইবারে চায়, চুরি করা চূড়া মাথায় বেঁধেছে ছুঁচা !
অর্জুন নিজে শ্যাম-কলেবর—কৃষ্ণের সখা সে যে !
সেকি ঘৃণা করে কৃষ্ণবরণ ? বধূ কৃষ্ণার তেজে
বাহুতে বীর্য্য, বক্ষে জাগিল যৌবন-ব্যাকুলতা,—
সে করেছে গ্লানি মসীরূপ বলি' ? সম্ভব নহে কথা !
এ কোন্ শবর কিরাতের গালি, অনার্য্য জাতি-চোর !
নকল কুলীন !—বর্ণ-গর্বে কুৎসা রটায় মোর !

হয়েছে ! হয়েছে ! অশ্বত্থামা ! জেনেছি এতক্ষণে—
বীরকুল গ্লানি সেই নিন্দুকে এবার পড়েছে মনে !
আমি ব্রাহ্মণ, চির-উজ্জ্বল ব্রহ্মণ্যের শিখা
ললাটে আমার—মিথ্যা-দহন জ্বলে যে সত্যটীকা !

রাজসভাতলে জনগণমাঝে করি না যে বিচরণ ;
পথ কুক্কুর নীচ-সহবাস ত্যজিয়াছি প্রাণপণ।
তবু যে আমার ধনু নির্ঘোষে টঙ্কার-ঝঙ্কারে
নিজে গায়ত্রী-ছন্দ-জননী আসিয়া দাঁড়ান দ্বারে।

আমার পর্ণ-কুটীরের তলে রাজার দুলাল বীর—
গড্ডলিকার দল নহে—আসি' মাটিতে নোয়ায় শির !
আমি সাধিয়াছি আর্য সাধনা-সনাতন সুন্দর !—
যে-মন্ত্র-বলে শাশ্বতীসমা সদগতি লভে নর।

ত্যজি' অনার্য্য-জুষ্টপন্থা, অন্ত্যজ—অনাচার,
ক্ষত্রিয় সাজি' ক্ষত্রিয়ে দিছি ব্রাহ্মণ-সংস্কার।
কর্ণপটহ বিদারণ করি', বিদারিয়া নভোতল।
পথে পথে ফিরি, ইতরের সাথে করি নাই কোলাহল।

যুগ-ধর্মের সুযোগ বুঝিয়া চির-সত্যের গ্লানি
করি নাই কভু,—যশোলিপ্সার—স্বার্থের আপসানি !
নিজ হৃদয়ের পুরীষ-পঙ্ক দুই হাতে ছড়াইয়া
যুগবাণী বলি'. ধ্রুব-শাশ্বত পদতলে গুঁড়াইয়া,
যত মূর্খ ও যণ্ডামার্কে ভক্তশিষ্য করি',
এই দেবতার দিবারে করিনি পিশাচের শর্বরী !

জানিস্ বৎস, কোন মহারথী—এ কোন নূতন গ্রহ,
মোর সাথে চির-শত্রুতা মানি', বিদ্বেষ দুঃসহ
পুষিয়াছে মনে ?—বৈরী সে, যথা কৃষ্ণের শিশুপাল !
সত্যের এই মিথ্যা-বৈরী যুগে যুগে চিরকাল !

আজ আসিয়াছে নূতন ছদ্মে শিষ্যের সাজ পরি'—
গুরু-শিষ্যের ভক্তি ও স্নেহ কুৎসায় লবে হরি' !

চিনেছি তোমারে, হে কপটচারী দাম্ভিক দুর্জন !
বক্ষের মণি অর্জুন নও—পাদুকার অর্জন !
বীর সে পার্থ আর্ত্ত হয় না স্বার্থের সঙ্কোচে,
—গুরুহত্যার পাতকের ভয়ে ললাটের স্বেদ মোছে !
বজ্র-আঘাতে হয় না কাতর বীর সে সব্যসাচী—
তারে কাবু করে গোটা দুই তিন বাতাসের মশা-মাছি !
তাহারি কারণে উন্মাদ হ'য়ে করিবে সে গুরু-দ্রোহ !
একি পাপ ! একি অহঙ্কারের নিদারুণ সম্মোহ !
সে কি পাণ্ডব ! দ্রোণের শিষ্য ক্ষত্রিয়—চূড়ামণি !—
খুলে ফেল্ তোর ক্ষত্রিয়-বেশ, ওরে পাণ্ডব-শনি !
রাধেয় কর্ণ পরিচয় তোর। আর যাহা পরিচয়—
সে কথা কহিতে ঘৃণায় আমার রসনা ক্ষান্ত হয় !
চিরদিন তুই মিথ্যার দাস, মিথ্যাই তোর প্রিয়—
গুরু ভার্গবে প্রতারণা করি' সেজেছিলি শ্রোত্রিয় !
সেই কীট তোরে ছাড়িল না আজও ! সেদিন পড়িলি ধরা
দংশন সহি' !—আজ বিপরীত—হ'লি যে অর্ধমরা !
জামদগ্নির অভিশাপ বহি' পলায়ে আসিলি চোর !
জাতি আপনার লুকা'তে নারিলি, লজ্জা নাহি যে তোর !
দ্রোণ-গুরু নয়, সার্থক তোর গুরু সে পরশুরাম—
বিস্ময় মানি দম্ভে তোমার—রেখেছ গুরুর নাম !

* * *

ওরে নির্ঘৃণ ! আপনি আপন বিষ্ঠার পর্বতে
চড়ি' বসিয়াছ—মনে করিয়াছ আঁধারিবে হেন মতে
সবিতার মুখ ! মোর যশো-রবি-রাহু হ'তে সাধ যায় !
আরে, আরে, তোর স্পর্ধায় দেখি জোনাকিও লাজ পায় !

কেমনে আনিলি হেন কথা মুখে ? যজ্ঞের হবিটুকু
সন্তর্পণে রাখিয়াছি ঢেকে, তাও হেরি চাকু-চুকু
করিয়া লেহন, সাধ যায়—সেথা উগারিতে একরাশি
অমেধ্য যে সব উদরে রাজিছে—কতকালকার বাসি,
চুরি করা যত গর্ হজমের !—পথে প্রান্তরে যার
সৌরভ পেয়ে এতদিন পরে ভরিয়াছে সংসার
লালা ও পঙ্কবিলাসীর দল—শবভুক নিশাচর,
শকুনি, গৃধিনী, শৃগালের পাল—রসনা-তৃপ্তিকর
পাইয়াছে ভোজ ! ভাবিয়াছ বুঝি সেই রস উপাদেয় ?
দেব-যজ্ঞের আহুতি সে ঘৃত সোমরস হবে হেয় ?
উন্মাদ—তুই উন্মাদ ! তাই পতনের কালে আজ
বিষ-বিদ্বেষ উথলি' উঠেছে, নাই তোর ভয় লাজ !
আমারে করেছে কুরু-সেনাপতি কৌরব নৃপমণি,
তাই হিংসায় পুরীষ-ভাণ্ডে মাছি ওঠে ভন্ ভনি' !
তাই তাড়াতাড়ি পার্থের নামে কুৎসার ছল ধরে'
তারি নামে লিপি পাঠালি আমারে কুৎসিত গালি ভরে'
আমি ব্রাহ্মণ, দিব্যচক্ষে দুর্গতি হেরি তোর—
অধঃপাতের দেরী নাই আর, ওরে হীন জাতি চোর !
আমার গায়ে যে কুৎসার কালি ছড়াইলি দুই হাতে—
সব মিথ্যার শাস্তি হবে সে এক অভিসম্পাতে,
গুরু ভার্গব দিল যা' তুহারে !—ওরে মিথ্যার রাজা !
আত্মপূজার ভণ্ড পূজারী ! যাত্রার বীর সাজা
ঘুচিবে তোমার, মহাবীর হওয়া মর্কট-সভাতলে !
দু'দিনের এই মুখোস-মহিমা তিতিবে অশ্রুজলে !
অভিশাপরূপী নিয়তি করিবে নিদারুণ পরিহাস
চরমক্ষণে মেদিনী করিবে রথের চক্র গ্রাস !

মিথ্যায় ভুলি' যে মহামন্ত্র গুরু দিয়েছিল কাণে,
বড় প্রয়োজনে পড়িবে না মনে, সে বিফল সন্ধানে
নিজেরি অস্ত্র নিজেরে হানিবে—শেষ হবে অভিনয়,
এতদিন যাহা নেহারি' সকলে মেনেছিল বিস্ময় !

[শনিবারের চিঠি, বিশেষ বিদ্রোহ সংখ্যা (দ্বাদশ সংখ্যা)
৮ই কার্তিক, ১৩৩১]

এরপর ঘনায়মান যুদ্ধ ঘোরতর হ'য়ে উঠল। মোহিত-নজরুল বিরোধ সপ্ত-গ্রাম স্পর্শ করল। 'শনিবারের চিঠি'র মাধ্যমে মোহিতলাল নজরুলের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ হাতে কলম ধরলেন।

৫.

বিরোধ ঃ মধ্যপর্ব

নজরুলের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে 'চিঠি'র যে শিথিলতা এসেছিল মোহিতলালের উপস্থিতিতে কেবল তার বেগই বাড়ল না—সঙ্গে সঙ্গে সে'টি শাণিত ও তীক্ষ্ণধার হয়ে উঠল। 'বিশেষ বিদ্রোহ সংখ্যা' 'শনিবারের চিঠি'র কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি এবং উক্ত সংখ্যায় যে মোহিতলালের 'দ্রোণ-গুরু' কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল সে কথাও আমরা জেনেছি। কবিতাটি 'ক্রোড় পত্রে' ছাপা হয়েছিল এবং কবিতাটির তীক্ষ্ণতা বাড়াবার জন্যে মোহিতবাবু যে ভূমিকাটি যুক্ত করেছিলেন তা' আমরা উদ্ধৃত করেছি। লক্ষ্যণীয় বিষয় ভূমিকায় তিনি সজনীকান্ত দাসকে পাণ্ডব-বীর অর্জুন আখ্যায় ভূষিত করেছেন ঃ

এরপর মোহিতলালের মোক্ষম অভিশাপের কবিতা। 'বিশেষ বিদ্রোহ সংখ্যা'র ভূমিকায় স্বয়ং সম্পাদক যোগানন্দ দাস বেপরোয়া

আক্রমণ চালালেন : "......আজ বাংলা দেশেও তেমনি একটা বিদ্রোহের রোমাঞ্চ, একটা পুলকস্পন্দন জাগছে।......ঝঞ্ঝার ঝনাৎকার, প্রলয় ঝড়ের বিষম ঝড়ৎকার, মহাকুলিশের কড়ক্কাকড়ি আজ বাংলা সাহিত্যগগনকে দিকে দিকে বিদীর্ণ বিশীর্ণ করে ফেল্‌ছে। বিদ্রোহী রক্তাশ্বের উন্মত্ত হ্রেষা যাদের চিত্তে বিপ্লবের চিঁহিরব প্রতিধ্বনিত করছে, বিশ্বের খিলানে তার প্রচণ্ড খুরক্ষেপ যাঁরা মুহূর্তে মুহূর্তে লক্ষ্য করে চলেছে, বাংলা দেশের সেই প্রধান কয়েকটি বিদ্রোহী কবির লেখা এইবার দেওয়া গেল।......যে মুটে দুপুর বেলায় ঝাঁকায় শুয়ে ঘুমোয় তার অন্তরে তখন কি ব্যথা লাগছে—পাহারাওয়ালারা যখন মোড়ে মোড়ে রোদ দিয়ে ফেরে তাদের সেই নীরব গাম্ভীর্যের মধ্যে অত্যাচারের কি বিকট মূর্তি লুক্কায়িত রয়েছে—নবোঢ়া পত্নী বায়োস্কোপ দর্শনাভিলাষিণী হয়ে যখন পতির অনুমতি না পেয়ে ক্ষুণ্ণ হয়ে অশ্রুবর্ষণ করে, তার সেই নিবিড় হৃদয় নিঙড়ানো ব্যথার ধারায় যুগে যুগে সঞ্চিত অবরুদ্ধ পীড়িত অত্যাচারিত নারীর বিদ্রোহী অন্তরের কি করুণ অথচ কি রূঢ় ইতিহাস জলের মত স্বচ্ছ হয়ে ওঠে—সেই সব গণপ্রাণের কথা জানতে গেলে এই কবিদের লেখা-পড়া একান্ত প্রয়োজন।"

'বিশেষ বিদ্রোহ সংখ্যা'য় শনিগোষ্ঠীর একজন বিশেষ কবি নামহীন ছড়ায় টিপ্পনী কাটলেন :

"ভেপসে উঠে খেপ্‌লি কেন কী হল তোর খাপ্পা খোকা?
খাবড়া মেরে হাবড়া গেল খাবড়ে গিয়ে বাপ খামোখা।"

অশোক চট্টোপাধ্যায়ের আক্রমণে শালীনতাবোধের অভাব প্রকট হয়ে উঠল। 'হর্ষক' ছদ্মনামের আড়ালে 'নব শিহরণ' কবিতায় তিনি লিখলেন :

শিহরণ জেগেছে রে কি হরণ করিব?
স্ত্রীহরণ বিহরণ বুঝে রণ মরিব।

নজরুলের "বিদ্রোহী" কবিতা নিখিল বাংলায় তুমুল আলোড়ন

এনেছিল। অন্য কোনো কবির কোনো কবিতা এ ধরনের আলোড়ন আলোচনার সম্মুখীন হয়নি। "বিদ্রোহী"র একমাত্র উপমা কবিগুরুর "সোনারতরী" কবিতা। তবে "সোনারতরী" নিয়ে যে আলোচনা হয়েছিল তা অনেকখানি যুক্তি নির্ভর কিন্তু "বিদ্রোহী" নিয়ে যে আলোচনা হয়েছে তা' হৈ চৈ-এর সামিল। "বিদ্রোহী" কে নিয়ে যে বিরুদ্ধ আলোচনা হয়েছে তা ধোপে টেকেনি। 'শনিবারের চিঠি'তে 'বিদ্রোহী'র জের চলেছিল দীর্ঘ দিন। বলাবাহুল্য এ আলোচনার অধিকাংশই অসংযত এবং অবৈজ্ঞানিক। কেবল ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়ে তার একটা স্বতন্ত্র মূল্য আছে। ১৩৩৪ সালের কার্তিক সংখ্যা মোতাবেক ১ম বর্ষের (নব পর্যায়) ৩য় সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'তে শ্রীবলাহক নন্দী বেনামীতে নীরদচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় "প্রসঙ্গ কথায়" লেখেন ঃ······"বাংলা দেশের বালক-বালিকারা যাঁহাকে 'ঝঞ্চার জিঞ্জীর', 'ঝড়-কপোতী' অথবা এ রকমই একটা দুর্বোধ্য নামে বিদ্রোহের অবতার বলিয়া জ্ঞান করে, তাঁহাকে এবং তাঁহার যে কবিতাটিকে বিদ্রোহী বাণী পাঞ্চজন্য শঙ্খ বলিয়া ধরিয়া লয় তাহাকেই দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরি না কেন?······আমি এটা, আমি সেটা, আমি জীবনের যত জীর্ণ, পরিত্যক্ত, জোড়াতালি দেওয়া জিনিস তাহারই ভগ্নাবশেষ। আমি ফাটা টর্পেডোর টুকরা, আমি সাইক্লোন, আমি কৃষ্ণের বাঁশী, আমি অর্ফিয়ূসের বীণা, আমি চেঙ্গিস, আমি বেদুইন, আমি ভীম, ভাসমান মাইন, আমি বিধবার দীর্ঘশ্বাস আমি বন্ধন হারা কুমারীর বেণী—ভগবান, ভগবান, বিদ্রোহীর মন কেমন জানি না, কিন্তু এমন স্বেচ্ছাচারী বাদশাহ, এমন ভীরু কেরাণীই বা কে আছে যে ষোড়শী তরুণীর গালের গুলবাগে, শুভ্র গ্রীবার উপর, সুকোমল বক্ষস্থলে দিনরাত লুটোপুটি খাইবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারে? এ-তো বিদ্রোহ নয়, এ-যে আত্মসমর্পণ।"······

সজনীকান্ত দাস মহাশয় 'ব্যাঙ্' প্যারডিতে বাজী মাত করেছিলেন কিন্তু কেবল ব্যাঙ্-এর মাধ্যমে ব্যঙ্গ করেই তিনি 'বিদ্রোহী' ভাব ভুলে যেতে পারেননি। কবিতাটি সত্যসত্যই তাঁর মনে প্রথম হতেই গভীর রেখাপাত করেছিল। কেন করেছিল তা' তিনি নিজেই জানেন না। "মোসলেম ভারতে" কবিতাটি পাঠ করে তাঁর মনে হয়েছিল কবিতাটির ছন্দ ও ভাবের মধ্যে কোথায় যেন একটা বড় রকমের দ্বন্দ্ব আছে। তাঁর 'আত্মস্মৃতির ১ম খণ্ডে তিনি এ সম্পর্কে লিখেছেন যে, বিদ্রোহী কবিতার এই দ্বন্দ্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা নিয়ে ছন্দ যাদুকর কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নিকট গিয়েছিলেন এবং জিজ্ঞাসা করেছিলেনঃ......"ছন্দের দোলা মনকে নাড়া দেয় বটে, কিন্তু 'আমি'র এলোমেলো প্রশংসা তালিকার মধ্যে ভাবের কোনও সামঞ্জস্য না পাইয়া মন পীড়িত হয়; এ বিষয়ে আপনার মত কি?"......এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ইতিপূর্বেই নজরুলের কবিতায় বিশেষরূপে অকৃষ্ট হয়েছিলেন। ১৩২৮ সালের ২য় বর্ষের ভাদ্র সংখ্যা 'মোসলেম ভারতে' দত্ত কবির 'খাঁচার পাখী' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। এই কবিতা পাঠে বিনীত মনের শ্রদ্ধা জানিয়ে নজরুল লেখেন তাঁর 'দিল দরদী' কবিতা। এই সত্যেন্দ্র-বন্দনা কবিতাটি প্রকাশিত হয় আশ্বিন সংখ্যায়। দেড় শ' লাইনের দীর্ঘ কবিতার শেষ চার লাইন এই ঃ

বাদ্‌শা-কবি, সালাম জানায় ভক্ত তোমার অ-কবি,
কইতে গিয়ে অশ্রুতে মোর কথা ডুবে যায় সবি।

এই কবিতাটি পাঠ করে সত্যেন দত্ত নিজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে নজরুলের সঙ্গে দেখা করার জন্যে তাঁর বাসায় এসেছিলেন। সুতরাং সত্যেন্দ্র-নজরুলের হৃদয়-মিলন ছিল খাঁটি ও গভীর। সে যাই হোক সজনীবাবুর এই অভিযোগ শুনে দত্ত কবি একটু হেসে বলেছিলেন ঃ

...."কবিতার ছন্দের দোলা যদি পাঠকের মনকে নাড়া দিয়া কোনও একটা ভাবের ইঙ্গিত দেয় তাহা হইলেই কবিতা সার্থক। 'বিদ্রোহী' কবিতা কোনও ভাবের ইঙ্গিত দেয় কিনা, তুমিই তাহা বলিতে পারিবে।" (আত্মস্মৃতি ১ম খণ্ড, পৃঃ ১১৩)। দত্ত কবির কথাটি সজনীবাবুর মনে দোলা দিয়ে গিয়েছিল। কাশীতে অবস্থান কালীন (এম. এস. সি. পড়ার সময়) তিনি একটি কবিতা রচনা করেন। কবিতাটির নাম "যৌবন"। "যৌবন"-এ তিনি ছন্দের দোলায় একটি ভাব আনার চেষ্টা করেছেন—বলাবাহুল্য সে ভাবটিও 'বিদ্রোহী'র বিদ্রোহী। কয়েকটি পংক্তি ঃ

আমি আলেয়ার আলো
আপন খেয়ালে চলি,
ঝঞ্ঝা মানি না, মানি না বাত্যা-ভয়,
আমি উল্কার মত
আপন বেগেতে জ্বলি ;
পথহারা, নাহি কারে সাথে পরিচয়।

আমি পর্বত হতে দুর্জয় বেগে নামি,
বাধাবন্ধন দু'ধারে ঠেলিয়া যাই,
কভু নহিকো কাতর
হতেও নিম্নগামী
নিম্নে যদি বা সাগরের খোঁজ পাই।

আমি বৈশাখী ঝড়,
বিপুল রুদ্র তেজে
আঁধারি জগৎ উড়াই ধূলার রাশি,
ঘন শ্রাবণের মেঘ—
ভীষণ সাজেতে সেজে
ডুবাতে ধরণী বড় আমি ভালবাসি।

আমি, বিদ্যুৎ-শিখা
জ্বলি তির্যক বেগে
অট্টহাস্তে আকাশের বুক চিরি।
আমি মহামারী
জনপদ মাঝে জেগে
মৃত্যুরে মোর সাথে সাথে লয়ে ফিরি।......
আমি যৌবন, আমি
নিত্য নূতন রূপে
আপনার বেগে আপনি ছুটিয়া চলি,
আমি হুঙ্কারি চলি
চলি নাকো চুপে চুপে
বিঘ্ন বিপদ পদতলে আমি দলি।
উল্কা আলেয়া এরাই তুলনা মোর
প্রকৃতি আমার তবু না প্রকাশ হয়,
আমি যৌবন
আমি উন্মাদ ঘোর
ছুটিব, মরিব, লভিব নিত্য জয়।

সতর্ক পাঠকের চোখের এ-ব্যঙ্গের অক্ষমতা সহজেই ধরা পড়বে।

'বিদ্রোহী'র প্যারডি করে 'আমি বীর' নামে আর একটি কবিতা লিখিত হয়েছিল। এটি যৌথ কবিতা—লিখেছিলেন তিনজনে : যোগানন্দ দাস, অশোক চট্টোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাস। 'শ্রীঅবলা-নলিনীকান্ত হাঁ' ছদ্মনামে কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল। এ সম্পর্কে শ্রীযোগানন্দ দাস মহাশয় লিখেছেন :

"তখন আমরা মেকী বিদ্রোহের বিরুদ্ধে চাবুক ধরেছি। ঠিক হ'ল 'আমি বীর' বলে একটা বিদ্রুপাত্মক কবিতা লিখতে হ'বে। অশোক কোথা থেকে এক গাউন ও হুড পরা স্নাতকের ছবি জোগাড় করলেন। তাকে কিছু অদল-বদল ক'রে একটি অপরূপ বীর

পুঙ্গবের ছবি খাড়া হ'ল—রোগা হাড্ডিসার কোটরে ঢোকা দুই গাল, পড়ে পড়ে দু'চোখে পুরু কাচের চশমা,—হাঁ করে ধুকছে। ছবি দেখেই আমাদের প্রেরণা এসে গেল। আমি শুরু করে দিলাম (একাদশ সংখ্যা, পৃ-২৭৪):

আমি বীর!
আমি দুর্জয় দুর্ধর্ষ রুদ্র দীপ্ত উচ্চ শির
আমি বীর!
দু'চোখে আমার দাবানল জলে জল্ জল্ জল্
স্তব্ধ বিশ্ব ইঙ্গিতে ভ্রূকুটীর
আমি বীর! আমি বীর!!"...

বারো তেরো লাইন লিখিতে না লিখিতে আমার হাত থেকে ছোঁ মেরে নিয়ে অশোক শুরু করে দিলেন:

"ভাবী শ্বশুরের হিসাব খতিয়া
তরুণ বাঙ্গালী-সাগর মথিয়া
উঠেছি যে আমি নিছক শুদ্ধ ক্ষীর।
আমি বীর! আমি বীর!!"......

সজনী ততক্ষণে তৈরী। অশোকের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে:

"আমি ভাঙ্গি বেঞ্চি ও চেয়ার
আমি করি না কারেও কেয়ার
হৃদি নিয়ে আমি ছিনিমিনি খেলি
লাখ লাখ তরুণীর!
আমি বীর!"......

ব্যাস! আর যায় কোথা? অশোক এক প্যাঁচে সজনীর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে একেবারে ঝড়ের বেগে বাকী ১৪ লাইন কবিতা শেষ:

আমি বীর!
দু'চোখে আমার প্রলয় জলিছে
স্তব্ধ বিশ্ব ইঙ্গিতে ভ্রূকুটীর!
আমি বীর!!"

নবপর্যায় 'শনিবারের চিঠির' প্রথম সংখ্যাতেই (১৩৩৪ সাল, ভাদ্র) নজরুল ইসলামের ওপর একটা তীক্ষ্ণ খোঁচা ছিল। খোঁচা দিয়েছিলেন স্বয়ং সম্পাদক মহাশয় যোগানন্দ দাস। কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করি :
..."বাংলা দেশের শতকরা ৯৯ জনের কাছে অপঠিত থাকিয়াই যদি রবীন্দ্রনাথের যুগ চলিয়া যায়......রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের জীবিতাবস্থাতেই যদি......নজরুল ইসলাম সাহিত্য যুগাবতার বলিয়া ঘোষিত হন তাহা হইলে সমাপ্তি হউক এই সাহিত্যের। এই বটতলার দেশে সাহিত্য চলিবে না ইহা নিশ্চয় জানিয়া আমরা নিশ্চিন্ত থাকিব।"

শনিমণ্ডলীর অন্যান্য শনিদের কথা স্বতন্ত্র। এঁরা নিতান্ত 'খেলায়' মেতেছিলেন। যাঁরা রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতার ব্যঙ্গ করে নিম্নরূপ 'বর্বর' (সজনীকান্তের স্বীকৃতি) কবিতা লিখতে পারেন—তাঁদের পক্ষে সব কিছুই সম্ভব :

"ঘুমে মগন সোনারপুরী কে রয় জাগি দুয়ারে
মুক্তো পথে গড়িয়ে যায় শুঁকিয়া যায় গুয়ারে ;
বন্ধু, তোমার মিথ্যা আশা,
কাগে মাথায় বাঁধল বাসা,
কোকিল তবু ডিম পাড়ে না,
ইংরাজে মার বুয়ারে,
লাগল কোথায় লাঠালাঠি
জাগল হুক্কাহুয়ারে।..."

কিন্তু আমি ভাবছি মোহিতবাবুর কথা। "বিদ্রোহী" কবিতা পড়ে যে তিনি বিশেষরূপে ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন সে পরিচয় আমরা পূর্বেই পেয়েছি। কিন্তু তিনি যে সমালোচকের আসনে বসে সংযম হারিয়ে

ফেলবেন একথা ভাবতেও কষ্ট হয়। নজরুলের বিদ্রোহাত্মক মনোভাব নিয়ে তিনিও দীর্ঘ আলোচনা করলেন। শ্রীসত্যসুন্দর দাস বেনামীতে তিনি লিখলেন ঃ "আমাদের দেশে খুব বর্তমানকালে এমন একটি প্রবৃত্তি দেখা দিতেছে, যাহাতে সাহিত্যের এই নীতি বা আদর্শ একেবারে উড়িয়া যাইতেছে। মানবাত্মার পক্ষে গ্লানিকর এক শ্রেণীর ভাব ও ভাবুকতা বিদ্রোহের 'রক্ত-নিশান' উড়াইয়া ভয়ানক আস্ফালন করিতেছে। এ বিদ্রোহের মধ্যে প্রাণশক্তির প্রাবল্য নাই, মনুষ্যত্বের অভ্রভেদী অভ্যুত্থান কামনা নাই। কাব্যে কোনও সমস্যার বা মনস্তত্ত্বের দোহাই নাই, কাজেই নিছক বিদ্রোহ ভালই জমিয়াছে। আধুনিক 'তরুণ' সাহিত্যিকের বালক-প্রতিভা কাব্য-কাননে 'কাম-কণ্টক ব্রণ মহুয়া কুঁড়ি'র চাষ আরম্ভ করিয়াছে। মুস্কিল হইতেছে এই যে, 'দুষ্ট খোকাও' বিদ্রোহ করিতে পারে বটে, কিন্তু সে বিদ্রোহে যে নৃত্য আছে তাহা নটেশের নৃত্য নয়, দুঃশাসন শিশুর দৌরাত্ম্যের উল্লাস হিসেবেই তাহা উপভোগ্য।"

আবেগবহুল "বিদ্রোহী" কবিতার মূল সুরটি এড়িয়ে গিয়ে সমালোচক এখানে যে আলোচনা করেছেন তা মোটামুটি যুক্তি-নির্ভর কিন্তু সত্য নয়। তবুও এ আলোচনাকে অসংযমীর আখ্যায় ফেলা যায় না। কিন্তু নজরুলের 'অনামিকা' কবিতাটি নিয়ে তিনি যে আলোচনা করেছেন তা' নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। আলোচনাটি পড়ে মনে হয়েছে হয় মোহিতবাবু কবিতাটির সূক্ষ্ম অর্থ বোঝেননি অথবা সব বুঝেও ইচ্ছাকৃতভাবে 'নদীর জল ঘোলা কেন'র সূত্র ধরে গায়ের ঝাল ঝেড়েছেন। 'অনামিকা' হলেন কবির প্রেয়সী। কবি-প্রেয়সী কোনো সীমিত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নন, তাঁর কোন নাম নেই, তিনি নামহীনা। কবি ইচ্ছাকৃতভাবেই তাঁর প্রেমিকাকে নামহীনা করেছেন। কেননা আমাদের চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে একটা বিরোধ সব-সময় থেকে যায়। যাকে আমাদের প্রেমের কেন্দ্রবস্তু করেছি, কল্পনায় যে পাওয়ার স্বরূপ মনে মনে গড়েছি—বাস্তবক্ষেত্রে সেই প্রেমিকাকে

একান্ত আপন করে পেয়েও দেখা যাবে পরিপূর্ণ পাওয়াটা তার কাছ থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। কল্পনায় 'পাওয়া'র সাথে বাস্তবের 'পাওয়া'র ব্যবধান অনেক। কবির এই 'অনামিকা' প্রেয়সী কল্পনার, বাস্তবের নয়। কবিগুরু প্রাচীন সাহিত্যের "মেঘদূত" নামক প্রবন্ধে এই ভাবটি অত্যন্ত সুন্দররূপে ব্যক্ত করেছেন। যা হোক মোহিতবাবু 'অনামিকা' কবিতাটির সমালোচনা করলেন এইভাবে: "এই লেখকই (নজরুল) বর্তমানে যুগ কবি বা Representative Poet—ইনিই তরুণের মুখপাত্র। কবিতাটির নাম 'অনামিকা'। কবির প্রেয়সীই অনামিকা অর্থাৎ নামহীনা; তাহার কারণ তাঁহার কামতৃষ্ণা কোন নাম-নির্দিষ্টা নায়িকাতে আবদ্ধ নহে। বিশ্বের যাহা কিছু মৈথুন জোগ্য তাহাকেই পাত্র ধরিয়া তিনি তাঁহার কাম পরিবেশন করিতেছেন। আবার নারীমাত্রেই তাঁহার সেই অনামিকা প্রেয়সী কেননা তাহাদের কোন ব্যক্তিগত পরিচয়ের ধার তিনি ধারেন না, তাহারা সেই এক অভিন্ন রতিরসের পাত্র বই ত নয়? অতএব তিনি কামের পাত্র বিচার করেন না—এ বিষয়ে তিনি এক রকম Pan-মৈথুন-ist।"

ক্রোধে মানুষ কেমন জ্ঞানান্ধ হ'য়ে যেতে পারে—এ সমালোচনা তারই নিদর্শন। নজরুল সম্পর্কে মোহিতবাবুর আলোচনাগুলি ক্রমেই সংযমহীন হয়ে উঠছিল—তিনি যেন নিজের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হারিয়ে 'শনিবারের চিঠি'র সুরে কথা কইছেন। এবার আর কোন নির্দিষ্ট কবিতা নয়—সমগ্র নজরুল সাহিত্য তাঁর কোপ দৃষ্টিতে পড়ল। ১৩৩১ সালের ১৫ই কার্তিকের 'শনিবারের চিঠি'তে তিনি "চামার খায় আম" বেনামীতে সমগ্র নজরুল সাহিত্যকে 'চানাচুর' আর "কাঁকড়ার ঠ্যাং'-এর সাথে তুলনা করেন:

চাহি না আঙুর—শুধু চানাচুর
কাঁকড়ার ঠ্যাং খান-দুই,—

খসখসে ফুল নিয়ে আয় সখি,
চাই না গোলাপ বেল, যুঁই।
লোকে বলে গানে আঁশটে গন্ধ
বোঝে না আমার এমন ছন্দ।—
আর কিছুদিনে ইহারি ক্ষুধায়
নাড়ী যে করিবে চুঁই চুঁই।
চাবে না আঙুর চাবে চানাচুর
চিংড়ির চপ খান-দুই।"

এরপর কয়েক সংখ্যা ধরে "রুবাইয়াৎ-ই-চামার-খায়-আম" ছদ্মনামে মোহিতবাবু নজরুল সমালোচনা করেন।

৮.

বিরোধ : অন্ত্য পর্ব

কাজী নজরুল ইসলাম নামটির সরাসরি ব্যঙ্গ নাম "গাজী আব্বাস্ বিট্‌কেল"-এর জন্ম সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'র প্রথম সংখ্যাতেই। সম্পাদক যোগানন্দ দাস মহাশয় এই নামটির জন্মদাতা হিসেবে অশোক চট্টোপাধ্যায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। নামটি সজনীবাবুর অত্যন্ত ভাল লেগেছিল। এই নামটিকে কেন্দ্র করেই 'শনিবারের চিঠি'র সাথে তিনি যুক্ত হ'য়ে গেলেন। ১৩৩১ সালের ২৮শে ভাদ্র (১ম বর্ষের ৮ম সংখ্যা) সংখ্যা সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হ'ল সজনীবাবুর কবিতা—"আবাহন"। গাজী আব্বাস বিটকেলকে উদ্দেশ্য করে তিনি এ কবিতাটি লিখলেন কিন্তু লক্ষ্য অন্য, নজরুল-ব্যঙ্গ। বিয়াল্লিশ লাইনের এই বলিষ্ঠ সরস কবিতাটিই হ'ল সজনীবাবুর প্রথম মুদ্রিত কবিতা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে নজরুলকে কেন্দ্র করেই সজনীবাবুর সাহিত্যিক প্রতিভার প্রথম স্ফুরণ ঘটেছে। আত্মস্মৃতির

১ম খণ্ডে ১৫৫ পৃঃ তিনি এই কবিতাটি সম্পর্কে বলেছেন : "আমার জীবনে কবিতাটির ঐতিহাসিক মর্যাদা আছে।" এই ঐতিহাসিক কবিতাটির সঙ্গে লেখক সম্পাদককে একটি চিঠি দিয়েছিলেন। চিঠি সমাপ্তির পর শুরু হ'য়েছে কবিতা। আমরা প্রথম হ'তেই উদ্ধৃতি দিলাম :

"শনিবারের চিঠির সম্পাদক মহাশয়,

জাতীয় মহাকবি বন্ধুবর গাজী আব্বাস বিটকেলের বর্তমান ঠিকানা না জানাতে আপনার কেয়ারে আমার চিঠিখানা পাঠাইলাম; আশা করি আপনি কবিবরকে এই চিঠিখানা দিবেন। অগ্রেই ধন্যবাদ দিলাম।"

ইতি— ভবকুমার প্রধান

"পুনঃ—জাতীয় কবিকে লেখা চিঠিখানি তো জাতীয় সম্পত্তি, সুতরাং আপনার শনিবারের চিঠিতে ইচ্ছা করিলে কবিতাটি ছাপাইয়া ধন্য হইতে পারেন।"

"বন্ধুবর গাজী আব্বাস বিটকেল সমীপেষু,

ওরে ভাই গাজীরে—
কোথা তুই আজিরে
কোথা তোর রসময়ী জ্বালাময়ী কবিতা!
কোথা গিয়ে নিরিবিলি
ঝোপে-ঝাড়ে ডুব দিলি
তুই যে রে কাব্যের গগনের সবিতা!…
দাবানল-বীণা আর
জহরের বাঁশীতে
শান্ত এ দেশে ঝড় একলাই তুল্‌লি,
পুষ্পক দোলা দিয়া
মজালি যে কত হিয়া
ব্যথার দানেতে কত হৃদি-দ্বার খুল্‌লি।

এই কবিতায় নজরুলের বিখ্যাত গ্রন্থগুলির নামও আক্রমনের হাত...হ'তে রক্ষা পায়নি। এখানে 'দাবানল বীণা' হ'ল কবির

বিখ্যাত 'অগ্নি-বীণা', 'জহরের বাঁশী' হ'ল 'বিষের বাঁশী,' আর 'ব্যথার দান' স্ব-নামেই আক্রান্ত হয়েছে।

যোগানন্দ দাস মহাশয় কবিতাটির সমাপ্তিতে অন্য ছন্দ লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু অন্য ছন্দ যে কি তা' ঠিক বোঝা গেল না আমাদের মনে হয় কবিতাটি আগাগোড়া একই ছন্দে লেখা। শেষটি এই ঃ

"আয় ভাই আয় গাজি
(দুই পাটি দাঁত মাজি)
রেখেছি ছিলিম সাজি
আয় তুই আয় ভাই স্বরাজের শেলিয়ে।"

নজরুল ব্যঙ্গ লক্ষ্য হলেও কবিতাটিতে বিদ্রুপের ধার অতি অল্পই আছে। ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ শরে নজরুলকে ধরাশায়ী করার শ্রেষ্ঠতম আয়োজন বুঝি ১৩৩৪ সালের ফাল্গুন সংখ্যা মোতাবেক ১ম বর্ষ (নব পর্যায়), ৭ম সংখ্যা। সমগ্র সংখ্যাটিই নজরুল-বিদ্রুপে ভরপুর। 'শ্রীতরুণচাঁদ উধাও' বেনামীতে "বাঙলার তরুণ" কবিতায় নজরুলের "সাম্যবাদী"র মূলসুর নিদারুণভাবে আক্রান্ত ঃ

ভাসনু কমল-লাগি ঠেলে অ-থই পগার জলে,
বিদ্রোহ আর কাম-ডোঙাতে দুইটি চরণ রাখি'—
তীরের গাঁয়ে সমাজ-বিধি মিট্‌মিটিয়ে জ্বলে
নেই আবরণ—একটুখানি আর্ট বলে থাক্ বাকি।...

এ ধরণের অশালীন আক্রমণ ও গালিগালাজ লক্ষ্য করে বিদ্রোহী কবি সমকালীন "আত্মশক্তি"তে "বড়র পীরিতি বালির বাঁধ" প্রবন্ধে লিখেছিলেন "কি শনিবারের চিঠি" এবং তাতে কী গাড়োয়ানী রসিকতা আর মেছোহাটা থেকে টুকে আনা গালি! এই গালির গালিচাতে বোধ হয় আমিই একালের সর্বশ্রেষ্ঠ শাহান শাহ্!

বাংলায় 'রেকর্ড' হ'য়ে রইল আমার দেওয়া এই গালির স্তূপ! কোথায় লাগে ধাপার মাঠ! কি হপ্তায় মেল (ধাপা মেল) বোঝাই!"...

এই গালিগালাজের চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছে ফাল্গুন সংখ্যার "জলসা" প্রবন্ধে। "শ্রীবটুকলাল ভট্ট" ছদ্মনামে স্বয়ং সজনীকান্ত দাস মহাশয় "জলসা" প্রবন্ধটি লেখেন। প্রবন্ধটি দীর্ঘ এবং ব্যঙ্গের রীতি নতুন। ব্যঙ্গ-প্রকাশের রীতি-নীতি সম্পর্কে 'শনিবারের চিঠি' গবেষক—বহু প্রকার রীতির আবিষ্কার কর্তা। পটুয়াটোলা ষ্ট্রীট হতে প্রকাশিত মাসিক "কল্লোলে" যে নতুন সাহিত্যাঙ্গিকের প্রকাশ ঘটেছিল তার সম্পর্কে ব্যঙ্গ করার প্রয়োজন অনুভব করলেন শনিমণ্ডলী। একটি বিজ্ঞাপনের আকারে ১৩৩৪ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় সে ব্যঙ্গ প্রকাশিত হ'ল ঃ

"বিখ্যাত বাংলা মাসিকের জন্য

সম্পাদক

সহকারী-

সম্পাদক

সমালোচক

গল্প লেখক

ঔপন্যাসিক

চাই—

বাংলা ভাষা জানা নিষ্প্রয়োজন

...নং "পটুয়াটোলা স্ট্রীটে আবেদন করুন।"

এ ব্যঙ্গ ইংগিত-ধর্মী কিন্তু হৃদয়-বিদারী।

"জলসা"র ব্যঙ্গ একটি অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। একটি নৃত্য-গীতির জলসা অনুষ্ঠিত হ'চ্ছে—সে জলসার বিজ্ঞাপনে নজরুল-আদর্শ বিকৃত, গ্রন্থনায় নজরুল-বক্তৃতা পীড়িত, গানের প্যারডিতে নজরুল-কবিতা আক্রান্ত। ব্যঙ্গ প্রকাশের আশ্চর্য নতুন আঙ্গিক।

ব্যঙ্গটি প্রকাশিত হয় ১৩৩৪ সালে। এ সময়ে কাজী কবি সংগীতের সমুদ্রে নিমগ্ন। তাঁর গজল গান সে সময় বাংলার

মাটি-মনকে পাগল করে তুলেছিল। হাটে-বাটে-মাঠে সর্বত্র সকল শ্রেণীর মানুষের মুখে তখন নজরুল-সংগীতের প্রতিধ্বনি—বিশেষ করে গজল গানের। ব্যঙ্গের মাধ্যমে নজরুল-গীতির এই জনপ্রিয়তাকে পঙ্গু করার অপচেষ্টায় কোমর বাঁধলেন শনিমণ্ডলী। ফলে "জলসা"র আবির্ভাব। নজরুল-সঙ্গীতের অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা সম্পর্কে স্বয়ং সজনীবাবু তাঁর "আত্ম-স্মৃতি"র দ্বিতীয় খণ্ডে (পৃঃ ১৯) লিখেছেন: "আজকাল বোম্বাই-সিনেমা-গানের বিকৃত অনুকৃতিতে আমাদিগকে যেমন পথে-ঘাটে বনে-বাদাড়ে লাউড স্পীকারের জ্বালায় শয়নে-স্বপনে উদ্বেলিত হইতে হয়, সেই সময়ে নজরুলী-গজলের স্থান-কাল-পাত্র নিরপেক্ষ আক্রমণও ছিল সেইরূপ মারাত্মক। বাড়িতে বাড়িতে স্নান ঘরে অবিরাম জলকল পতনের সঙ্গে তাল রাখিয়া ছেলে-মেয়েদের করুণ "কে বিদেশী" গান অভিভাবকদের অতিশয় উত্যক্ত করিত। দিলীপকুমার পরিচালিত কয়েকটি আসরে স্বয়ং নজরুল স্বদেশী গানে ইস্তফা দিয়া এই গজল-গান একটু বেশী প্রচার করিতেছিলেন; গ্রামোফোন কোম্পানীগুলিতেও তখন তিনি প্রধান সঙ্গীত রচয়িতা ও সুরকার। লাউড স্পীকারের রেওয়াজ না থাকিলেও ঘরে ঘরে এবং পান-বিড়ির দোকানে গ্রামোফোনে গজল-গান অবিরাম চলিতে থাকিত। স্রেফ ব্যঙ্গ করিয়া এই মন্দাকিনী-স্রোত রোধ করিব প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলাম।"...এবং সেই প্রতিজ্ঞার ফল "জলসা"।

কিন্তু "জলসা" সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে "কচি ও কাঁচা" সম্পর্কে কিছু বলা আবশ্যক। "কচি ও কাঁচা" পঞ্চমাঙ্ক নাটক। লেখক—শ্রীকেবলরাম গাজনদার। এ নাটক ১৩৩৪ সালের ভাদ্র সংখ্যায় আরম্ভ হয়ে চার-পাঁচ মাস পর্যন্ত চলেছিল। এ নাটকের উদ্দেশ্য-ব্যক্তিরা হ'লেন সকল তরুণ প্রগতিশীল লেখক—বিশেষ করে "কল্লোলে"র লেখকগোষ্ঠী। এ আলোচনার সর্বত্র শালীনতা-বোধের বড় অভাব—এমনকি মাঝে মাঝে এমন অশালীন উক্তি

প্রকাশিত হয়েছে যেটি চোখ মেলে পড়তেও সঙ্কোচ বোধ হয়।
"কচি ও কাঁচায়' বহু কবি সাহিত্যিকের ভীড়—শ্রীকেবলরাম গাজনদার নজরুলের নামকরণ করেছেন "বায়রণ"। এ নাটকে বায়রণ নিজেই তাঁর বিখ্যাত গজল গানের (বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিস্‌নে আজি দোল) প্যারডি গাইছেন :

জানালায় টিকটিকি তুই টিকটিকিয়ে করিস নে আর দিক।
ও বাড়ির কলমিলতা কিসের ব্যথায় ফাঁক করেছে চিক॥
বহুদিন তাহার লাগি রাত্রি জাগি গাইনু কত গান।
আজিকে কারে জানি নয়না হাসি হাসল সে ফিক্ ফিক্॥......

"জলসা"-র প্রধান ও প্রথম লক্ষ্য নজরুল, দ্বিতীয় লক্ষ গায়ক দিলীপকুমার রায়, তৃতীয় লক্ষ্য একজন মহিলা—সমকালীন নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী রেবা রায়। শ্রদ্ধেয় দিলীপকুমার রায় শনি-মণ্ডলীর কোপ দৃষ্টিতে পড়েছিলেন—অপরাধ তিনি নজরুল-গীতি গাইয়ে। নজরুল-সঙ্গীতকে যাঁরা জনপ্রিয় করেছেন তাঁদের মধ্যে নিঃসন্দেহে দিলীপবাবু অন্যতম—বিশেষ করে কাজী কবির গজল গানগুলি তাঁর কণ্ঠদানে অনন্য হয়ে উঠেছিল। শ্রীমতী রেবা রায় কয়েকটি অনুষ্ঠানে নজরুল-গীতির সাথে নৃত্য পরিবেশন করায় "জলসায়" আক্রান্ত হয়েছেন। তখনো উদয়শঙ্কর বা অমলা নন্দী (পরে অমলা শঙ্কর) নৃত্যের আসরে স্ব-নামে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেননি। শ্রেষ্ঠ নৃত্য-পটীয়সী বল্‌তে শ্রীমতী রায়কে বুঝাত।

"জলসা" প্রবন্ধের সূত্রপাতেই দেখা যায় লেখক শ্রীবটুকলাল ভট্ট মহাশয় ট্রামের ভ্রমণকারী। পথে যেতে যেতে তিনি একটি বিজ্ঞাপনের কাগজ পান এবং সেটি পড়তে শুরু করেন। বিজ্ঞপ্তিটির সূচনা এইরূপ :

"এক ঢিলে দুই পাখী"

স্ফূর্তির নায়গারা প্রপাত—দেশ-প্রেমের হলদিঘাট্ সঙ্গীত-জলসা।

চিরবাঞ্ছিত ও বহুবঞ্চিত তরুণ সাহিত্যিকদের পোষাক-দারিদ্র্য দূর করবার জন্য শ্রীযুক্ত রৈবতক সাহার বিপুল আয়োজন।"...

এরপর বিজ্ঞাপনে নজরুলের একটি উদ্ধৃতি। সে উদ্ধৃতিতে তিনি তাঁর পোষাক-দারিদ্র্যের কথা জনসমক্ষে উত্থাপিত করেছেন। সভার আয়োজন সম্পর্কে স্বয়ং বটুকলাল মহাশয়ের জবানীতেই শুনুন:

..."আয়োজনের ত্রুটি নাই, শ্রীমতী বাড়বা বাঁড়ুয্যে, শুক্লা সেন, মাজুর্কা মজুমদার, ত্রয়োদশী ত্রিবেদী, চিক্কণা চাকী...পাংশুলা পাণ্ডে... মিস টুনটুনি...প্রভৃতির নিঃসঙ্গ অথবা সসঙ্গ গান। শ্রীযুক্ত বুদবুদ বটব্যাল, বিকৃত বদন তরফদার, অরিষ্ট সান্যাল, চৌতাল চক্রবর্তী, মাষ্টার বাঁটুল, লালু প্রভৃতির আলাপ এবং—গাজি আব্বাস বিটুকেলের "ভাণ্ডারী হুঁসিয়ার" ও সুবিখ্যাত বিম্ববতী রাহার 'হা ঘরে নৃত্য' ইত্যাদি।"...

বিজ্ঞাপনের শেষাংশে বিলম্বে হতাশ হবার সম্ভাবনাটিও যুক্ত হয়েছে। টিকিটের হার ১০৲, ৫৲, ৩৲, ২৲ এবং ১৲ টাকা। কেবলমাত্র ১০৲ ও ৫৲ টাকার টিকিটের কয়েকটি আসন ছাড়া আর সব আসন পূর্ণ।

বিজ্ঞাপন পড়ে লেখক বটুকলাল মহাশয় "জলসা"য় যাওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারলেন না। তিনি চুপিসারে আসরের দ্বারপ্রান্তে এসে হাজির হলেন। চোখে পড়ল সাইন-বোর্ডে নজরুলের কবিতা—তা'তে স্পষ্ট লেখা আছে এ জলসায় 'বুঢ়্ঢা পীর'দের কোন স্থান নেই, এখানে প্রবেশাধিকার একমাত্র তরুণ-তরুণীদের:

"যুবা-যুবতীর সে দেশে ভিড়
সেথা যেতে নারে বুঢ়্ঢা পীর।"

(নজরুলের 'আয় বেহেস্তে কে যাবি আয়' কবিতার অংশ)

সুতরাং এ জলসায় বুড়োদের প্রবেশ নিষেধ। এক তরুণের চশমায়

নিজের প্রতিকৃতি দেখে বটুকলাল মহাশয়ের মনে হল যে তরুণ বলে তিনি চলে যেতে পারেন। ফলে তিনি ভেতরে প্রবেশ করে সভা-মঞ্চের দিকে তাকিয়ে দেখলেন……"আব্বাস মিয়া (নজরুল) ও বিকৃতবদনবাবু (দিলীপ) পরস্পর মাথা নাড়িয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। আব্বাস মিঞার মস্তক আন্দোলন ও অর্ধ-ব্যক্ত হাসি দেখিবার জিনিষ!"…

হঠাৎ একটা গোলমালের সৃষ্টি হ'ল। বৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র ছদ্মবেশে সভায় প্রবেশ করছিলেন। গেট-কিপারদের হাতে ধরা পড়ে নাজেহাল হয়েছেন এবং লাঞ্ছনার লজ্জা মাথায় নিয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছেন।

এই ঘটনার ভিতর দিয়ে লেখক নজরুলের যৌবন-বন্দনার বিরুদ্ধে তীব্র আঘাত হেনেছেন। এরপর নাচ-গান আরম্ভ হয়েছে। নাচ মানে 'হা ঘরে নৃত্য'—সেখানে শ্রীমতি রেবা রায় লাঞ্ছিতা আর গান মানে নজরুল কবিতার প্যারডি—সেখানে নজরুলের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার শাণিত অস্ত্রের ব্যবহার। প্রথম গানটি হ'ল কাজী কবির "জীবন-বন্দনা" কবিতার প্যারডি—ভাব কিন্তু "বিদ্রোহী" ও "সাম্যবাদী'র মূল সুরে আঘাত হানা। কয়েকটি পংক্তি ঃ

সেদিন সুদূর রাশিয়া হইতে আসিল কাদের বিজয় বার্তা,
কাদের মহিমা বর্ণিল কবি অসম ছন্দে ব্যাপিয়া চার তা'।…
তারা যে তরুণ নবারুণ সম যুগে যুগে তারা মারিছে টেক্কা,
আঁস্তাকুড় ও বস্তি বাহিয়া ছুটেছে বেঘোরে তাদের এক্কা।…
নারী দেহে কারা খুঁজিয়া পেয়েছে কামরূপ জেরুজালেম, Mecca—
তাহারা তরুণ সারা দেশ জুড়ি' ছুটিয়া চলেছে তাদের এক্কা।…
ভগবান বুকে কারা মারে লাথি, শালগ্রাম শিলা ডুবায় মদ্যে—
ভাবে শুঁড়িখানা এই এ দুনিয়া কাহারা ওমর খায়েমী পদ্যে'
আপনারে কাম-সন্তান ভেবে, মা-র সতীত্বে করে কটাক্ষ,
যীশু ব্যাসদেব কুন্তী পুত্র দিতেছে কাদের কথায় সাক্ষ্য।… ইত্যাদি।

শ্রদ্ধেয় যোগানন্দ দাস মহাশয় শনিবারের চিঠিকে 'ভুঁইফোঁড়' কাগজ বলেননি। এর জন্ম-বৃত্তান্ত গর্বের সাথে স্মরণ করেছেন। 'শনিবারের চিঠি'র জন্মের পিছনে যে ইতিহাস রয়েছে তা' স্মরণ করে আমরাও গর্বিত এবং এ কথাও স্বীকার করব যুগ-প্রয়োজনেই 'শনিবারের চিঠি'র জন্ম। কিন্তু 'চিঠি'র জন্মাদর্শের সাথে তার চেহারার কি বিরাট পার্থক্য! আমাদের আপত্তি এখানে। জন্ম যার বিরাটের পটভূমিকায়—সে কিনা কেবল ব্যঙ্গের কাগজ হ'য়ে দাঁড়াল এবং সে ব্যঙ্গ অধিকাংশ ক্ষেত্রে অশালীন! উপরের কবিতাটি পড়ে যে কোনো রুচিবান পাঠক ক্ষুব্ধ হবেন।

"জলসা"র পরের গানটি নজরুলের বিখ্যাত "কে বিদেশী মন উদাসী বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে" গানের প্যারডি। এগার লাইনের প্যারডি আমি এখানে আট লাইন উদ্ধৃত করলাম:

কে উদাসী বনগাঁবাসী বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে,
বাঁশী-সোহাগে ভিরমী লাগে, বর ভুলে যায় বিয়ের কনে।
ঘুমিয়ে হাসে দুষ্টু খোকা,—বেরিয়ে আসে দাঁতের পোকা
বোকা-চাঁদের লাগল ধোঁকা খোকা-কবির বাঁশীর স্বনে।...

...কুঙ্কুমবালা অনেক রাতে,
দেয় নাক-মুখ এঁটো পাতে,
বিড়াল-বধু দুধ ও ভাতে,
তেয়াগি কাঁদে হেঁসেল-কোনে।

সাবল হাতে সিঁধেল চোরে,
ভাসে সে সুরে নয়ন-লোরে,
দোহাই তোরে আর বেঘোরে
মারিও না গরীব জনে।

এই প্যারডি কবিতাটি দু'-তিন সংখ্যা পরে পুনরায় 'শনিবারের চিঠি'তে একটি পৃথক ক্রোড় পত্রে (শনিবারের চিঠি দ্বিগুণ বড় এক সীট কাগজে) লাল কালিতে ছাপা হয়। সেখানে একটি Foot Note

ছিল। সেই Foot Note-এ নজরুলের বহু গানের স্বরলিপি রচয়িতা শ্রীমতি মোহিনী দেবী জঘন্যভাবে আক্রান্ত হ'য়েছেন।

"কবি ও কাঁচা" পঞ্চমাঙ্ক নাটকে নজরুলের বিখ্যাত গজল-গান "বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিস্‌নে আজি দোল"-এর প্যারডির কথা উল্লেখ করেছি—"জলসা"য় উক্ত গানের আর একটি সুন্দর প্যারডি প্রকাশিত হয়। এটি বার লাইনের কবিতা—নিম্নে উদ্ধৃতি দিলাম :

"তেপায়ায় ট্যাঁক ঘড়ি তুই টিকটিকিয়ে কস্‌কি নিশিদিশ!
কচি সব পাড়ার ছুঁড়ি—ওই বা থুড়ী, বালিকা I mean.
তারা সব হয়নি বড়, জলদি কর, বাড়াও বয়স ভাই,
এখনও বুঝতে নারে ঠোরে ঠায়ে চোখের আলাপিন।

আজো যে ফ্রক পরে হায়, ঘুরে বেড়ায় চায় না আঁখি তুলে
কবে যে ঘোমটা চিরি আসবে ধীরে, বাজবে আঁখি বীণা।
কবে যে দখ্‌নে হাওয়ার বুঝবে Power, প্রেম Tower-এ উঠে,
কালো ঐ চোখের তারায় হাত ইশারায় পিইব দারুপিন।

দেখিয়া পথ নিরজন বুকের বসন আপনি খুলিয়া যাবে—
ঘড়ি তুই চল ছুটিয়া টিকটিকিয়া বাড়িয়ে গতি ক্ষীণ!
তোরে যে ফি বছরে অয়েল করে যতন করি কত,
সময়ে পারিস নাকি, দিতে ফাঁকি ওরে সুইস-জীন।"

এ প্যারডিতেও 'শনিবারের চিঠি'র মূল সুর প্রতিধ্বনিত।

নজরুলের সর্বশ্রেষ্ঠ কোরাস গান "কাণ্ডারী হুঁশিয়ার" আজ আর কারো অজানা নয়। শ্রীযুক্ত নারায়ণ চৌধুরী মহাশয় এটিকে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ কোরাস সঙ্গীত বলে উল্লেখ করেছেন। শ্রীবটুকলাল ভট্ট নামের আড়ালে "জলসা"য় সজনীবাবু এই মহৎ গানটির প্যারডি করলেন এই ভাবে :

চোর ও ছ্যাচোর, ছিঁচকে সিঁধেলে দুনিয়া চমৎকার—
তলপি তলপা তহবিল নিয়ে কাণ্ডারী হুঁশিয়ার।

বাজার করিয়া চাকর-বাবাজি ভারী করে ফেরে ট্যাক—
ঘি-তেল চুরিতে বামুন ভায়ার, হ'য়েছে বিষম 'ন্যাকা'
ভাত নিয়ে যবে বাড়ী যায় দাসী আঁচল তাহার দ্যাখ—
মজাদার ভারি, এ দুনিয়াদারী সামলিয়ে চলা ভার ।।
চোর ও ছ্যাচোর ইত্যাদি...

গয়লার মন ময়লা অতীব দুধে ঠেসে দেয় জল,
ময়দার সাথে চাখড়ি মিশায় এমনি ময়দা কল,
কোটাবাড়ী যার সেও ভিখ মাগে আঁখি করে ছলছল,
নেহাৎ বেচারা ভাবিছ যাহারে সে পাকা পকেটমার ।।

শ্যামের নামেতে পড় যে গল্প লেখক তাহার রাম,
নতুন বলিয়া কিনিলে যে জুতা পুরানো তাহার চাম,
সেলেতে সস্তা জিনিষ কিনতে দিলে ঠিক দু'নো দাম,
ধোপা বেটা ভুল ঠিকানা রাখিয়া হইল পগার পার ।।

চোরা মার্কেটে যাবে যদি যেও সামলিয়ে নিজ জেব,
চট করে ট্যাক খুলিয়া ফেল না দেখ যদি দ্বিজ-দেব,
অনেক ঠকিয়া অনেক শিখেছি কহিতেছি অতএব,
মাথায় হস্ত যে বুলাবে তব মতলব আছে তার ।।

যে বাঁশে ভাবিছ নিখুঁত নিরেট ধরেছে তাহাতে ঘুণ,
সামলিয়ে চলো সেই সাধুলোকে খেয়েছে যে তব নুন,
বাসর শয্যা ভাব যেথা সেথা গড়াগড়ি যায় খুন, (হিয়ার, হিয়ার)
আছে ত উপায় কর সমবায় কসে গড় "ভাণ্ডার"।
চোর ও ছ্যাচোর ইত্যাদি...

এটাই ছিল "জলসা"র শেষ গান। গান শেষে "এঙ্কোর এঙ্কোর রব ও হাত-তালি"—তারপর সভা ভঙ্গ, জলসা সমাপ্ত!

আমি ভাবছি একটি বিরাট প্রতিভা কিভাবে কেবলমাত্র ব্যঙ্গ-রচনার ভিতর দিয়ে আপন শক্তি ব্যয় করেছে !!

বৈষ্ণব দর্শন শাস্ত্রে ভগবৎ-পূজার যে পাঁচটি পথ নির্দিষ্ট হয়েছে তার মধ্যে শত্রুরূপে ভজনার পথটি মোক্ষম এবং অব্যর্থ। পথটি চিরাচরিত বিশ্বাসের অনুগামী নয়, খুব বেশী সংখ্যক ভগবৎ-প্রেমিক এ পথে চলেননি। অটুট আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ় মনোবল না থাকলে এ পথে যাতায়াত নিষিদ্ধ। সজনীবাবু তাঁর বন্ধু-পূজায় এ নিষিদ্ধ পথেরই পথিক হয়েছেন। শত্রুরূপে ভজনা করেই তিনি সমকালীন সকল মহৎ জনের বন্ধুত্ব লাভ করেছেন। আজ ভাব্‌ছি আব অবাক হচ্ছি—তাঁর মত শত্রুতা করার নির্ভীক মনোবল কি আমাদের মধ্যে কারো নেই!

শনিমণ্ডলীর অন্যতম শনি—সজনীকান্ত দাস। কার সাথে তাঁর শত্রুতা হয়নি? রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, দীনেশ সেন, তারাশঙ্কর, প্রেমেন, অচিন্ত্য—সব সব। সকলেই তাঁব শত্রু—মোক্ষম শত্রু। মোক্ষম শত্রু বলেই মহৎ বন্ধু হ'তে পেবেছেন সবাই। বিরাট ব্যাক্তিত্বসম্পন্ন সজনীকান্ত দাসের—Grand old man of the opposition-এর বাহাদুরী এখানে। 'শনিবারেব চিঠি' বুড়ো মানুষটাকে (কবিগুরু) কম নাজেহাল করেনি। শত্রুতা বা মতবিবোধ যখন চূড়ান্ত তখন কোন একটা চাক্‌রির জন্যে কবিগুরুর নিকট থেকে একটি পরিচয়পত্রেব প্রয়োজন হ'ল সজনীবাবুর। তিনি লিখলেন,…"জানাইলাম, ১৬ই ফেব্রুয়ারী (১৯২৮) মধ্যে প্রশংসাপত্র আমার হস্তগত হওয়া চাই।" ১৫ই তারিখে তিনি রবীন্দ্রনাথেব স্বাক্ষরযুক্ত একটি প্রশংসাপত্র পেলেন:

"SANTINIKETAN"
Feb. 13, 1928.

I know Babu Sajanikanta Das and I can certify that he is an author whose mastery of Bengali language and knowledge of our literature is remarkable.

—Rabindranath Tagore."

কতখানি আত্মবিশ্বাস থাকলে এ-ধরনের চিঠি লেখা যায়, এবং কতখানি ভালবাসলে এ-ধরনের প্রশংসা-বাণী উচ্চারণ করা যায় তা' সহজেই অনুমেয়। দেবী দুর্গা আর অসুর যেন!

শ্রদ্ধেয় তারাশঙ্কর সম্পাদিত 'শনিবারের চিঠি'র "সজনীকান্ত স্মরণ সংখ্যা"য় দক্ষিণারঞ্জন বসু মহাশয়ের একটি মূল্যবান প্রবন্ধ বার হ'য়েছে—"ভুল বুঝেছিলাম।" প্রবন্ধটিতে সজনীকান্ত চরিত্রের এই বন্ধু-প্রীতির দিকটা সুন্দররূপে ব্যক্ত হয়েছে। তারাশঙ্করের সাথে সজনীবাবুর বন্ধুত্ব ও অন্তরঙ্গতা হয়ত একটু বেশীই। তবুও দুই বন্ধুর মাঝে প্রথমে হ'ল মতভেদ। কারণ, তারাশঙ্কর সম্বন্ধে 'সংবাদ সাহিত্যে'র অসহিষ্ণু উক্তি। সেই মতভেদ গিয়ে দাঁড়াল মনকষাকষিতে। দুই বন্ধুর পুনর্মিলনের চেষ্টায় নামলেন অনেকেই। সজনীবাবুর কণ্ঠে কিন্তু সেই আত্মপ্রত্যয়ের সুর—'আমার সম্পর্কে বড়বাবুর (তারাশঙ্করের) মনে যত অভিমানই থাক না কেন, এ কথা আমি জোর করেই বলতে পারি, আমার কোন বিপদের কথা শুনলে ও-ই ছুটে এসে সবার আগে আমার পাশে দাঁড়াবে।'

প্রেমেনবাবু আকাদমি পুরস্কার পেয়েছেন। স্বভাবসুলভ আক্রমণাত্মক হুঙ্কার বেরুল 'সংবাদ-সাহিত্যে'। কারণ জিজ্ঞেস করলে সজনীবাবু বললেন—"বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের মধ্যে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান প্রেমেন। ওর সৌভাগ্যে আমরা নিশ্চয়ই খুশী। কিন্তু এত বেশী পেয়ে এত কম দিলে তা' আমরা সহ্য করব কেন?... প্রেমেনের কাছে আমি আরও অনেক বেশী চাই।"

একই সুর। একই প্রত্যয়-নিষ্ঠ কণ্ঠ। শত্রুভাবে বন্ধু-পূজা।

প্রত্যক্ষদর্শী শ্রদ্ধেয় পরিমল গোস্বামী "স্মরণে" স্মৃতিকথায় সজনীবাবুর এই বন্ধুপ্রীতির একমটি সুন্দররূপে তুলে ধরেছেন। লিখেছেন: "তাঁর পুরানো দিনের আক্রমণের লক্ষ্য যাঁরা ছিলেন তাঁদের অধিকাংশ তাঁর টানে তাঁর বন্ধুরূপে কাছে চলে এসেছিলেন, মাত্র দু-একজন ছাড়া। আমি নিজ চোখে দেখেছি সজনীকান্তের সবাইকে কাছে

টানার আকুলতা। এবং এ-কথা আমার চেয়ে কেউ বেশী জানে না যে যাঁদের সাহিত্যক্ষেত্রে গাল দেওয়া হয়েছে বা যাঁদের লেখা নিয়ে ব্যঙ্গ করা হ'য়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে তাঁর ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ছিল না। তিনি অনেক অন্তরঙ্গ বন্ধুকেও নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করেছেন কিন্তু তাতে বন্ধুত্বের হানি ঘটেনি।"

সজনীবাবুর স্বভাবই ছিল এই। এবং ঠিক এই কারণেই তিনি নজরুলকে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে পেয়েছিলেন। নজরুলের সাথে 'শনিবারের চিঠি'র বিরুদ্ধতা, শত্রুতা ও সংঘর্ষের ইতিহাস আমরা বিস্তারিত পেয়েছি। এবারে তাঁদের বন্ধুত্ব ও মিলনের পর্বটির দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক্।

১০.

সজনীবাবু নজরুলকে সর্বপ্রথম দূর থেকে দেখেন ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে সাহিত্য-রসিক কবিরাজ জীবনকালী রায় মহাশয়ের বাড়ীতে গানের আসরে। পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণের সময় গঙ্গায় স্নানার্থীদের ভিড়ে যে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যায় তার নিবারণকল্পে সজনীবাবু সদলবলে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে আহিরীটোলা ঘাটের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে "উদাত্ত বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে"র গান 'বল ভাই মাভৈঃ মাভৈঃ' শুনে "পুলকে বিস্ময়াভূত হইয়া দাঁড়াইয়া" গিয়েছিলেন। বলাবাহুল্য গায়ক হলেন কাজী নজরুল ইস্‌লাম এবং তাঁর পাশে বসেছিলেন শ্রীমোহিতলাল মজুমদার, শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ও নলিনীকান্ত সরকার। এই নজরুল দর্শন সম্পর্কে সজনীবাবু তাঁর "আত্মস্মৃতি"র ১ম খণ্ডে লিখেছেন:

"বিদ্রোহী"র প্রলাপ পড়িয়া যে মানুষটির কল্পনা করিয়াছিলাম, ইঁহার সহিত তাঁহার মিল নাই। বর্তমানের মানুষটিকে ভালবাসা যায়,

কবিতায় সুর যোজনা করেন। তিনি বহুবার গানটি গ্রামোফোন কোং-এর মজলিস-ই আড্ডায় সকলকে গেয়ে শুনিয়েছেন। পরে কাজী কবির দেওয়া সুরে গানটি শ্রীবিমল দাশগুপ্তের কণ্ঠে মেগাফোনেও রেকর্ড হ'য়েছিল।

ইণ্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি লিমিটেডের আমলে আকাশবাণীতে প্রতি মাসে শনি মণ্ডলের একটি করে অধিবেশন হত। এই অধিবেশনের প্রধান পরিচালক সজনীকান্ত দাস। এখানেও নজরুল বিশেষরূপে সজনীবাবুর সহায়ক হয়েছিলেন—'আত্মস্মৃতি'র পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে মুক্তকণ্ঠের স্বীকৃতি আছে। শনিমণ্ডলীর প্রায় প্রতিটি অনুষ্ঠানে কাজী কবি যোগদান করতেন। এ প্রসঙ্গে কবি-বন্ধু নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় বলেছেন যে, নজরুলের গান ও আবৃত্তি ছিল এ অনুষ্ঠানের অন্যতম চিত্তাকর্ষক সম্পদ। সজনীবাবুর 'পথ চলতে ঘাসের ফুল'-এর অনেকগুলি গান কাজী কবি এই অনুষ্ঠানে গেয়ে শুনিয়েছিলেন।

নজরুল-সজনীর এই মিলন শেষ পর্যন্ত এমন আন্তরিকতায় পরিণত হয়েছিল যে উভয়ে মিলিতভাবে 'পাদপূরণ'মূলক কবিতাও লিখেছিলেন। একটি কবিতার উদাহরণ দিই :

নজরুল—পুকুরে পড়েছে বেড়াজাল আজ
ভাগো ভাগো, মীন-বৎস্য।
সজনী—আসিয়াছে যত জাঁদরেল জেলে
সাবাড় করিতে মৎস্য…ইত্যাদি।

এই অসম্ভব মিলন সম্পর্কে সবজন শ্রদ্ধেয় দা-ঠাকুর (শরৎ পণ্ডিত) একটি ছড়া বেঁধেছিলেন এবং সেটি তিনি প্রায় প্রত্যেক আসরে একবার করে সকলকে শুনিয়ে দিতেন।

বিদ্রোহী কবি তখন সবে মাত্র কাল-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছেন (১৯৪২ খ্রীঃ)। তাঁর অর্থনৈতিক অবস্থা রীতিমত সঙ্কটজনক। ইতিপূর্বেই কবি-পত্নীর চিকিৎসার জন্যে কবির গাড়ী, বই ও গানের

রায়ালটি বিক্রি হ'য়ে গেছে। তার ওপর কবি হ'লেন অসুস্থ। এই দারুণ অর্থনৈতিক সঙ্কটের সময় এগিয়ে এসেছিলেন সজনীকান্ত। বিভিন্ন স্থান হ'তে টাকা তুলে তিনি নানাভাবে সাহায্য করেছেন।

'শনিবারের চিঠি' কারণে-অকারণে নজরুলকে যত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও গালি-গালাজ করুক—ভালও বেসেছে সমপরিমাণে। আমি বার বার বলেছি 'চিঠি'র এ গালিগালাজ ছিল নিতান্ত পাগলামী, খেয়াল বা খেলা কিন্তু ভালবাসাটা ছিল আন্তরিক। এটাই বোধ হয় দীর্ঘকাল-ব্যাপি দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের বড় লাভ।

'নজরুল ও শনিবারের চিঠি' এই দীর্ঘ অধ্যায়টি এখানে শেষ করলাম। পরিশেষে আমার বিনীত বক্তব্য—আমার এ আলোচনা পূর্ণ নয়। কেন না আমরা প্রত্যক্ষদর্শী নই—আমাদের নির্ভর করতে হ'য়েছে প্রধানতঃ মুদ্রিত পত্র-পত্রিকা-পুস্তকের উপর। বহু পত্র-পত্রিকা আবার দুষ্প্রাপ্য। সুতরাং আলোচনার অসম্পূর্ণতার সাথে তথ্যগত কিছু দোষ দুর্বলতা থাকাও বিচিত্র নয়। আমার আলোচনা প্রধানতঃ 'শনিবারের চিঠি'র সাপ্তাহিক সংস্করণ ও মাসিকের ১৩৩৬ সালের সংস্করণ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই আলোচনায় কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে শ্রীমোহিতলাল মজুমদার ও শ্রীসজনীকান্ত দাসের কথা বেশী করে বলা হয়েছে। মোহিতলাল ও সজনীবাবু স্বর্গীয়। নজরুল থেকেও নেই। সুতরাং কারো প্রতি অশ্রদ্ধা বশতঃ আমি কোন কথা লিখিনি বা মন্তব্য প্রকাশ করিনি, যা' সত্য তাই লিখেছি। ইতিহাস যখন লেখা হবে তখন সত্যকথাই লেখা হ'বে—আমাদের এ আলোচনা সেই দুরূহ কার্যের পূর্ব প্রচেষ্টা। হয়ত প্রথম প্রচেষ্টা।

আবব‍াসউদ্দীন

১.

নজরুলের সঙ্গীত, বিশেষ করে তাঁর পল্লীগীতি ও ইসলামী সঙ্গীতগুলি যাঁরা জনপ্রিয় করেছেন, তাঁদের মধ্যে নিঃসন্দেহে সুরশিল্পী আব্বাসউদ্দীন আহমদ সর্বশ্রেষ্ঠ। অথবা বলা যায় নজরুলের পল্লীগীতি ও ইসলামী সঙ্গীতগুলি আব্বাসউদ্দীনকে নিখিল বাংলায় দুর্লভ যশ গৌরবে অধিষ্ঠিত করে দিয়েছে। আব্বাসউদ্দীনের কণ্ঠের অপূর্ব সুরমাধুর্যে একদিন বাঙালীর হৃদয়াকাশ ভরে উঠেছিল। নজরুলের সঙ্গীতে ছিল অপূর্ব উন্মাদনা আর সুগভীর তন্ময়তা, আব্বাসউদ্দীনের কণ্ঠের যাদু-স্পর্শে তাই জীবন্ত রূপ লাভ করেছিল। নিখিল বাংলার আপামর জনসাধারণ সে সুর-সুধা পান করে তৃপ্ত ও কিছু পরিমাণে ভাবুক হ'য়ে উঠেছিল।

নজরুলের সঙ্গে আব্বাসউদ্দীনের প্রথম চাক্ষুষ মিলন ঘটে কুচবিহার কলেজে। চারণ কবি নজরুল তখন যুক্ত-বাংলায় অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। কুচবিহার স্কুল ও কলেজের যুক্ত মিলাদ অনুষ্ঠানে কবিকে সভাপতি করে নিয়ে আসা হ'য়েছে। আব্বাসউদ্দীন তখন ওখানে বি. এ ক্লাসের ছাত্র। হোস্টেলে থাকেন আর কলেজে পড়েন। চারণ কবির থাকার ব্যবস্থা হ'য়েছিল হোস্টেলের আব্বাসউদ্দীনের প্রকোষ্ঠেই। সুতরাং প্রাথমিক মিলন ও আলাপটা অত্যন্ত হৃদ্য হ'য়ে উঠেছিল।

দুপুরে সমাপ্ত হ'ল মিলাদ অনুষ্ঠান। তারপর চলল বক্তৃতা। উদার প্রাণ নজরুলের বক্তৃতার মাঝে পরাধীনতার জ্বালা সুতীব্র হ'য়ে দেখা দিল। সমবেত জনতাকে তিনি স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। তাঁর আবেগধর্মী বক্তৃতা বোধ হয় মাত্রা ছাড়িয়েছিল। তিনি ইসলাম ধর্মের দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মের উপরেও স্বাধীনতা অর্জনের স্থান দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'যে আসনের উপর বসে আমি নামাজ পড়ব ইংরেজ এসে যদি সেই আসনটাই কেড়ে নেয় তা' হ'লে নামাজের পবিত্রতা থাকে কোথায়? সেই জন্য পরাধীন দেশে নামাজ পড়াটাও...।' মুহূর্তে জনতার রূপ পাল্টে গেল। সভার মাঝে কবি আক্রান্ত হন দেখে ছাত্রেরা তাঁকে নিয়ে হোস্টেলে পালিয়ে এলো।

হোস্টেলে ফিরে এসে তিনি আব্বাসউদ্দীনের লেখার সাথে পরিচিত হলেন। আব্বাসউদ্দীনের কবিতা ও গল্প তখন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হ'চ্ছে—বিশেষ করে কলেজ ম্যাগাজিনে। 'আর্য সাহিত্যসমাজ' থেকে তিনি 'কাব্যরত্নাকর' উপাধিও সংগ্রহ করেছেন। নামের শেষে সেটা গর্বভরে যুক্ত করেন। এই গালভরা দীর্ঘ বিশেষণটি যুক্ত থাকতে দেখে কবি বলেন, 'এত অল্প বয়সে এত বড় লেজ যুক্ত করেছ?' বলাবাহুল্য সারাজীবনে আব্বাসউদ্দীন এ উপাধি আর ব্যবহার করেন নি।

ইতিমধ্যে ছাত্রেরা 'গায়ক' আব্বাসউদ্দীনের সুনাম কবির কর্ণে তুলে দিয়েছিলো। কবি সঙ্গীতের কথা বলতেই একটু সলাজ ইতস্ততঃ করে আব্বাসউদ্দীন একটি রবীন্দ্র সংগীত গাইলেন, 'সে আসে ধীরে যায় লাজে ফিরে'। জহুরী জওহর চেনে। সুরেলা কণ্ঠে আকৃষ্ট হয়ে কবি আব্বাসউদ্দীনকে কলকাতায় এসে গ্রামোফোন কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য জিদ করলেন। তারপর আব্বাসউদ্দীন কেমন ভাবে রেকর্ড কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন —সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। নজরুল আব্বাসউদ্দীনের এই প্রথম মিলন

সঙ্গীত-প্রিয় বাঙালীর কাছে অত্যন্ত মঙ্গলপ্রসূ হ'য়েছিল। কবি এবং গায়ক উভয়ের জীবনের এক স্বর্ণোজ্জ্বল ভবিষ্যতের অঙ্গীকারপত্র বুঝি এই মিলনে গোপন-নীরবে স্বাক্ষরিত হ'য়েছিল।

অবশ্য কবি বক্তৃতা দিয়ে কুচবিহারবাসীকে সন্তুষ্ট করতে না পারলেও গানে গানে মাতিয়ে দিয়ে এসেছিলেন। দু'দিন ছিলেন কুচবিহারে। উদাত্ত কণ্ঠে শিকল পরার গান, চরকার গান ইত্যাদিতে গভীর উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিলেন।

২

আব্বাসউদ্দীনের সাথে কবির দ্বিতীয় সাক্ষাৎ হয় দার্জিলিং-এ। শৈলাবাস দার্জিলিং-এ বিদ্রোহী কবির আগমনে অপূর্ব উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছে। নৃপেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল হলে কবির সংগীত ও আবৃত্তির সাড়ম্বর আয়োজন করা হয়েছে। পূর্ব হতেই হল ভরে গিয়েছিল। সংবাদ পেয়ে সভাস্থলে যখন আব্বাসউদ্দীন এসে পৌঁছুলেন তখন বিদ্রোহী কবি তাঁর সুখ্যাত 'বিদ্রোহী' কবিতা মেঘমন্দ্রস্বরে আবৃত্তি করে চলেছেন। সভাস্থল পূর্ণ নীরব। সমাপ্তিতে বিপুল করতালি। তারপর শুরু হ'ল গানের জলসা। গানের পর গান। ইতিমধ্যে আব্বাসউদ্দীনের উপস্থিতির কথা কে একজন কবির গোচরে এনেছেন। কবি তাঁকে নিকটে ডাকলেন এবং তারপর জনতার সঙ্গে আব্বাসউদ্দীনের পরিচয় করিয়ে দিলেন এক সংক্ষিপ্ত আবেগধর্মী বক্তৃতার মাধ্যমে।

আব্বাসউদ্দীনের কণ্ঠের প্রশংসায় সেদিন তিনি পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠেছিলেন। সেই সভাতেই আব্বাসউদ্দীন গাইলেন কবির বিখ্যাত গান 'ঘোর-ঘোররে আমার সাধের চরকা ঘোর'। কণ্ঠে কী যাদু ছিল! জনতার সাথে কবিও অভিভূত হয়ে পড়লেন। কলকাতায় গিয়ে তাঁর সাথে দেখা করার জন্য আব্বাসউদ্দীনকে বার বার বললেন।

কবির বুঝি মনে হয়েছিল এই তরুণ সুরশিল্পীকে দিয়ে নিখিল বাংলায় সুরের প্লাবন বইয়ে দেওয়া যাবে।

দার্জিলিং-এ এই দেখা-সাক্ষাতের এক বছর পরে আব্বাসউদ্দীন চলে এলেন কলকাতায়। এবার কবির সাথে তাঁর মিলন ঘটল গ্রামোফোন কোম্পানিতে। কবি তখন H. M. V-এর হেড কম্পোজার (Head Composer)। কেবল তাই নয়—গ্রামোফোন কোম্পানির সর্বেসর্বাও বলা যায় তাঁকে। তাঁর সাথে পরামর্শ করে তবে কোনো নতুন কাজে এগিয়ে যেতেন কোম্পানি। মোটকথা H. M. V-তে কবির তখন অপরিসীম প্রতিপত্তি। কবির পূর্ণ সহানুভূতিতে আব্বাসউদ্দীন নজরুলের অনেকগুলি গান রেকর্ড করে ফেললেন। এই সময়ের প্রথম দিকে তিনি যে নজরুলসংগীতগুলি রেকর্ড করেছিলেন তাদের মধ্যে কয়েকটি বিখ্যাত গানের প্রথম পংক্তি এই :

'বন্ধু আজো মনে রে পড়ে
আমকুড়ানো খেলা',
'অনেক ছিল বলার যদি দু'দিন
আগে আসতে',
'বেণুকার বনে কাঁদে বাতাস বিধুর',
'গাঙে জোয়ার এল ফিরে তুমি
এলে কৈ' ইত্যাদি।

৩.

প্রথম দিকে কিছু পল্লীগীতি ও কিছু আধুনিক গানের রেকর্ড করা হয়েছিল কিন্তু ইসলামী-সংগীতের প্রচলন তখনো হয় নি। ইসলামী-সংগীত প্রচারিত হওয়ার মূলে অনেকগুলি বাধা ছিল। প্রথমত সে সময় বাংলা ভাষায় উৎকৃষ্ট ইসলামী-সংগীত ছিল না,

এরপর কাজীদা' লিখে চললেন ইসলামী গান। আল্লা-রসুলের গান পেয়ে বাংলার মুসলমানের ঘরে ঘরে জাগল এক উন্মাদনা। যারা গান শুনলে কানে আঙুল দিত তাদের কানে গেল, 'আল্লা নামের বীজ বুনেছি', 'নাম মোহম্মদ বোল রে মন নাম আহমদ বোল'। কান থেকে হাত ছেড়ে দিয়ে তন্ময় হ'য়ে শুনল এ গান, আরো শুনল 'আল্লাহ আমার প্রভু আমার নাহি নাহি ভয়'। মোহরমে শুনল মর্সিয়া, শুনল 'ত্রিভুবনের প্রিয় মোহম্মদ এলো রে দুনিয়ায়'। ঈদে নতুন করে শুনল 'এলো আবার ঈদ ফিরে এলো আবার ঈদ, চল ঈদ গাহে'। ঘরে ঘরে এলো গ্রামোফোন রেকর্ড, গ্রামে গ্রামে প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগল আল্লা-রসুলের নাম।"...

এই ভাবে ইসলামী-সংগীত রেকর্ড হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিখিল বাংলায় সেগুলি অপূর্ব জনপ্রিয়তা লাভ করল। এরপর কবি অজস্র ধারায় ভক্তিমূলক গান রচনা করে চললেন। একই সঙ্গে তিনি রচনা করে চলেছেন শ্যামা-সংগীত আর ইসলামী-সংগীত। নিখিল বাংলার জনসাধারণের কাছে তখন নজরুলের ভক্তিমূলক গানের কী বিপুল চাহিদা! ইসলামী-সংগীতের চাহিদা এত বেড়ে গিয়েছিল যে, কোম্পানি প্রতি মাসে কয়েকখানা করে ইসলামী-সংগীত বাজারে বার করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু আব্বাসউদ্দীন একা আর কত গাইবেন। তা' ছাড়া একই শিল্পীকে দিয়ে বিভিন্ন গান, হোক নূতন, গাওয়ালে এক ঘেয়ে হ'তে বাধ্য। তাই ছদ্ম নামের আড়ালে বহু হিন্দু গায়ক-গায়িকা ইসলামী-সংগীত গাইতে এগিয়ে এলেন। চিত্ত রায় হ'লেন দেলোয়ার হোসেন, ধীরেন দাস নাম পাল্টালেন গণি মিঞা, সোনা মিঞা সাজলেন গিরীন চক্রবর্তী আর আশ্চর্যময়ী দেবী ও হরিমতী দেবী যথাক্রমে সকিনা বেগম ও আমিনা বেগম রূপে রেকর্ডে কণ্ঠ দিলেন। এইচ, এম, ভি, টুইন, মেগাফোন ইত্যাদি কোম্পানিতে নজরুলের আরো কয়েকটি বহুখ্যাত ইসলামী-সংগীত রেকর্ড করা হয়েছিল।

কয়েকটির প্রথম পংক্তি এই : 'বাজিছে দামামা বাঁধ রে আমামা শির উঁচু করি মুসলমান', 'ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এল রে দুনিয়ায়', 'তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে', 'শাহারাতে ফুটল রে ফুল', 'মোহরমের চাঁদ এলো ঐ', 'খোদার প্রেমের শরাব পিয়ে', 'মোহাম্মদ নাম জপে ছিলি বুলবুলি তুই আগে', 'নামাজী তোর নামাজ হ'ল রে ভুল', বাহিরে কোথায় খুঁজিছ খোদারে', 'কারো মনে তুমি দিও না আঘাত' ইত্যাদি।

৪.

নজরুলের ইসলামী-সংগীতগুলির চাহিদা যখন সর্বোচ্চ, আয়ের সেই সোনালী দিনগুলিতেও কবিকে পাওনাদারের ভয়ে দরজা বন্ধ করে থাকতে হত। কবির এক চাকর ছিল—নাম 'হইরা' বা 'হরি'। যে কেউ গিয়ে কাজী সাহেবের খোঁজ করলেই সে বলতো, 'কবি সাহেব বাসায় নেই।' আব্বাসউদ্দীনও কয়েকদিন এমন ভাবে ফিরে এসেছেন। হরির নিকট থেকে কবির অনুপস্থিতির সংবাদ শুনে একদিন আব্বাসউদ্দীন ফিরে আসছেন এমন সময় কবির দরাজ কণ্ঠের উচ্চ হাসি শুনতে পেলেন। অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও হরিকে সেদিন বাড়ীর মধ্যে যেতে দিতে হ'ল আব্বাসউদ্দীনকে। অবশেষে কবির নিকট থেকে আসল ব্যাপারটা শুনলেন তিনি, 'পাওনাদারদের আর কত ফেরাব বল।' জীবনে নজরুল কোনোদিন হিসেবি ছিলেন না। এই বেহিসেবিপনাই তাঁকে ঋণে আবদ্ধ করেছিল।

৫.

ইসলামী-সংগীত রচনার সঙ্গে সঙ্গে কবি পল্লীগীতিও রচনা করতেন। এবং পল্লীগীতি রচনাতেও কবির স্বকীয় দুর্লভ স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয় হ'য়ে উঠেছিল। ইসলামী-সংগীতগুলির মত তাঁর পল্লীগীতিগুলিও বাংলার আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছিল। নজরুল-সংগীত তখন দেশকে

মাতিয়ে দিয়েছিল। নজরুল-সংগীতের সঙ্গে রবীন্দ্র-সংগীতের প্রভেদ এখানেই। ভাবসম্পদে রবীন্দ্র-সংগীত নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ কিন্তু জনপ্রিয়তায় নজরুল-সংগীত তখন সবার উপরে। কিষাণ, মুটে, মজুর, কুলি, মাঝি সম্প্রদায় তখন গাইছে পল্লীগীতি বা সাম্পানের গান। ভক্ত সম্প্রদায় গাইছে 'ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ' বা 'বল্ রে জবা বল'। শিক্ষিত সম্প্রদায় তখন গজল গানে মাতোয়ারা। মোটাকথা সে সময় বাংলার বাতাসে কান পাতলেই নজরুল-সংগীত শোনা যেত। কয়েকটি অনবদ্য পল্লীগীতি রচনার সঙ্গে আব্বাসউদ্দীনের স্মৃতি জড়িয়ে আছে। এখানে সেই ঘটনাটি উল্লেখ করা হ'ল ঃ

আব্বাসউদ্দীন কুচবিহারের লোক। কুচবিহারের পল্লী অঞ্চলে ভাওয়াইয়া গানের প্রচলন খুব বেশী। ভাওয়াইয়া গান আর কিছুই নয়—পল্লীগীতির রকম ফের। মেগাফোন কোং-এর রিহার্সাল রুমে একদিন বসে বসে আব্বাসউদ্দীন একটি ভাওয়াইয়া গানের অংশ বিশেষ সুর-সহযোগে গেয়ে অবসর বিনোদ করছিলেন ঃ

গানের প্রথম কলিটি এই ঃ

'নদীর নাম সই কচুয়া
মাছ মারে মাছুয়া
মুই নারী দিচোং ছেকাপাড়া,—

গানটির সুরের বিশেষ্টতায় কবি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হ'য়েছিলেন, পরবর্তী জীবনে তিনি স্বীকার করেছেন যে ভাওয়াইয়া গান শুনে তিনি বড় উন্মনা হ'য়ে পড়েন। এ গান শুনলেই তাঁর মন পল্লীমায়ের বুকে আঁকাবাঁকা নদীর কিনারা ধরে কোন দিগন্তে হারিয়ে যায়। পল্লীর ধুলোমাটির সাথে এ গানের কোথায় যেন একটা সুগভীর সংযোগ রয়েছে। থাক—সেদিন রিহার্সাল রুমে গানটি শুনে কবি আব্বাসউদ্দীনকে বললেন, 'আমি যতক্ষণ না তোমাকে থামতে বলি ততক্ষণ একটানা গেয়ে যাও গানটা।' আব্বাসউদ্দীন ব্যাপারটা বুঝলেন। তিনি চোখে বন্ধ করে দশ বারো মিনিট ধরে গেয়ে চললেন। হঠাৎ এক সময় কবি বললেন, 'থাম'। হাতে তাঁর পাণ্ডুলিপি। একটা মহৎ

পল্লীগীতি ইতিমধ্যে জন্মলাভ করেছে। কবি বললেন, 'এবার অবিকল ঐ সুরে গেয়ে যাও এই গানটি।' পূর্বোক্ত ভাওয়াইয়া গানের মাত্রা ঠিক রেখে কবি রচনা করলেন তাঁর এই বিখ্যাত পল্লীগীতিটি ঃ

'নদীর নাম সই অঞ্জনা
নাচে তীরে খঞ্জনা
পাখী সে নয় নাচে কালো আঁখি।
আমি যাব না আর অঞ্জনাতে
জল নিতে সখী লো
ঐ আঁখি কিছু রাখিবে না বাকী।

গানখানি পরে আব্বাসউদ্দীনের কণ্ঠেই রেকর্ড করা হয়। এই রেকর্ডের উল্টো পিঠে ছিল 'পদ্মদীঘির ধারে ধারে' গানখানি। এটিও একটি ভাওয়াইয়া গানের অনুকরণে লিখিত। সেই ভাওয়াইয়া গানের প্রথম স্তবকটি এই ঃ

'তেরষা নদীর পারে পারে ও
দিদিলো মানসাই নদীর পারে
আজি সোনার বঁধু গান করি যায় ও
দিদি তোরে কি মোরে কি
শোনেক দিদি ও।'

এর কিছুদিন পূর্বে কবি লিখেছিলেন তাঁর প্রসিদ্ধ পল্লীগীতি 'ঐ যে ভরা নদীর বাঁকে কাশের বনের ফাঁকেফাঁকে।' ভাটিয়ালী সুরে এ গানখানিও গেয়েছিলেন আব্বাসউদ্দীন এবং এই একটি মাত্র গানের পল্লীগীতি গায়ক হিসেবে তাঁর ব্যাপক প্রতিষ্ঠা অর্জিত হয়েছিল। কলকাতায় গানখানির জনপ্রিয়তা যে কী বিপুল হয়েছিল তা' সেদিনের প্রত্যক্ষদর্শীরা জানেন। পথে-ঘাটে, অলিতে-গলিতে শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলের কণ্ঠেই গানটি অনুরণিত হ'য়ে ফিরেছিল। কলকাতায় পল্লীগীতির জনপ্রিয়তার মূলে ছিল শহরবাসীর সদিচ্ছা। কলকাতায় যাঁরা থাকেন কমবেশী তাঁদের অধিকাংশই পল্লীবাসী। উপার্জন

ইত্যাদির জন্য তাঁরা শহরে বাস করে কিছুটা শহুরে হ'য়ে উঠেছেন সত্যি, কিন্তু তাঁদের মনটা বাঁধা রয়েছে মাটির মায়ায়। তাই তাঁরা পল্লীগীতগুলিকে অন্তরের সাথে গ্রহণ করলেন। ইট-কাঠের কৃত্রিমতায় তাঁদের মনটা হাঁফিয়ে উঠেছিল, পল্লীগীতি পেয়ে তাঁদের মনটা যেন তৃপ্তিতে ভিজে এল। এখন পথ চলতে চলতে আনমনে তাঁরা গেয়ে উঠল :

ঐ সে ভরা নদী বাঁকে
কাশের বনের ফাঁকে ফাঁকে
দেখা যায় যে ঘরখানি
সেথায় বধূ থাকে লো।'

অথবা :

'কুচ-বরণ কন্যা রে তার
মেঘ-বরণ কেশ
আমায় লয়ে যাও রে নদী
সেই কন্যার দেশ।'

৬.

নজরুলের সঙ্গে আব্বাসউদ্দীনের সম্পর্ক কেবল মৌখিক হৃদ্য আলাপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়—তা' সুগভীর আন্তরিকতায় পরিণত হয়েছিল। বিভিন্ন ঘরোয়া উৎসব-অনুষ্ঠানে একে অপরকে দাওয়াৎ করতেন—যেন একে-অপরের আত্মীয়। অবশ্য নজরুলের আত্মীয় কে নন, কার সাথে তিনি অনাত্মীয়সুলভ ব্যবহার করেছেন—এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া কঠিন।

আব্বাসউদ্দীনের প্রথম পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়েছে। তিনি এসে কবিকে ধরলেন একটা নাম রাখার জন্যে। কবি বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, এর নাম থাক 'মোস্তাফা কামাল'। এই নামকরণের ভিতরেও

নজরুলের নিজস্ব স্পৃহা সুস্পষ্ট। তিনি বলেছিলেন, "কামাল আতাতুর্কের মত এই ছেলে যেন একদিন আমাদের পরাধীন দেশকে স্বাধীন করতে পারে।"

আব্বাসউদ্দীন কবিকে কাজীদা বলে ডাকতেন। প্রকৃতপক্ষে কবি আব্বাসউদ্দীনের দাদার ভূমিকাই গ্রহণ করেছিলেন। সময় সময় তিনি তাড়না-ভর্ৎসনাও করতেন। আব্বাসউদ্দীন যখন রেকর্ড কোম্পানীতে যোগ দেন তখন কেস্টবাবু (কানাকেষ্ট) অপরিসীম জনপ্রিয়তার অধিকারী। হবু গায়কেরা অনেকেই কেস্টবাবুর কণ্ঠের নকল করার চেস্টা করতেন। এই অপচেস্টায় নিযুক্ত হয়েছিলেন আব্বাসউদ্দীন এবং নকলটা একেবারে নিখুঁত হ'য়েছিল। একদিন গ্রামোফোন কোম্পানীতে বসে কেস্টবাবুর নকল গাইছিলেন আব্বাসউদ্দীন। উপস্থিত সকলেই এই নকল কানাকেস্টকে পেয়ে মহাখুশি, এমন সময় কবি বেরিয়ে এলেন পাশের ঘর থেকে। ঘরে বসে বসে তিনি সবটাই শুনেছিলেন, বেরিয়ে এসে তীক্ষ্ণকণ্ঠে ভর্ৎসনা করলেন আব্বাসউদ্দীনকে। তিনি বললেন, "নকলনবীসী হ'লে আব্বাসউদ্দীনকে কেউ চিনবে না, বরং সকলের কাছে সে হেয়র পাত্র হ'বে। অরিজিন্যালিটি নস্ট করা পাপ, দ্বিতীয়বার যেন এই পাপে লিপ্ত হ'তে না দেখি।" বলাবাহুল্য এ কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন আব্বাসউদ্দীন।

৭.

গ্রামোফোন কোম্পানীতে রেকর্ড করার সুযোগ দিয়ে নজরুল যেমন সংগীত-জগতে প্রসিদ্ধ করে তুলেছিলেন আব্বাসউদ্দীনকে, তেমনি সঙ্গে-সাথে করে বিভিন্ন সভা-সমিতিতে নিয়ে গিয়ে তাঁকে পরিচিত করে দিয়েছিলেন বাংলার জনগণের সঙ্গে। ২৩-৮-৩৩ তারিখে নারায়ণগঞ্জ সংগীত-সংসদের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিকে লিখিত একটি পত্রে

নজরুল আব্বাসউদ্দীনকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করেন। চিঠিটির বিশেষ অংশ এই ঃ

সবিনয় নিবেদন,

শ্রীমান আজিজুল হাকিমের মারফৎ আপনাদের প্রস্তাব-মত নিম্নলিখিত সর্তে আমরা ছয়জন আর্টিস্ট নারায়ণগঞ্জ যাইতে রাজী হইয়াছি।

প্রথম সর্ত ঃ—আপনি আমাদিগকে ১২০০৲ টাকা (বারশত টাকা) দিবেন। ঐ টাকায় আমরা নারায়ণগঞ্জে আগামী ১৪ই ও ১৫ই সেপ্টেম্বর দুই রাত্রি গান করিব।···

···আমরা নিম্নলিখিত ছয়জন আর্টিস্ট যাইব ঃ—

১। অন্ধ গায়ক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে ২। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস, ৩। শ্রীনলিনাকান্ত সরকার, ৪। আব্বাসউদ্দীন আহমদ, ৫। শ্রীরাস বিহারী শীল (সঙ্গতিয়া), ৬। কাজী নজরুল ইসলাম।

আপনার পত্র ও সম্মতি পাইলে আপনার লিখিত-মত চুক্তি-পত্র সহি করিয়া পাঠাইয়া দিব। ইতি—

বিনীত—

নজরুল ইসলাম।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ৫ই ও ৬ই নভেম্বরে সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়েছিল 'সিরাজগঞ্জ যুব-সম্মেলন'। এই সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক এম, সিরাজুল হককে লিখিত একটি পত্রে আব্বাসউদ্দীনকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার কথার উল্লেখ আছে। প্রকৃতপক্ষে সে সময় কার্যক্ষেত্রে নজরুল যে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন, সংগীতক্ষেত্রে সুরের দোলায় আব্বাসউদ্দীনও তেমনি বাংলার হৃদয় লুট করে নিয়েছিলেন, আর সে সময় আদর্শ জন-নেতা হিসেবে প্রসিদ্ধ হ'য়েছিলেন শিরাজী সাহেব। এমন দিনে কবি প্রায়ই গভীর আবেগের সাথে বলতেন, "শিরাজী, আব্বাসউদ্দীন আর আমি—একত্রিত হ'লে বাংলা দেশ জয় করতে

পারি।” কথাটি এতটুকুও মিথ্যা নয়। এম. সিরাজুল হককে লিখিত চিঠিখানি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আকারেও দীর্ঘ নয়। তাই চিঠির সবটুকুই এখানে তুলে দিলাম :

কলিকাতা,

২, নভেম্বর ১৯৩২

“জনাব সম্পাদক সাহেব,

তস্‌লিম! আপনাদের নেতা আসাদউদ্দৌলা শিরাজীর মারফৎ আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ পেলাম। যে সময় সারা বাংলাদেশ আমার বিরুদ্ধে, সেই সময় এই বিদ্রোহীকে আপনারা তরুণদের পথ প্রদর্শনের জন্য ডেকেছেন। ধন্য আপনাদের সাহস!

‘ধূমকেতু’র সারথীরূপে নয়—যুদ্ধের ময়দান হতেই তারুণ্যের নিশান-বর্দার আমি। তাই ছুটে এসেছি দেশবাসীর পাশে। আজাদী অনাগত—তারই আগমনী গাওয়া ও তা হাসিল করাই বিপ্লবীর প্রাণের লক্ষ্য। আপনারা লক্ষ্য পথ ধরে যাত্রা করুন। কোনো বিঘ্নই সে পথে দাঁড়াতে সক্ষম হ'বে না। দেশ গোলামীর জিঞ্জির হ'তে মুক্ত হোক। মুক্ত-প্রাণে, মুক্ত-বাতাসে যেদিন মুক্তির গান গাইতে পারব, সেইদিন হবে আমার অভিযানের শেষ। আপনারা জনকয়েক তরুণ আমার সহযাত্রী হচ্ছেন, এ জন্য আমি একান্ত আশান্বিত। আজ যদিও চারদিকে বিভীষিকা—অনাদর অকৃতজ্ঞতা দেখা দিয়েছে—অবু ও পিছপা' হবার কিছু নেই। প্রতিভা, মনীষা, পাণ্ডিত্য, ত্যাগ ও সাধনার মূল্য একদিন সমাজ দেবেই। গায়ক আব্বাসউদ্দীনও আপনাদের আমন্ত্রণ কবুল করেছেন। ইনশাল্লাহ ৫ই নভেম্বর ভোরের ট্রেনে সিরাজগঞ্জ বাজার ষ্টেশনে পৌঁছাব।”

নজরুল তাঁর জীবনে যতগুলি কন্‌ফারেন্সে যোগ দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে এই সম্মেলনটি ছিল নিঃসন্দেহে অন্যতম। কবি এবং আব্বাসউদ্দীনকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে সৈয়দ আসাদউদ্দৌলা শিরাজী

সাহেব কলকাতায় এসেছিলেন। ৫ই নভেম্বরের ভোরে তাঁরা পৌঁছুলেন সিরাজগঞ্জ ষ্টেশনে। বাইরে প্রচণ্ড শীত। অথচ সেই শীতকে উপেক্ষা করে সাত আট হাজারের এক বিরাট জনতা কবিকে স্বাগত জানাবার জন্যে নীরবে অপেক্ষমান। খদ্দরের পাজামা, খদ্দরের শেরোয়ানী, খদ্দরের টুপি আর খদ্দরের উত্তরীয়। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল বলিষ্ঠ দেহে অপূর্ব সাজ। কবি নামলেন গাড়ী থেকে। বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে তাঁকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হ'ল। পুরনারীগণ চন্দন-পুষ্প নিয়ে পথের উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মানা। গাড়ি সামান্য একটু পথ গিয়ে থেমে যায়। চন্দনের ফোঁটা আর পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হয় দু'দিক থেকে। এমনি করে সারা শহর ঘুরিয়ে তাঁদের যখন মোক্তার আফজল আলী-খাঁ সাহেবের বাসায় নিয়ে আসা হ'ল তখন দীর্ঘ পাঁচ ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে গেছে। দুপুর একটার সময় আব্বাসউদ্দীনের উদ্বোধনী সংগীত দিয়ে সভার কাজ আরম্ভ হ'ল। বিশাল জনতা। সারা শহর বুঝি ভেঙ্গে পড়েছে। কোথাও তিল ধারণের জায়গা নেই। আব্বাসউদ্দীন সুরের যাদু দিয়ে জনতার হৃদয় দুলিয়ে দিলেন আর সেই হৃদয়ে আগুন জ্বাললেন নজরুল। তাঁর বাণীতে সেদিন বুঝি আগুন ঝরেছিল। নিখিল বাংলার তরুণদের ডাক দিলেন, বিপদ-বাধা দ'লে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। সঙ্কল্প তাঁর বন্ধনমুক্তির, স্বাধীনতার। সেদিন বিশাল জনতার সম্মুখে নজরুল যে অভিভাষণ পাঠ করেছিলেন, আমার মনে হয় সেটি ছিল তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিভাষণ। এই একটি মাত্র অভিভাষণে নজরুলের সমগ্র জীবনাদর্শ বিধৃত হ'য়ে আছে। এই মূল্যবান সুদীর্ঘ অভিভাষণটির সামান্য অংশ উদ্ধৃত করে দিলাম:

...আমি কবি। বনের পাখীর মত স্বভাব আমার গান করার। কাহারও ভালো লাগিলেও গাই, ভালো না লাগিলেও গাহিয়া যাই। ...আমার একমাত্র সম্বল, আপনাদের—তরুণদের প্রতি অপরিসীম ভালবাসা। গানে কবিতায় আমার সকল শক্তি দিয়া তাহারই জয় ঘোষণা করিয়াছি। যৌবন-সূর্য যেথায় অস্তমিত দুঃখের তিমির-

কুন্তলা নিশীথিনীর সেই ত' লীলাভূমি।···খোদার দেওয়া এই পৃথিবীর নিয়ামত হইতে যে নিজেকে বঞ্চিত রাখিল, সে যত মুনাজাতই করুক, খোদা তাহা কবুল করিবেন না। খোদা হাত দিয়াছেন বেহেশ্‌তী চীজ অর্জন করিয়া লইবার জন্য, ভিখারীর মত হাত তুলিয়া ভিক্ষা করিবার জন্য নয়। আমাদের পৃথিবী আমরা আমাদের মনের মত করিয়া গড়িয়া লইব। ইহাই হউক তরুণের সাধনা। আমাদের বাঙালী মুসলিমদের মধ্যে যে গোঁড়ামী, যে কুসংস্কার তাহা পৃথিবীর আর কোনো দেশে, কোনো মুসলমানদের মধ্যে নাই বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। আমাদের সমাজের কল্যাণকামী যেসব মৌলানা সাহেবান খাল কাটিয়া বেনো জল আনিয়াছিলেন, তাঁহারা যদি ভবিষ্যদ্দর্শী হইতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন—বেনো জলের সাথে সাথে ঘরের পুকুরের জলও সব বাহির হইয়া গিয়াছে। উপরন্তু সেই খাল বাহিয়া কুসংস্কারের অজস্র কুমীর আসিয়া ভিড় করিয়াছে। মৌলানা মৌলবী সাহেবকে সওয়া যায়, মোল্লাকেও চক্ষুকর্ণ বুঁজিয়া সহিতে পারি, কিন্তু কাঠ মোল্লার অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। ইসলামের কল্যাণের নামে ইঁহারা যে কওমের জাতির ধর্মের কি অনিষ্ট করিতেছেন, তাহা বুঝিবার মত জ্ঞান নাই বলিয়াই ইঁহাদের ক্ষমা করা যায়। ইঁহারা প্রায় প্রত্যেকেই "মন-মন শাহ ফরীদ, বগলমে ইট।" ইঁহাদের নীতি "মুর্দা দোজখ মে যায় য়্যা বেহেশ্‌ত মে যায়, মেরা হালুয়া রুটি সে কাম।" ইহাদের ফতুয়াভরা ফতোয়া। বিবি তালাক ও কুফরীর ফতোয়া ত' ইহাদের জাম্বিল হাতড়াইলে দুই দশ গণ্ডা পাওয়া যাইবে। এই ফতোয়াধারী ফতোয়াবাজদের হাত হইতে গরীবদের বাঁচাইতে যদি কেহ পারে ত' সে তরুণ! ···আমাদের পথে মোল্লারা যদি হ'ন বিন্ধ্যাচল, তাহা হইলে অবরোধ প্রথা হইতেছে হিমাচল। আমাদের দুয়ারের সামনের এই ছেঁড়া চট যে কবে উঠিবে খোদা জানেন। আমাদের বাঙলা দেশের স্বল্পশিক্ষিত মুসলমানদের যে অবরোধ, তাহাকে অবরোধ বলিলে অন্যায় হইবে, তাহাকে

একেবারে শ্বাসরোধ বলা যাইতে পারে।...এখন আমাদের তরুণদের সাধনা হউক আমাদের এই চির-বন্দিনী মাতা-ভগ্নীদের উদ্ধারসাধন। জন্ম হইতে দাঁড়ে বসিয়া যে পাখী দুধ ছোলা খাইতে শিখিয়াছে, সে ভুলিয়া গিয়াছে যে সেও উড়িতে পারে। এই পিঞ্জিরের পাখীর দ্বার মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। খোদার দান এই আলো-বাতাস হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিবার অধিকার কাহারও নাই। খোদার রাজ্যে পুরুষ আজ জালিম, নারী আজ মজলুম। ইহাদেরই ফরিয়াদে আমাদের এই দুর্দশা, আমাদের মত হীন-বীর্য সন্তানের জন্ম।...পৃথিবীর অন্যান্য মুসলমান-প্রধান দেশের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, এই ভারতেরই সকল প্রদেশের আজও যাঁহারা সর্বশ্রেষ্ঠ গুণী—কি কণ্ঠ-সংগীতে, কি যন্ত্র-সংগীতে—তাঁহাদের প্রায় সকলই মুসলমান।...সংগীত-শিল্পের বিরুদ্ধে মোল্লাদের সৃষ্ট এই লোকমতকে বদলাইতে তরুণদের আপ্রাণ চেষ্টা করিতে হইবে। তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে যাহা সুন্দর তাহাতে পাপ নাই। সকল বিধি-নিষেধের উপরে মানুষের প্রাণের ধর্ম বড়। আজ বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে একজনও চিত্র-শিল্পী নাই। ভাস্কর নাই, সংগীতজ্ঞ নাই, বৈজ্ঞানিক নাই, ইহা অপেক্ষা লজ্জার আর কি আছে? এই সবে যাহারা জন্মগত প্রেরণা লইয়া আসিয়াছিল, আমাদের গোঁড়া সমাজ তাহাদের টুঁটি টিপিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে ও ফেলিতেছে। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমাদের সমগ্র শক্তি লইয়া যুঝিতে হইবে।...পশুর মত সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়া বাঁচিয়া আমাদের লাভ কি যদি আমাদের গৌরব করিবার কিছুই না থাকে। ভিতরের দিকে আমরা যত মরিয়াছি, বাহিরের দিকে তত সংখ্যায় বাড়িয়া চলিয়াছি। এক মাঠ আগাছা অপেক্ষা একটি মহীরুহ অনেক বড়—শ্রেষ্ঠ।"...

নজরুল আব্বাসউদ্দীনকে গভীর ভাবেই ভালবাসতেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ক্লাসিকালে গান না শিখলে কণ্ঠ-শিল্পে ঐশ্বর্যবান হওয়া যায় না। আব্বাসউদ্দীনের কণ্ঠে যে সুরের বুলবুলি ঘুমিয়ে

আছে—ক্ল্যাসিকালের দৌলতে তা' পাখা মেলে দূর নভোলোকের শাশ্বত সৌন্দর্যপথে উড়ে যাবে। সে জন্যে তিনি H. M. V-র ট্রেনার ওস্তাদ জমিরউদ্দীন খাঁ সাহেবের কাছে আব্বাসউদ্দীনের তালিম নেওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ইন্দুবালা, আঙ্গুরবালা, কমলা ঝরিয়া ইত্যাদি কমবেশি সকলেই ওস্তাদ জমিরউদ্দীনের মন্ত্রশিষ্যা।

৮.

নজরুলের কিছু কিছু গানে সুরযোজনা করেছিলেন আব্বাসউদ্দীন। তুরস্ক থেকে কলকাতায় এসেছেন নারীজাগরণের অগ্রপথিক মাদাম খালিদা এদিব হানুম। কারমাইকেল হোস্টেলের ছাত্রবৃন্দ তাঁর অভ্যর্থনার আয়োজন করেছেন। কবির ওপর পড়েছে উদ্বোধনী সংগীত রচনার ভার : কবি লিখলেন :

গুণে গরীমায় আমাদের নারী
আদর্শ দুনিয়ায়,
রূপে লাবণ্যে মাধবী ও শ্রী-তে
হুর পরী লাজ পায়।
...লক্ষ খালেদ আসিবে যদি
এ নারীরা মুক্তি পায়॥

সঙ্গে সঙ্গে সুরযোজনা করে গাইলেন আব্বাসউদ্দীন। অবশ্য পরে এটি রেকর্ড করা হয়েছিল।

এমনি ভাবে বহু সমসাময়িক প্রয়োজনে রচিত গানে সুর দিয়েছিলেন আব্বাসউদ্দীন এবং সেগুলি গেয়ে প্রয়োজন সিদ্ধ করেছিলেন।

উত্তরবঙ্গে বন্যার তাণ্ডবলীলা সুরু হয়েছে। কবি রচনা করলেন 'ভিক্ষা দাও গো পুরবাসী'। একদল গায়কের সাথে হারমোনিয়াম

গলায় ঝুলিয়ে রাস্তায় বেরুলেন আব্বাসউদ্দীন। হাজার হাজার টাকা ও গাড়ি গাড়ি বস্ত্র এনে জমা দিলেন ফ্লাড রিলিফ ফাণ্ডে।

ঢাকায় সুরু হয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। চারিদিকে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি। দেশের মানুষ বুঝি শুভবুদ্ধি হারিয়ে পশুতে পরিণত হ'তে চাইছে। ব্যথিত হলেন নজরুল। দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু-মুসলিমের হাতে মিলনের রাখি পরাবার জন্যে কবি লিখলেন দুটি গান: 'ভারতের দুই নয়নতারা হিন্দু-মুসলমান', 'হিন্দু আর মুসলিম মোরা দুই সহোদর ভাই।' মৃণালকান্তি ঘোষ আর আব্বাসউদ্দীনের মিলিত কণ্ঠে গান দু'খানি রেকর্ড করা হয়েছিল।

পল্লীগীতি এবং ইসলামী সংগীতে আব্বাসউদ্দীন যথেস্ট নাম করেছিলেন—কিন্তু কোনো স্বদেশীগানে তখনো পর্যন্ত তিনি কণ্ঠ দেন নি। এটি লক্ষ্য করলেন নজরুল। স্বদেশী গান গাওয়ার জন্যে তিনি আব্বাসউদ্দীনকে বল্‌লেন। কেবল বলা নয়—দুটি স্বদেশীগানও রচনা করে দিলেন। নজরুলের বহুতর প্রথম শ্রেণীর স্বদেশী গানের মত এ গান দু'টির বাণী ছিল অপূর্ব। ভাব এবং কথা, কথা এবং ভাব এক অদ্বৈত সম্পর্কে বিজড়িত হয়েছিল। প্রথম গানটির কথা 'ভোলো লাজ ভোলো গ্লানি জননী মুক্ত আলোকে জাগে' আর দ্বিতীয় গানটি ছিল 'নম নম নম বাংলা দেশ মম চির মনোহর চির মধুর।'

নজরুল এবং আব্বাসউদ্দীন একে অপরের সাথে বহুতর আবেগময় মুহূর্ত কাটিয়েছেন। একে অপরকে সূক্ষ্মতমভাবে পর্যবেক্ষণ করারও সুযোগ পেয়েছেন। ব্যক্তিগত সংস্পর্শে এসে নজরুলের অন্তর-লোকের দিকে দৃষ্টি ফেলে অবাক হয়ে গেছেন আব্বাসউদ্দীন, কী মহৎ হৃদয়! কী মহৎ প্রাণ!! কোথাও কোন গ্লানি নেই, কোথাও কোনো মালিন্য নেই—বিশাল অন্তরপ্রদেশ চির আলোকময়, চির জ্যোতির্ময়। হিন্দু-মুসলিমের

দাঙ্গা নিয়ে বহুবার কথা হয়েছে উভয়ের মাঝে, প্রতিবারই কবির চোখ সজল হয়ে উঠেছে, দেশের হ'ল কী—মানুষ কী সব পাগল হ'য়ে গেল !!

৯.

নজরুল ছিলেন হিংসা-দ্বেষের অতীত। এ দু'টি জিনিষ কখনো তাঁকে স্পর্শ করে নি। অসূয়া বলে জিনিষটি তিনি জানতেন না। বহুভাবে বহুক্ষেত্রে এটি লক্ষ্য করেছেন আব্বাসউদ্দীন। কবি যে খাতায় সংগীত রচনা করতেন সেটি অধিকাংশ সময় গ্রামোফোন কোম্পানীতে ফেলে রেখে আসতেন। আব্বাসউদ্দীন বহু সময় লক্ষ্য করেছেন হবু সংগীত রচয়িতারা সেই খাতায় সদ্যরচিত কোনো কোনো গানের পংক্তিকে সামান্য কিছু অদল-বদল করে তাঁদের গানে সংযুক্ত করেছেন। কবিকে এ কথা জানাতেই একটু হেসে অবহেলা করে উত্তর দিয়েছেন, 'কত নেবে—নিক না! কলসী করে জল নিলে কলসী ভাঙতে পারে—সাগর শুকোবে না।'

বেহিসেবী নজরুলের একটি চমৎকার পরিচয় দিয়েছেন আব্বাসউদ্দীন। কবির ঘরেই বসে আছেন উভয়ে। একজন হকার কাপড়ের মোট কাঁধে করে হেঁকে চলেছে। কবি ডাকলেন তাকে। কোনো দরদস্তুর না করে ছেলেদের জন্য কয়েকগজ সিল্কের কাপড় কিনলেন। তিন দিন পর উভয়ে আবার মিলিত হয়ে গল্প করছেন—সেই চীনাম্যান হকারটি কাপড়ের বোঝা কাঁধে করে আবার হাঁকতে হাঁকতে চলেছে। আজও তাকে ডাকা হ'ল এবং কিছু কাপড় কেনা হ'ল। চীনাম্যান যা দাম চাইল তাই দিয়ে দিলেন কবি। আব্বাসউদ্দীন সংসারী এবং হিসেবী মানুষ। তিনি লক্ষ্য করলেন একই কাপড়, মাত্র এই তিন দিনের ব্যবধানে মূল্যের

দিক থেকে দেড়গুণ হ'য়েছে। কবিকে কথাটা জানাতেই তিনি বললেন, আরে কাপড়ের পাহাড় কাঁধে করে ঘুরছে, গরীব মানুষ নেবে না দু'টো পয়সা।

এই-ই নজরুল। বেহিসেবী, উদ্দাম এবং উদার!

১০.

অনেক সংগীতের জন্মক্ষণের সাক্ষী আব্বাসউদ্দীন। অতি নিকট থেকে তিনি লক্ষ্য করেছেন কেমনভাবে এক একটি সংগীত জন্ম নিচ্ছে কবির তুলিতে। একটি উৎকৃষ্ট আধুনিক গানের জন্মেতিহাসের যে কৌতুককর বিবরণ দিয়েছেন তিনি, সেটি উল্লেখ করে আমরা এ প্রসঙ্গের সমাপ্তি টানবো।

একদিন গ্রামোফোন কোম্পানীতে আব্বাসউদ্দীন এবং তৎকালীন অন্যান্য অনেক খ্যাতনামা গাইয়ের দল বসে খোশ গল্পে মেতে উঠেছিলেন। এম সময় কাজী কবি প্রশ্ন করলেন, 'লটারীতে যদি সবাই লাখখানেক করে টাকা পেয়ে যাও তবে তোমরা তোমাদের প্রিয়াকে কে কী ভাবে সাজাতে চাও'। কলরব ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ হ'ল। একটু পরেই মতামত বর্ষাতে লাগল অবিরল ধারায়। কেউ বললেন, 'আমি এখনই চলে যাব 'ওয়াসেল মোল্লা'য়, কেউ বললেন 'কমলালয় ষ্টোর্সে', কেউ বললেন 'প্রিয়াকে নিয়ে চলে যাব এম বি সরকারে—জড়োয়া গহনায় অঙ্গ দ্যুতিময় করে দেব', নানাজনের নানা কথা আর মন্তব্যের শিলাবৃষ্টি থামিয়ে কবি এগিয়ে এলেন। হারমোনিয়াম নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সুরু হ'ল তাঁর প্রিয়াকে সাজানোর কাজ।

বলাবাহুল্য গগনচারী উদ্দাম কল্পনার সাহায্যেই তিনি বিনাপয়সায় সাজালেন তাঁর অনন্ত প্রিয়াকে। সৃষ্টি হ'ল বাংলার আধুনিক সংগীতের একটি নিত্যকালীন সম্পদ :

মোর প্রিয়া হ'বে এসো রাণী

দেব খোঁপায় তারার ফুল।

কর্ণে দোলাব তৃতীয়া তিথির

চৈতী চাঁদের দুল॥

কণ্ঠে তোমার পরাবো বালিকা

হংস-সারির দোলান মালিকা

বিজলী জরির ফিতায় বাঁধিব

মেঘ-রং এলো চুল॥

জোছনার সাথে চন্দন দিয়ে

মাখাব তোমার গায়,

রামধনু হ'তে লাল রং ছানি

আলতা পরাব পায়।

আমার গানের সাত সুর দিয়া

তোমার বাসর রচিব যে প্রিয়া

তোমারে ঘিরিয়া গাহিবে

আমার কবিতার বুলবুল॥

এই দুই মহান শিল্পী আজ নীরব। সুরশিল্পী আব্বাসউদ্দীন পাকিস্তান হওয়ার পর ঢাকায় চলে গিয়েছিলেন এবং সেখানেই ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর, বুধবার, সকাল ৭-২০ মিনিটে পরলোকগমন করেছেন। নজরুল আজ থেকেও নেই। আর আমরা কোনো দিনই এই দুই মহৎ সংগীত-শিল্পীর কণ্ঠে নতুনতর কিছু শুনতে পাব না। এ সৃষ্টি-লয় অপূরণীয়।

আফজালুল হক

১.

সং চিন্তা এবং উন্নত রুচিবোধ না থাকলে কখনো কোন মহং প্রচেষ্টার পূর্ণতর রূপ দেওয়া সম্ভব হয় না। সৌভাগ্যক্রমে আফজালুল হকের মধ্যে এই দুর্লভ গুণাবলীর আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছিল। এই গুণাবলীয় সঙ্গে মিশেছিল আথিক সঙ্গতি ও উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত বংশ মর্যাদা। আফজালুল হক সাহেব হলেন শান্তিপুরের অধিবাসী। তাঁর পিতা ছিলেন অবিভক্ত বাংলার অন্যতম কবি—মোজাম্মেল হক। 'ফেরদৌসী চরিত', 'শাহনামা', 'মহর্ষি মনস্থুর' প্রভৃতি অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য পুস্তকের তিনি রচয়িতা। হক সাহেবের ভাই হ'লেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সলার স্যার আজিজুল হক। ইনিও ছিলেন মনেপ্রাণে সাহিত্যানুরাগী। সুতরাং এই পরিবারের মধ্যে যে একটি পরিছন্ন রুচি ও সাহিত্যের সুন্দর পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল সে কথা কল্পনা করতে কোন অসুবিধা নেই। বংশগত এই রুচি ও আভিজাত্য পরবর্তীকালে আফজালুল হকের অনেক উপকারে এসেছিল।

'মোসলেম পাবলিশিং হাউস' নামে আফজালুল হকের একটি পুস্তক প্রকাশনা ছিল। তাঁর পিতার কাব্য ও জীবনীমূলক গ্রন্থগুলি ছাড়াও তিনি অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন। এই পুস্তক

প্রকাশনাটির পরিচালন ভার গ্রহণ করে হক সাহেব একটি রুচিপূর্ণ আদর্শ মাসিকের অভাব বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। সে সময় মুসলিম সম্পাদিত কোন উল্লেখযোগ্য মাসিক পত্রিকা ছিল না। সুতরাং এই প্রকাশনী হ'তে তিনি একটি আদর্শ মাসিক পত্রিকা প্রকাশের জন্য বদ্ধপরিকর হন। এই মাসিক পত্রিকাটির সঙ্গে কবি নজরুলের নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এমন কি কবির প্রথম দিকের সকল শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এই পত্রিকাটির পৃষ্ঠায় সর্বপ্রথম আত্ম-প্রকাশ করে। কেবল কবি নজরুলের নয়, এই পত্রিকাটির সঙ্গে সমকালীন সাহিত্যানুরাগী বাঙালী হিন্দু-মুসলিমের একটি ঘনিষ্টতম সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। সুতরাং এই পত্রিকাটির সম্বন্ধে একটু বিশদ ভাবে আলোচনার প্রয়োজন আছে। তা' ছাড়া বিষয়টি আজ পর্যন্ত আশ্চর্যভাবে অনালোচিতই রয়ে গেছে।

পত্রিকাটির প্রকাশ সম্পর্কে এক রকম স্থির সিদ্ধান্তই নেওয়া হ'ল। কিন্তু নাম করণ নিয়ে প্রথমেই বাধল গোলযোগ। নিজের পুস্তক প্রকাশনীর নামের সঙ্গে মিলিয়ে আফজালুল হক পত্রিকাটির নাম করণ করতে চাইলেন "মোসলেম ভারত"। জনাব মুজফ্‌ফর আহমদ এরূপ নামকরণে প্রবল আপত্তি তোলেন। তাঁর আপত্তির কারণগুলি হ'ল এই ঃ

সে সময় ৩২ নং কলেজ স্ট্রীটের দোতলায় প্রধানতঃ মুসলিম লেখকদের একটি সমিতি গড়ে উঠেছিল। এই সমিতির নামকরণ হয় "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি"। এই সমিতির ত্রৈমাসিক মুখপাত্রটির নাম "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা"। এই সমিতি ও মুখপাত্রের সঙ্গে হক সাহেব মোটামুটি ভাবে যুক্ত ছিলেন। তা' ছাড়া আফজালুল হকের পুস্তক প্রকাশনটির নাম ছিল "মোসলেম পাবলিশিং হাউস"। এর উপরেও মাসিক পত্রিকাটির নাম "মোসলেম ভারত" রাখার বিশেষ সার্থকতা নেই। এ সকল দিক লক্ষ্য করেই মুজফ্‌ফর সাহেব নামকরণটির বিরোধিতা করেন। আফজালুল হক সাহেবও

ছিলেন মজফ্‌ফর সাহেবের মত উদারপন্থী। যাঁরা তাঁর সঙ্গে মিশেছেন তাঁরা জানেন কোন সংকীর্ণ গোঁড়ামিতে তাঁর চিত্ত আবিল নয়। তবুও কেন জানিনা তাঁর মনে হ'য়েছিল এই পত্রিকা প্রথম দিকে হিন্দু-সমাজ ক্রয় করবেন না। বাংলা সাহিত্য-পত্রিকার বাজারে তখন প্রবাসী, ভারতবর্ষ ও বিচিত্রা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। তাই পত্রিকাটির পৃষ্ঠপোষক রূপে নিখিল বাংলার মুসলিম সমাজকে পাওয়ার জন্যে তিনি পত্রিকাটির নাম 'মোসলেম ভারত' রাখারই সিদ্ধান্ত নিলেন। নিতান্ত ব্যবসায়িক সাফল্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই এমন নামকরণ করা হ'য়েছিল—অন্য কোন কারণে নয়।

যা' হোক নামকরণের ব্যাপারটি মিটে গেল। এবার চলতে লাগল পরিকল্পনা ও লেখা সংগ্রহের চেষ্টা। আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি—জনাব আফজালুল হকের মধ্যে একটি পরিচ্ছন্ন রুচিবোধ ছিল। সুতরাং কী অঙ্গসজ্জা, কী প্রচ্ছদপট, কী লেখার নির্বাচন কোন দিকেই যাতে কোন ত্রুটি না থাকে তার জন্যে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা শুরু করলেন।

প্রথমেই লক্ষ্য দিলেন প্রচ্ছদপটের উপর। প্রথম দর্শনেই যাতে পত্রিকাটি তার স্নিগ্ধ রুচি দিয়ে পাঠককে আকৃষ্ট করতে পারে তার জন্যে সকল রকম আয়োজন করা হ'লো। ব্যয়বহুল আয়োজন।

হক সাহেব যখন প্রচ্ছদপটের কথা চিন্তা করছিলেন সে সময় "Life of Mohammad" নামে একটি মূল্যবান বই তাঁর হস্তগত হয়। বইটির লেখক হলেন একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ Soliman Bin Ibrahim. ভদ্রলোক ফরাসী মুসলমান। বইটি অনেকগুলি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতি অধ্যায়ের প্রথমে ছিল বহুবর্ণে রঞ্জিত একটি করে নয়নাভিরাম চিত্র। বইটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে লেখা হ'য়েছে "A glorious illustrated volume. The text drawn from Oriental sources by Soliman Bin Ibrahim, is adorned with 35 full-Page coloured plates by E. Dinet, the great French Painter and

adorned with 12 ornamental Pages, Coloured and gilt with decorative lettering, arabesques etc. by Mohammad Racim. Published by "The Paris Book Club", Paris. Printed on Imperial Japanees volume. Price Rs. 225 Per copy". এই মূল্যবান পুস্তকটির একটি কপি হক সাহেব দু'শো টাকায় কেনেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী E. Dinet অঙ্কিত চিত্রগুলি হক সাহেবের অত্যন্ত ভাল লেগেছিল। তিনি ঐ চিত্রগুলির একটিকে 'মোসলেম ভারত'-এর প্রচ্ছদপট হিসেবে ব্যবহারের মনস্থ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি "The Paris Book Club"-এর কাছে অনুমতি চেয়ে পত্র লিখলেন। অল্পদিনের মধ্যে উত্তর এলো। The Paris Book Club আনন্দের সঙ্গে সম্মতি দিয়েছেন।

সম্মতি তো এলো কিন্তু ব্লক করবে কে? চিত্রগুলির মধ্যে যে সূক্ষ্ম কারুকার্য ছিল তা' খ্যাতিসম্পন্ন কোন ব্লক মেকার ছাড়া যথাযথ অবিকৃত অবস্থায় ফুটিয়ে তোলা সম্ভব ছিল না। সে সময় কলকাতার নাম করা ব্লক মেকার ছিলেন 'Ura & Sons'-এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছিলেন "সন্দেশে"র খ্যাতনামা সম্পাদক শ্রীসুকুমার রায় ও সুবিনয় রায়। ডিজাইন দেখা মাত্র ওঁরা ব্লক করে দিতে সম্মত হ'লেন। ব্লক করতে গিয়ে এক গোলযোগ দেখা দিল। মূল ডিজাইনের মাঝখানে আরবী অক্ষরে পরিচিতি লেখা ছিল—ঐ অংশটি তুলে ওখানে আরবী ধাঁচের অক্ষরে "মোসলেম ভারত" শব্দটি লেখার প্রয়োজন হলো। বলাবাহুল্য বাংলার অমর শিশু-সাহিত্যিক সুকুমার রায় কেবল লেখক ছিলেন না—ছিলেন ভাল শিল্পীও। তিনি আরবী অক্ষরের অনুকরণে মূল চিত্রের মধ্যস্থলে "মোসলেম ভারত" শব্দ দুটি লিখে দেওয়ার ভার নিলেন। সর্বোপরি একটি শিল্প-সম্মত কাজ করতে পেয়ে তিনি মনে মনে খুব খুশীই হয়েছিলেন।

যথাসময়ে ব্লক তৈরী হয়ে গেল। এবার এল মুদ্রণের পালা। চিত্রের সূক্ষ্ম কারুকার্যের যথাযথ পরিস্ফুটনের জন্য ব্লকে যে ধরণের

২০

নজরুলের লেখাসহ 'মোসলেম ভারতে'র প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যা, ১৩২৭ সালের বৈশাখ মোতাবেক ১৯২০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয়।

শেষে এমন হয়েছিল যে নজরুলকে বাদ দিয়ে "মোসলেম ভারতে"র কল্পনাই করা যেত না। সেকালে কবিগুরু যেমন ছিলেন "প্রবাসী"র শ্রেয়তম লেখক নজরুলও তেমনি ছিলেন "মোসলেম ভারতে"র। হাবিলদার কবির জীবনের সকল শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি" "মোসলেম ভারতে"র পৃষ্ঠাতেই আত্মপ্রকাশ করেছে।

"মোসলেম ভারতে"র প্রথম সংখ্যায় "বাঁধন-হারা" পত্রোপন্যাসের প্রথম কিস্তি ছাড়া কবির অন্য কোনো লেখা প্রকাশিত হয়নি। এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন নজরুল তখন ছোটগল্পের লেখক হিসেবে পরিচিত, কবি হিসেবে নন। তিনি যে কবিতা লেখেন এ সংবাদ অনেকেই জানতেন না। এমন কি কবি শাহাদৎ হোসেন নন, আফজালুল হক সাহেবও নন। ,শাহাদৎ হোসেন সাহেব তখন মাসিক "সওগাতে"র সঙ্গে যুক্ত। লেখার জন্য তিনি এলেন নজরুলের কাছে—৩২নং কলেজ স্ট্রীটে। লেখা চাইতেই নজরুল বললেন, "কী লেখা দেব—গল্প না কবিতা।"

কবিতা লেখেন শুনে শাহাদৎ হোসেন বিস্মিত হয়ে গেলেন। বললেন, "আপনি কবিতাও লেখেন নাকি!"

"বোধন" কবিতাটি সর্বপ্রথম কবির নিকটে দেখে আফজালুল হক সাহেবও বিস্মিত হয়ে প্রায় অনুরূপ উক্তি করেন। এই

"বোধন" কবিতাটি রচনার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে। নজরুল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সঙ্গে করে এনেছিলেন অমর কবি হাফিজের একখানি "দিওয়ান"। এই "দিওয়ানে"র একটি গজলের প্রথম পংক্তি ছিলঃ "য়ুসোফে গুম গশতা বাজ আয়েদ বা-কিনান গম মখোর"। জনাব মুজফ্ফর আহমদ ও মঈনুদ্দীন হোসেন সাহেবের অনুরোধে একদিন সন্ধ্যায় বসে কবি এটি অনুবাদ করে ফেলেন। অনূদিত কবিতাটির ছন্দ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিল জননী ভারতবর্ষে"র ছন্দানুযায়ী লিখিত। প্রথম পংক্তিটি এইঃ "দুঃখ কি ভাই হারানো ইউসুফ কিনানে আবার আসিবে ফিরে।" পরদিন সকালে অনূদিত সমগ্র কবিতাটি পড়ে আফজাল সাহেব এমনই অভিভূত হয়ে পড়েন যে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই কবিতাটি দ্বিতীয় সংখ্যা "মোসলেম ভারত"-এ মুদ্রণের জন্য প্রেসে পাঠিয়ে দেন। এই সংখ্যায় নজরুলের আর একটি কবিতা মুদ্রিত হয়—নাম "শাত-ইল-আরব"। প্রথম জীবনে নজরুল যে ক'টি সাড়া জাগানো কবিতা লেখেন এবং যাদের জন্য তাঁর নাম নিখিল বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে আলোচ্য কবিতাটি তাদের মধ্যে অন্যতম। মুসলিম ঐতিহ্য নিয়ে লেখা এই কবিতাটির ধ্বনি-বৈচিত্র্য ও ছন্দ-মাধুর্য সমকালীন বাংলার অসংখ্য পাঠককে মোহিত করেছিল। এমন কী সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার অখ্যাত কবির এই কবিতাটি পড়ে এমনই বিমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন যে, তিনি সঙ্গে সঙ্গে কবিকে স্বাগত জানিয়ে "মোসলেম ভারতে"র সম্পাদককে একটি সুদীর্ঘ পত্রে লেখেনঃ—"বহুদিন কবিতা পড়িয়া এত আনন্দ পাই নাই, এমন প্রশংসার আবেগ অনুভব করি নাই।" এই কবিতাটি রচনারও একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে —সেটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্যঃ

নজরুলের নিকট "মেসোপটেমিয়া" নামে একটি ইংরাজী বই ছিল। সম্ভবতঃ এ বইটাও তিনি সেনানিবাসে থাকাকালীন সংগ্রহ

করেছিলেন। যা হোক—এ বইয়ের প্রথমে আর্টপেপারে একটি অপূর্ব চিত্র মুদ্রিত ছিল। ছবিটি আফজাল সাহেবের খুব পছন্দ হয়েছিল—তিনি প্রথমে কেবলমাত্র এটিকে "মোসলেম ভারতে" মুদ্রণের বাসনা প্রকাশ করেন। কিন্তু পরিচয়হীন কেবলমাত্র একটি সুন্দর ছবি মুদ্রণের সার্থকতা কোথায়? তাই তিনি নজরুলকে এর একটি পরিচিতি (কবিতা নয়) লিখে দিতে বলেন। কিন্তু নজরুল গদ্যেয় পরিচয়লিপি লেখার জন্য অনুরুদ্ধ হয়ে সকলকে বিস্মিত করে অতি অল্প সময়ের মধ্যে লিখে ফেলেন একটি সুদীর্ঘ এবং অনবদ্য কবিতা, ধ্বনির কী দ্যোতনা—ছন্দের কী তুর্লভ ঐশ্বর্য। নাম—"শাত-ইল-আরব।" এই কবিতাটি ছাড়াও "একজন সৈনিক" ছদ্ম-নামের আড়ালে নজরুল নিজেই গদ্যেয় উল্লিখিত ছবিটির এই পরিচয় লিপিটি লিখে দেন: "টাইগ্রীস" (দিজলা) আর ইউফ্রেটিস (ফোরাত) বসরার অদূরে একজোট হয়ে "সাত-ইল-আরব" নাম নিয়েছে। তারপর বসরার পাশ দিয়ে বয়ে পারস্য উপসাগরে গিয়ে পড়েছে। এর তীরে দু'তিন মাইল করে চওড়া খর্জ্জুর-কুঞ্জ, তাতে ছোট নহর আর তারই কূলে কূলে আঙুরলতার বিতান, বেদানা, নাশপাতির কেয়ারী, এখানে এলেই অনেক পুরানো স্মৃতি জেগে ওঠে আর আপনিই গাইতে ইচ্ছে করে—

শাতিল্-আরব! শাতিল্-আরব!!
পূত যুগে যুগে তোমার তীর,
শহীদের লোহু দিলীরের খুন
ঢেলেছে যেখানে আরব বীর।"

এই পরিচয়লিপিও দ্বিতীয় সংখ্যা "মোসলেম ভারতে" মুদ্রিত হয়।

তৃতীয় (আষাঢ়) সংখ্যায় মুদ্রিত হয় "বাদল প্রাতের শরাব" কবিতাটি। এটিও অমর কবি "হাফিজের ছন্দ ও ভাব" অবলম্বনে

রচিত। এই কবিতাটির ছন্দও মোহিতলাল মজুমদারকে বিশেষরূপে আকৃষ্ট করে। কবিতাটির প্রথমে কয়েকটি অবিস্মরণীয় পংক্তি এই :

বাদ্‌লা-কালো স্নিগ্ধ আমার কান্তা এলো রিমঝিমিয়ে
বৃষ্টিতে তার বাজল নূপুর পায় জোরেরই শিঞ্জিনী যে।
ফুটলো উষার মুখটি অরুণ, ছাইল বাদল তাম্বু ধারায় ;
জমলো আসর বর্ষা-বাসর, দাও সাকী দাও ভর-পিয়ালায়!"

চতুর্থ (শ্রাবণ) সংখ্যার প্রথমেই প্রকাশিত হয় কবির সাড়া জাগানো কবিতা 'খেয়াপারের তরণী' আর রূপক গল্প 'বাদল বরিষণে'।

'খেয়াপারের তরণী' কবিতাটি রচনার একটি মনোরম পটভূমি আছে—সেটি এখানে উল্লেখ করা গেল। আফজালুল হক সাহেব "মোসলেম ভারত" পত্রিকাখানির উচ্চমান বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন মত বাংলার সর্বত্র যাতায়াত করেছেন। যেখানে তিনি কোন আদর্শ রুচিপূর্ণ জিনিষের সন্ধান পেয়েছেন সেটি সাদরে পত্রিকাটির জন্য সংগ্রহ করে এনেছেন। একবার তিনি ঢাকায় যান। এখানে বিখ্যাত নওয়াব পরিবারের সঙ্গে তাঁর আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা হয়। এই সময় নওয়াবজাদী মেহেরবানু খানম অঙ্কিত একটি ছবি দেখে তিনি মুগ্ধ হন—ছবিটি তিনি নিজ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য সঙ্গে করে আনেন। শিল্পী নওয়াবজাদী মেহেরবানু খানম হলেন নওয়াব স্যার আহ্‌সানউল্লাহ্‌ বাহাদুরের কন্যা ও স্যার নওয়াব সলিমুল্লাহ্‌ বাহাদুরের ভগ্নী। এঁর স্বামীর নাম খান্‌ বাহাদুর খাজা মোহাম্মদ আজম। চিত্রখানি ত্রিবর্ণের—তরঙ্গ-ক্ষুব্ধ গর্জনোন্মুখ নদীতে খেয়াপারাপারের দৃশ্য। দু'টি তরণী তরঙ্গ-সঙ্কুল নদীর বুকে ভাসমান—তারা পরপারের যাত্রী। চিত্রে একটি তরণীকে নিমজ্জমান অবস্থায় দেখান হয়েছে কিন্তু অপরটি শত ঝঞ্ঝা ও দুর্যোগ অতিক্রম করে অবলীলাক্রমে যাত্রী পারাপারে ব্যস্ত।

প্রথমটি পাপের নৌকা, দ্বিতীয়টি পুণ্যের। এই নৌকার চারটি দাঁড়ের মাথায় আরবী অক্ষরে ইস্‌লাম ধর্মের প্রথম চারজন খালিফার নাম—আবুবকর, উস্‌মান, উমর, আলী—লেখা আছে। হাল ও পালের মধ্যে যথাক্রমে লেখা আছে হজরত মোহাম্মদ ও শাফায়াত। 'শাত্‌-ইল-আরব' চিত্রটির মত এই চিত্রটিও হক সাহেব নজরুলকে দিয়ে একটি পরিচিতি লিখে দিতে বলেন। কিন্তু ছবিটি দেখে কবি এমনই অনুপ্রাণিত হয়ে পড়েন যে, তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অমর কবিতা 'খেয়াপারের তরণী' লিখে ফেলেন। বহু পঠিত, বহু প্রশংসিত এই কবিতাটির কোন অংশ আমি আর এখানে উদ্ধৃত করলাম না—কেবল কবিতাটি সম্পর্কে মোহিতলাল মজুমদারের বিশেষরূপে স্মরণযোগ্য মন্তব্য উদ্ধৃত করলাম:—

"খেয়াপারের তরণী" শীর্ষক কবিতায় ছন্দ সর্বত্র মূলতঃ এক হইলেও মাত্রা বিন্যাস ও যতির বৈচিত্র্যে প্রত্যেক শ্লোকে ভাষানুযায়ী সুর সৃষ্টি করিয়াছে; ছন্দকে রক্ষা করিয়া তাহার মধ্যে এই যে একটি অবলীলা, স্বাধীন স্ফূর্তি, অবাধ আবেগ, কবি কোথাও তাহাকে হারাইয়া বসেন নাই; ছন্দ যেন ভাবের দাসত্ব করিতেছে—কোনখানে আপন অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে নাই - এই প্রকৃত কবিশক্তিই পাঠককে মুগ্ধ করে। কবিতাটি আবৃত্তি করিলেই বোঝা যায় যে, শব্দ ও অর্থগত ভাবের সুর কোনখানে ছন্দের বন্ধনে ব্যাহত হয় নাই। বিস্ময়, ভয়, ভক্তি, সাহস, অটল বিশ্বাস এবং সর্বোপরি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটা ভীষণ গম্ভীর অতিপ্রাকৃত কল্পনার সুর, শব্দ বিন্যাস ও ছন্দ ঝংকারে মূর্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমি একটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিব,—

> আবুবকর উসমান উমর আলী-হাইদর
> দাড়ী যে এ তরণীর নাই ওরে নাই ডর।
> কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা
> দাঁড়ি মুখে সারি গান 'লা শরীক আল্লাহ্‌'।

এই শ্লোকে মিল, ভাবানুযায়ী শব্দ-বিন্যাস এবং গভীর গম্ভীরধ্বনি, আকাশে ঘনায়মান মেঘপুঞ্জের প্রলয় ডম্বরু ধ্বনিকে পরাভূত করিয়াছে ;—বিশেষ ঐ শেষ ছত্রের শেষ বাক্য—'লা শরীক আল্লাহ'—যেমন মিল, তেমনি আশ্চর্য প্রয়োগ। ছন্দের অধীন হইয়া এবং চমৎকার মিলের সৃষ্টি করিয়া এই আরবী বাক্য যোজনা বাঙ্গালা কবিতায় কি অভিনব ধ্বনি-গাম্ভীর্য লাভ করিয়াছে !"

পঞ্চম (ভাদ্র) সংখ্যায় মুদ্রিত হয় নজরুলের 'কোরবাণী' কবিতাটি। সমকালীন ঘটনার বিচিত্র আবর্ত থেকে নজরুলের অনেকগুলি কবিতার সৃষ্টি হয়েছে। 'খেয়াপারে তরণী' কবিতার উৎস মূল আমরা লক্ষ্য করেছি—'কোরবাণী' কবিতার পিছনে যে ইতিহাস রয়েছে তা কম কৌতুককর নয়।

ইস্‌লাম ধর্মাবলম্বীদের কাছে 'কোরবাণী'র মূল উদ্দেশ্য হল ত্যাগ-শিক্ষা। যা কিছু আপন, যা কিছু প্রিয় তা খোদার নামে উৎসর্গ করতে হবে, সঙ্গে পঞ্চ রিপুর অপবিত্র প্রবৃত্তিকে দমন করতে হবে। তরীকুল আলম নামে একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট কোরবাণী অনুষ্ঠানের খুনখারাবী ও রক্তপাতের মধ্যে বর্বরযুগের হানাহানি ও বন্যতা দেখতে পান। তাই এ পবিত্র অনুষ্ঠানকে তিনি বর্বর যুগের চিহ্ন বলে অবিহিত করেন। এই মতের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আঘাত হেনে নজরুল লেখেন তাঁর 'কোরবাণী' কবিতা। এ কবিতার একদিকে আছে যেমন তরীকুল আলমের ভিত্তিহীন মন্তব্যের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণধার প্রতিবাদ তেমনি অন্য দিকে আছে ইস্‌লামের এই পবিত্র অনুষ্ঠানের প্রতি সুদৃঢ় সমর্থন।

ষষ্ঠ (আশ্বিন) সংখ্যায় প্রকাশিত হল বৈধব্য বেদনায় ভারাক্রান্ত অশ্রুসজল কবিতা "মোহররম"। আফজালুল হক সাহেব এই কবিতাটি লেখানর জন্য নজরুলকে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখেন। বলাবাহুল্য কিছুক্ষণের মধ্যেই পাণ্ডুলিপি হস্তে দরজায় টোকা দেন

নজরুল—একটি সুদীর্ঘ অনবদ্য কবিতা লেখা হয়ে গেছে তাঁর। কবিতাটি সেকালে অনেকের মুখে মুখেই ফিরত।

সপ্তম (কার্তিক) সংখ্যায় প্রকাশিত হয় কবির একটি বিখ্যাত গান: "বন্ধু আমার! থেকে থেকে কোন সুদূরের নিজনপুরে।" এই গানটি মোহিতলাল মজুমদারের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। এমন কী বহুসময় দেখা গেছে কবি যখন গানটি গাইছেন তখন মোহিতবাবু আবেগভরে মাথা নেড়ে বার বার তাঁর চিবুক স্পর্শ করছেন।

অষ্টম (অগ্রহায়ণ) সংখ্যায় মুদ্রিত হয় 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম্' আর হাফিজের গজলের সুদীর্ঘ অনুবাদ। নবম (পৌষ) সংখ্যায় প্রকাশিত হল "দীওয়ান-ই হাফিজের' অনুবাদ আর শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তার দেওয়া সুরেই রচিত নজরুলের "হয়ত তোমায় পাব দেখা" মধুর গানটির স্বরলিপি। দশম (মাঘ) সংখ্যার প্রথমেই মুদ্রিত হয়েছিল 'বিরহ বিধুরা' কবিতাটি। এ ছাড়াও হাফিজের গজল। একাদশ সংখ্যায় মুদ্রিত হয় দু'টি গান 'মরমী' ও 'স্নেহ-ভীতু'। বর্ষশেষ সংখ্যায় (দ্বাদশ—চৈত্র) একটি গান "আমার ঘরের পাশ দিয়ে সে চলতো নিতুই সকাল সাঁঝে" ও তার স্বরলিপি প্রকাশিত হয়।

দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (ভাদ্র, ১৩২৮) প্রকাশিত হয় 'কার বাঁশী বাজিল' কবিতা ও একটি গান। দ্বিতীয় সংখ্যায় (আশ্বিন) মুদ্রিত হয় 'বাদল দিনে', 'দিল্-দরদী', 'পলাতকা' তিনটি কবিতা। তৃতীয় সংখ্যায় (কার্তিক) প্রকাশিত হয় চির বিখ্যাত কবিতা "বিদ্রোহী' ও "কামালপাশা"। এরপর আরো দু'টি সংখ্যা "মোসলেম ভারত" প্রকাশিত হয়—কিন্তু তাতে কবির কোন উল্লেখযোগ্য কবিতা মুদ্রিত হয়নি। চতুর্থ (অগ্রহায়ণ) সংখ্যায় মুদ্রিত হয় "ফাতেহা-ই দোয়াজ দহম" (তিরোভাব) এবং শেষ পঞ্চম (পৌষ) সংখ্যায় প্রকাশিত হয় "বিজয়িনী" কবিতা।

"মোসলেম ভারতে" মুদ্রিত কবির সকল সৃষ্টির সঙ্গে আমরা পরিচিত হলাম। একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাব নজরুলের সুনাম,

যশ, প্রতিপত্তি, খ্যাতি সকল কিছুই এই কবিতাগুলির মধ্যে নিহিত। এই কবিতাবলীই তাঁকে বাংলা সাহিত্যে বিশেষরূপে চিহ্নিত করেছে। সুতরাং "মোসলেম ভারতে"র মাধ্যমে নিখিল বাংলার সুহৃদ হৃদয়ে কবির প্রতিষ্ঠা—এমন কথা বললে বোধহয় অত্যুক্তি করা হবে না। বাংলা সাহিত্যের আর কোন কবি এত অল্প লিখে (মাত্র গোটা দশেক কবিতা) এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন বিপুল প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেননি। "মোসলেম ভারতে"র লেখাগুলি পড়েই সমকালীন বাংলার সকল সমালোচক, লেখক, পাঠক নতুন প্রদীপ্ত প্রতিভাকে স্বাগত জানাতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিশোর কবির কবিতার ভাব-ভাষা ও ছন্দগত প্রভাব অনেকের মধ্যেই দেখা গেল। "বিদ্রোহী"র ছন্দ অবলম্বন করে সে সময় বিভিন্ন পত্রিকায় এত অসংখ্য কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল যে অন্য কোন কবির কোন কবিতার ছন্দ অবলম্বন করে এমনটি হয়নি। কিশোর কবির প্রতি স্তুতিবাদ জানিয়ে অগ্রহায়ণ সংখ্যা "মোসলেম ভারতে" শ্রীমোহিতলাল মজুমদার নজরুলের "বাদল প্রাতের শরাব"-এর ছন্দাবলম্বনে লিখলেন "ক্ষ্যাপা" ঃ

শিশুর মত সরল হেসে উঠল ক্ষ্যাপা খিলখিলিয়ে,
জ্যোৎস্না মেয়ের ওষ্ঠ চুমি' ঝড়ের সাথে দিল মিলিয়ে।...

শান্তিনিকেতন থেকে শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী মহাশয় "সৈনিক কবি কাজী নজরুল ইসলাম সাহেবের প্রতি" এক অবিস্মরণীয় সুদীর্ঘ অভিনন্দন কবিতা লিখে পাঠালেন—কার্তিক সংখ্যা "মোসলেম ভারতে"র পৃষ্ঠায় তা' দেখা গেল ঃ

ছন্দে গানে বাজাও কবি বাজাও প্রাণের গান,
মুগ্ধকর বিশ্বজনে দাওগো নতুন প্রাণ।...

কবিকে স্বাগত জানিয়ে শ্রীমোহিতলাল মজুমদারের লেখা দীর্ঘ পত্রের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, বরোদা রাজ্যের উচ্চপদস্থ সেন্সার কমিশনার বিশিষ্ট সাহিত্য রসিক মিস্টার সত্যব্রত মুখার্জীও

কবিকে অভিনন্দন জানিয়ে এক দীর্ঘ আবেগপূর্ণ পত্র দেন। অভিনন্দন জানিয়েছিলেন আরো অনেকে। মোট কথা "মোসলেম ভারতে"র যুগটাই (নজরুলের প্রথম যুগ) কবিখ্যাতির স্বর্ণযুগ।

"মোসলেম ভারতে"র যুগে কবির আর একটি স্বরূপের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই—'বিজ্ঞাপন লেখক নজরুলের স্বরূপ। 'ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্' বাংলার বিখ্যাত বাদ্যযন্ত্র ব্যাবসায়ী। এই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ কিশোর কবিকে তাঁদের নির্মিত হার্মোনিয়ামের একটি বিজ্ঞাপন লিখে দিতে বলেন—কবি সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হয়ে যান এবং লেখেন আট লাইনের এই মনোরম বিজ্ঞাপন ঃ

কি চান? ভাল হারমোনী?
কাজ কি গিয়ে—জার্মানী?
আসুন, দেখুন এইখানে
যেই সুরে যেই গানে
গান না কেন, দিব্যি তাই
মিলবে আসুন এই হেথাই।
কিনবি কিন্
'ডেয়ার্—কিন!

সে সময় পার্কসার্কাস এলাকায় 'বাহাদুর' নামে আর একটি বাদ্য-যন্ত্রের প্রতিষ্ঠান ছিল। ডোয়াকিনের বিজ্ঞাপন প্রাকাশিত হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁরাও কবির নিকট ছুটে এলেন। একই অনুরোধ—তাঁদের প্রতিষ্ঠান নির্মিত 'বাহাদুর' হার্মোনিয়ামের বিজ্ঞাপন লিখে দিতে হবে। কবি এবারেও লিখলেন আট লাইনের কবিতা—'বাহাদুরে'র চমৎকার বিজ্ঞাপন ঃ

মিষ্টি 'বাহা বাহা' সুর
চান ত কিনুন 'বাহাদুর'!
দু'দিন পরে বলবে না কেউ—"দুর-দুর!"
যতই বাজান ততই মধুর মধুর সুর!!

করতে চান কি মনের প্রাণের আহা দূর ?
একটি বার ভাই দেখুন তবে 'বাহাদুর !'
যেমন মোহন দেখতে, তেমনি শিরীন ভরাট
বাহা সুর।
চিনুন, কিনুন 'বাহাদুর !!'

এ দুটো বিজ্ঞাপনই "মোসলেম ভারতে"র অনেকগুলি সংখ্যায় মুদ্রিত হয়েছিল। আমি দ্বিতীয় বর্ষের কার্তিক সংখ্যায় (এই সংখ্যায় "কামালপাশা" ও "বিদ্রোহী" কবিতা একত্রে মুদ্রিত হয়) বিজ্ঞাপন দুটি একত্রে দেখেছি। নজরুল কোন এক কেশ তৈলের ওপর একটি সুন্দর বিজ্ঞাপন লিখেছিলেন—কিন্তু বহু চেষ্টার পরও তার কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

৩.

'মোসলেম ভারত'-এর যুগের কবি নজরুলের অনেক কথা, অনেক ঘটনার সাক্ষী আফজালুল হক সাহেব। এই সময় নজরুল কিছুদিন (জনাব মুজফ্ফর আহমদের মতে দু' মাস কী তিন মাস) আফজালুল হকের সঙ্গে থেকেছেন, একই অন্ন খেয়েছেন দু-জনে।

নজরুলের পানপ্রিয়তার কথা বর্তমানে একটা কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে, অবিশ্বাস্য বলেও অনেকে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু বিষয়টা সম্পূর্ণ সত্য। আফজালুল হক সাহেব জানাচ্ছেন 'পানের বাটায়' কোনো কাজ হত না—নজরুলের জন্য ছিল পানের 'ডাবর'। বড় বড় পানের খিলি একসঙ্গে তিনি একাধিক মুখে দিতেন। মেডিক্যাল কলেজের বিপরীত ফুটপাতে এক পানের দোকান ছিল—একজন বৃদ্ধা পানোয়ালী ছিলেন সে পানের দোকানের মালিক। তাঁর পান

সে সময় ও' এলাকায় বিখ্যাত ছিল। পয়সায় দুটি করে পান—বিরাট আয়তনের খিলি। প্রধানত কবির জন্যই প্রতিদিন বেশ কয়েক আনার পান খরচ হত। বুড়ীর পান, পুঁটিরামের দোকানের মিষ্টি এবং মালাইয়ের চা—এ তিনটি ৩২ নম্বরের দ্বিতলের কোণার ঘরটির নিত্য অতিথি ছিল। কেবল নজরুল কেন—অন্য যে কোনো দর্শক বা অতিথি ওখানে গেলে এ তিনটির দর্শন পেতেন। বলাবাহুল্য আফজাল সাহেব হাসিমুখেই সকল খরচ বহন করতেন।

কবির ঘনিষ্ঠ বন্ধু জনাব মুজফফর আহমদ জানাচ্ছেন আফজালুল হকের দেওয়া তথ্য ভুল। যে সময়ের কথা বর্ণনা করা হয়েছে ঐ সময়ে কবি বিশেষ পান খেতেন না। আর মালাইয়ের চা তখন ঐ এলাকার কোথাও পাওয়া যেত না। আমি বিষয়টি জনাব আফজালুল হকের দৃষ্টিতে আনি কিন্তু তিনি অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এ কথার সত্যতার উপর জোর দেন। আমি এখানে দু'জনের মতামত উদ্ধৃত করলাম।

'মোসলেম ভারত'-এর যুগেই কবি এ, কে, ফজলুল হক সাহেবের 'নবযুগ'-এর সঙ্গে যুক্ত হন—কিন্তু কিছুদিন কাজ করার পর তিনি 'নবযুগ'-এর সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এই সময় কবির শরীরও ভালো যাচ্ছিল না। বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, কিছুদিন বায়ু পরিবর্তনের জন্য তিনি দেওঘরে যাবেন। যে কথা সেই কাজ। কবি যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কিন্তু এদিকে 'মোসলেম ভারত'-এর উপায় যে কী হবে সেটি একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। নজরুল ছাড়া 'মোসলেম ভারত' অচল। এ-প্রসঙ্গে জনাব মুজফ্ফর আহমদ মন্তব্য করেছেন যে, সে সময় ঠিক হয়েছিল দেওঘরে থাকাকালীন আফজালুল হক প্রতি মাসে একশো করে টাকা পাঠাবেন—আর ওখান থেকেই কবি পত্রিকার জন্য লেখা পাঠাবেন। জনাব অফজালুল হক জানিয়েছেন যে, সে সময় এ ধরণের কোনো কথা হয়েছিল বলে তাঁর মনে নেই। যা'হোক দেওঘরে যাবার দিন

সাড়ম্বরে একটি বিদায় সম্বর্ধনা জানানো হল কবিকে। এই অনুষ্ঠানের মূলে ছিলেন আফজালুল হক সাহেব। এই অনুষ্ঠানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে 'সন্দেশ' সম্পাদক সুবিনয় রায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মুজফ্ফর আহমদ, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই অনুষ্ঠানে কবি তাঁর কয়েকদিন পূর্বে রচিত একটি গান গেয়ে শোনান। প্রিয় বন্ধুবান্ধবদের ছেড়ে দূরে যাওয়ার বেদনা এই বিদায় সংগীতে অন্তরঙ্গ হয়ে ফুটেছে :

বন্ধু আমার! থেকে থেকে কোন্ সুদূরের নিজন পুরে
ডাক দিয়ে যাও ব্যথার সুরে?
আমার অনেক দুখের পথের বাসা বারে বারে ঝড়ে উড়ে,
ঘর ছাড়া তাই বেড়াই ঘুরে। ...ইত্যাদি

দেওঘরে পৌঁছেই কবি তাঁর অন্যতম বন্ধু পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে একটি চিঠি দেন। সেই অপ্রকাশিত চিঠিটি আমরা এখানে উদ্ধৃত করলাম :

Dr. Bose's Sanatorium
Quarter No. 49
Deoghar.
শুক্রবার, বিকাল
[কোনো তারিখ লেখা ছিল না—ডাকঘরের স্ট্যাম্পের তারিখ 19 Dec. 20.]

ভো ভো "লিভুঁর" মুশঁয়ের!

গতকাল শুভ দিবা দ্বিপ্রহরে অহম্ দানবের এই দেওঘরেই আসা হয়েছে। আপাততঃ আসন পেতেছি ঐ উপরের ঠিকানাতে। শিমুলতলা যাওয়া হয়নি। পথের মাঝে মত বদলে গেল। পরে সমস্ত কথা জানাব। জায়গাটা মন্দ নয়। তবে এক মাসের বেশী থাকতে পারব না এখানে, কেননা এখনো (?) খুব বেশি আনন্দ পাচ্ছি না।...নারায়ণের টাকাটা দিয়েছিস অবিনাশদা'কে।

যদি হাতে টাকা থাকে, তবে বিজলির দু'টাকা তাদের অফিসে দিয়ে আমার ঠিকানায় কাগজ পাঠাতে বলিস।···তোর বৌ-এর খবর কি? তাঁর সঙ্গে আমার চিঠির মারফৎ আলাপ করিয়ে দিস। কালই চিঠি না পেলে কিন্তু তোদের মাঝে জোর কলহ বাধিয়ে দেব।···কান্তিবাবুকে আমার প্রীতি ভালবাসা আর প্রণাম জানাস। তোর গল্প লিখবো, একটু গুছিয়ে নি আগে। বড্ডো শীত রে এ····জায়গায়। টাকা ফুরিয়ে গেছে, আফজল কিম্বা খাঁ যেন শীগ্গীর টাকা পাঠায়, খোঁজ নিবি আর বলবি আমার মাঝে মানুষের রক্ত আছে। আজ যদি তারা সাহায্য করে, তা ব্যর্থ হবে না—আমি তা সুদে আসলে পুরে দেবো।

ইতি—

তোর পিরীত-দধি-লুব্ধ মার্জার

নজর্।

সানাটোরিয়ামের পাশে কবি একটি বাসা ভাড়া নেন। এখানে দেওঘরের নিকটস্থ হিরনা গ্রামের আবদুল্লা নামে একজন ভৃত্য কবির সকল কাজ করে দিত। কবি তাকে ডাকত আবদুল বলে। যাক্ দেওঘরে এসে কিন্তু কবির স্বাস্থ্যের কিছুমাত্র উন্নতি হল না। উন্নতি তো হলই না—বরং বেশ কিছু অবনতি দেখা গেল। বেশ কয়েক মাসের মধ্যে তিনি মাত্র গুটিকয় গান ছাড়া আর কিছুই লেখেন নি। নজরুলের জীবনধারা ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় তাঁর দুঃখের, দারিদ্র্যের দিনগুলিতে তিনি উচ্চ শ্রেণীর সাহিত্যসৃষ্টি করেছেন। কিন্তু দেওঘরের নিশ্চিন্ত অলস জীবনযাত্রার মধ্যে সে জ্বালা-যন্ত্রণার দাহন কোথায়?

এই সময়ের একটি ছোট্ট ঘটনা স্মরণীয়। দেওঘরে থাকাকালীন এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। একদিন দুপুরে মধ্যাহ্নের ক্লান্তিকর মুহূর্তগুলি যাপনের জন্য কবি ভদ্রমহিলার

বাসায় এসে হাজির হলেন। কিন্তু নিরাশ হতে হল তাঁকে। দেখা গেল দরজায় তালা দেওয়া—বিশেষ প্রয়োজনে ভদ্রমহিলা ছেলেমেয়েদের নিয়ে অন্য কোথাও গেছেন। কবি একটুকরো কাঠ-কয়লা দিয়ে বড় করে দেওয়ালে লিখে দিলেন ঃ

"আজ দুপুরে দেওঘরে,
কেউ ঘরে নেই এই ঘরে।"

এখানে আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ঘটনাটি জনাব মুজফ্‌ফর আহমদ তাঁর "কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা" গ্রন্থে এ-ভাবে উল্লেখ করেছেন ঃ

"এই সময় একটি ব্যাপার ঘটে। রাজশাহীর এক যুবক একজন যুবতীকে সঙ্গে নিয়ে একদিন সন্ধ্যার কিছু পরে নজরুলের নিকটে এসে বলল যে, "হঠাৎ এসে বিপদে পড়েছি, আজ রাত্রির মতো আপনার খালি ঘরটিতে আমাদের আশ্রয় দিন।" স্বামী-স্ত্রী ভেবে নজরুল সঙ্গে সঙ্গেই রাজী হয়ে যায়। পরের দিনই অবশ্য তারা চলে গেল। এই ঘটনা নিয়ে শহরে কানাঘুষা হতে লাগল। শোনা গেল যুবকটি মেয়েটিকে ঘরের বার করে এনেছিল। ওরা স্বামী-স্ত্রী ছিল না। শ্রীমতী কুমুদিনী বসুরা তো ব্রাহ্ম ছিলেন। তিনি নজরুলকে জানালেন যে তাঁদের নিকট নৈতিক চরিত্রের মূল্য খুব বেশী। তাঁদের ধারণা হ'য়েছিল যে জেনে-শুনেই নজরুল সেই যুবক-যুবতীকে থাকতে দিয়েছিল। অন্য সব পরিবারের লোকেরা নজরুলের কথাই বিশ্বাস করে নিলেন। কিন্তু তার সঙ্গে শ্রীমতি বসুর বাক্যালাপ বন্ধ হয়ে গেল। দেওঘরে তাঁর সঙ্গে নজরুলের আর কোন দিন কথা হয়নি।···ইতোমধ্যে শ্রীমতি বসুর কলকাতা ফেরার দিন এসে গিয়েছিল। যাওয়ার দিন তিনি নজরুলের কটেজের পাশে এসে আবদুলকে বললেন,—"তোমার বাবুকে বল যে আমি কলকাতা চলে যাচ্ছি।" নজরুল ঘরের বার হলো না।

জনাব মুজফ্‌ফর আহমদ গিয়ে কবিকে দেওঘর থেকে কলকাতায় আনেন।

আফজালুল হক সাহেবের নিকট হতে আর একটি মূল্যবান তথ্য জানা গেছে। এ তথ্যটি দিয়ে আমাদের অনেকের ভুল সংশোধিত হবে।

নজরুলের প্রথম প্রকাশিত বই কোন্‌টি? যুগবাণী? অগ্নিবীণা? না ব্যথার দান?

আজ পর্যন্ত সকল নজরুল-জীবনীকার—এমন কী নজরুল-জীবনী সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি জনাব মুজফ্‌ফর আহমদ পর্যন্তও—লিখেছেন যে, নজরুলের প্রথম প্রকাশিত বই 'যুগবাণী' এবং দ্বিতীয় বই 'অগ্নিবীণা'। কিন্তু তথ্যটি আদৌ সত্য নয়। সন্দেহাতীতরূপে নজরুলের প্রথম প্রকাশিত বই 'ব্যথার দান'। প্রমাণস্বরূপ একটি মাত্র ঘটনাই যথেষ্ট।

'মোসলেম ভারত'-এর যে সংখ্যায় (কার্তিক, ১৩২৮) "বিদ্রোহী" কবিতাটি প্রকাশিত হয় সেই সংখ্যায় 'ব্যথার দান'-এর বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হয়েছে। 'ব্যথার দান' এই বিজ্ঞাপনের পূর্বেই বাজারে প্রকাশিত হয়েছে। 'অগ্নিবীণা'র প্রধান কবিতাই "বিদ্রোহী"—সুতরাং 'অগ্নিবীণা' 'ব্যথার দান' এর পূর্বে প্রকাশিত হতে পারে না। তা'ছাড়া 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে' রক্ষিত 'ধূমকেতু'র পুরাতন ফাইল দেখলেও বিষয়টির সত্যতা প্রমাণিত হবে। 'ধূমকেতু'-র প্রথম বর্ষের সপ্তম সংখ্যা (শনিবার, ১৬ই ভাদ্র, ১৩২৯ সাল মোতাবেক মোহর্‌রম, ১৩৪১ হিজরী) হতে কয়েকটি সংখ্যা পরিষদে আছে। এই সপ্তম সংখ্যায় 'অগ্নিবীণা' ও 'যুগবাণী' মুদ্রিত হচ্ছে বলে বিজ্ঞাপিত করা হয়েছে—কিন্তু ঐ সংখ্যার কভারে 'ব্যথার দান' পুস্তক সম্পর্কে অন্যান্য পত্রপত্রিকার সুদীর্ঘ মতামত মুদ্রিত করা হয়েছে। এ থেকেই প্রমাণিত হয় 'ব্যথার দান' কবির প্রথম মুদ্রিত পুস্তক। এরপর মুদ্রিত হয় 'অগ্নিবীণা'—সুতরাং 'অগ্নিবীণা' কবির দ্বিতীয় বই, তৃতীয় বই হল 'যুগবাণী'।

'ব্যথার দান' প্রকাশের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে। "হেনা",

"ব্যথার দান", "অতৃপ্ত কামনা" প্রভৃতি গল্পগুলি ত্রৈমাসিক 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় প্রকাশিত হতেই কবি ঐ লেখাগুলির পাণ্ডুলিপি নিয়ে কলকাতার বিভিন্ন প্রকাশকের নিকট কয়েকদিন ধরে যাতায়াত করেন। টাকার বিশেষ প্রয়োজন অথচ 'ব্যথার দান' প্রকাশে কেউ সম্মত নন। যে কালে রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো বইয়ের প্রথম সংস্করণ দপ্তরীর বাড়ীতে নষ্ট হয়—সে সময় একজন নূতন লেখকের বই ছাপতে যাওয়া অনেকখানি বিপদের কথা বৈকি! এবং এ বিপদের সম্ভাবনা সকল প্রকাশক সজ্ঞানে এড়িয়ে গেলেন। একদিন দুপুরে ঘোরাঘুরির পর যথেষ্ট ক্লান্ত হয়ে কবি বাসায় ফিরেছেন, আফজালুল হক বসে আছেন সেখানে। কবি 'ব্রিচেস' (সৈনিক পোশাক) খুলছেন এমন সময় হক সাহেব "কোথায় গিয়েছিলেন" জিজ্ঞেস করতেই কবি 'ব্যথার দান' সম্পর্কে সকল কথা বলে গেলেন। তাঁকে যথেষ্ট ম্লান এবং বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। সেই মুহূর্তেই কোনো কিছু বিবেচনা না করে আফজালুল হক 'ব্যথার দান' ছাপতে রাজী হলেন। কবির পক্ষে তো সেই মুহূর্তে কোনো কিছু বিবেচনা করা সম্ভব ছিল না (আর তিনি কোন্ দিনই বা তা করেছেন), তিনি সঙ্গে সঙ্গে 'কপি রাইট' লিখে দিলেন। আফজালুল হকের সঙ্গে তখন তাঁর যা সম্পর্ক সে অবস্থায় মূল্যের কথা উঠতেই পারে না। 'কপি রাইট' লিখে দেওয়ার জন্য হকসাহেব কোনোরূপ জোর বা চাপ দেন নি। কবি স্ব-ইচ্ছায় এবং আনন্দের সঙ্গে দুশো টাকার বিনিময়ে 'কপি রাইট' লিখে দেন। অবশ্য পরবর্তীকালে কবির এই সদানন্দ ভাবের সুযোগ নিয়ে অনেকেই তাঁকে নির্মমভাবে ঠকিয়েছেন।

আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও এখানে একটি প্রতিবাদের কথা উল্লেখ করতে হচ্ছে। 'ব্যথার দান' যে কবির প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ আমার এই মন্তব্যের প্রতিবাদ করে জনাব মুজফ্ফর আহমদ 'নন্দন' মাসিকের কোনো এক শারদীয় সংখ্যায় 'প্রতিবাদে' শিরোনামায় ১৬ পৃষ্ঠার তথ্য বহুল এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে কবির পান খাওয়া,

মালাইয়ের চা ইত্যাদির কথাও ছিল। জনাব মুজফ্ফর আহমদের মতে 'ব্যথার দান' নয়—'যুগবাণী'ই হলো কবির প্রথম প্রকাশিত পুস্তক। 'ব্যথার দান'কে প্রথম প্রকাশিত পুস্তক বলায় ঐ প্রবন্ধে তিনি আমাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণও করেছেন। তিনি তাঁর স্মৃতির উপর নির্ভর করে বলেছেন সন্দেহাতীত রূপে 'যুগবাণী' কবির প্রথম প্রকাশিত পুস্তক। এখন দেখা যাচ্ছে তাঁর স্মৃতি তাঁকে প্রতারিত করেছে! তাঁর লিখিত 'কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা'য় বর্তমানে তিনি আমার মতকে স্বীকার করে নিয়ে লিখেছেন যে 'ব্যথার দান'ই কবির প্রথম প্রকাশিত পুস্তক।

এখন আমার সবিনয় বক্তব্য এই : সকল ক্ষেত্রে স্মৃতির উপর নির্ভর করা ঠিক নয়। এটা ত চিরসত্য—স্মৃতি মানুষকে বিভ্রান্ত করে। শ্রদ্ধা-ভাজন ব্যক্তিরা, বিশেষ করে জনাব মুজফ্ফর আহমদের মত বহুল সম্মানিত দেশ-নেতা ও নজরুল-বন্ধু, যখন কবির সম্পর্কে, তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে কোন কথা বলেন তখন আমাদের তা' মাথা পেতেই নিতে হয়। বিশেষ করে আমরা যখন নজরুল-যুগের নয়। কিন্তু এখানেও ঐ এক কথা—নিজের স্মৃতির উপর এতখানি নির্ভর করা কী ঠিক!

যথাসময়ে 'ব্যথার দান'-এর পাণ্ডুলিপি প্রেসে পাঠানো হল। কিন্তু পাইকা টাইপে গল্পগুলি মুদ্রণের পর দেখা গেল মাত্র কয়েক ফর্মার বই হয়েছে। ঐ অবস্থায় একটি চটি বই বাজারে বার করা যায় না—কবিও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তখন শ্রাবণ মাস, মধ্যাহ্ন কাল, মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির অবিশ্রাম বর্ষণ, বাদলের সকল চিহ্ন সুস্পষ্ট। সেই মেঘাচ্ছন্ন বাদল-মধ্যাহ্নেই কবি লিখতে বসে গেলেন—প্রায় দু' ঘণ্টার কাছাকাছি সময়ে লিখে ফেললেন সুদীর্ঘ গল্প "বাদল-বরিষণে"। গল্পটি শ্রাবণ মাসের (১৩২৭ সাল) 'মোসলেম ভারত'-এ মুদ্রিত হয়েছিল। 'রাজবন্দীর চিঠি' তিনি এর পরে রচনা করেছিলেন। এবং ঐ দীর্ঘ গল্প দুটি নিয়ে মোটামুটি একটা ভদ্র আকারে 'ব্যথার দান' বাইরে আত্মপ্রকাশ করে।

'মোসলেম ভারত'-এর প্রকাশ তখন খুব অনিয়মিত। কবি আফজালুল হক সাহেবকে একটি অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের কথা জানালেন—এর থেকে অর্থাগম হলে 'মোসলেম ভারত'কে আবার নিয়মিত প্রকাশ করা যাবে। বলাবাহুল্য হক সাহেব রাজী হয়ে গেলেন। হক সাহেবের নামেই চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট হতে মুদ্রাকর ও প্রকাশক ডিক্লারেশন নেওয়া হল। কাগজের সারথি হলেন কাজী নজরুল ইসলাম, ম্যানেজার হিসেবে ছাপা হল শ্রীশান্তিপ্রসাদ সিংহের নাম। প্রথম সংখ্যা যেদিন আত্মপ্রকাশ করে সেদিনের রাতটি এক অবিস্মরণীয় রাত। হক সাহেবের মুখে জানা গেল, কবির সে কী আনন্দ, সে কী উন্মাদনা। কবির সঙ্গে হক সাহেবও সারা রাত মেটকাফ প্রেসে জেগে কাটিয়ে দিলেন। আর জাগলেন প্রেসের কর্মীবৃন্দ। কবি ও হক সাহেব মাঝে মাঝে প্রুফ দেখেন, প্রুফ না থাকলে গান গেয়ে প্রেসের কর্মীবৃন্দের আনন্দ দেন, হৈ-হুল্লোড় করে কম্পোজিটারদের নিদ্রা থেকে দূরে রাখেন, মাঝে মাঝে চা আর পান তো আছেই। সে রাতে মেটকাফ প্রেসের মধ্যে একটা আনন্দ ও উন্মাদনার ঝড় বয়ে গেল।

সকালে বাইরে আত্মপ্রকাশ করল 'ধূমকেতু'!

'ধূমকেতু'র প্রথম হকার হল আবদুল। পূর্বেই উল্লেখ করেছি এই আবদুল দেওঘরে থাকার সময় কবির সকল কাজ করে দিত। দেওঘর থেকে কলকাতায় আসার সময় কবি একে সঙ্গে করে আনেন এবং আফজালুল হক একে কবির সেবার জন্য নিযুক্ত করেন। সে সকালবেলাই এক বাণ্ডিল 'ধূমকেতু' নিয়ে হাওড়ার দিকে চলে গেল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সব কাগজ বিক্রি করে দেহমনে উন্মত্ত নেশা নিয়ে ছুটে এল আবদুল, আরো কাগজ চাই। কিন্তু তখন সব শেষ, বিক্রির জন্যে আর একটি কপিও অবশিষ্ট নেই।

প্রথম বর্ষের অষ্টম সংখ্যা (মঙ্গলবার, ২৬শে ভাদ্র, ১৩২৯ সাল মোতাবেক ১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯২২ খৃষ্টাব্দ) পর্যন্ত 'ধূমকেতু'

আফজালুল হকের বাসা ৩২ নম্বর কলেজ স্ট্রীট হতে প্রকাশিত হয়—তারপর পত্রিকা-অফিস ৭নং প্রতাপ চাটুজ্যে লেন-এ উঠে যায়। অষ্টম সংখ্যা 'ধূমকেতু'তে এই অফিস পরিবর্তনের ঘোষণা এই ভাবে মুদ্রিত হয়েছে :

"'ধূমকেতু'-র কেন্দ্রচ্যুতি—"

"ধূমকেতু' কেন্দ্র ৭নং প্রতাপ চাটুয্যের লেন'-এ উঠে এসেছে। অতঃপর চিঠিপত্র, টাকাকড়ি, বিনিময়ের কাগজ সবই এই ঠিকানায় 'ধূমকেতু'র একমাত্র স্বত্ত্বাধিকারী কাজী নজরুল ইসলামের নামে পাঠাতে হবে।"

এই কেন্দ্রচ্যুতির পর আফজালুল হক সাহেবের সঙ্গে 'ধূমকেতু'র আর বিশেষ কোনো যোগ ছিল না। তবুও প্রথম বর্ষের দ্বাদশ সংখ্যায় (মঙ্গলবার, ৯ আশ্বিন, ১৩২৯ সাল মোতাবেক ২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯২২ খৃষ্টাব্দ) কবির "আনন্দময়ীর আগমনে" মুদ্রিত হতেই তাঁর নামে যে গ্রেপ্তারীর পরোয়ানা বার হয় তাতে হক সাহেবকেও বন্দী হতে হয়। কেননা পত্রিকার সঙ্গে তাঁর কোনো যোগ না থাকলেও প্রকাশক ও মুদ্রাকর হিসেবে তাঁর নাম ছাপা হচ্ছিল। কিন্তু চার দিন আটক রাখার পর আফজালুল হক যে নির্দোষ এমন প্রমাণ পেয়ে সরকার-পক্ষ তাঁকে মুক্ত করে দেবেন—এমন সময় কুমিল্লা থেকে নজরুলকে ধরে আনা হল কলকাতায়। ফলে হক সাহেবের মুক্তি-দিবস আরো কিছুদিন পেরিয়ে গেল। শেষে সরকার-পক্ষ স্থির করলেন হক সাহেব যদি তাঁদের প্রয়োজন মতো কোর্টে এসে সাক্ষী দিতে রাজি থাকেন তা'হলে তাঁরা তাঁকে ছেড়ে দেবেন।

বলাবাহুল্য হক সাহেব তাতেই রাজি হলেন।

হক সাহেবের প্রদত্ত সাক্ষ্য বিচারাধীন বন্দী নজরুলের অনেক উপকারে এসেছিল।

৪.

আফজালুল হক সাহেবের সঙ্গে নজরুলের সম্পর্ক বড় মধুর, বড় পবিত্র। আন্তরিকতায় নিবিড়তা এলে যা হয়—অনেক গোপন কথার প্রকাশ,অনেক রসিকতার নিবিড়তা।

আমরা আমাদের চলার পথে এমন অনেক রসিকতা করি যা' অনেক ক্ষেত্রে কিছু স্থূল কিন্তু বড় মধুর। বন্ধু-বান্ধবের আড্ডায় বসে কোন সুন্দরী তরুণীকে যেতে দেখলে আমাদের মধ্যে কেউ অনেক সময় এমন মন্তব্য প্রকাশ করেন যা' অনেক ক্ষেত্রেই মার্জিত থাকে না—কিন্তু তার মধ্যে আনন্দের খোরাক থাকে প্রচুর। সর্বজন শ্রদ্ধেয় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে এমন কিছু গোপন তথ্য পরিবেশন করেছেন পরিমল গোস্বামী। তিনি তাঁর 'স্মৃতিচিত্রণ' গ্রন্থে লিখেছেন যে তাঁর (বিভূতিবাবুর) চরিত্র-বৈশিষ্ট্যগুলি খুব উপভোগ্য ছিল।...একদিন বিভূতিবাবু...কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে চলছিলেন, হঠাৎ পিছন ফিরে দেখেন বিভূতিবাবু একটি ছুটে চলা মোটরের দিকে চেয়ে আছেন—কি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করতেই বিভূতিবাবু ডান হাতে বুক চাপড়ে বলে উঠলেন, 'মেরে দিয়ে গেল!' অর্থাৎ ঐ মোটরে একটি সুন্দরী মেয়ে ছিল, তাঁর চোখ ঝলসে দিয়ে সে চকিতে মিলিয়ে গেল। কি সাংঘাতিক ঘটনা!

ঘটনাটি স্থূল নিশ্চয়ই—কিন্তু দিল-খোলা বিভূতিবাবুকে চিন্‌তে এতটুকু কষ্ট হয় না আর এই সঙ্গে যে আনন্দ আমরা উপভোগ করলাম সেটিও কম মূল্যবান নয়। নজরুলও মাঝে মাঝে অনুরূপ ভাবে রসিকতা করতেন। ৩২ নং কলেজ স্ট্রীটের যে ঘরে

তিনি থাকতেন সেখান থেকে পথচারীদের দেখতে কোনই অসুবিধা হ'তো না। তাঁর রসিকতার ধরণটা কতক এই রকম ছিল ঃ

কোন তরুণীকে যেতে দেখলে তিনি সব কাজ ফেলে অকস্মাৎ গম্ভীর হয়ে উঠে দাঁড়াতেন—হঠাৎ উঠে দাঁড়ানোর জন্য উপস্থিত সকলের দৃষ্টি তাঁর দিকে পড়তো এবং তাঁর বিস্ময়ভরা আয়ত আঁখির দৃষ্টি অনুসরণ করে পথের দর্শনীয় সজীব দেহটি সকলের কাছে সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠতো। সকলে তরুণীটির দিকে তাকিয়েছে এমন বুঝতে পারলে কবি ধীরে টেনে টেনে উচ্চারণ করতেন, এক লাইন কবি ই-তা-আ!

হাসির হুল্লোর পড়ে যেত সঙ্গে-সঙ্গে।

কিন্তু সবদিন কবি কেবল এক লাইন কবিতা বলতেন না। সৌন্দর্যের পার্থক্য থাকলে তাঁর বলাতেও তর-তম স্পষ্ট হ'য়ে উঠতো। অপূর্ব সুন্দরী অথচ শান্ত পদবিক্ষেপে চলা রমণীকে দেখলে তিনি বলতেন কবিগুরুর কবিতা, চপল ভংগীতে চলা তরুণীকে দেখে বলতেন সত্যেন দত্তের লাইন।

কবির প্রথম বিবাহ হয় কুমিল্লার অন্তর্গত দৌলৎপুর নিবাসী আলী আকবর খানের ভাগ্নী নার্গিস-আসার খানের সঙ্গে। নানা কারণে এ বিয়ে সুখের হয় নি, এমন কি কেবল নামমাত্র বিয়ে ছাড়া এ বিয়েকে প্রকৃত কোন বিয়েই বলা চলে না। রাতে বিয়ে হ'য়েছিল এবং বিয়ের পর কবি আসর ত্যাগ করে চলে আসেন। কিন্তু এই বিয়ে সুখের না হওয়ার মূলে কবির কোনই দোষ ছিল না—ত্রুটি ছিল অন্যত্র। সে অন্য কথা।

এই বিয়েতে যে নিমন্ত্রণপত্র ছাপা হ'য়েছিল তাতে নাম ছিল আলী আকবর খানের, কিন্তু সমগ্র পত্রটি কবির রচনা। নিমন্ত্রণপত্রও যে কতখানি সাহিত্য হ'য়ে উঠতে পারে—এই পত্রটি তার নিদর্শন।

কুমিল্লা থেকে কবি নিমন্ত্রণ করেছিলেন আফজালুল হক সাহেবকে

সেই নিমন্ত্রণপত্রখানি আজও হক সাহেবের নিকট সযত্নে রক্ষিত আছে। সেই অপ্রকাশিত পত্রখানি আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করলাম ঃ

বিনয় সম্ভাষণ পূর্বক নিবেদন—

'জগতের পুরোহিত তুমি, তোমার এ জগৎ মাঝারে,
এক চায় একেরে পাইতে, দুই চায় এক হইবারে।'

—রবীন্দ্র।

এ বিশ্ব-নিখিলের সকল শুভকাজে যাঁর প্রসন্ন কল্যাণ আঁখি অনিমিখ হয়ে জেগে রয়েছে, সেই পরম করুণাময় আল্লাহ্ তায়ালার করুণাধারা শ্রাবণের ধারার মতই ব্যাকুলবেগে আজ আমার ঘরে—আমাদের মুখের 'পরে বুকের 'পরে ঝরে পড়ছে; তাঁর কল্যাণ-আতুর আনত আঁখির সু-নিবিড় চাওয়া কেমন এক সুধা-করুণ আশীষে ছেয়ে ফেল্‌ছে!

শিশির-নত ফুলের মতই আজ তাই আমার সকল প্রাণ-দেহ-মন তাঁর চরণধুলোর তলে লুটিয়ে পড়ছে। তাঁর ঐ মহাকাশের মহা-সিংহাসনের নীচে আমার মাথা নত করে আমি আপনাদের জানাচ্ছি যে ঃ

আমার পরম আদরের কল্যাণীয়া ভাগ্নী নার্গিস আসার খানমের বিয়ে বর্ধমান জেলার ইতিহাস প্রখ্যাত চুরুলিয়া গ্রামের দেশবিখ্যাত পরম-পুরুষ, আভিজাত্য গৌরবে বিপুল গৌরবান্বিত, আয়মাদার, মরহুম মৌলবি কাজী ফকির আহমদ সাহেবের দেশ-বিশ্রুত পুত্র মুসলিম-কুল-গৌরব মুসলিম-বঙ্গের 'রবি'-কবি দৈনিক নবযুগের ভূতপূর্ব সম্পাদক কাজী নজরুল ইস্‌লামের সাথে। বাণীর দুলাল দামাল ছেলে, বাংলার এই তরুণ সৈনিক-কবি ও প্রতিভান্বিত লেখকের নতুন করে নাম বা পরিচয় দেবার দরকার নেই। এই আনন্দ-ঘন চির-শিশুকে যে দেশের সকল লেখক-লেখিকা, সকল কবি বুকভরা ভালোবাসা দিয়েছেন, সেই বাঁধন-হারা যে দেশমাতার একেবারে বুকের

কাছটিতে প্রাণের মাঝে নিজের আসনখানি পেতে চলেছে, এর চেয়ে বড় পরিচয় তার আর নেই।

আপনারা আমার বন্ধু, বড় আপনারজন। আমার এ গৌরবে, আমার এ সম্পদের দিনে আপনারা এসে আনন্দ করে আমার এ কুটির-খানিকে পূর্ণ আনন্দ দিয়ে ভরাট করে তুলুন, তাই এ আমন্ত্রণ।

এমন আচমকা না চাওয়া পথে কুড়িয়ে-পাওয়া যে সুখে আমার হৃদয় কানায় কানায় পুরে উঠেছে, আপনাকেও যে এসে তার ভাগ নিতে হবে। এদের পাশে দাঁড়িয়ে, মাথায় হাত দিয়ে প্রাণভরা আশীর্বাদ করতে হবে! আর একা এলে তো চলবে না, সেই সঙ্গে আপনি আপনার সমস্ত আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবকে আমার হয়ে পাকড়াও করে আনবেন এ মঙ্গল-মধুর দৃশ্য দেখাতে।

বিয়ের দিন আগামী ৩রা আষাঢ়, শুক্রবার নিশীথ-রাতে। নিশীথ-রাতের বাদল ধারার মতই আপনাদের সকলের মঙ্গল-আশীষ যেন এদের শিরে ঝরে পড়ে এদিন!

আমি আজ তাই জোর করেই বলছি, আমার এত বড় চাওয়ার দাবির অধিকার ও সম্মান হ'তে—আপনার প্রিয় উপস্থিতি হ'তে আমায় বঞ্চিত করে আমার চোখে আর পানি দেখবেন না। আরজ—

বিনীত-

দৌলৎপুর, ত্রিপুরা, আলী আকবর খান
২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৮ বাং

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, নানা কারণে এ বিয়ে বিয়ের দিনই ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং কবি বিবাহ-বাসর ত্যাগ করে চলে আসেন। তিনি ঐ দিন রাতে দৌলৎপুর হ'তে কান্দিরপাড়ে চলে আসেন। এখানে তিনি বিখ্যাত সেনগুপ্ত পরিবারের 'একজন হ'য়ে' বেশ কিছু দিন অবস্থান করেন। এই পরিবারে সর্বেসর্বা স্নেহশীলা

মহিলা শ্রীমতী বিরজাসুন্দরী দেবীকে তিনি মা বলেন। বলা-বাহুল্য, বিরজাসুন্দরী দেবী কবিকে আপন পুত্রের মতই ভালবাসতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই মহীয়সী মহিলার হাতে লেবুর রস পান করে কবি হুগলী জেলে তাঁর ঐতিহাসিক অনশনব্রত ভঙ্গ করেন। কুমিল্লা হতে আফজালুল হককে লেখা একটি চিঠিতে এই 'মায়ের স্নেহে'র কথা উল্লেখ করেছেন। আর একটি বিষয় লক্ষণীয়ঃ চিঠিতে কবি আফজাল সাহেবকে 'ডাবজল' বলে সম্বোধন করেছেন। উভয়ের মধ্যকার প্রীতির সম্পর্কটুকু সুন্দররূপে ফুটে উঠেছে। আমরা নিম্নে এই অপ্রকাশিত পত্রখানির অনুলিপি প্রকাশ করলাম ঃ

Kandirpar
Comilla
15th Chaitra.

ভাই ডাবজল !

'মোস্‌লেম ভারত' কি ডিগ্‌বাজি খেল না কি? খবর কি? 'ব্যথার দান' কেমন কাটছে? কত কাটল? অন্যান্য কাগজে সমালোচনা বা বিজ্ঞাপন বেরুল না কেন? 'সার্ভেন্ট' আর 'মোহাম্মাদী'র সমালোচনা এবং 'বিজলী' ও 'বাংলার কথা'র বিজ্ঞাপন দেখেছি মাত্র। আরবী ছন্দ' দেখেছেন? কে কি বললে? আপনার মুমূর্ষু অবস্থা দেখেই ওটা প্রবাসীতে দিয়েছি। তার জন্যে দুঃখিত হয়েছেন না কি? আর সব খবর কি? 'মোসলেম ভারতে'র অবস্থা জানবার জন্যে বড্ডো উদ্বিগ্ন রইলাম। এতদিন চট্টোগ্রামে বা অন্য কোথাও যেতে পারি নি, তার কারণ এ বাড়িতে অন্তত, দুজন করে অনবরত শয্যাগত রোগশয্যায়। এখানে আবার বসন্ত হয়েছে মেয়েদের। এসব ছেড়ে যেতে পারি নি। তা' ছাড়া মায়ের স্নেহ আর নিজের আলস্য-ঔদাস্য তো আছেই। চট্টোগ্রামে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সে আসবেন না কি? আমি যাব নিশ্চয়ই

দেখতে। দুই কাজই হবে। নিজের শরীরও ভাল নয়। মনের অশান্তির আগুণ দাবানলের মত দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে। অবশ্য, 'আমি নিজেই নিজের ব্যথা করি সৃজন!' হ্যাঁ, আমায় আজই কুড়িটি টাকা টেলিগ্রাফ মনি অর্ডার করে পাঠাবেন kindly, বড্ডো বিপদে পড়েছি। কারুর কাছে চাইতে লজ্জা হয়। অন্য কারুর কাছে আমি যাই-ই হই, আপনার কাছে আমি হয়তো ভালোতে মন্দতে মিশে তেমন আছি। এই অসময়ে আমার আর কেউ নেই দেখে আপনার স্মরণ নিলুম। আশা করি বঞ্চিত হব না। তা' অপনি যত কেন দুর্দশাগ্রস্ত হোন না কেন। টাকা চাই-ই চাই ভাই। নইলে যেতে পারব না। অনেক কষ্ট দিলুম—আরও দেব। 'ব্যথার দান' মোট নয়খানা পেয়েছি মাত্র আরও খান পনের আমার দরকার। খুবই দরকার—আজই পাঠাবেন। বাড়িতে এক-খানাও নেই। সে যাক টাকা পাঠাবেনই যে কোরে হোক।

আমার লেখাটা তা' হ'লে 'উপাসনায়' দিয়ে দেবেন যদি মো ভাঃ না বেরোয়।

চির স্নেহানুবন্ধ

নজরুল

এ চিঠিতে ডাকঘরের যে শীলমোহর আছে তা'তে তারিখ হ'লে '28 March, 1922.'

এই চিঠিতে কবি লিখেছেন, 'চাটোগ্রাম বা অন্য কোথাও যেতে পারি নি।' এর পিছনে একটি ইতিহাস আছে। কবি এব জনাব মুজফ্ফর আহমদের সম্পাদনায় সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ' বা হ'য়েছিল—কিন্তু নানা কারণে তার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় উভয়ে যৌথভাবে মূলধন সংগ্রহ করে নতুন একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন করেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা 'দি ন্যাশন্যাল জার্নাল লিমিটেড জয়েণ্ট স্টক কোং' নাম দিয়ে একটি প্রতিষ্ঠানও গঠন করেন

এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সারা বাংলায় শেয়ার বিক্রয়ের আয়োজন হয় এবং এই উদ্দেশ্যে কবিকে চট্টোগ্রামে পাঠান হয়। কিন্তু কবি চট্টোগ্রামে না গিয়ে ওঠেন কুমিল্লার কান্দিরপাড়ে।

চিঠিতে কবি যে টাকা ও 'ব্যথার দানের' কথা বলেছেন হক সাহেব তা সঙ্গে সঙ্গেই পাঠিয়ে দিয়েছেন। উভয়ের পারস্পারিক সৌহার্দ্য-সম্পর্ক নির্ণয়ে যে চিঠিখানির অসীম গুরুত্ব রয়েছে তা অনস্বীকার্য।

আর একটি অপ্রকাশিত তথ্যের অবতারণা করে আমরা এ প্রসঙ্গ সমাপ্ত করব। তথ্যটি দিয়েছেন আফজালুল হক।

বয়ঃসন্ধিক্ষণের দুর্বল মুহূর্তে কবি কোন এক কিশোরীর প্রতি আকৃস্ট হন। কবির প্রতি কিশোরীও হয়তো কিছুটা দুর্বল মনোভাব পোষণ করতেন! একদিন কথা প্রসঙ্গে উভয়ের মাঝে কথাকাটাকাটি হ'তে হ'তে কবি উত্তেজিত হ'য়ে পড়েন। নিতান্ত বালক-সুলভ চাপল্যে তিনি একটি চড় মারেন। এতে কিশোরী অভিমান-ক্ষুব্ধ হয়ে স্থান ত্যাগ করেন। বেশ কিছুদিন উভয়ের মাঝে আর দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। হঠাৎ সে সুযোগ এলো একদিন। কবি শুধোলেন, কেন এতদিন দেখা করনি? নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে থাকেন কিশোরী। এতে অভিমান-ক্ষুব্ধ কবি অধিকতর উত্তেজিত হয়ে পড়েন। উত্তেজনার মুহূর্তে তিনি তাঁর মাথায় কয়েক মুষ্টি ধূলা নিক্ষেপ করেন এবং খোপা থেকে একটি রূপার কাঁটা খুলে নেন। এ ঘটনায় কিশোরীর কর্তৃপক্ষ বেশ কিছুটা ক্ষুব্ধ হন। শেষে এমন হ'লো যে উভয়ের মধ্যে দেখা-সাক্ষাতের আর কোন অবকাশই রইল না। এই ঘটনায় আবেগ-চঞ্চল কবি বিশেষ রূপে আহত হ'য়ে পড়েন।

রূপার কাঁটাটি কবি দীর্ঘ দিন সযত্নে রক্ষা করেছিলেন। সৈনিক বিভাগে দীর্ঘদিন কাটিয়ে তিনি যখন কলকাতায় ফিরে এলেন তখনো তাঁর কাছে কাঁটাটি ছিল। সে কাঁটা তিনি জনাব

মুজাফ্ফর আহমদ ও আফজালুল হক সহ অন্যান্য বন্ধুদের দেখান। জনাব মুজফ্ফর আহমদও আমাকে এই ঘটনাটির কথা বলেছেন। যা হোক কলকাতা থেকে কবি যে সময় কুমিল্লায় যান তখন এই তরুণীর বিবাহের আয়োজন চলে। এ সংবাদ পেয়ে কবির কোন বন্ধু কুমিল্লায় তাঁকে চিঠিতে জানান, 'তোমার মাথার কাঁটার বিয়ে হ'য়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি ফিরে এলে হয়তো কিছু সুরাহা হ'তে পারে।'

কিন্তু কবি তাড়াতাড়ি ফেরেন নি।

কবির অনেকগুলি গল্পে এই ঘটনাটির স্পষ্ট প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। এমন কী "ব্যথার দান"-এর উৎসর্গ-পত্রে কবি এই বালিকাকে উদ্দেশ্য করে লেখেন :

"মানসী আমার!

মাথার কাঁটা নিয়েছিলুম বলে ক্ষমা করনি, তাই বুকের কাঁটা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করলুম।"

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

সেই একই কথা শুনলাম—কবির আরো পাঁচজন বন্ধু-বান্ধবের মুখে যে কথা শুনেছি সেই কথা। সুরেশবাবু বললেন, তাঁর সঙ্গে কবির এমনই একটা সম্পর্ক ছিল যা অন্যত্র বিরল। কথাটা হয়তো মিথ্যা নয়। উদারপ্রাণ সদালাপী বন্ধুবৎসল নজরুল যখনই যাঁর সঙ্গে মিশেছেন—প্রাণ দিয়ে মিশেছেন, 'আম' 'খাসে'র প্রভেদ বিলুপ্ত করেই মিশেছেন, ফলে সবার পক্ষেই অনুরূপ ধারণা করার অবকাশ ঘটেছিল। বর্তমানের দ্বন্দ্ব-সর্বস্ব যুগে হৃদয়ের এই উদারতা ক্রমেই সংকীর্ণ ও সঙ্কুচিত হ'য়ে আসছে।

সুলগ্নেই যাত্রা শুরু হ'য়েছিল।

সুরেশবাবু কবিকে বললেন, ওঠ গাড়ীতে।

গাড়ীতে উঠে জাঁকিয়ে বসে কবি বললেন, বেশ—তারপর।

মৃদু হেসে সুরেশবাবু বললেন, বাড়ীতে বসে আর ভাল লাগছে না। চল ঘুরে আসি একটু।

বহুবার যে প্রস্তাব কবি নাকচ করে দিয়েছিলেন এমনি সহজ চালাকির জটিলতায় পড়ে কবি তা'তে সম্মতি জানাতে

বাধ্য হলেন। কবি বুঝতেই পারলেন না যে তাঁকে অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে নিয়ে যাওয়া হ'চ্ছে। গাড়ীটা বা ড্রাইভার আকাশ-বাণীরই, কিন্তু বর্তমানের মত তখনকার দিনে আকাশবাণীর গাড়ীতে বা ষ্টাফদের কোথাও 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও'র বিজ্ঞাপন আঁটা থাক্‌ত না। ফলে কবি বুঝতেই পারলেন না যে তাঁকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হ'চ্ছে। আকাশবাণীর কম্পাউণ্ডে গাড়ী রেখে কবিকে নিয়ে সুরেশবাবু সোজা উঠে এলেন তাঁর চেম্বারে। কবি তখনো বলছেন, এ আমাকে কোথায় নিয়ে এলে ?

কতকটা প্রত্যয়-নির্ভর কণ্ঠে সুরেশবাবু বললেন, এটা অল ইণ্ডিয়া রেডিও এবং এবার থেকে রেডিওর জন্যই গান রচনা করতে হবে।

কবি কথাটা শুনেই গম্ভীর হ'য়ে গেলেন।

সে যুগে মর্য্যাদা-সম্পন্ন কোন সাহিত্যিক রেডিওর সঙ্গে যোগাযোগ থাকাটা বাঞ্ছনীয় মনে করতেন না, হয়তো কিছুটা মর্যাদাহানীকর মনে করতেন। রেডিওর প্রসঙ্গ উঠতেই নজরুল বহুবার বলেছেন : 'আগে কবি-রাজকে এনে 'টক' প্রচার কর তবে আমি যাব।' অবশ্য শেষের দিকে কবিগুরুও কালিম্পং থেকে বেতারে কথিকা প্রচার করেছিলেন। যাক সে অন্য কথা।

কবির মুখের ভাব লক্ষ্য করে সুরেশবাবু কিছুটা বিচলিত হ'য়ে পড়লেন। তবুও কণ্ঠে প্রত্যয়ের সুর টেনে বললেন, রেডিওতে না থেকে গ্রামোফোনে থাক্‌বে, ব্যাপার তো একই। তফাত এই গ্রামোফোনে একটি রেকর্ড বড় জোর হাজারখানা তৈরী হ'বে— শুনবে হাজার পাঁচেক লোক, কিন্তু বেতার যোগে সেটা প্রচারিত হ'লে অন্তত: এক লক্ষ লোকের আনন্দের মূলধন হবে। তা' ছাড়া এখানে গান রচনার স্বাধীনতা পাবে—ফরমায়েস মত এক সঙ্গে পাঁচ মিশেলী গান রচনা করতে হ'বে না। এমন কী সুরের

ওপরেও হস্তক্ষেপ কর। হ'বে না—তোমার দেওয়া সুরেই গানগুলি প্রচারিত হ'বে।

গাম্ভীর্য ঝেড়ে ফেলে হেসে উঠলেন কবি, দাও খাতা-কলম।

একেবারে শিশু, নির্মল অন্তর—'তুমি যেমন করাও তেমনি করি।'

১৯৩৮ সালের ঘটনা। সেই থেকে কবি রেডিওতে রয়ে গেলেন। রেডিওতে যোগাযোগের মূলে যে সুরেশ চক্রবর্তীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা কাজ করেছিল সে কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। সুরেশ বাবুইকবিকে নিয়ে এলেন রেডিওতে। এখানে তাঁর সক্রিয় সহযোগিতায় কবির সংগীত-জীবনের এক গৌরবময় নতুন দিগন্তের দ্বার খুলে গেল।

২.

অবশ্য কবির সঙ্গে সুরেশবাবুর যোগাযোগ এর বহু পূর্বেই ঘটেছিল। মিলন-সেতু 'বিদ্রোহী' কবিতা। কবিতাটি প্রকাশিত হবার পর নলিনীকান্ত সরকারের সঙ্গে এসে সুরেশবাবু কবির সঙ্গে আলাপ করে যান। তারপর বহুবার বহু আলাপ হয়েছে। ১৯২৬ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত এ আলাপ অক্ষুণ্ণ ছিল। এই সময় সুরেশবাবু আইন পাশ করে ওকালতির জন্য মৈমনসিংহে চলে যান। কিন্তু আইন ব্যবসা জমে উঠলেও সংগীতের আকর্ষণ তাঁকে পেয়ে বসেছিল, ফলে তিনি মৈমনসিংহ থেকে কলকাতায় চলে আসেন। এখানে এসে ১৯৩৪ সালে তিনি বেতারে সংগীত শিক্ষক নিযুক্ত হ'লেন এবং ঐ একই সালের শেষের দিকে Music Director-এর পদে উন্নীত হ'লেন। এ সময়ে কবির সঙ্গে তাঁর পূর্ব যোগাযোগ ঘনিষ্টতর হ'য়ে উঠেছিল।

কেবল সংগীত রচনা নয়, বেতারের জন্য কবিকে দিয়ে অনেকগুলি কবিতা রচনা করিয়ে নিয়েছিলেন সুরেশবাবু। অসংখ্য কবিতাবলীর মধ্যে একটি কবিতা বিশেষরূপে স্মরণযোগ্য। কবিতাটির নাম 'রবি-হারা'।

১৩৪৮ সালের শ্রাবণ মাস। রবীন্দ্রনাথের অবস্থা বেশ কিছুদিন ধরেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় চলছে। ২২শে শ্রাবণ সকাল থেকেই কবির অবস্থা গুরুতর হয়ে উঠেছিল। কয়েক মিনিট অন্তর অন্তর বেতারে কবিগুরুর অবস্থা দেশবাসীকে জানিয়ে দেওয়া হ'চ্ছে। বেতারের তরফ থেকে কবির বাস ভবনে রয়েছেন নলিনীকান্ত সরকার। তিনি টেলিফোন যোগে কবির অবস্থা জানিয়ে দিচ্ছেন বেতার কর্তৃপক্ষকে। দুপুর ১২টা ১১ মিনিটের সময় এল চরম সংবাদ। বেতারে তখন পাশ্চাত্য সংগীতের রেকর্ড বাজছিল এবং সে রেকর্ডগুলির পরিচিতি ঘোষণা করছিলেন একজন ইংরেজ। সুরেশবাবু সেখানে গিয়ে সাহেবের মুখ থেকে মাইক কেড়ে নিলেন এবং বাদ্যযন্ত্রের সুইচ অফ করে দিলেন। সাহেব তো হতভম্ব। মাইক কেড়ে নিয়ে কবিগুরুর মৃত্যু সংবাদ প্রচার করলেন সুরেশবাবু। কবির মৃত্যুর পর বেতারযোগে কি প্রচার করা হবে তা' পূর্বাহ্নেই লিখিত হ'য়েছিল। ইংরেজী অংশটি ঘোষণা করলেন উক্ত ইংরেজ। ঘোষণার পর্ব সমাপ্ত করে বেরিয়ে এলেন সুরেশবাবু। তিনি ফোনে সর্বপ্রথম যোগাযোগ করলেন নজরুলের সঙ্গে এবং জানালেন যে, রাজকবির মৃত্যু উপলক্ষ্যে সন্ধ্যায় বেতারের এক বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য কবিতা চাই। অবশ্য এ অনুরোধ তিনি আরও অনেকের নিকট জানিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের কথা শুনে কবি লিখলেন 'রবি-হারা' শীর্ষক দীর্ঘ কবিতাটি এবং যথারীতি বেতার মারফত প্রচারিতও হ'য়েছিল। ১৩৪৮ সালের ভাদ্র মাসের 'সওগাতে' এই অমূল্য কবিতাটি মুদ্রিত হবার পর

কবির কোন গ্রন্থে কবিতাটি সংকলিত হয়নি—সম্প্রতি 'নজরুল রচনা সম্ভার' প্রথম খণ্ডে কবিতাটি স্থান লাভ করেছে!

৩.

নজরুলের সংগীত-জীবনকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে: প্রথম অধ্যায় কেটেছে গ্রামোফোনে এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের সূচনা ও সমাপ্তি রেডিওতে। প্রথম পর্বে কবি যে গানগুলি রচনা করেন সেগুলি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল কিন্তু এগুলির মধ্যে অধিকাংশ সংগীতে এবং রাগের কারুকার্য সূক্ষ্মতম পর্যায়ে উন্নীত হ'তে পারেনি—রাগ এবং রাগিনীর হর-পার্বতী মিলন ঘটেছে দ্বিতীয় পর্বে। সংগীত-শাস্ত্রের সূক্ষ্মতম বিধিনিষেধ মেনে এই পর্বের সংগীতগুলি দুর্লভ সৌন্দর্যে মনোহর হয়ে উঠেছে। নজরুল-সংগীতের বলিষ্ঠতা ও সুর বৈচিত্র্যের অন্বেষণে গবেষকদের লক্ষ্য এই পর্বের সংগীতাঞ্জলির দিকে নিবদ্ধ রাখতে হ'বে। 'Great music' বলতে আমরা যা বুঝি তা' নজরুল এই পর্বেই সৃষ্টি করেছেন। বেতারে কবির জন্যে তিনটি অনুষ্ঠান নির্দিষ্ট ছিল: (ক) হারামণি (খ) গীতি বিচিত্রা এবং (গ) নবরাগমালিকা। এই তিনটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সংগীত রচনায় কবি অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

৪.

'হারামণি' অনুষ্ঠানটি মাসে একবার করে প্রচারিত হতো। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কবি অপ্রচলিত এবং লুপ্তপ্রায় রাগ-রাগিনীর পুনঃপ্রচলনের প্রচেষ্টায় নিজেকে নিয়োগ করেছিলেন। রাগ-রাগিনীতে সমৃদ্ধ হয়ে না উঠলে কোন দেশের সংগীত প্রাচুর্যময়

ও শাশ্বত হয়ে উঠতে পারে না। এই সহজ সত্যের দিকে দৃষ্টি রেখে কবি বাংলার সংগীতকে রাগ-রাগিনীর প্রাচুর্যে অনবদ্য করে তুলতে চেয়েছিলেন। এই অনুষ্ঠানে প্রচারিত প্রতিটি সংগীত লুপ্তপ্রায় বা হারিয়ে যাওয়া রাগ-রাগিনীকে কেন্দ্র করে লিখিত। এই সকল রাগ-রাগিনীর মধ্যে অনন্ত গৌড়, মালগুঞ্জ, যুঁই, আহীর ভৈরব, বাঙাল বিলাবল, আনন্দ ভৈরব, বসন্ত মুখারি, উমা তিলক, শৃঙ্গার বিরহাগ্নি, লঙ্কাদহন সারং, জৌন বাহার, রক্তহংস সারং ইত্যাদি প্রধান। এদের মধ্যে আহীর ভৈরব সুরটি পরবর্তীকালে বিশেষরূপে আদৃত ও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। 'অরুণ কান্তি কে গো যোগী ভিখারী' শীর্ষক বিখ্যাত নজরুল গীতিটি আহীর ভৈরব সুরে লিখিত। হারামণি অনুষ্ঠান শুরু হবার প্রথমে সুরেশবাবু রাগ ও সুরের বিশ্লেষণ করতেন। এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে রাগ সম্পর্কে শ্রোতাদের মনে মোটামুটি একটা ধারণা গড়ে ওঠার পর সেই রাগে রচিত গানটি কবি নিজে গাইতেন। লক্ষণীয় বিষয় এই যে হারামণি অনুষ্ঠানের কোন গান বাইরের শিল্পীকে দিয়ে গাওয়ান হ'তো না। এই অনুষ্ঠানের সংগীতগুলি রচনার জন্য কবিকে কঠোর পরিশ্রম করতে হ'তো। সংগীতজ্ঞ আমীর খসরু রচিত ফার্সী ভাষার এক বিপুলায়তন গ্রন্থ এবং নওয়াব আলী চৌধুরী কৃত 'মআরিফুন্ নাগমাত' বিখ্যাত সংগীত গ্রন্থ দু'খানি কবি অতি যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করতেন। এ ছাড়াও রাগ-রাগিনী সম্পর্কে একটি মোটামুটি ধারণা তিনি সুরেশ বাবুর কাছ থেকেও পেতেন। এই দ্বিবিধ মূলধন সম্বল করে কবি গভীর রাত্রে একান্ত নিস্তব্ধ পরিবেশে ধ্যান-তন্ময়তার ভিতর দিয়ে হারামণির গানগুলি রচনা করতেন। সংগীত রচনার জন্য কোন সময় কবিকে এমন তপস্যা নিমগ্ন হতে দেখা যায়নি। অথচ দুর্ভাগ্য আমাদের এই অনুষ্ঠানে প্রচারিত অধিকাংশ গান বর্তমানে পাওয়া যায় না। শোনা যায় হারামনি অনুষ্ঠান সম্পর্কীয় গানের খাতাটি

চুরি হ'য়ে গেছে। ফলে বাংলা দেশ তার নিজস্ব সংগীতের এক আশ্চর্য সম্পদ হারিয়েছে।

৫.

বেতারে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় অনুষ্ঠান হয়েছিল 'গীতিবিচিত্রা'। অনুষ্ঠানটি মাসে দু'বার প্রচারিত হ'তো, পৌনে এক ঘণ্টার অনুষ্ঠান। কবি যতদিন বেতারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, নিয়মিত অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হয়েছে। সংগীত পরিচালক সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্তীর মতে আশি হতে নব্বুইটি গীতিবিচিত্রা বেতার মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে। অনুষ্ঠানটি শোনার জন্যে দেশের আপামর জনসাধারণ সাগ্রহে অপেক্ষা করে থাকতো।

গীতিবিচিত্রা অনুষ্ঠানটিকে সংগীত আলেখ্য অনুষ্ঠান বলা চলে। মূল একটি বিষয়কে অবলম্বন করে ছ'টি করে সংগীত পরিবেশন করা হ'তো। এই অনুষ্ঠানে যে সকল সংগীত আলেখ্য পরিবেশিত হ'য়েছে তাদের মধ্যে প্রধান হ'লো 'কাফেলা', 'কাবেরী তীরে', 'ছন্দসী' ইত্যাদি।

'কাফেলা' আলেখ্যটিতে দেখা যায় এক দল মরুযাত্রী এগিয়ে চলেছে। তাদের চলার সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও দৃশ্যাবলী পরিবর্তিত হচ্ছে আর পরিবর্তিত হচ্ছে সময়। দিবস সন্ধ্যার বুকে বিলীন হ'য়ে রাত্রের মধ্যে প্রবেশ করছে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হচ্ছে কাফেলার গতিবেগ এবং মেজাজ। বাণী এবং সঙ্গীতের মাধ্যমে এই পরিবর্তনকে ধরে রাখার চেষ্টা করা হ'য়েছে। কাফেলার গতিবেগের সঙ্গে ফুটে উঠেছে গৃহে অপেক্ষমান প্রিয়তমাদের প্রতি তাদের হৃদয় আকর্ষণ। সব মিলিয়ে কাফেলা সংগীত আলেখ্যটি অপূর্ব। মরুভূমির পরিবেশ ফোটানোর জন্য আরব দেশ থেকে সংগৃহীত আরবীয় সুর সমৃদ্ধ রেকর্ড থেকে কবি সুর সংগ্রহ

করেছিলেন। এই রেকর্ডগুলি গ্রামোফোন কোম্পানী কবির জন্য আরব থেকে আনিয়েছিলেন। কাফেলার কয়েকটি গানে আরবী সুর বিধৃত ছিল।

'কাবেরী তীরে' গীতিনাট্যটি একটি নিটোল ভালবাসার কাহিনীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। কাবেরী নদীর তীরে প্রেমের আদিম আকর্ষণে মিলিত হ'য়েছে দুটি হৃদয়, তাদের মান অভিমানকে কেন্দ্র করে ছ'টি গানের মাধ্যমে কাহিনী পরিসমাপ্তি লাভ করেছে। নজরুলের বিখ্যাত গান 'কাবেরী নদী জলে কে গো বালিকা' এই গীতিনাট্যর জন্যেই রচিত। পরে এটি সুপ্রভা সরকারের কণ্ঠে রেকর্ড করা হয়।

'ছন্দসী' গীতিনাট্যটি দু'টি অনুষ্ঠানে সমাপ্ত হয়। 'ছন্দসী'র রচনা ও প্রচার প্রধানতঃ সুরেশবাবুর সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে আট-দশটি সংস্কৃত ছন্দকে অনুসরণ করে কবি গান রচনা করেন। সংস্কৃতের যে ক'টি ছন্দকে কবি অনুসরণ করেছিলেন তাদের মধ্যে কয়েকটি হ'লো 'মালিনী', 'বসন্ত তিলক', 'তনুমধ্যা' 'ইন্দ্রজা', 'মন্দাক্রান্তা' ইত্যাদি। এই ছন্দগুলির মাত্রা, যতি, তাল ইত্যাদির ব্যাখ্যা সুরেশবাবু কবিকে বুঝিয়ে দিতেন—যেমন বাইশ মাত্রার মালিনী ছন্দ এই ঃ

ন ন ম য য যু তে, 'য়ং' মালিনী ভোগি লো কৈঃ

কিম্বা একুশ মাত্রার বসন্ততিলক ছন্দটি ঃ

জ্ঞেয়ং ব স ন্ত তি ল কং ত ভ জা জ গৌগঃ

এই ছন্দগুলি যথাযথ অনুধাবন করে নিয়ে ঠিক অনুরূপ ছন্দে কবি বাংলায় সংগীত রচনা করতেন। এভাবে মাত্রা ঠিক রেখে প্রকৃত সংগীত রচনা করা যে কত কঠিন তা সহৃদয় রসবেত্তা ব্যক্তিগণ

অনুধাবন করিবেন। এই কঠিন পরীক্ষায় নজরুল অনায়াসে সাফল্য অর্জন করেছিলেন।

গীতিবিচিত্রার আর একটি অনুষ্ঠান গড়ে উঠেছিল কেবলমাত্র কীর্তনের সুরে। আশি হ'তে নব্বইটি অনুষ্ঠানের জন্য কবি কমপক্ষে পাঁচশো গান রচনা করেছিলেন এবং এর মধ্যে অন্ততঃপক্ষে সত্তর-আশিটি সংগীত আলেখ্য। পাঁচশো গানের মধ্যে সমসাময়িক কালে যে স্বল্প সংখ্যক গান রেকর্ড করা হয়েছিল (তাদের সংখ্যা পঞ্চাশের উর্দ্ধে নয়) সেগুলি ছাড়া আর একটিও পাওয়া যায় না। অনুরূপভাবে আলেখ্যগুলিও অবলুপ্ত হয়েছে অথবা হবার অপেক্ষায় আছে, অন্ততঃ তারপর থেকে পাঠক সমাজের চোখে পড়েনি। কলকাতার বেতার দপ্তরের পুরানো রেকর্ডপত্রে হয়তো এখনো কিছু গীতিনাট্য পাওয়া যেতে পারে। আমি ব্যক্তিগতভাবে বেতার কার্যালয়ে দু'দিন গিয়ে কর্তৃপক্ষদের অসহযোগিতার মনোভাবের ফলে নিরাশ হয়ে ফিরে এসেছি। এই জাতীয় সম্পদের যথাযোগ্য অনুসন্ধান হ'লে বাংলা তথা পাক-ভারতের সংগীত ভাণ্ডার যে বিশেষ রূপে সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠবে—এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা চলে।

৬.

'হারামণি' এবং 'গীতিবিচিত্রা' অনুষ্ঠান দু'টি ছাড়াও কবির সংগীত এবং সুরে প্রচারিত হতো 'নবরাগ মালিকা' অনুষ্ঠানটি। 'হারামণি' অনুষ্ঠানে তিনি যেমন অপ্রচলিত বা হারিয়ে যাওয়া রাগরাগিণীগুলির পুনঃপ্রচলনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন তেমনি 'নবরাগ মালিকা' অনুষ্ঠানে তাঁর লক্ষ্য স্থির ছিল নতুনতর সুর সৃষ্টির দিকে। বর্তমান সংগীত জগতে নতুন সুর সৃষ্টি করা যে কত কঠিন তা সংগীতজ্ঞ ব্যক্তিগণ

সহজেই অনুধাবন করবেন। বিশ্বকবি অনেক উৎকৃষ্ট সংগীত রচনা করেছেন কিন্তু নতুন রাগরাগিণীর সৃষ্টি তিনি বড় একটা করেন নি, পুরাতন প্রচলিত রাগরাগিণীকেই তিনি নতুনরূপে উপস্থিত করেছেন। কিন্তু নজরুল? কেবল একটি দু'টি নয়, প্রায় পনেরটির মত নতুন সুরের সৃষ্টি তিনি করেছেন। এগুলির মধ্যে 'উদাসী ভৈরব,' 'অরুণ ভৈরব', 'শিবানী ভৈরবী,' 'আশা ভৈরবী', 'রেণুকা,' 'অরুণ রঞ্জনী,' 'নির্ঝরিণী,' 'দোলন-চাঁপা,' 'ধনকুন্তলা,' ,সন্ধ্যামালতী,' 'মীনাক্ষী,' 'রূপমঞ্জরী' ইত্যাদি প্রধান। ভাবতে আশ্চর্য লাগে কী কঠোর তপস্যায় কবি এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। নতুনতর সুর-রাগিণীর প্লাবনে তিনি বুঝি সমগ্র দেশকে প্লাবিত করে দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর সজ্ঞান জীবন-নাট্যের শেষ পর্বের দিনগুলি ধ্যানী তানসেনের মত সংগীতময় ও ধ্যান-সর্বস্ব হ'য়ে উঠেছিল। কবি সভা-সমিতি ছেড়েছিলেন, বন্ধু-বান্ধব ছেড়ে নিস্তব্ধ গৃহে সংগীত-সুর-সৃষ্টির দুরূহ মৌন তপস্যায় নিয়োজিত হয়েছিলেন।

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে নজরুল-সাহিত্য নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা হ'লেও নজরুল-সংগীতের সত্যকার আলোচনা কোথাও হয়নি। কয়েকটি পল্লী সংগীতের বা কয়েকটি ভক্তিমূলক সংগীতের (ইস্‌লামী-শ্যামা-কীর্তন ইত্যাদি) অথবা মুষ্টিমেয় গজল গানের প্রথম পংক্তি উদ্ধৃত করে গায়ক-গায়িকার নামের তালিকা প্রকাশ করলেই নজরুল-সংগীতের আলোচনা হবে না। এর জন্যে প্রথম প্রয়োজন হারামণি এবং নবরাগ মালিকা অনুষ্ঠানে তিনি যে সংগীতগুলি প্রচারিত করেছেন সেগুলির সংগ্রহ। যে সকল সংগীতে আশ্চর্য সাফল্যে বিভিন্ন সুরের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন সেগুলিও সংগ্রহ করতে হবে। এগুলি সংগ্রহের পর কঠোর পরিশ্রমে সংগীতগুলির শাস্ত্র-সম্মত আলোচনা চাই—তা' হ'লে নজরুল-সংগীতের কিছু সত্যকার আলোচনা হ'বে। প্রচলিত রাগ-রাগিনী নিয়ে যে গানগুলি কবি রচনা করেছেন, সেগুলি 'নজরুল-সংগীত'-ই—'সংগীতজ্ঞ নজরুল' সেখানে

নেই এবং সংগীতজ্ঞ নজরুলকে না জানলে নজরুল-সংগীতের আলো-চনা কখনই পূর্ণ হ'তে পারে না।

আমরা এখানে 'হারামণি' অনুষ্ঠানে প্রচারিত চারটি সংগীত উদ্ধৃত করলাম। প্রথম ও দ্বিতীয় সংগীতের প্রথম পংক্তি, তৃতীয় সংগীতটি সম্পূর্ণ এবং চতুর্থ সংগীতটির সম্পূর্ণ উদ্ধৃতিসহ পূর্ণাঙ্গ শাস্ত্রীয় আলোচনা প্রকাশ করা গেল :

১ম সংগীত : সুর—মালগুঞ্জ।

'গুঞ্জমালা দোলে কুঞ্জে এসো হে কালা'

২য় সংগীত : সুর—শিবর উজনী।

'পার্থসারথি, বাজাও বাজাও পাঞ্চজন্য তব শঙ্খ'

৩য় সংগীত : সুর—বসন্ত মুখারী (তেতালা)।

বসন্ত মুখর আজি।
দক্ষিণ সমীরণে মর্মর গুঞ্জনে
বনে বনে বিহ্বল বাণী ওঠে বাজি ॥
অকারণ ভাষা তার ঝর ঝর ঝরে
মুহু মুহু কুহু কুহু পিয়াপিয়া স্বরে।
পলাশ বকুলে অশোকে শিমুলে
সাজানো তাহার কল-কথার সাজি ॥
দোয়েল মধুপ বন-কপোত কূজনে
ঘুম ভেঙ্গে দেয় ভোরে বাসর শয়নে।
মৌনী আকাশ সেই বাণী-বিলাসে
অস্ত চাঁদের মুখে মৃদু মৃদু হাসে
বিরহ শীর্ণা গিরিঝর্ণার তীরে
পাহাড়ী বেণু হাতে ফেরে সুর ভাঁজি ॥

৪র্থ সংগীত ঃ আনন্দ-ভৈরব (অপ্রচলিত রাগ)।

আরোহী—সা ঋা গা মা পা ধা না র্সা।

অবরোহী—র্সা না ধা পা মা গা ঋা সা।

বাদী—পা।   সম্বাদী—রে।

কথা ও সুর—কাজী নজরুল ইসলাম।

স্বরলিপি—জগৎ ঘটক।

গান ও রাগের ব্যাখ্যা—শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

গান*

জয়, আনন্দ-ভৈরব ডমরু পিণাক-পাণি।
গঙ্গাধর চন্দ্রচূড় শিব তীব্র-ধ্যানী (১)॥
তব সূর্য্যকান্তি-রাগে (২)
প্রাণে প্রভাত শান্তি জাগে,
পর-প্রধান (৩) পূর্ণরূপ (৪), হে শুদ্ধ জ্ঞানী (৫)॥
সরলমতি (৬) শঙ্কর (৭) হে, নাচো, গরল পিয়ে,
আশুতোষ, তুষ্ট তুমি বিল্বদল নিয়ে।
মৃত্যু-ভীত বিশ্বজনে
তমসা-মগন ভুবনে,
শোনাও আনন্দিত মা-ভৈঃ অভয় বাণী॥

---

*গানখানির মধ্যে কবিতার ভাবটুকু সম্পূর্ণ বজায় রেখে কয়েকটি এরূপ দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যাতে লক্ষণ-গীতের ন্যায় রাগের বৈশিষ্ট্যও দৃষ্টিগোচর হয়। এদের অর্থ নিচে দেওয়া হল ঃ

(১) তীব্র ধৈবত ও নিখাদ ব্যবহৃত হয়। (২) এই রাগ প্রাচীন গ্রন্থে 'সূর্যকান্তি' রাগ নামে প্রসিদ্ধ। (৩) পা = বাদী, রে = সম্বাদী। (৪) সম্পূর্ণ জাতি। (৫) শুদ্ধ গান্ধার ও নিখাদ লাগে। (৬) গতি বক্র নয়, সরল। (৭) মিশ্র মেল।

গানের ও রাগের ব্যাখ্যা ঃ

(১) তীব্র ধ্যানী—তীব্র যোগধ্যানরত শিব। সঙ্গীতে তীব্র ধা ও নি যুক্ত এই রাগ।

(২) সূর্যকান্তি রাগে—সূর্যকান্তা একটি দক্ষিণ ভারতীয় রাগ। ভাষাগত অর্থ ভয় সঙ্কোচ দূরকারী শিবের উজ্জ্বল কান্তি। এটি প্রভাতের রাগ সুতরাং আলোকের রাগ বলা চলে।

(৩) পর-প্রধান = প্রধানেরও প্রধান। রাগের বৈশিষ্ট্য বিচারে পা ও রে স্বর প্রধান। এই দুইটিই আনন্দ ভৈরব রাগের বাদী ও সম্বাদী স্বর। পর = পা, রে।

(৪) পূর্ণ রূপ—যেহেতু শিবের মধ্যে কোথাও অভাব বা অপূর্ণতা নেই। রাগ হিসাবে আনন্দ ভৈরব পূর্ণ অর্থাৎ সম্পূর্ণ জাতীয়, যেহেতু এতে সপ্ত স্বরই ব্যবহার্য।

(৫) শুদ্ধ জ্ঞানী = পূর্ণ অবিমিশ্র জ্ঞানসম্পন্ন শিব। রাগ হিসাবে আনন্দ ভৈরব শুদ্ধ 'গা' ও 'নি' যুক্ত। জ্ঞানি = গা, নি।

(৬) সরলমতি = সরলগতি। আনন্দ ভৈরব সঙ্গীতের ব্যাকরণে বক্রগতির রাগ নয়।

(৭) শঙ্কর = উচ্চারণে = সঙ্কর। সঙ্কর = মিশ্র। আনন্দ ভৈরব রাগের ঠাট মিশ্র, যেহেতু এতে ভৈরব আর বিলাবল ঠাটের মিশ্রণ ঘটেছে।—পূর্বাঙ্গে ভৈরব ঠাট + উত্তরাঙ্গের বিলাবল ঠাট।

জসীমউদ্‌দীন

১.

বাংলা-কাব্য-সাধনায় অধুনাকালে যে দু'জন মুসলমান কবির কথা সর্বাগ্রে মনে পড়ে তাঁরা হলেন নজরুল ইসলাম ও জসীমউদ্দীন। দু'জনেই তাঁদের অভ্যুদায়িক উষা-লগ্নে দুই ভিন্ন স্রোতে গা ভাসিয়ে এসেছিলেন, দু'জনেই ছিলেন প্রচলিত কাব্যধারার প্রবল ব্যতিক্রম। নজরুলের বিদ্রোহাত্মক মনোভঙ্গী যেমন সকলকে চমৎকৃত করেছিল তেমনি সকলকে মুগ্ধ করেছিল জসীমউদ্দীনের কাব্যের পল্লীর সুর। পল্লীর মাটি ও মনকে যেদিন মেঠোয়ালি সুরে কাব্যে বিধৃত করলেন, রসিক সমাজ সেদিন জসীমউদ্দীনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠেছিলেন।

সমসাময়িক কালের এই দু'জন শ্রেষ্ঠ কবির হৃদ্য-সম্পর্কটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। কবি নজরুলের সঙ্গে জসীমউদ্দীনের প্রাথমিক আলাপটি কম বিচিত্র নয়।

জসীমউদ্দীনের বাড়ী ফরিদপুর জেলায়। ঘরের সুমুখ দিয়েই বড় পদ্মা প্রবহমান। শিশু কবি পদ্মার তীরে বসে লেখেন কবিতা, পল্লীর কবিতা। পল্লী আর প্রকৃতির সুকোমল সুরে সে সকল কবিতার কমনীয় বক্ষ কম্পমান। কিন্তু গ্রামে সে সকল কবিতার কদর বিশেষ কেউ করে না—কবির একমাত্র প্রাপ্য অবহেলা। শিশুকবি চঞ্চল হ'য়ে ওঠেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় কলকাতার

বৃহত্তর সাহিত্যিক সমাজের সম্মুখে এসকল কবিতা উপস্থাপিত করতে পারলেই তাঁর কবি-জীবনের ঊষা-লগ্ন সাফল্যের আলোকে রঙীন হ'য়ে উঠবে। সুযোগও মিলে গেল। দেশের জনচিত্ত তখন অসহযোগ আন্দোলনের গর্জ্জনমুখর ঢেউ-এ অশান্ত, বিক্ষুব্ধ। একে একে আদালত, স্কুল-কলেজের দ্বার বন্ধ হ'লো। আন্দোলন দাবাগ্নির মত শহর থেকে ছড়িয়ে পড়ল গ্রামে। গ্রামের বিদ্যালয়ে বিক্ষোভ দেখা দিল, অবশেষে ছাত্রসমাজ ইংরাজ সরকারের গোলাম তৈরীর কারখানায় যাওয়া সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ করে দিল। জসীমউদ্দীনও গ্রামের স্কুল ত্যাগ করে পিতামাতাকে কিছু না জানিয়ে গোপনে চলে এলেন কলকাতায়। সঙ্গে সামান্য কয়েক আনা পয়সা আর 'যক্ষের ধন' কবিতার মলিন খাতাখানি। কিন্তু গ্রামের সরল কিশোর বালকের মনে কলকাতা সম্পর্কে যে সোনালী স্বপ্ন দানা বেঁধে উঠেছিল, শিয়ালদহের পাষাণ প্লাটফরমে পা দিয়ে সে স্বপ্ন টুটে গেল। দেখা গেল শহরের রাস্তাঘাটে জসীমউদ্দীনের পল্লী-কবিতা সমঝদার কবি-সাহিত্যিক ছড়িয়ে নেই। এখানে টিঁকে থাক্‌তে গেলে যেটি প্রথম প্রয়োজন তা' হলো 'রূপেয়া'—অথচ সম্বল মাত্র কয়েক আনা। অবশেষে শুভানুধ্যায়ী 'কাতিকদাদা'র পরামর্শে কিশোর কবি কবিতার খাতা ফেলে রেখে 'বসুমতী' আর 'নায়কে'র হকার হলেন। প্রথম দিন পঁচিশখানা 'নায়ক' বিক্রয় করে তিনি উপার্জ্জন করেন চৌদ্দ পয়সা। প্রতিদিন সকাল হ'তে দুপুর রাস্তায় রাস্তায় কাগজ বিক্রয়, মধ্যাহ্নে ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে স্নান, রান্না ও খাওয়া, তিনটার মধ্যে রোদ-জ্বালা পথে বার হ'য়ে রাত ন'টা পর্যন্ত আবার সমানে কাগজ বিক্রয়ের প্রচেষ্টা। রাতে ক্লান্ত দেহমনে বাসায় ফিরে কিশোর কবি ছাদে মাদুর পেতে বিশ্রাম করেন, কখনো দূরে আকাশ ভরা নির্বাক তারাগুলির দিকে তাকিয়ে থাকেন। কিশোর-কল্পনা উড়ু উড়ু সোনালী রং মেখে স্বপ্নময় হ'য়ে ওঠে, তখনই কবিতার মলিন খাতাখানি মিটিমিটি আলোর সামনে

খুলে বসেন। কোনদিন এক ছত্র লেখা হয় কোনদিন হয় না। এমনি করেই দিন কাটে। একদিন তিনি কবিতার খাতাখানি নিয়ে প্রবাসীর সহ-সম্পাদক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় যান কিন্তু চারুবাবু কবিতা তো পড়লেন না উপরন্তু কর্কশ কণ্ঠে ধমক দিয়ে কিশোর কবির মনে নিদারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলেন। কলকাতার প্রতি আর এতটুকু মোহ কবির মনে অবশিষ্ট রইল না। তিনি দেশে ফেরার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে পড়লেন। পাথেয় সংগ্রহের জন্য তিনি গেলেন মৌলবী তমীজউদ্দীন সাহেবের কাছে; তিনি কবিকে শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হকের সঙ্গে পরিচয় করার জন্য উপদেশ দিলেন। এই হক সাহেবের নিকট এসে কবি অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ আন্তরিকতা পেলেন। তিনি সযত্নে কবির কয়েটি লেখা পড়লেন এবং উচ্চ প্রশংসা করলেন। এমন কি কয়েকটি কবিতা পত্রিকায় প্রকাশের জন্য নিয়ে নিলেন। কবি মোজাম্মেল হক তখন ত্রৈমাসিক "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা" এবং মাসিক "মোসলেম ভারতে"র সম্পাদক। তিনি জসীমউদ্দীনকে অবশ্যই হাবিলদার কবি কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে দেখা করে যেতে বললেন। অবশেষে পরদিন এক শুভক্ষণে কিশোর কবি নজরুল-দর্শনে বার হ'লেন। কবি থাকেন তখন বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির অফিসে। সমিতির অফিসে গিয়েই তিনি বারান্দায় রচনারত কবিকে দেখলেন। সেই নজরুল—প্রাণময়, সদাচঞ্চল। কিশোর কবির মনে হ'লো এতদিনে তিনি যেন একটি জীবন্ত প্রাণের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন। কলকাতায় আসার সমুদয় ক্লান্তি, হতাশা আর অপমান তিনি যেন মুহূর্তে ভুলে গেলেন—নজরুলের সঙ্গে পরিচিত হবার পর তিনি কল্পনায় গড়া কলকাতার রূপটি খুঁজে পেলেন। কবি আগ্রহের সঙ্গে জসীমউদ্দীনের কবিতার খাতাখানি নিয়ে অনেকগুলি কবিতা পড়ে ফেল্‌লেন এবং প্রতিটি কবিতার জন্য উচ্চ প্রশংসা করলেন। এমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা জসীমউদ্দীন সেই বয়সে আর

কারো নিকট থেকে পাননি। প্রকৃতপক্ষে নজরুল স্বভাবই এই —ঘুনাক্ষরে তিনি কোন দিন কারো নিন্দা করেন নি। বরং প্রাপ্যের অধিক প্রশংসা করেছেন—অকৃপণ এবং অযাচিত। জসীমউদ্দীন জানিয়েছেন যে সেদিন নজরুল যে কবিতাটি রচনা করেছিলেন সেটি হ'লো "হার-মানা হার পরাই তোমার গলে" (বিজয়িনী)।

জসীমউদ্দীন বসে আছেন এমন সময় কবির সঙ্গে দেখা করতে এলেন বিশ্বপতি চৌধুরী মহাশয়। দু'বন্ধুতে অনেক আলাপ, অনেক কথা, অনেক আবৃত্তি হ'লো—সেই অসংখ্য আলাপ-কোলাহলের মধ্যে যে আবৃত্তিটি আজও জসীমউদ্দীনের মনে অক্ষয় হ'য়ে আছে সেটি হ'লো "পলাতকা" কবিতার আবৃত্তি ঃ

"আচমকা কোন্ শশক-শিশু চমকে ডেকে যায়,
ওরে আয়—
আয়রে বনের চপল চখা,
ওরে আমার পলাতকা !"

গল্পগুজব শেষ হ'লে কবি কবিতার খাতাখানি রেখে যেতে বললেন। বিকেলে যথাসময়ে জসীমউদ্দীন এসে দেখলেন যে কবি তখনো কবিতাগুলি মনোযোগের সঙ্গে পড়ছেন। জসীমউদ্দীনকে দেখেই বললেন ঃ "আমার যেগুলি ভাল লেগেছে সেগুলি দাগ দিয়ে রেখেছি, নকল করে পাঠিয়ে দিও—এখানকার বিভিন্ন মাসিকে প্রকাশ করে দেব।"

কবির নিকট থেকে বিদায় নিয়ে জসীমউদ্দীন চলে এলেন। এই সময়ে তাঁর মানসিক অবস্থাটা তাঁর ভাষাতেই সুন্দর রূপ পেয়েছে। "কবির নিকট হইতে চলিয়া আসিলাম। কিন্তু কবির ব্যক্তিত্ব আর স্নেহ-মধুর ব্যবহার আমার অবচেতন মনে কাজ করিতে লাগিল। কোন্ অশরীরী ফেরেস্তা যেন আমার মনের বীণার তারে তাহার কোমল অঙ্গুলি রাখিয়া অপূর্ব সুর-লহরী বিস্তার করিতে লাগিল। তাহার প্রভাবে সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি, এমন কি কলকাতার নোংরা

বস্তি, গাড়ি-ঘোড়া-ট্রামও আমার কাছে অপূর্ব বলিয়া মনে হইতে লাগিল।"

কিন্তু এর পরই জন্মভূমির অদৃশ্য আকর্ষণে জসীমউদ্দীন উতলা হ'য়ে পড়লেন এবং কলকাতার মায়া ত্যাগ করে ফরিদপুরে পাড়ি জমালেন। বাড়িতে এসে তাঁর কাজ হ'ল কবিতার নকল পাঠিয়ে বিদ্রোহী কবিকে পত্রাঘাৎ করা। কবিও সময় পেলে উত্তর দেন— ডাক পিয়নের হাত দিয়ে সে আনন্দের কণা উপহার পান জসীমউদ্দীন: "ভাই শিশুকবি, তোমার কবিতা পেয়ে সুখী হলুম। আমি দখিন হাওয়া। ফুল ফুটিয়ে যাওয়া আমার কাজ। তোমাদের মত শিশু-কুসুমগুলিকে যদি আমি উৎসাহ দিয়ে আদর দিয়ে ফুটিয়ে তুল্‌তে পারি, সে-ই হ'বে আমার বড় কাজ। তারপর আমি বিদায় নিয়ে চলে যাব আমার হিমগিরির গহ্বর বিবরে।"

কেবল চিঠিতেই অঙ্গীকার নয়—বাস্তবেও তার প্রতিফলন দেখা গেল। "মোসলেম ভারতের" যে সংখ্যায় বিদ্রোহীর "বিদ্রোহী" কবিতা প্রকাশিত হয় সেই সংখ্যায় প্রকাশিত হ'লো জসীমউদ্দীনের 'মিলনগান,' চট্টোগ্রামের "সাধনা" পত্রিকাতেও অনেকগুলি কবিতা প্রকাশিত হ'লো। প্রকৃতপক্ষে এসবই হ'লো নজরুলের মহৎ প্রচেষ্টার ফল। নজরুল তাঁর ঐকান্তিক-স্নেহ-প্রীতি দিয়ে এভাবে বহু কবি-প্রতিভাকে লালিত করেছেন।

২.

জসীমউদ্দীনের জীবনেও নজরুলের প্রভাব বড় কম নয়—অন্তত: কৈশোরের সেই সোনালী দিনগুলিতে নজরুল নামটি তাঁর প্রাণের একটি বিরাট অংশ জুড়ে বিরাজ করতো। ঐ সময় নজরুল্‌কে নিয়ে তিনি একটি কবিতা লিখে ফেললেন:

নজরুল ইস্‌লাম !
তছলিম ঐ নাম !
বাংলার বাদলায় ঘনঘোর ঝঞ্ঝায়,
দামামার দমদম লোহুময় গান গায় ;
কাঁপাইয়া সূর্য ও চন্দ্রের কক্ষ,
আলোড়িত আসমান ধরণীর বক্ষ ;
সেই কালে মহাবীর তোমারে যে হেরিলাম,
নজরুল ইসলাম !......ইত্যাদি।

এরপর বেশ কিছুদিন জসীমউদ্দীন নজরুলের নিকট চিঠি লিখে কোনো উত্তর পাননি—হঠাৎ আকস্মিকভাবে একটি চিঠি পেলেন এবং তাতে বিদ্রোহী কবি জানিয়েছেন যে তিনি "ধূমকেতু" নামে একটি অর্ধসাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেছেন, তিনি যেন কিছু গ্রাহক সংগ্রহ করে দেন। জসীমউদ্দীন আপ্রাণ চেষ্টায় 'ধূমকেতু'র অনেকগুলি গ্রাহক সংগ্রহ করে দেন—তাঁর কথায় যিনি প্রথম গ্রাহক হন তিনি হ'লেন বর্তমানে পাক্‌-বাংলার অন্যতম কবি সুফি মোতাহার হোসেন।

এর দীর্ঘদিন পর জসীমউদ্দীন পুনরায় কলকাতায় এলেন। এবার তাঁর উদ্দেশ্য কংগ্রেসের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা। ইতিমধ্যে বিদ্রোহী কবির কারাবাস, ঐতিহাসিক অনশন ধর্মঘট, কলকাতা হ'তে হুগলীতে বাসাবদল ইত্যাদি অনেক ঘটনাই ঘটে গেছে। নজরুল তখন তাঁর প্রতিভার মধ্য গগনে, চারদিকেই যেন নজরুল-বৈজয়ন্তীর সমারোহ। মুসলিম পাবলিশিং হাউসে এসে জসীমউদ্দীন দেখা করলেন কবির সঙ্গে। কিন্তু কবি তখন তাঁর গুণগ্রাহীদের দ্বারা এমনই আক্রান্ত যে কোন কথা বলাই তাঁর পক্ষে সম্ভব হলো না। কিছুক্ষণের মধ্যেই কবি ঝড়ের বেগে কয়েকজন বন্ধুসহ কক্ষচ্যুত গ্রহের মত ট্যাক্সী-যোগে হাওড়া স্টেশন হয়ে হুগলীর উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

এ ঘটনার বহুদিন পর কবির সঙ্গে জসীমউদ্দীনের পুনরায় সাক্ষাৎ হয় তাঁর জন্মভূমি ফরিদপুরেই। সেবার মহাউদ্দীপনার মধ্যে বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন বসে ফরিদপুরে। এই উপলক্ষে কলকাতার বহু গণ্যমান্য নেতা ফরিদপুরে আগমন করেন। স্বয়ং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। পল্লী-কবি হঠাৎ একসময় সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলেন বিদ্রোহী কবি একটি দল (কমিউনিষ্ট নেতা মরহুম আবতুল হালিম, গায়ক শ্রীমণীন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং আরো কয়েকজন) নিয়ে সভায় এসে হাজির হয়েছেন। কবি তাঁর দলবল নিয়ে জসীমউদ্দীনের বাড়ীতে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করতেই তিনি যেন ঈদের চাঁদ হাতে পেয়ে গেলেন। বাঁশবনের ছায়াতলে মাতুর বিছিয়ে বসার জায়গা করা হ'লো। সামনেই বড় পদ্মার খর প্রবাহ। কবি কিছুক্ষণের মধ্যেই যেন প্রকৃতির সঙ্গে মিশে গেলেন। বোধহয় স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে কিছু রাখার জন্যে একখণ্ড কাগজ কবির হাতে দিয়ে জসীমউদ্দীন বললেন, "কবিভাই, আপনি একটা কিছু লিখে দিন।"

খুব অল্পসময়ের মধ্যে কবি একটি অপূর্ব কবিতা লিখে দিলেন। কবিতাটি দীর্ঘদিন পল্লীকবির নিকট ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি সেটি হারিয়ে ফেলেছেন। 'সেই অপ্রকাশিত কবিতাটির তুটি পংক্তি এই ঃ

আকাশেতে একলা দোলে একাদশীর চাঁদ
নদীর তীরে ডিঙ্গি তরী পথিক ধরা ফাঁদ।

বিকালে কবিকে নৌকা করে নদীর ওপারের চরে নিয়ে যাওয়া হ'লো। সেখানে জসীমউদ্দীন একটি স্কুল খুলেছিলেন। কবি স্কুল দেখলেন এবং ওপাড়ার আজগর ফকির এবং

চরকেষ্টপুরের মথুর ফকিরের অকৃত্রিম সুরেলা পল্লীগীতি শুনে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠেছিলেন।

রাতে এক সমস্যা দেখা দিল। চায়ের জন্য কবি অস্থির। অথচ পল্লীতে চা পাওয়া যাবে কোথায়? বিশেষ করে সেকালে যখন খাস শহরেই চায়ের সুপ্রচলন হয়নি। অনেক অনুসন্ধানের পর আলিম মাতব্বরের বাড়ীতে চায়ের সন্ধান পাওয়া গেল। তিনি কার্যোপলক্ষে কলকাতায় এসে চা খাওয়া শিখে গিয়েছিলেন এবং পল্লীর লোকদের তাজ্জব বানাবার জন্যে কিছু চা সংগ্রহ করে এনেছিলেন। অবশ্য এই চায়ের সঙ্গে ঘাসপাতা মিশিয়ে তিনি চায়ের ভাণ্ডারকে অফুরন্ত রেখেছিলেন। সেই অদ্ভুত চায়ের কিছু পাতা যখন কবিকে উপঢৌকন দেওয়া হলো তখন তিনি আনন্দে আত্মহারা। অতিকষ্টে সংগ্রহীত এই চায়ের প্রস্তুত কাহিনী স্বয়ং জসীমউদ্দীনের ভাষায় উপভোগ্যের রূপ পেয়েছেঃ "মহামূল্য চা এখন কে জ্বাল দিবে? এ-বাড়ীর বড়-বৌ ও-বাড়ীর ছোট-বৌ— সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া যাহার যত রন্ধন-বিদ্যা জানা ছিল সমস্ত উজাড় করিয়া সেই অপূর্ব চা রন্ধন-পর্ব সমাধান করিল। অবশেষে চা বদনায় ভর্তি হইয়া বৈঠকখানয় আগমন করিল। কবির সঙ্গে আমরাও কিঞ্চিত প্রসাদ পাইলাম। কবি তো মহাপুরুষ। চা পান করিতে করিতে চা-রাধুনিদের অজস্র প্রশংসা করিতেছিলেন। আমরাও কবির সঙ্গে ধূয়া ধরিলাম। গ্রাম্য চাষীর বাড়ীতে যত রকমের তরকারী রান্না হইয়া থাকে, সেই চায়ের মধ্যে তাহার সবগুলিরই আস্বাদ মিশ্রিত ছিল। কমিউনিষ্ট-কর্মী আবদুল হালিম বড়ই সমালোচনা প্রবণ। তাঁহার সমালোচনা মতে সেই চা-রামায়ণের রচয়িত্রীরা নাকি লঙ্কাকাণ্ডের উপর বেশী জোর দিয়াছিলেন। আমাদের মতে চা-পর্বে সকল ভোজনরসের সবগুলিকেই সম মর্যাদা দেওয়া হইয়াছিল। পরবর্তীকালে বহু গুনীজনের কাছে এই চা খাওয়ার বর্ণনা করিয়া কবি আনন্দ পরিবেশন করিতেন।"

পরদিন সকালে যথাসময় কবিকে ফরিদপুর কন্‌ফারেন্সের ময়দানে আনা হ'লো। তাঁর থাকার জন্যে একটি তাঁবু দেওয়া হয়েছিল। কবি এবং তাঁর শিষ্যদের সুবিধার জন্যে ক'জন ভলান্টিয়ার নিযুক্ত করা হয়েছিল—জসীমউদ্দীন হলেন তাঁর খাস ভলান্টিয়ার। কন্‌ফারেন্সে বিক্রির জন্যে সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত 'বিষের বাঁশী' ও'ভাঙ্গার গান' এই ত্ব'খানিও আনা হয়েছিল। যথাসময়ে সভার কাজ আরম্ভ হ'লো। অনেকের অনেক বক্তৃতার পর কবিও বক্তৃতা দিলেন কিন্তু বক্তৃতায় তিনি তেমন সুনাম অর্জন করতে পারলেন না। প্রকৃতপক্ষে বিশাল জনতার সম্মুখে বক্তৃতা দেওয়ায় তিনি তখনও রপ্ত হ'য়ে উঠেননি। নিতান্ত সাদামাঠা বক্তৃতার পর তিনি যখন তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে দেশাত্ম-বোধক গান ধরলেন তখন সভার চেহারা আলাদা। অগণিত জনগণের যুগ-সঞ্চিত আশা-আকাঙ্খা যেন বহির্গমনের পথ পেল। মুহূর্তে লক্ষ জনতা এক দেহ এক প্রাণ। 'কারার ঐ লৌহ-কপাট ভেঙে সব কর রে লোপাট' অথবা 'শিকল পরা ছল মোদের শিকল পরা ছল' ইত্যাদি গানে কোটি ভারতবাসী তাদের আশা-আকাঙ্খার মূর্ত প্রকাশ দেখতে পেল। গান হ'লো শ্রোতার লাঞ্ছনার বিজয়-তিলক। প্রতিটি গানেই জন-সমুদ্র উতলা, উদ্বেল। গান থামলেই সমবেত চিৎকার, আরো গান চাই, গান শুনব আমরা। লক্ষ বক্তৃতায় যে কাজ হ'য়নি একটি মাত্র গানেই তা প্রধুমিত হ'য়ে উঠল। বিদ্রোহীর হৃদয়োদ্বেল গানে জনতা তাদের সুদৃঢ় কামনার গোপন মর্মবাণী উপলব্ধি করল। গানে গানে উড্ডীন হ'লো অনাগত স্বাধীনতার বিজয়-কেতন!

সভাশেষের পর জসীমউদ্দীন কবিকে নিয়ে এলেন তার নিজের বাসায়। পদ্মার জলকল্লোল, জ্যোস্নালোকিত সুবিস্তীর্ণ মোহময় বালুচর এবং অনাবৃত আদিম প্রকৃতি কবির মনে সুগভীর প্রভাব বিস্তার করল। ঐখানে অবস্থান করে 'বালুচর' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ লেখার বাসনা প্রকাশ করলেন কিন্তু তাঁর সে ইচ্ছা পূরণ হয়নি। পাবনা হ'তে এক ভদ্রলোক এসে কবিকে একরকম জোর করেই ধরে নিয়ে গেলেন।

৪.

এর দীর্ঘ দিন পর কবি হঠাৎ একদিন জসীমউদ্দীনের পদ্মাতীরের গৃহে এসে হাজির হলেন। কবির হঠাৎ আগমনে জসীমউদ্দীন খুশীই হলেন কিন্তু তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য শুনে কিছুটা নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়লেন। কবি দাঁড়িয়েছেন কেন্দ্রীয় আইন সভার নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। নির্বাচনের এলাকা ক্ষুদ্র নয়—ঢাকা এবং ফরিদপুর উভয় জেলাতেই তাঁকে নির্বাচনের জন্য প্রচার কার্য চালাতে হবে। সকল কথা শুনে জসীমউদ্দীন কবির প্রস্তাবকে অবাস্তর বলে উড়িয়ে দিতে চাইলেন। সর্বপ্রধান কারণ হ'লো বাংলা দেশের মুসলিম সমাজ তখন কবিকে কাফের বলে ফতোয়া দিয়েছে। মুসলমান সমাজ আর যাই করুক—কাফেরকে কোন দিনই ভোট দেবে না। কবি কিন্তু এতটুকু নিরুৎসাহ না হ'য়ে বললেন, "পূর্ব-বাংলার বিখ্যাত পীর-বাদশা মিঞা আমাকে সমর্থন করে ফতোয়া দিয়েছে। সুতরাং মুসলমান সমাজ মাথা নীচু করে আমাকে ভোট দেবেই।" তিনি আরো বললেন যে ঢাকায় শতকরা নিরানব্বুই ভাগ ভোট তাঁর বাঁধা—সুতরাং ফরিদপুর থেকে সামান্য কিছু ভোট পেলেই বিজয়লক্ষীর পক্ষে অন্য দলে যোগ দেওয়া অসম্ভব। তিনি এমন বাসনাও প্রকাশ করলেন, নির্বাচনের পর, নির্বাচিত তো তিনি হ'য়েই গেছেন—দিল্লী যাওয়ার সময় জসীমউদ্দীন যেন তাঁর সঙ্গে যান।

ভোট গ্রহণের দু'দিন বাকী—উভয় কবিই আশান্বিত। ভোরের বেলা দুই কবি এসে উপস্থিত হ'লেন ফরিদপুরের খ্যাতনামা জননায়ক মৌলবী তমিজদ্দীন খানের বাড়ি। তমিজদ্দীন খান নিম্ন-পরিষদের সভ্য-প্রার্থী। সুতরাং খান সাহেবের সমর্থকবৃন্দ যদি কবিকে সমর্থন করেন তা' হ'লে তাঁর জয় সুনিশ্চিত। কিন্তু কবির আগমন-সংবাদ শুনেই

খান সাহেবের সমবেত সমর্থকবৃন্দের একজন বলে উঠ্‌লেন, "আপনি তো কাফের—আমরা কাফেরকে ভোট দিই না।"

এ মন্তব্যে কবি এতটুকু বিচলিত হ'লেন না। অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে জানালেন যে, এ ধরণের কথা তাঁকে প্রায়ই শুনতে হয়। তবে সমবেত সুধীবৃন্দ যদি তাঁর দু'একটি কবিতা শোনেন তবে তিনি কৃতার্থ হ'বেন।

সকলের আন্তরিক উৎসাহে শুরু হ'লো কবিতা আবৃত্তি। কবি একের পর এক কবিতা আবৃত্তি করে চলেন—যখন তিনি 'মোহরম' কবিতাটি আবৃত্তি শুরু করলেন তখন যে ভদ্রলোক কবিকে কাফের উপাধি দিয়েছিলেন সর্বাগ্রে তাঁরই চোখ অশ্রুপূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল। সে আকুল অশ্রু বর্ষণ-মুখর। এইভাবে নির্বাচনের প্রচারকার্যে এসে কবি সকলকে কবিতা শুনিয়েছেন। বিষয়-বুদ্ধির সঙ্গে যে কবির কতটুকু যোগছিল এই ঘটনাটুকু তার সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন। এইভাবে নির্বাচনের দু'দিন আগে কবিতা শুনিয়ে অপরাহ্নে কবি যখন বিদায় নিলেন তখন খান সাহেব কবিকে ডেকে গোপনে বলে দিলেন যে তাঁর সমর্থকদের পক্ষে তাঁকে সমর্থন করা সম্ভব হ'বে না। কবি হাসি মুখে পথে নামলেন—তাঁর মুখে কোন গ্লানি নেই।

এই ধরণের প্রচারকার্যে অবশিষ্ট দিনটি সমাপ্ত হ'লো। কবি যতই উৎসাহিত হোক না কেন—মুসলিম-সম্পাদিত দৈনিক পত্রিকাগুলি যে হারে তাঁর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করছিল তাতে নিজেদের জয় সম্পর্কে জসীমউদ্দীনের মনে যথেষ্ট সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। তবুও তিনি নির্দ্দিষ্ট দিনে কবিকে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের সম্মুখে বসিয়ে রাখলেন—কবিকে সম্মুখে দেখে অনেকেই তাঁকে ভোট দেবেন এমন একটি ক্ষীণ আশা হয়তো তাঁর ছিল। ভোট গ্রহণ সমাপ্ত হ'লে কবিও বললেন যে অধিকাংশ ভোটারই তাঁকে ভোট দিয়েছেন। কিন্তু পরদিন সকালে উঠে তিনি ঘোষণা করলেন যে এই ভোটযুদ্ধে তাঁদের পরাজয় অনিবার্য। তিনি এখন ঢাকায় গিয়ে যাতে জামানতের টাকাটা মার না যায় তার

ব্যবস্থা করবেন। "জয়ী হইবেন বলিয়া কাল যিনি খুশীতে মশগুল ছিলেন, হারিয়া গিয়া জামানতের টাকা মার যাওয়ার চিন্তা আজ তাঁহার মনে কোথা হইতে আসিল? ব্যবহারিক জীবনে এই বয়স্ক-শিশুটি সারা জীবন ভরিয়া এমনই ভুল করিয়া প্রতি পদক্ষেপে নানা বিড়ম্বনার সম্মুখীন হইয়াছেন।"

৫.

দেশ বরেণ্য নেতা সরোজিনী নাইডুর সঙ্গে কবি এবং হেমন্তকুমার সরকার আর একবার এলেন ফরিদপুরে। কংগ্রেসের আহ্বানে একটি বিরাট জনসমাবেশে বক্তৃতা দিয়ে পরদিনই সরোজিনী নাইডু চলে এলেন কলকাতায়। ফরিদপুরে থেকে গেলেন কবি এবং হেমন্তকুমার। জসীমউদ্দীনের মত তরুণদল সম্মিলিত হয়ে তাঁদের ধরে রাখলেন। তরুণদলের অধিকাংশই তখন ফরিদপুরের রাজেন্দ্র কলেজের ছাত্র, জসীমউদ্দীনও। তাঁদের সমবেত প্রচেষ্টায় কলেজ প্রাঙ্গনে কবির একটি জলসার ব্যবস্থা করা হ'লো। অধ্যক্ষ কামাখ্যাচরণ মহাশয় সানন্দে সম্মতি দিলেন। কিন্তু গোলযোগ দেখা দিল নির্দিষ্ট তারিখের একদিন পূর্বে। সরকারপক্ষ এই বক্তৃতার কথা জান্‌তে পেরে অধ্যক্ষ মহাশয়কে জানিয়ে দেন যে কলেজ প্রাঙ্গনে সরকার-বিরোধী কবি নজরুলকে যেন কোন অবস্থাতেই বক্তৃতা করতে না দেওয়া হয়। কলেজের ক্ষতির আশঙ্কায় কামাখ্যাবাবু সে কথা যথাসময় জানিয়ে দিলেন জসীমউদ্দীনকে। সভার তরুণ উদ্যোক্তারা খুব নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়লেন। খোলা মাঠের মাঝখানে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা যেতে পারে কিন্তু জনতা সেখানে সমবেত হবে কিনা, তার উপর কবি এই প্রস্তাবটি কিভাবে নেবেন সে সম্পর্কে একটু দ্বিধা ও

সন্দেহ থেকেই যায়। শেষ পর্যন্ত সকলে মলিন মুখে কবির সম্মুখে দাঁড়ালেন। প্রস্তাব শুনে কবি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হ'য়ে গেলেন। মহাউৎসাহে তরুণদল দশ-বারটি টিন পিটিয়ে পিটিয়ে সমগ্র শহরবাসীকে কবির বক্তৃতা ও সংগীতের কথা জানিয়ে দিলেন। সন্ধ্যার বহু পূর্বেই সহস্র সহস্র জনতায় ময়দান পরিপূর্ণ হ'য়ে গেল—লোকারণ্যের মাঝে একটি অভূতপূর্ব জমাট উদ্দীপনা দোল খেয়ে ফিরতে লাগল। এই সভায় কবি তাঁর নতুন স্বরূপে প্রকাশিত হ'লেন। এতদিন তাঁর কণ্ঠে শোনা গেছে ভাঙার গান, বিদ্রোহের বাণী —আজ তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হ'লো সাম্যবাদের সুর। জনতাকে বিমুগ্ধ করে উদাত্ত কণ্ঠে তিনি গাইলেন 'উঠরে চাষী জগৎবাসী, ধর কষে লাঙ্গল,' 'আমরা শ্রমিকদল, ওরে আমরা শ্রমিকদল,' ইত্যাদি। সবশেষে আবৃত্তি করলেন সুদীর্ঘ কবিতা 'সাম্যবাদী'। শ্রোতৃবৃন্দের ঘন ঘন করতালির মাঝে কবির অনলবর্ষী কণ্ঠ সেদিন সকলের মনে আগুন ধরিয়ে দিল। অনেক দিনের অপমান ও গ্লানি বিপুল বেগে বহিঃপ্রকাশিত হয়ে সহস্র মনকে বিবশ বিহ্বল করে দিল। কেবলমাত্র আবৃত্তি ও গানে মানুষের মনে যে কী বিপুল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করা যেতে পারে যাঁরা নজরুলের গান শোনেন নি তাঁদের কাছে তা অবিশ্বাস্য থেকেই যায়।

৬.

হাস্যরসিক নজরুলের কিছু পরিচয় আমরা জসীমউদ্দীনের জবানবন্দীতে পেয়েছি। কবির গানের শিষ্যা পুষ্পলতা দে-র জন্মদিনে নিমন্ত্রিত হ'য়েছিলেন—কবি, কবি-পত্নী, শাশুড়ী, জাহানারা বেগম, তাঁর মা, জসীমউদ্দীন এবং আরো অনেকে। ছোট ছোট মাটির

পাত্রে বিবিধ খাদ্যদ্রব্য নিমন্ত্রিতদের সম্মুখে দেওয়া হ'য়েছে। কবি এক একটিকে দেখিয়ে বলেন, এটি খুড়ীমা, এটি মাসীমা, এটি পিসীমা ইত্যাদি। জসীমউদ্দীন কৌতুকের ছলে জিজ্ঞেস করেন, "তা'হ'লে আমার ভাবী কোনটি কবি-দা ?"

কবি কোন চিন্তা না করে সঙ্গে সঙ্গেই পানীর গ্লাসটি হাতে ধরে বলেন, "এটি তোমার ভাবী—যেহেতু আমি তার পাণি-গ্রহণ করেছি।"

হাসির তুফানে ভাঁটা পড়তে না পড়তেই কবি গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, "জসীম, তুমি লুচি খেও না।"

সকলেই সকৌতুকে কবির দিকে তাকালেন। কবি বল্‌লেন, "যেহেতু আমরা বে-লুচি-স্থান (বেলুচিস্থান) থেকে এসেছি—সুতরাং আমাদের লুচি খাওয়া নিষেধ।"

চারিদিকে আবার হাসির হল্লা।

সজ্ঞান অবস্থায় কবির সঙ্গে জসীমউদ্দীনের শেষ সাক্ষাৎ ঘটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে—এক বক্তৃতা মঞ্চে। কবির বক্তৃতার সেবারই কিছু প্রলাপ-উক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। বক্তৃতায় মাঝে কবি বলেন, "আমি খোদাকে দেখেছি—কিন্তু সেকথা বলার সময় এখনো আসেনি।" এর অল্প কিছুদিন পরই তিনি অসুস্থ হ'য়ে পড়েন।

এখনো হারানো দিনের অনুরাগীদের দেখলে কবি নীরবে তাঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। কিন্তু অতীতের সেই মধুময় দিনগুলি তাঁর কাছে তেমনি মনোরম ও অর্থপূর্ণ হ'য়ে ওঠে কী!

মন্মথ রায়

১.

মানুষকে আকর্ষণ করা এবং আপন করে নেওয়ার জন্যে অনেকগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন। আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদেরা এই বৈশিষ্ট্যগুলির সর্বপ্রথমে অন্তরের উদারতার কথা উল্লেখ করেছেন। সংকীর্ণ মনোবৃত্তি নিয়ে নিজের চারপাশে একটি গণ্ডীর সৃষ্টি করলে মানুষকে আপন করা যায় না। কবি নজরুলের মধ্যে এই উদারতা এক বিশেষ রূপ লাভ করেছিল। অহমিকায় তিনি নিজের চারপাশে কোনোদিন গণ্ডীর সৃষ্টি করেন নি। সবার জন্যে তাঁর মনের দ্বার অবারিত। যাঁরা এসেছেন তাঁরা স্থায়ী আসন পেয়েছেন, যাঁরা আসেন নি তাঁরাও আসতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁর বাক্য ও ব্যবহারে এমনি একটা অমায়িক অন্তরঙ্গতা ফুটে উঠ্‌তো যে পতঙ্গের মত সেখানে ঝাঁপ না দিয়ে উপায় ছিল না। অপরিমেয় স্বাস্থ্য, উজ্জ্বল দৃষ্টি, প্রাণখোলা হাসি আর দরদ-ভরা গান—সে তো আছেই। সমকালীন বাংলার অধিকাংশ কবি-সাহিত্যিক-নাট্যকার তাই তাঁর ঘনিষ্ট প্রতিবেশী হ'তে বাধ্য হয়েছিলেন।

এমনি এক 'বাধ্য হওয়া প্রতিবেশী' নাট্যকার মন্মথ রায়। কত তুচ্ছ ঘটনা—অথচ কী গভীর আন্তরিকতার সূত্রপাত!

কবি গিয়েছিলেন নোয়াখালির লক্ষ্মীপুরে। সেখানে সুধাংশু নামে একটি ছেলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ছেলেটি তখন ঢাকার জগন্নাথ

কলেজে পড়ত। এই ছেলেটি তিন বছরের তিনখানা "বাসন্তিকা" পত্রিকা দেখায় কবিকে। "বাসন্তিকা" ছিল জগন্নাথ হলের মুখপত্র। পত্রিকাটির তৎকালীন সম্পাদক ছিলেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ঐতিহাসিক ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। সেই পত্রিকা তিনখানিতে মন্মথ রায়ের দু'খানি নাটক ছিল—"সেমিরেমিস," ও "ইলা"। সম্পূর্ণ এই নতুন স্বাদের নাটক দু'খানি কবির খুব ভাল লেগেছিল—বিশেষ করে "সেমিরেমিস।" এই নাটকটি তিনি নিজে তো বহুবার পাঠ করেছেন এমন কী বহুজনকে পাঠ করে শুনিয়েছেন। "সেমিরেমিস" পাঠ করে মন্মথ রায়ের সঙ্গে আলাপের জন্য কবি মনের মধ্যে কিছু আবেগ অনুভব করেন। এবং বহু খোঁজাখুঁজির পর মন্মথ রায়ের ঠিকানা সংগ্রহ করেন। বলাবাহুল্য মন্মথ রায় তখন ছিলেন উত্তর বঙ্গের বালুরঘাট শহরে। সেইখানেই কবি মন্মথ রায়কে চিঠি দেন। একেবারে অযাচিত চিঠি, মন্মথ রায় নির্বাক। এমন চিঠির কল্পনাও তিনি কোনোদিন করেন নি। নজরুল তখন নিখিল বাংলার মধ্যমণি। লক্ষ কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই তরুণ কবির নাম সমানে উচ্চারিত হ'চ্ছে। স্বয়ং মন্মথ রায় সুদূর উত্তর বঙ্গের বালুরঘাট থেকে নজরুলের সঙ্গে পরিচয় ও সান্নিধ্যলাভের জন্যে উন্মুখ হ'য়েছিলেন। হঠাৎ এই চিঠি। আজো সেদিনের কথা স্মরণ করে তিনি শ্রদ্ধায় মাথা নত করেন। আমার সঙ্গে আলাপ আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বার বার বলেছেন যে নজরুলের মত উদার মহৎ হৃদয় তিনি আর বেশী দেখেন নি। হৃদয় দিয়ে মানুষকে কাছে টানার যে কী দুর্লভ ক্ষমতা নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন!

এ প্রসঙ্গে একটি কথা আমাদের বিশেষরূপে স্মরণ রাখতে হবে—নজরুল নিজে ঠিকানা সংগ্রহ করে যখন মন্মথ রায়কে চিঠি দিচ্ছেন তখন ঐ নামটির সঙ্গে বাংলাদেশ বিশেষ পরিচিত নয়, অথচ কাজী সাহেবের নাম তখন লক্ষ মুখে।

কিনা মনে নেই, যখন মনে নেই—তখন ওটাতে হয়ত "লোমহর্ষণই" হয়েছিল "প্রাণ হর্ষণ" হয়নি ; হলে নিশ্চয় মনে থাকৃত। তার জন্ত দুঃখ করিনে, কারণ আপনাকে মনে আছে। শুধু সুশ্রী আপনাকে দেখেছিলাম সেদিন, আজ সুন্দর তোমায় দেখ্ছি।

পবিত্রের মারফৎ আপনার প্রথম লেখা পড়ি—মুক্তির ডাক। পড়ে আমার কেমন লাগে, পবিত্র লিখ্তে বলেছিল। ইচ্ছে করেই লিখিনি। সূর্যকে অভিবাদন করতে পারি কিন্তু তাকে উজ্জলতর করে দেখানোর মত আলো ও অভিমান আমার নেই। আজো আপনার শক্তিকে অন্তর দিয়ে নমস্কার জানাচ্ছি মাত্র, তাকে প্রশংসা করিনি। আপনাকে প্রশংসা করার শক্তি আমার নেই।

আপনার "মুক্তির ডাক"-এর পর আমি "অজগর মণি" ও "কাজল লেখা" পড়ি। পড়ে মুগ্ধ হই, কিন্তু মুগ্ধ হয়েই ক্ষান্ত থাকি নি, যাকে পেয়েছি—তাকেই পড়িয়েছি। কিছুদিন আগে নোয়াখালী যাই, সেখান থেকে লক্ষ্মীপুরে গিয়ে সুধাংশু বলে একটি ছেলের সঙ্গে পরিচয় হয়। বোধহয় আপনিও চেনেন তাকে। তাকে ধন্যবাদ, সেই আমার তিনখানা "বাসন্তিকা" দেখায়। তাতেই আপনার অমর সৃষ্টি "সেমিরেমিস" "ইলা" ও "স্মৃতির ছায়া" কি'ছাপ পড়ি। "সেমিরেমিস" পড়ে কী যে আনন্দ পেয়েছি—তা বলে উঠতে পারছিনে। যতবার পড়ি, ততবারই নতুন মনে হয়। আজ ইউরোপে জন্মালে আপনার প্রশংসায় দশদিক মুখরিত হ'য়ে উঠত। এ ঈর্ষা এবং ততোধিক ঈর্ষাতুর সাহিত্যিকের দেশে আপনার যোগ্য আদর হয়নি দেখে বিস্মিত হয়নি একটুও—দুঃখিত যতই হই।

ইলাও আমার বুকে কম দোলা দেয়নি—কিন্তু সেমিরেমিসে আমি যেন তলিয়ে গেছি। এত বড় সৃষ্টি!—দুঃসাহসের দিক থেকে বল্‌ছিনে —এর সৃষ্টির সার্থকতার ও পরিপূর্ণতার দিক দিয়েই বল্‌ছি—আমায় আর কারুর কোনো লেখা এত বিচলিত করেনি।....আপনার লেখার একটা ফিরিস্তি দেখেছি বাসন্তিকায় আপনার শেষ চিঠিতে কিন্তু তার

সবগুলি পড়ে উঠবার সুযোগ সুবিধে পাইনি বলে নিজেকে দুর্ভাগ্য মনে করছি।

আমার ভয় হয় উকিল মন্মথ সেমিরেমিসের মন্মথকে ভস্ম না করে ফেলে। 'ল' আর অঙ্কাতঙ্ক আমার ছেলেবেলা থেকে।...

আমি ইঙ্গিত দিতে কী পারব আপনার মত শিল্পীকে আপনার সৃষ্টি বিষয়ে? আমার মনে হয় "তাজমহল" সৃষ্টির কল্পনাকে কেন্দ্র করে লেখা আপনার হাত দিয়ে যা বেরুবে, তা সত্যিকার—তাজমহলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে সেমিরেমিসের স্রষ্টাকে এ লিখ্‌তে এতটুকু কুণ্ঠা আমার নেই। আপনার মত জান্‌লে খুশী হব।

"নওরোজ" বেরিয়েছে—ওতে আমার এক মিতে লেখককে দেখবেন—তবে তিনি "নাজিরুল" নজরুল নন,—আকার ইকারের দণ্ড ধারণ করে নিজের বিশিষ্টতা রক্ষা করেছেন। তাঁর ভাল লেখা পড়ে তাঁর প্রাপ্য নজরুলকে দেবেন না যেন। সত্যিই অনেক বক্‌লাম —আপনার অনুরোধই রক্ষা করা গেল। তবে বকাটা বড্ডো তাড়াতাড়ি হ'ল—তাই এ বকাটা বোকার মতই মনে হবে।

আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রীতি গ্রহণ করুন। ইতি

"নবনাটিকা" দর্শনাকাঙ্ক্ষী

নজরুল ইস্‌লাম

P. S. আপনার নৃপেনদার সহযোগে আমিও অনুরোধ জানাচ্ছি নওরোজের হাটে সওদা করতে আসার জন্য। দেরী করলে চলবেনা। কখন লেখা পাঠাচ্ছেন জানাবেন।

হৃদয়ের উদারতা সঙ্গে অকৃপণ আশীর্বাদী মনোভাব মিশে সমগ্র চিঠিখানিকে এক বিরল বৈশিষ্ট্য দান করেছে।

চিঠি পেয়ে মন্মথ রায় কলকাতায় আসেন এবং "সওগাত', অফিসে

কবির সঙ্গে দেখা করেন। সে দর্শনও অপূর্ব। পরিচয় পেয়ে কবি আবেগ ভরে মন্মথ রায়কে বুকে জড়িয়ে ধরেন। কতকাল পরে যেন হারানো বন্ধুর সাক্ষাৎ পেয়েছেন।

২.

এই সাক্ষাতের পর উভয়ের অন্তরাবেগ শতবর্ণ রাগে ফুটে উঠেছে। মন্মথ রায় একের পর এক নাটক লিখে চলেছেন কিন্তু সংগীত রচনায় তিনি বিশেষ অপটু। অথচ সংগীত না হ'লে তখনকার দিনে নাটক মঞ্চস্থ করা অসম্ভব। নৃত্য-গীত তখনকার থিয়েটারের প্রাণ। যেমন তেমন নাটকে যদি সুসমৃদ্ধ নৃত্য-গীতের ব্যবস্থা থাকে তা' হ'লে প্রযোজক কর্তৃপক্ষ অর্থনৈতিক দিক সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হ'তে পারতেন। আর ভাল নাটকের সঙ্গে যদি উত্তম সংগীতের মনিকাঞ্চন যোগ ঘটতো তা' হ'লে তো কথাই নাই। মন্মথ রায়ের কতকগুলো প্রথম শ্রেণীর নাটকে এই মণিকাঞ্চন যোগ ঘটেছে। নাটক রচনা করেছেন মন্মথ রায়, তার জন্যে বিনিদ্র রজনীতে সংগীত রচনা করে চলেছেন কাজী নজরুল। কেবল সংগীত রচনা নয়—সে সংগীতে সুর যোজনা করে অনবদ্য করে তুলেছেন। সেকালে "মহুয়া" এবং মন্মথবাবুর আরো কতকগুলি নাটকের বিশেষ জনপ্রিয় হ'য়ে ওঠার মূলে নজরুলের গান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে। অবশ্য মন্মথ রায় এর জন্যে বিশেষ কৃতজ্ঞ। তিনি তাঁর বইয়ের ভূমিকায় একথা সগর্বে ও অকৃপণ হৃদয়ে ঘোষণা করেছেন। "কারাগার" নাটকের (এই নাটকটির অভিনয় বৃটিশ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়েছিল) ভূমিকায় তিনি লিখেছেন: "গান রচনায় আমি অক্ষম। কিন্তু আমার এই অক্ষমতা সার্থক হইয়াছে সেই এক পুণ্যপ্রভাতে যে দিন সারা বাংলার কবিদুলাল কাজী নজরুল ইস্‌লাম আমার হাত দু'খানি পরম স্নেহে ধরিয়া বলিয়াছিলেন,

'আপনি আপনার নাটকের জন্য আমাকে দিয়া গান লেখাইয়া না লইলে আমার অভিমানের কারণ হইবে।' যে আন্তরিক স্নেহে তিনি আমার 'মহুয়ার' কণ্ঠে গান দিয়াছিলেন, এবারও আমার 'কারাগারে'র জন্য তেমনি আন্তরিক স্নেহে তিনি গান রচনা করিয়াছেন। রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্তও তিনি কারাগারের জন্য শুধু গান রচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই—পরমোল্লাসে উহাতে স্বয়ং সুরযোজনা করিয়াছেন।" এ প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য এই যে 'কারাগার' নাটকের "ধরিত্রীর" কণ্ঠের গানগুলি নজরুলের রচনা অন্যান্য গান রচনা করেছেন হেমেন্দ্রকুমার রায়। 'ধরিত্রীর' কণ্ঠে মোট পাঁচটি গান ছিল। গানগুলির প্রথম পংক্তি এই: 'মন্দিরে মন্দিরে জাগো দেবতা, আনো অভয়ঙ্কর শুভ বারতা,' 'কারা পাষাণ ভেদি' জাগো নারায়ণ, কাঁদিছে বেদীতলে আর্ত জনগণ,' 'পূজা দেউলে, মুরারী, শঙ্খ নাহি বাজে,' 'নাহি ভয় নাহি ভয়, মৃত্যু সাগর মন্থন শেষে, আসে মৃত্যুঞ্জয়', এবং 'তিমির বিদারি আলোক-বিহারী কৃষ্ণমুরারী আগত ওই' একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে প্রতিটি গানে পরাধীন মানবাত্মার জাগরণ-বাণী ধ্বনিত। কংসের কারাগার থেকে দেবকী-বাসুদেবের মুক্তি কামনার অন্তরালে ইংরেজ নাগ-পাশ থেকে পরাধীন ভারতবাসীর মুক্তি-মন্ত্র বাঙ্ময় হ'য়ে উঠেছে। মন্মথ রায়ের অন্যান্য যে সব নাটকে কবি গান রচনা করেছেন তাদের মধ্যে মহুয়া, সাবিত্রী, সতী প্রধান। পূর্বেই উল্লেখ করেছি "মহুয়া" নাটকের জন-প্রিয়তার মূলে কাজী কবির গান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে। এই নাটকের ভূমিকায় মন্মথ রায় লিখেছেন: "মহুয়া নাটকের গানগুলি কাজি নজরুল ইস্‌লামের প্রীতির দান। সুরও দিয়াছিলেন তিনিই। এই গান এবং সুর নাটকটির জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ।" এই নাটকে গান আছে মোট সতেরখানি। নজরুল ইস্‌লামের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ পল্লীগীতি—যা তৎকালীন নিখিল বাংলায় আলোড়ন এনেছিল—এই নাটকের

জন্য রচিত। কয়েকটির প্রথম কলি এই: 'আয় মহুয়া আয়, বউ কথা কও, বউ কথা কও, কও কথা অভিমানিনী', ভরিয়া পরাণ শুনিতেছি গান আসিবে আজ বন্ধু মোর', 'আজি ঘুম নহে নিশি জাগরণ,' 'ও ভাই আমার এ নাও যাত্রী না লয় ভাঙা আমার তরী,' 'আমার গহীন জলের নদী,' ইত্যাদি। "সাবিত্রী" নাটকের জন্য তেরখানি এবং "সতী" নাটকের জন্য অনুরূপ এগারখানি গান রচনা করেছেন। এই গানগুলি সংগ্রহ করে একখণ্ড "নজরুল-গীতিকা" প্রকাশিত হতে পারে। "সাবিত্রী" নাটকের ভূমিকায় মন্মথ রায় লিখেছেন: " 'সাবিত্রী'র পরম সম্পদ হইয়াছে তাহার গান। লিখিতে গর্বে এবং গৌরবে আমার বুক ভরিয়া ওঠে যে সমস্ত গানগুলির কথা এবং সুরই গীত-সুন্দর সুর-যাদুকর বাঙলার কবি-দুলাল কাজী নজরুল ইসলামের সস্নেহের দান। ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার এই আন্তরিক স্নেহের অবমাননা করিতে চাহি না।" পূর্ণাঙ্গ নাটক ছাড়া মন্মথ রায়ের 'লায়লা-মজনু,' 'কাফনচোরা,' 'কারাগার' ইত্যাদি রেকর্ড-নাট্যে কাজী সাহেব অনবদ্য সুরযোজনা করেছেন।

৩.

আর একটি মাত্র ঘটনা উল্লেখ করে আমরা এ প্রসঙ্গ সমাপ্ত করব। কেন্দ্রীয় সরকার হ'তে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট একটি অনুরোধ আসে—সম্বিতহারা নজরুল সম্পর্কে এমন একটা কিছু লিখে প্রকাশ করা যাতে কবি নজরুলের পূর্ণ স্বরূপ প্রকাশিত হয়। মন্মথ রায় তখন ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের Publicity Production officer—প্রচার প্রযোজক। তিনি স্বর্গত বিধানচন্দ্র

রায়ের কাছে প্রস্তাব দিলেন যে নজরুল জনগণের কবি। দেশের অগণিত জনগণের সম্মুখে তাঁর পুরো স্বরূপ তুলে ধরতে হ'লে একখানা পুস্তক রচনা অপেক্ষা একটি তথ্য-চিত্র অধিকতর কার্যকরী হ'বে। ডাঃ রায় সঙ্গে সঙ্গে এ প্রস্তাব অনুমোদন করলেন। শুরু হ'ল "বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইস্‌লাম" ডকুমেণ্টারী তথ্য-চিত্র নির্মাণের কাজ। মন্মথ রায়ের একমাত্র প্রচেষ্টায় দীর্ঘদিন কঠোর পরিশ্রমের পর ছবিটি পশ্চিম বাংলার সর্বত্র মুক্তিলাভ করে ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে। এই কাজে মন্মথ রায়কে যাঁরা বিশেষরূপে সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে কবি-বন্ধু এবং নজরুল-জীবনী রচয়িতা হুগলীর প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, কবি-পরিবারের জনাব আবদুল সালাম, কবিপুত্রদ্বয় এবং বিপ্লবী কালিপদ গুহরায়ের নাম বিশেষরূপে স্মরণীয়। এই তথ্যচিত্রটি সকল মনীষী এবং পত্র-পত্রিকার অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছে। একটি বিশেষ প্রদর্শনীতে স্বর্গত মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় ছবিটি দেখে অশ্রু-রুদ্ধ কণ্ঠে মন্মথ রায়কে বলেন: "ছবিটি বড় সেন্টিমেণ্টাল করে ফেলেছ হে।" ঐ প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জনাব হুমায়ুন করীব। ছবিটি সমাপ্ত হবার পর তিনি উপরের দিকে মুখ করে চোখ বন্ধ অবস্থায় অন্ততঃ তিন মিনিটকাল নীরব ছিলেন। যখন উঠে দাঁড়ালেন তখন দেখা গেল তাঁর চোখ দিয়ে টপ্‌টপ্‌ করে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। এই তথ্য-চিত্রের সর্বশেষ বাণী ছিল এই: "কবির থাকার ব্যবস্থা হ'য়েছিল স্থানীয় স্কুল বাড়ীতে। একদিন তাঁকে আদি বাড়ীতে আনা হ'ল। কিন্তু স্মৃতি জাগে কই? ছেলেবেলার বন্ধু-বান্ধব প্রিয়জনদের দেখেও কি তোমার কিছু মনে পড়ছে না কবি? কথা কও! কথা কও!! কথা কও!!! নিশ্চিহ্ন এই মসজিদে সাঁঝের বাতি জ্বালাতেন যিনি আজ সেই কবির মনের বাতি নিভে গেছে। হে ঈশ্বর!—সে বাতি তুমি

জ্বালিয়ে দাও, জ্বালিয়ে দাও!" তথ্যচিত্রটি দেখে অধ্যাপক হুমায়ুন কবির লেখেন: "...I do not know when the light of the poet's mind will be enkindled again. But this much is sure that the light wich he has enkindled in the lives and hearts of thousands of men and women will never go out. This film will clearly bring forth the message of that light to one and all."

Amrita Bazar Patrika লেখেন: ...."The most remarkable.......was a biographical documentary sketch on Poet Nazrul Islam, wich had a moving quality seldom to be found in a documentary. ...Its director Manmatha Roy has done a fine job with the material at his disposal."

"হিমাদ্রি" লিখেছেন: ..."কবির বাল্য যৌবন ও প্রৌঢ় জীবনের মূল ধারাটি বিভিন্ন প্রামাণ্য ঘটনা ও চিত্রের মধ্য দিয়া অনুসৃত হইয়াছে। দুই হাজার ফিটের রীলের মধ্যে ইহার বেশী বিষয়বস্তু পুরিয়া দেওয়া কঠিন। কবির স্বগ্রামে গমন, গৃহপরিবেশ ও জন্মদিনের অনুষ্ঠানগুলির চিত্র মর্মস্পর্শী।"

আনন্দবাজার পত্রিকা লিখেছেন: "বিদ্রোহী কবি ছবিটি বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। বাল্যকাল থেকে আরম্ভ করে বর্তমান দিন পর্যন্ত কবির ঘটনাবহুল জীবন সংক্ষেপে রূপায়িত হ'য়েছে দু'হাজার ফিটের এই ছবিতে। বিশেষ করে উজ্জ্বল হয়ে থাকে স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর দানের অংশটুকু। ...বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর কণ্ঠে তাঁর 'বলবীর চির উন্নত মম শির' ইত্যাদি অবিস্মরণীয় কবিতার প্রাণময় চরণগুলি শুনে আমরা নতুন করে মুগ্ধ হই।"...

আবেদন করলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই চিত্রটি বিভিন্ন স্থানে

দেখানোর জন্য অনুমতি দেন। কিন্তু আমার মনে হয় এ ব্যাপারে সরকারের আরও কর্তব্যনিষ্ঠ হওয়া উচিত। কবির জন্মদিনের এক পক্ষকাল পূর্ব হ'তে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র, সকল প্রেক্ষাগৃহে ছবিটির প্রদর্শন আবশ্যিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাতে ক'রে দর্শকবৃন্দ কেবল একটি ছবিই দেখবেন না, মহৎ জীবনের সংস্পর্শে এসে নিজেরাও ধন্য হ'বেন।

এই তথ্য-চিত্র নির্মাণে মন্মথ রায়কে বিশেষরূপে বহুতর অসুবিধার সম্মুখীন হ'তে হ'য়েছিল। চিত্রগ্রহণের জন্য উচ্চশক্তির আলো জ্বালিয়ে ক্যামরা সামনে ধরলেই সম্বিতহারা কবি বিশেষরূপে ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠ্‌তেন এবং দুর্বোধ্য ভাষায় কী সব বলতেন। এই সময় তাঁকে শান্ত রাখার জন্য কিছু খাওয়ানোর প্রয়োজন হ'তো। যেন খাদ্যের প্রলোভনে ছেলেমানুষকে ভোলান। নিয়তির কী নিষ্ঠুর পরিহাস!

মুজফ্ফর আহমদ

১.

নজরুল তাঁর প্রথম জীবনে যাঁর কাছ থেকে আন্তরিক সাহায্য, বন্ধুত্ব, উপদেশ এবং চলার পথের দীক্ষা পেয়েছেন তিনি কমরেড মুজফ্ফর আহমদ। নজরুলের জীবনেতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে এই লোকটি অধিকাংশ সময় ছায়ার মত কায়ার পিছনে ঘুরেছেন এবং তার সর্বাপেক্ষা দুঃখের দিনগুলিতে দৃঢ় হস্তে সকল আঘাতগুলি সরিয়ে দিয়েছেন। এঁর সাহায্য এবং উপদেশ না পেলে নজরুলের জীবনধারাই হয়তো ভিন্নমুখী হতো। আজ পর্যন্ত মুজফ্ফর আহমদ ও নজরুলের সম্পর্ক-সম্বন্ধটি নিয়ে আহমদ সাহেবের "নজরুল প্রসঙ্গে" ছাড়া বিশেষ কোনো আলোচনা প্রকাশিত হয়নি—কিন্তু সেটি হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। তা' না হলে নজরুল-জীবনী অপূর্ণই থেকে যাবে।

নজরুলের সঙ্গে মুজফ্ফর সাহেবের প্রথম পরিচয় চিঠিপত্রে—১৯১৮ খৃষ্টাব্দে। তরুণ নজরুল তখন করাচীর সেনানিবাসে ৪৯ নম্বর বাঙ্গালা পল্টনের কোয়ার্টার মাষ্টার হাবিলদার। সৈনিকজীবনের নিয়ম-শৃঙ্খলা ও কঠোরতার মাঝে কিছু কিছু সাহিত্য চর্চাও চলছে। এবং সেই সূত্রেই মুজফ্ফর সাহেবের সঙ্গে তাঁর চিঠিপত্রের আলাপের সূত্রপাত।

সে সময় "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি" নামে একটি প্রতিষ্ঠান ছিল এবং তার অফিস ছিল ৩২ নং কলেজ স্ট্রীটের দোতালায়। এই

সমিতির একটি ত্রৈমাসিক মুখপত্র ছিল—নাম "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা"। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ও মুহম্মদ মোজাম্মেল হক। মুজফ্ফর আহমদ ছিলেন এই সমিতির সহ-সম্পাদক এবং একমাত্র সকল সময়ের কর্মী, মুখপত্রে এঁর নাম প্রকাশক হিসেবে ছাপা থাকতো। আসলে পত্রিকার সকল কিছুই তাঁকে করতে হতো, এমন কি বেশ কিছু সম্পাদনাও। ফলে গ্রাহক এবং লেখকদের সঙ্গে চিঠিপত্রে তাঁরই ঘনিষ্টতম যোগাযোগ স্থাপিত হয়। করাচীর সেনানিবাস থেকে এই সময় নজরুল 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'র সঙ্গে লেখক হিসেবে যুক্ত হন এবং অসংখ্য চিঠিপত্র লেখেন। সেই চিঠিপত্রের উত্তর দিতে গিয়ে মুজফ্ফর সাহেবের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই অদেখা সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত এমন মধুর ও আন্তরিক হয়ে উঠেছিল যে নজরুল তাঁর ব্যক্তিগত বিষয়ও নিরুদ্বিগ্নচিত্তে বন্ধুকে জানাতো। বলাবাহুল্য মুজফ্ফর সাহেব প্রগাঢ় প্রীতির সঙ্গে সে আহ্বানে সাড়া দিতেন। নজরুলের গল্প, গাঁথা ও কবিতা পড়ে তাঁর এই ধারণা হয়েছিল যে "বাঙলা সাহিত্য জগতে বিরাট সম্ভাবনা নিয়ে একজন কবি ও লেখকের আবির্ভাব হচ্ছে।" এই সময় উক্ত পত্রিকার ২য় বর্ষের ২য় সংখ্যায় (শ্রাবণ, ১৩৩২ সাল) নজরুলের 'মুক্তি' শীর্ষক একটি দীর্ঘ কবিতা প্রকাশিত হয়। এটাই কবির প্রথম প্রকাশিত কবিতা এবং সে জন্যেই কবিতাটির একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। তথাপি কবিতাটি আজ পর্যন্ত কবির কোনো গ্রন্থে মুদ্রিত হয়নি। কবিতাটি সংরক্ষিত হওয়া উচিত; নইলে চিরতরে লুপ্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। একটি সত্য ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে কবিতাটি লিখিত হয়েছিল। প্রথম প্রকাশের কিছুদিন পর কবিতাটি মাসিক 'সহচর' পত্রিকাতেও পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। কবির শেষ জীবনে আধ্যাত্মিকতার প্রতি যে তীব্র আসক্তি দেখা গিয়েছিল—কাব্য-জীবনের ঊষালগ্নে তার প্রকাশ ঘটেছিল এই কবিতাটিতে। সুতরাং কবির মানস-ভঙ্গি উপলব্ধি করার জন্যে কবিতাটির একটি স্বতন্ত্র মূল্য রয়েছে।

এই কবিতাটি মুদ্রিত হওয়ায় কবি অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে ওঠেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পত্রিকার সম্পাদককে একটি চিঠি দেন। আজ পর্যন্ত কবির যতগুলি চিঠি পাওয়া গেছে কালসীমার দিক থেকে বিচার করলে এটাই প্রথম চিঠি। চিঠিখানির মধ্যে নবীন লেখকের মানসিক চাঞ্চল্যের কথা সুন্দররূপে ধরা পড়েছে। সম্পূর্ণ চিঠিখানি এই:

From:
QAZI NAZRUL ISLAM
Battalion Quarter Master Habilder.
49th Bengalis.
Dated, Cantonment, Karachi,
The 19th August, 1919.

আদাব হাজার হাজার জানবেন!

বাদ আরজ আমার নগণ্য লেখাটি আপনাদের সাহিত্য পত্রিকায় স্থান পেয়েছে, এতে কৃতজ্ঞ হওয়ার চেয়ে আমি আশ্চর্য হয়েছি বেশী। আমার সব চেয়ে বেশী ভয় হয়েছিল, পাছে বেচারী লেখা 'কোরকে'র কোঠায় পড়ে। অবশ্য যদিও আমি কোরক ব্যতিত প্রস্ফুটিত ফুল নই; আর যদিই সে রকম হয়ে থাকি কারুর চক্ষে তবে সে বেমালুম ধুতরো ফুল। যা'হোক আমি তার জন্যে আপনার নিকট যে কত বেশী কৃতজ্ঞ তা' প্রকাশ করার ভাষা পাচ্ছিনে। আপনার এরূপ উৎসাহ থাকলে আমি যে একটি মস্ত জবর কবি ও লেখক হব তা হাতে-কলমে প্রমাণ করে দিব, এ একেবারে নির্ঘাৎ সত্যি কথা। কারণ, এবারে পাঠালুম একটি লম্বা-চওড়া 'গাথা' আর একটি 'প্রায় দীর্ঘ' গল্প আপনাদের পরবর্তী সংখ্যা কাগজে ছাপাবার জন্যে, যদিও কার্তিক মাস এখনো অনেক দূরে। আগে থেকে পাঠালুম, কেননা; এখন হতে এটা ভাল করে পড়ে রাখবেন এবং চাই কি আগে হতে ছাপিয়েও রাখতে পারেন।

তা' ছাড়া আর একটি কথা। শেষে হয়ত ভাল ভাল লেখা জমে আমার লেখাকে বিলকুল রদ্দি করে দেবে ; আর তখন হয়ত এত বেশী লেখা না পড়তেও পারেন। কারণ আমি বিশেষরূপে জানি, সম্পাদক বেচারাদের গলদঘর্ম হয়ে উঠতে হয় এই নতুন কাব্যিক রোগাক্রান্ত ছোকরাদের দৌরাত্ম্যিতে। যাক, অনেক বাজে কথা বলা গেল। আপনার সময়টাকেও খামকা টুটি চেপে রেখেছিলুম। এখন বাকি কথা ক'টি মেহেরবাণী করে শুনুন। যদি কোন লেখা পছন্দ না হয়, তবে ছিঁড়ে না ফেলে এ গরীবকে জানালেই আমি ওর নিরাপদে প্রত্যাগমনের পাথেয় পাঠিয়ে দিব। কারণ, সৈনিকের বড্ড কষ্টের জীবন। আমি তার চেয়ে হাজার গুণ পরিশ্রম করে একটু আধটু লেখি। আর কারুর কাছেও একেবারে Worthless হলেও আমার নিজের কাছে ওর দাম ভয়ানক। আর ওটা বোধহয় সব লেখকের পক্ষেই স্বাভাবিক। আপনার পছন্দ হল কিনা, জানবার জন্যে আমার নাম ঠিকানা লেখা একখানা Stamped খামও দেওয়া গেল এর সঙ্গে। পড়ে মত জানাবেন।

আর যদি এত বেশী লেখা ছাপবার মত জায়গা না থাকে আপনার কাগজে, তা'হলে যেকোন একটা লেখা 'সওগাতের সম্পাদককে Hand over করলে আমি বিশেষ অনুগৃহীত হব। 'সওগাতে' লেখা দিচ্ছি দু' একটা করে। যা' ভাল বুঝবেন জানাবেন।

গল্পটি সম্বন্ধে আপনার কিছু জিজ্ঞাস্য বা বক্তব্য থাকলে জানালেই আমি ধন্যবাদের সহিত তৎক্ষণাৎ তার উত্তর দিব, কারণ এখনও অনেক সময় রয়েছে।

আমাদের এখানে সময়ের money value ; সুতরাং লেখা সর্বাঙ্গসুন্দর হতেই পারে না। Undisturbed time মোটেই পাই না। আমি কোন কিছুরই copy or duplicate রাখতে পারি না। সেটি সম্পূর্ণ অসম্ভব।

By the by, আপনারা যে 'ক্ষমা' বাদ দিয়ে কবিতাটির 'মুক্তি'

নাম দিয়েছেন, তাতে আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। এই রকম দোষগুলি সংশোধন করে নেবেন। বড্ডো ছাপার ভুল থাকে, একটু সাবধান হওয়া যায় না কি? আমি ভাল, আপনাদের কুশল সংবাদ দিবেন।

নিবেদন ইতি—

খাদেম

নজরুল ইসলাম

এরপর আরো অনেক চিঠি দিয়েছিলেন নজরুল এবং তার অধিকাংশের উত্তর দিয়েছিলেন মুজফ্‌ফর আহমদ। চিঠিপত্রের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত বিষয়ের লেনদেন হতে আরম্ভ হলো এবং একটি পত্রে নজরুল অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে জানালেন যে তাঁদের ৪৯ নম্বর বেঙ্গলী রেজিমেণ্ট ভেঙ্গে দেওয়ার সিদ্ধান্ত একরকম প্রায় স্থির হয়ে গেছে। এরপর তিনি কি করবেন? মুজফ্‌ফর সাহেব বোধ হয় এমনই শুভ সংবাদের আশায় দিন গুণছিলেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে চিঠিতে জানালেন "কলকাতায় এলে এস।" উত্তরে নজরুল অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে জানতে চাইলেন যে তাঁর জৈবিক প্রয়োজনটুকু মিটবে কী দিয়ে! সে দায়িত্বটুকু মাথা পেতে নিলেন মুজফ্‌ফর সাহেব। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল কলকাতার সাহিত্য-সমাজে নজরুলকে প্রতিষ্ঠিত করা। কবির মধ্যে বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে তা তিনি চিনেছিলেন তাই সে সম্ভাবনাকে লালন-পালন বিকশিত করার সকল দায়িত্ব সানন্দে গ্রহণ করতে রাজী হলেন। এমনিভাবে অধিকাংশ সমস্যা ও সংকট-মুহূর্তে মুজফ্‌ফর সাহেব আগিয়ে এসেছেন এবং প্রায় ক্ষেত্রে গুরুভার দায়িত্ব নিজে বহন করে নজরুলের কবি-প্রতিভা বিকাশের সাহায্য করেছেন। যে সময় স্বয়ং মুজফ্‌ফর সাহেবকেই নিজের অন্ন-চিন্তায় ব্যস্ত থাকতে হয়, সে সময়ও তিনি নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে নজরুলকে আশ্রয় দিয়ে মহৎ মনের পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যই বিরল-দৃষ্ট। সাহিত্য সমিতিতে এই আশ্রয়-দান নজরুলের পক্ষে যে কেমন অর্থপূর্ণ ও মঙ্গলপ্রসূ হয়েছিল' সে কথা

পরবর্তী জীবনে কবি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের ৫ই ও ৬ই এপ্রিল কলকাতা মুসলিম ইনষ্টিটিউট হলে "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি"র রজত-জুবিলী অনুষ্ঠানে কবি তাঁর জীবনের শেষ অভিভাষণে বলেন'···"বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সঙ্গে আমার যোগাযোগ বহুদিনের। কয়েকজন বন্ধুর আহ্বানে আমি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির আড্ডায় আশ্রয় নিই। এখানে আমি বন্ধুরূপে পাই মিঃ মুজফ্‌ফর আহমদ প্রমুখ সাহিত্যিকবৃন্দকে।—সেদিন যদি সাহিত্য-সমিতি আমাকে আশ্রয় না দিত, তবে হয়ত কোথায় ভেসে যেতাম' তা আমি জানি না। এই ভালবাসার বন্ধনেই আমি প্রথম নীড় বেঁধেছিলাম, এ আশ্রয় না পেলে আমার কবি হওয়া সম্ভব হত কি না, আমার জানা নেই।"

২.

মুজফ্‌ফর সাহেবের নিকট থেকে চিঠি পেয়ে তাঁকে চাক্ষুষ দেখার জন্যে কবি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। কিন্তু ৪০ নম্বর বাঙালী রেজিমেণ্ট ভেঙ্গে দেওয়ার তখনো কিছু বিলম্ব আছে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি কিছুদিনের ছুটির জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করতেই তা মঞ্জুর হয়ে গেল। সাতদিনের ছুটি পেলেন তিনি। পল্টনে যোগ দেওয়ার পর এটাই ছিল তাঁর প্রথম ও শেষ ছুটি। এই ছুটিতে কবি সোজা চলে এসেছিলেন কলকাতায়। কলকাতায় তাঁর পরিচিত বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন একমাত্র শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। শৈলজানন্দ সে সময় মহারাজা কাশিমবাজারের পলিটেকনিক ইনিষ্টিটিউটে শর্টহ্যাণ্ড ও টাইপ রাইটিং শিখতেন। নজরুলের এই বন্ধুটির অবস্থাও তখন স্বচ্ছল ছিল না—তিনি চিৎপুর রোডের একটি মেসে থেকে কোন রকমে দিন

কাটাতেন। কলকাতায় এসে কবি প্রথম সাক্ষাৎ করেন শৈলজাবাবুর সঙ্গে এবং পরে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আসেন ৩২ নং কলেজ স্ট্রীটে' বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে। এখানেই মুজফ্ফর আহমদের সঙ্গে তাঁর প্রথম চাক্ষুষ পরিচয়। কবির পরণে সৈনিকের পোষাক। এই প্রথম দর্শন সম্পর্কে মুজাফ্ফর সাহেব লিখেছেন ঃ "নজরুলের বয়স তখন বাইশ বছরের মত হবে, কিংবা কিঞ্চিত কমও হতে পারে। তখন তার মধ্যে আমি তিনটি জিনিষ লক্ষ্য করেছিলাম—সুগঠিত দেহ, অপরিমেয় স্বাস্থ্য ও প্রাণখোলা হাসি। নজরুলের এই তিনটি জিনিসের জন্যে প্রথম দেখাতেই লোকেরা তার ওপর আকৃষ্ট হতেন।" শৈলজাবাবুও এর আগে মুজফ্ফর সাহেবকে দেখেননি। এই আলাপে নজরুল এবং শৈলজা দু'জনেই যুগপৎ মুগ্ধ হলেন! এই প্রথম দর্শন এবং এই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষটি সম্পর্কে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর "কেউ ভোলে না কেউ ভোলে" গ্রন্থে যা' লিখেছেন আমার মনে হয় মানুষটির সম্পূর্ণ পরিচয় তাতে বিধৃত হয়েছে ঃ "গিয়ে দেখলাম—অপূর্ব সুন্দর একটি মানুষ। গৌরবর্ণ শীর্ণকায় সংযতবাক যে যুবকটিকে সেদিন আমি দেখেছিলাম, আজও তিনি আমার স্মৃতিপটে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। সেদিন তাঁরও বিশেষ কিছুই আমি জানতাম না। আমিও ছিলাম এক পরিচয়হীন আগন্তুক মাত্র। নজরুল ইসলামের একজন সহপাঠী বন্ধু। কথা যা হয়েছিল নজরুলের সঙ্গেই হয়েছিল। আমি ছিলাম তার নীরব শ্রোতা।

"নজরুলের প্রতি তাঁর সেই সহৃদয় ব্যবহার, তাঁর সেই উদার দাক্ষিণ্য, তার মুখের শুধু দুটি-চারটি কথা, প্রসন্ন প্রফুল্ল মুখচ্ছবি আর একটি অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব আমাকে সত্যই সেদিন মুগ্ধ করেছিল।

..."ছোটখাটো মানুষটি, কিন্তু তাঁর হৃদয় যে এত বড়, তখন সে কথা ভাবতে পারিনি।......"

চিঠিপত্রে যে কথার আলোচনা হয়েছিল—সাক্ষাতে হলো তারই অনুমোদন। দেখার সঙ্গে সঙ্গেই মুজফ্ফর সাহেব নজরুলকে দ্বিধাহীন

চিত্তে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির আড্ডায় এসে উঠতে বললেন। যেন বড় একটা দুশ্চিন্তার অবসান হলো। মাথার উপর বিপুল আকাশ, পায়ের তলায় অসীম পৃথিবী—তার মাঝে নিশ্চিন্ত আশ্রয়। নজরুল নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে শৈলজানন্দের বাসায় ফিরে এলেন।

সাতদিনের ছুটি। হৈ-হুল্লোড়ে তিনদিন কেটে গেল কলকাতায়। তারপর সেই সৈনিকের পোষাক পরেই তিনি পা বাড়ালেন তাঁর মাতৃভূমির পথে—বর্ধমানের আসানসোল মহকুমার পুরুলিয়া গ্রামে। ক'দিন ওখানে কাটিয়ে তিনি চলে যাবেন করাচী। আর কলকাতায় ফিরবেন না—এরূপ স্থির হয়েছিল।

৩.

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উদ্দামতা কমে এসেছে। হিংস্র পশু এখন ক্লান্ত। সমরায়োজন নয়, এখন এসেছে ভাঙনের পালা। নজরুলদের পল্টনের প্রয়োজন শেষ হয়েছে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের মার্চের শেষে ৪৯নং বাঙালী রেজিমেন্ট ভেঙে দেওয়া হল। পূর্বের কথা মত নজরুল তাঁর গাঁটরি-বোচকা নিয়ে এলেন কলকাতায়। কিন্তু এখানে এসে সর্বপ্রথম তিনি কোথায় উঠলেন তা' নিয়ে মতভেদ আছে। মুজফ্ফর আহমদ লিখেছেন: "আগেকার কথামতো নজরুল তার গাঁটরি-বোচকা নিয়ে সোজা ৩২নং কলেজ ষ্ট্রীটে সাহিত্য সমিতির অফিসে উঠল।" আবার শৈলজানন্দ লিখেছেন যে নজরুল সোজা তাঁর বাসাতেই (মেসে) উঠেছিলেন। এই পরস্পর বিরোধী মন্তব্যটির প্রতি মুজফ্ফর সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় তিনি নিজের মন্তব্যটিকে ভাল বলে স্বীকার করেছেন। কেবলমাত্র স্মৃতির উপর নির্ভর করে দীর্ঘদিনের ঘটনা লিপিবদ্ধ করায় এই ভুলটুকু হয়েছে।

যা হোক—পল্টন ভেঙে দেওয়ার পর নজরুল প্রথমেই এসে উঠলেন শৈলজানন্দের মেসে। ওখান থেকে এলেন ৩২নং কলেজ স্ট্রীটে—সাহিত্য সমিতির অফিসে। একদিনেই সাহিত্য সমিতির অফিস সরগরম হয়ে উঠল। 'প্রাণ' থাকলেই গান জাগে। রাতে বসল গানের জলসা, সে জলসার মধ্যমণি নজরুল গাইলেন একখানি হিন্দুস্তানী সঙ্গীত—"পিয়া বিনা মোয় জিয়া" না মানে বদরী ছাইরে।" কিন্তু এ সময় নজরুল তন্ময় হয়ে থাকতেন রবীন্দ্র-সংগীতে। রবীন্দ্র-সংগীত ছিল তাঁর প্রাণের সামগ্রী। নজরুলের বিরাট বোঁচকার মধ্যে কী আছে তা' দেখার আগ্রহ জন্মেছিল সবার মনে। সেদিন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ এই: "কৌতূহলের বশে নজরুলের গাঁটরি-বোচকাগুলি আমরা খুলে দেখতাম। তাতে তার লেপ-তোশক ও পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল। সৈনিক পোশাক তো ছিলই আর ছিল শির্ওয়ানি, ট্রাউজার্স, ও কালো উঁচু টুপি যা তখনকার দিনে করাচীর লোকেরা পরতেন। তা' ছাড়া ছিল একটি দূরবীন যন্ত্র (বাইনেকুলার), কবিতার খাতা, গল্পের খাতা, পুঁথি পুস্তক, মাসিক পত্রিকা এবং রবীন্দ্রনাথের গানের স্বরলিপি ইত্যাদি। পুস্তকগুলির মধ্যে ইরানের মহাকবি হাফিজের "দিওয়ান"-এর একখানা ভালো সংস্করণ (দিওয়ান-ই-হাফিজ) ছিল।" প্রাপ্ত তালিকা থেকে একটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে সে সময় নজরুলের ওপর রবীন্দ্রনাথ ও হাফিজের প্রভাব গভীর হয়ে দেখা দিয়েছিল। তিনি একদিকে যেমন রবীন্দ্র-সংগীত সুধায় নিমগ্ন ছিলেন তেমনি অনুবাদ করতেন অমর কবি হাফিজের কবিতা। সমিতিতে স্থানলাভের কয়েকদিন পর তিনি হাফিজের "ইউসফ-ই গুমগশতা বাজ আইয়েদ ব-কিনআন গম মখুর" বিখ্যাত কবিতাটির অনুবাদ করেন এই ভাবে:

দুঃখ কি ভাই হারানো ইউসুফ
কিনারে আবার আসিবে ফিরে···ইত্যাদি।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এই অনুদিত কবিতাটির ছন্দের সঙ্গে

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "যেদিন সুনিল জলধি হইতে উঠিল জননী ভারতবর্ষ"-এর ছন্দের কোনো পার্থক্য নেই। কবিতাটি "বোধন" নামে ১৩২৭ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা মোতাবেক ১ম বর্ষের ২য় সংখ্যায় "মোসলেম ভারতে" মুদ্রিত হয়েছিল। পরে কবির বিখ্যাত গ্রন্থ "বিষের বাঁশীর" অন্তর্ভুক্ত হয়, কিন্তু গ্রন্থে প্রকাশ করার সময় সমকালীন ভারতবর্ষের বেদনাহত পটভূমিতে সমগ্র কবিতাটি পুনর্লিখিত হয়েছিল। তখন প্রথম পংক্তিটি এই রকম দাঁড়ায়ঃ

দুঃখ কি ভাই, হারানো সুদিন
ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভু পুনঃ
হয়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে।……

পল্টন থেকে ফিরে সাহিত্য সমিতির বাসায় দু'দিন ছিলেন। তারপর চলেগিয়েছিলেন বর্ধমানে তাঁর নিজের গ্রামে। কম বেশী এক সপ্তাহ ছিলেন সেখানে। এই সময় এমন একটা অজ্ঞাত 'মান-অভিমানের ব্যাপার' ঘটেছিল যার জন্যে কবি তাঁর সারা জীবনে আর একটি বারও স্বগ্রামে পদার্পণ করেননি।

চুরুলিয়া হতে ফেরার পথে বর্ধমানে কবিকে নামতে হয়েছিল। এখানে নেমে কবি ডিস্ট্রীক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসে গিয়েছিলেন এবং সাব-রেজেষ্ট্রারের পদপার্থী হয়ে একখানা দরখাস্ত দিয়ে এসেছিলেন। সাহিত্য সমিতির অফিসে এসে কবি যখন একথা মুজফ্ফর সাহেবকে জানালেন তখন তিনি রীতিমত বিচলিত হয়ে পড়লেন। মুজফ্ফর সাহেব স্পষ্ট বুঝেছিলেন সাব-রেজিষ্ট্রারের চাকরী নিলে নজরুলের কবি-প্রতিভার বিকাশ বিঘ্নিত হতে বাধ্য। তিনি দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়ে এগিয়ে এলেন। খামখেয়ালী বেপরোয়া নজরুলকে সমূহ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করাই তাঁর একমাত্র চিন্তা হয়ে দাঁড়াল। ভবিষ্যৎ বিপদের কথা তিনি নজরুলকে বোঝালেন। সাহিত্য-সমিতির অফিসে ইণ্টারভিউয়ের চিঠি

এল। এ চাকরী একেবারে নিশ্চিত ছিল। ইণ্টারভিউয়ের চিঠি পাওয়ার পর থেকে তিনি চোখে চোখে রাখলেন কবিকে। এমনি করে একটা বিরাট ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে তিনি নজরুলকে উদ্ধার করলেন। কবির ভবিষ্যৎ জীবন এর ফলে অধিকতর সম্ভাবনাময় হয়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছিল সন্দেহ নেই।

৪.

নজরুলের চরিত্রে লোকআকর্ষণের এক বিরাট ক্ষমতা ছিল। তিনি যেখানে গিয়ে আস্তানা গেড়েছেন সেখানেই গড়ে উঠেছে মজলিস—জমজমাট আসর নজরুল চরিত্রের। এই বৈশিষ্ট্যটি সুন্দর রূপে ফুটে উঠেছিল সাহিত্য-সমিতির অফিসে বসবাসকালে। পল্টনে তিনি অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। সাত হাজার সৈনিক—সকলেই তাঁর বন্ধু। তার ওপর নজরুল এসে আশ্রয় নিলেন এমন এক জায়গায় যেখানে যোগাযোগ করা অত্যন্ত সহজ। সুতরাং সাত হাজার সৈনিকের অধিকাংশের গমন-নির্গমনে সাহিত্য সমিতির ক্ষুদ্র বাসাখানি টলমাটল হয়ে উঠেছিল। মুজফ্‌ফর সাহেব তাই ঠিকই লিখেছেন: "ধরতে গেলে একরকম আক্রমণই শুরু হয়ে গেল আমাদের ঐ বাড়ীটার ওপরে। বহুল সংখ্যায় বাঙালী পল্টনের সৈনিকরা সে-বাড়ীতে আসছিলেন ও চলে যাচ্ছিলেন। আমরা সাহিত্য সমিতির লোকেরা বসবার-দাঁড়াবার স্থান পর্যন্ত যাচ্ছিলাম না। তখন ওই সৈনিকদের মুখে শুনেছিলেম যে বেঙ্গলী রেজিমেণ্টের সাত হাজার সৈনিকের প্রত্যেকেই পল্টনের দুজন সৈনিককে ব্যক্তিগত ভাবে চিনতেন। তাঁদের একজন হচ্ছেন কোয়ার্টার মাষ্টার হাবিলদার কাজী-নজরুল ইসলাম এবং অপর জন জমাদার শম্ভু রায়।"

কেবল সৈনিক বন্ধুগণই নন—নজরুল আসার পর থেকে তরুণ সাহিত্যিকদের ভীড় জমতে লাগল ঐ বাড়ীটিতে। সাহিত্য সমিতির অফিসে পূর্ব থেকেই একটা স্নিগ্ধ সাহিত্যের আবহাওয়া বইতো—নজরুলের আগমনে তা উতরোল হয়ে উঠল। সমিতির মুখপাত্র "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা" তো পূর্ব হতেই প্রকাশিত হচ্ছিল, নজরুল আসার পর হতেই এখান থেকে প্রকাশিত হলো রুচিসম্পন্ন মাসিক পত্রিকা "মোসলেম-ভারত"। সুতরাং নানান সাহিত্যিকের ভীড়ে আসর জমজমাট। সমকালীন সকল মুসলমান লেখক এ আসরে জমায়েত হতেন আর আসতেন মোহিতলাল মজুমদার, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়, হেমেন্দ্রলাল রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী ইত্যাদি। প্রাণভরপুর এই সাহিত্যিক আড্ডাটি অনেকের স্মৃতিপটে আজো উজ্জ্বল হয়ে আছে। নজরুলের নিজের কথায় আড্ডাটির স্বরূপ অপূর্ব সুন্দর হয়ে ফুটেছে : "আমাদের তখনকার আড্ডা ছিল সত্যিকার জীবন্ত মানুষের আড্ডা। আমরা এই তথাকথিত য়্যারিষ্টোক্রাট্ বা 'আড়ষ্ট-কাক ছিলাম না। বোমারু—বারীন দা এসে একদিন আমাদের আড্ডা দেখে বলেছিলেন—হ্যাঁ আড্ডা বটে! আজকালের তরুণেরা যে নীড় সৃষ্টি করে বসে আছে, আমরা তা করিনি; আমরা করেছিলাম জীবনকে উপভোগ।"

কিন্তু এই আড্ডাটিই সব নয়—এই সঙ্গে সঙ্গেই অক্ষরের আলিম্পনে কবির মহৎ সৃষ্টিগুলি কথা কয়ে উঠছিল। এ প্রসঙ্গে বিশেষরূপে স্মরণীয় নজরুলের উল্লেখযোগ্য সকল কবিতাই এ সময় রচিত হয়েছে এবং সেগুলির অধিকাংশ প্রকাশিত হয়েছে "মোসলেম ভারত" মাসিক পত্রিকায়।

একদিকে "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা" অন্যদিকে "মোসলেম ভারত"—এর মাঝেই আবার দুই বন্ধু (নজরুল ও মুজফ্‌ফর আহমদ) একটি সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকার প্রকাশের আয়োজন করতে লাগলেন। সেই আয়োজনের ইন্ধন যোগাতে এগিয়ে এলেন মঈনউদ্দীন হোসায়ন, মুহম্মদ ওয়াজিদ আলী, ফজলুল হক সেলবর্সী ইত্যাদি। পরে তাঁদের আলাপ হয় মিষ্টার এ, কে, ফজলুল হক সাহেবের সঙ্গে। ফজলুল হক সাহেবও একটি পত্রিকা প্রকাশের জন্য মনে মনে তৈরী হচ্ছিলেন। সে সময় তিনি হাইকোর্টের নামজাদা উকিল এবং কংগ্রেস ও খিলাফৎ আন্দোলনের একজন বড় নেতা। অর্থনৈতিক সকল ঝুঁকি তিনি ঘাড়ে নিয়ে পত্রিকা প্রকাশের সকল ব্যবস্থা করে দিলেন। পত্রিকার নাম রাখা হল "নবযুগ"। বাংলা দেশে মুসলিম পরিচালিত পত্র-পত্রিকার মধ্যে একমাত্র "নবযুগই" বোধহয় সর্বপ্রথম আরবী-ফার্সীযুক্ত নামকরণের ব্যতিক্রম। পত্রিকাটির "নবযুগ" নামকরণের মধ্যে একটি উদার মনোবৃত্তির ছোঁয়া জড়িয়ে আছে। এবং এই মহৎ উদাহরণের মূলে বিশেষরূপে কাজ করেছিল নজরুল ও মুজফ্‌ফর সাহেবের মহত্তর মন। শেষপর্যন্ত অনেক বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে "নবযুগের" প্রস্তুতি-পর্ব শেষ হল এবং ১৯২০ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি নজরুল ইসলাম ও মুজফ্‌ফর আহমদের যুগ্ম-সম্পাদনায় সান্ধ্য দৈনিক "নবযুগ" আত্মপ্রকাশ করে। রয়াল সাইজের (২০ ইঞ্চি × ২৬ ইঞ্চি) একতা কাগজ, দাম এক পয়সা। ২২ নং টার্ণার ষ্ট্রীটে ছিল "নবযুগের" ছাপাখানা, ৬ নং টার্ণার ষ্ট্রীটের নীচের তলার দু'খানা ঘরে ছিল পত্রিকার অফিস।

নবযুগে যোগ দেওয়ার পর নজরুল ও মুজফ্‌ফর সাহেব উভয়ই "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি"র অফিস হতে প্রথমে উঠে আসেন মার্কুইস লেনের একটি বাড়ীর দোতলায় এবং সামান্য কিছু পরে পুনরায় স্থান পরিবর্তন করে ৮-এ টার্নার স্ট্রীটে। এই বাড়ীটি নজরুলের সৃষ্টির সঙ্গে বিশেষরূপে চিহ্নিত হয়ে আছে। কবির বিখ্যাত কবিতা "খেয়াপারের তরুণী" এ বাড়ীতে বসেই লেখা। সদালাপী নজরুলের পক্ষে মানুষের সঙ্গে ভাব জমাতে বেশী সময় লাগে না। এই বাড়ীতে বসবাসকালে তার সুন্দর প্রমাণ পাওয়া গেল। বাড়ীটি ছিল একতলা পাকা বাড়ী, এর চারপাশে ছিল খোলার বাড়ী,—গরীব মুসলমানেরা ছিল সেই বাড়ীর বাসীন্দা। মাত্র ক'দিনের মধ্যে পুরুষদের সঙ্গে তো বটেই এমন কি বয়স্কা মেয়েদের সঙ্গেও সম্পর্ক পাতিয়ে ফেললেন। "যাঁর গায়ের রং খুব ফর্সা ছিল তাঁকে সে রাঙা খালা ডাকত। খালারা কোনো কোনো দিন তাঁদের রান্না করা তরকারি আমাদের দিয়ে যেতেন।"

"নবযুগে" কাজ করার সময় মুজফ্‌ফর সাহেব বিশেষরূপে উপলব্ধি করেছিলেন প্রচণ্ড কাজের চাপ, উত্তেজনা ও উত্তাপের মধ্যে থাকলেই নজরুলের পক্ষে উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করা সহজসাধ্য। কথাটা অবাস্তব মনে হতে পারে কিন্তু নজরুল সেই জাতের মানুষ উত্তাপ ছাড়া যাঁদের পক্ষে চলা অসম্ভব। "নবযুগের" কাজের চাপ যত বেড়েছে, সৃষ্টির সঙ্গে ততবেশী তন্ময় হয়েছেন নজরুল। মুজফ্‌ফর সাহেব তাই ঠিকই বলেছেন যে "নবযুগে" কাজ করার সময় কবি নজরুল ও সৈনিক নজরুলের আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছিল।

কবির জীবনী আলোচনা করলে দেখা যাবে সারা জীবন তিনি ছিলেন খামখেয়ালী। নিজের দারিদ্র্য পালনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত অমনোযোগী। দু'একবার এমনও দেখা গেছে স্ত্রীপুত্রকে ফেলে, সংসারের চিন্তা না করে দীর্ঘ দিন উধাও হয়ে ফিরেছেন। কিন্তু নবযুগে কাজ করার সময় কবির মধ্যে এই খামখেয়ালীপনা

দেখা যায় নি। এসময় আপন কর্ম ও দায়িত্বের সঙ্গে কবি অনেকবেশী আত্মস্থ। আড্ডা এবং আসরকে যিনি বহু মূল্যবান মনে করতেন, এসময় বহু অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই আড্ডা থেকে ওঠার সময় সৈনিক কবি প্রায়ই বলতেন :

ওঠ কবি সৈনিক
"নবযুগ" দৈনিক।

এবং ছড়া বলতে বলতে বন্ধু-বান্ধবদের বহুতর অনুরোধ অপরোধ উপেক্ষা করে কবি "নবযুগ" অফিসের দিকে পা বাড়াতেন।

"নবযুগে" কাজ করার সময় কবির আর একটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন মুজফ্ফর আহমদ। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তখন বিশেষরূপে নজরুলের ওপর পরিলক্ষিত হয়েছিল। নজরুল তখন সকল সময় রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইতেন। কোন আড্ডা বা জলসা ছাড়া নিছক অবসর বিনোদনের জন্য রবীন্দ্র-সঙ্গীতই ছিল একমাত্র সম্বল। নজরুল তখন সঙ্গীত রচনায় আত্মনিয়োগ করেননি। ফলে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের চর্চা তিনি খুব বেশী পরিমাণে করতেন। কেবল রবীন্দ্র-সঙ্গীত কেন—সমস্ত রবীন্দ্র-সাহিত্যই ছিল কবির প্রিয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি এবং সে কবিতার প্যারোডি করে "নবযুগের" সংবাদের হেডিং দেওয়া নজরুলের একটি বিশেষ আকর্ষণ হয়ে উঠেছিল। যেমন ইরাকের রাজা ফৈসুল সম্পর্কে সংবাদ পরিবেশনের সময় রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতার প্যারডি করে তিনি লিখেছেন :

"আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ সখা ফৈসুলহে আমার।"

নজরুলের বলিষ্ঠ লেখনিতেই "নবযুগ" বিশেষ জনপ্রিয়

হয়েছিল। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ই কাজটিকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। শেষে পত্রিকাটির চাহিদা এত বেড়ে গিয়েছিল যে, ঠিকমত উপযুক্ত সংখ্যা ছেপে কর্তৃপক্ষ সরবরাহ করতে পারতেন না।

মুজফ্ফর সাহেব বলেছেন যে, একটা যুগপযোগী চিন্তাধারার স্পষ্ট চিহ্ন "নবযুগের" পৃষ্ঠায় ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তার মধ্যে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন তো ছিলই—আর ছিল কৃষক-মজুরশ্রেণীর কথা। এই অবহেলিত দরিদ্র জনসমাজের দাবীর কথা মাঝে মাঝে বেশ সরল কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছিল। সে-ই হল কাল। একদিকে সরকার অন্যদিকে কর্তৃপক্ষ উভয়ের মনোভাবে অসন্তুষ্টি মনোভাব পরিলক্ষিত হলো। প্রথমদিকে অবশ্য কর্তৃপক্ষ এ সম্পর্কে কিছু বলতেন না কিন্তু শেষের দিকে তাঁরাও নির্বিবাদে এরূপ মতবাদ প্রচার করতে দিলেন না। সরকারের বিশেষ নজর "নবযুগের" ওপর পূর্ব হতেই পড়েছিল—তাই দু'একবার কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করে দিয়ে জামিনের এক হাজার টাকা বাজেয়াফৎ করে নিল অবশ্য দু'হাজার টাকা জমা দিয়ে পুনরায় পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু হক সাহেব তখন অন্য মানুষ। থাক—সে কথা। এ সময় কঠোর পরিশ্রমে নজরুল অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর শরীরও ভাল যাচ্ছিল না। এরেস্টের পরে কবির বন্ধু-বান্ধব কেউ চাইছিল না যে তিনি "নবযুগে" কাজ করুন। তাঁদের আশঙ্কা ছিল "নবযুগের" কঠোর চাপে তাঁর মৌলিক সৃষ্টি বিঘ্নিত হবে। তাই তাঁরা "নবযুগের" সংস্রব ত্যাগ করার জন্য জিদ করতে লাগলেন। কর্তৃপক্ষের মনোভাব, নিজের স্বাস্থ্য এবং বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধ— এই তিনের সম্মিলিত ফলে কবি স্থির করলেন তিনি "দেওঘরে যাবেন। যাবার সময় কবি এই গানটি রচনা করে গেলেন ঃ

"বন্ধু আমার! থেকে থেকে কোন সুদূরের নিজনপুরে
ডাক দিয়ে যাও ব্যথার সুরে?
আমার অনেক দুঃখের পনের বাসা বারে বারে ঝড়ে উড়ে
ঘরছাড়া তাই বেড়াই ঘুরে।..."

সেদিনের প্রত্যক্ষদর্শী লিখেছেন: "নজরুল যখন গানটি গাইছিল তখন কবি মোহিতলাল মজুমদার আনন্দে প্রায় গলে পড়ছিলেন। তিনি বারে বারে নজরুলের চিবুক স্পর্শ করছিলেন।"

৬.

কবি চলে গেলেন দেওঘরে। বেশ কিছুদিন আনন্দে কাটল। কিন্তু কিছুকাল পরে বেশ কিছু অর্থকষ্টের মধ্যে পড়তে হয়েছিল কবিকে। কলকাতায় বসে সে সংবাদ পেলেন মুজফ্‌ফর সাহেব। ছুটলেন দেওঘরে। তাঁর সঙ্গে গেলেন এমদাদুল্লাহ। নোয়াখালি জেলা স্কুলে এমদাদুল্লাহ ছিলেন মুজফ্‌ফর সাহেবের সহপাঠী। তিনি গিয়ে দেখলেন নজরুল বিশেষ কিছু লিখতে পারেননি। স্থির হলো কবিকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনা হবে। কিন্তু টাকা? একমাত্র এমদাদুল্লহে সাহেবের কাছে তাঁর বি, এ পরীক্ষার ফি বাবদ কিছু টাকা ছিল। সেই টাকা ধার নিয়ে মুজফ্‌ফর সাহেব নজরুলকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন কলকাতায়। এবারেও সমূহ কিছু ক্ষতির হাত থেকে তিনি রক্ষা করলেন কবিকে।

দেওঘরে থাকাকালীন এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে নজরুলের আলাপ হয়েছিল—নাম শ্রীযুক্তা কুমুদিনী বসু। কলকাতায় ফিরে

ভদ্রমহিলা তাঁর মেয়ের জন্মদিন উপলক্ষে কবিকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। এই উপলক্ষে কবি "পথিক শিশু" নামে যে গানটি রচনা করেছিলেন সেটি এই :

"নাম-হারা তুই পথিক শিশু এলি অচিন দেশ পারায়ে।
কোন নামের মাজ পরলি কাঁকন? বাঁধন-হারার কোন কারা এ?
আবার মনের মতন করে—'
কোন নামে বল ডাকবো তোরে।
পথ-ভোলা তুই এই কে ঘরে
ছিলি ওরে, এলি ওরে বারে বারে নাম হারায়ে। ..."

গানটি পরে তাঁর "পূবের হাওয়া" গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

৭.

দেওঘর থেকে ফিরে এসে কবি আবার আশ্রয় নিলেন সাহিত্য সমিতির অফিসে। এ সময়ে কবির ব্যয়-ভার জনাব আফজালুল হক সাহেব বহন করতেন। দিন কেটে যাচ্ছিল সেই পূর্বের মত সাহিত্য-চর্চা ও আনন্দানুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে কিন্তু নিয়তি বুঝি অদৃশ্যলোক থেকে কবিকে বেদনার পথে আকর্ষণ করছিল। এ সময় এক বেদনাতুর ঘটনা ঘটে কবির জীবনে।

জনাব মুজফ্‌ফর আহমদ মারফৎ আলী আকবর খান নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কবির আলোচনা হয়। খান সাহেব ছিলেন অত্যন্ত দাম্ভিক। তাঁর রূঢ় ব্যবহারের আড়ালে প্রকাশ পেত অনেক কদর্য ইতিহাস যা তাঁর চরিত্রকে কোন রকমেই মহিমান্বিত করতো না। যা হোক এই আলী আকবর খান একদিন অতর্কিতে কবিকে নিয়ে গেলেন নিজের দেশে—ত্রিপুরা জেলার কুমিল্লা মহকুমার অন্তর্গত

দৌলৎপুর গ্রামে। এখানে খান সাহেবের এক ভাগ্নী নার্গিস আসার খানমের সঙ্গে কবির বিয়ের ঠিক হয়। বিয়ের যে নিমন্ত্রণপত্র ছাপা হয় তা কবি নিজেই লিখেছিলেন কিন্তু নাম ছিল আলী আকবর খানের। এই নিমন্ত্রণপত্রের এক স্থানে লেখা ছিল। "আমার পরম আদরের কল্যাণীয়া ভাগ্নী নার্গিস আসার খানমের বিয়ে বর্ধমান জেলার ইতিহাস প্রখ্যাত চুরুলিয়া গ্রামের দেশবিখ্যাত পরমপুরুষ, আভিজাত্য-গৌরবে বিপুল গৌরবান্বিত আয়মাদার, মরহুম মৌলবী কাজী ফকির আহমদ সাহেবের দেশ-বিশ্রুত পুত্র মুসলিম কুল-গৌরব মুসলিম-বঙ্গের 'রবি'-কবি দৈনিক নবযুগের ভূতপূর্ব সম্পাদক কাজী নজরুল ইসলামের সাথে।"...এই নিমন্ত্রণপত্রের একখানি জনাব মুজফ্‌ফর সাহেবের নিকট পাঠিয়ে তাঁকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। নিমন্ত্রণ-পত্রটি পড়ে মুজফ্‌ফর সাহেব বিশেষরূপে বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি বুঝতে পারেন যে দাম্ভিক আলী আকবর খানের সাহচর্যে থেকে নজরুলও কিছু দাম্ভিক হয়ে পড়েছেন—তা' না হ'লে নিজের সম্পর্কে এমন কথা তিনি কিছুতেই লিখতে পারতেন না। এই দাম্ভিকতার ফল কখনো শুভ হবে না ভেবে মুজফ্‌ফর সাহেব সঙ্গে সঙ্গে নজরুলকে এক অত্যন্ত গোপনীয় চিঠি (২৬শে জুন, ১৯২১ খৃষ্টাব্দ) লেখেন। 'আয়মাদার' এবং 'রবি'-কবি শব্দ দু'টির ভিতরে দিয়ে আত্মম্ভরিতার যে পরিচয় রয়েছে সে সম্পর্কে অত্যন্ত সংযত ভাষায় আহমদ সাহেব কবিকে সাবধান করে দেন। চিঠিখানির প্রয়োজনীয় অংশ আমরা উদ্ধৃত করলাম ঃ

"পরম প্রীতিভাজনেষু,

কাজী সাহেব, আপনার পত্রাদি যে আর মোটেই পাওয়া যাইতেছে না, তার কারণ কি? খান সাহেবের নিমন্ত্রণপত্র পাইয়াছিলাম। পত্রখানা আপনারই মুসাবিদা করা দেখিলাম। পত্রের ভাষা দু' এক জায়গায় বড় অসংযত হইয়াছে। একটু যেন কেমন দাম্ভিকতা

প্রকাশ পাইয়াছে। আপনার হাত দিয়া অমন লেখা বাহির হওয়া কিছুতেই ঠিক হয় নাই। আমার বড় ভয় হইতেছে যে, খান সাহেবের সংশ্রবে থাকিয়া আপনিও না শেষে দাম্ভিক হইয়া পড়েন। অন্যে বড় বলিলে গৌরবের কথা হয়, আর নিজেকে নিজে বড় বলিলে অগৌরবের মাত্রাই বাড়িয়া যায়। বাস্তবিক আমার প্রাণে বড় লাগিয়াছে বলিয়া আমি এই কথা বলিলাম।"…

১৩২৮ সালে ৩রা আষাঢ় শুক্রবারে এই বিবাহ-পর্ব নাম মাত্র অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ কারণে মনঃক্ষুণ্ণ হ'য়ে কবি বিবাহবাসর ত্যাগ করে সেই রাত্রেই কুমিল্লার কান্দিরপাড়ের বিখ্যাত সেনগুপ্ত পরিবারে আশ্রয় নেন। এর পরের ঘটনাটি আমরা মুজফ্‌ফর সাহেবের ভাষাতেই বিবৃত করলাম ঃ "কুমিল্লা হ'তে নজরুলের একখানা ছোট্ট চিঠি পেলাম। তার ভাষা মনে থাকার কথা নয়। সে যা লিখেছিল তার মোদ্দা কথা হচ্ছে যে, সে আলী আকবর খানের দ্বারা প্রতারিত ও অপমানিত হয়েছে। সে খুব অসুস্থ। আমি যেন তাকে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিই। এক বন্ধুর নিকট ধার করে বিশটি টাকা আমি তাকে তখনই পাঠিয়ে দিলাম। কথাটা কলকাতার বন্ধুদের জানানো হ'লো। সকলে খুব দুঃখ করতে লাগলেন এবং আমায় ধরে বসলেন যে তখনই কুমিল্লায় গিয়ে নজরুলকে নিয়ে আসা উচিত। আমার কুমিল্লা যেতে আপত্তি ছিল না, কিন্তু যাওয়ার পথে দুটি বাধা ছিল। এক ঃ আমার নিকটে টাকা ছিল না। দুই ঃ গোয়ালন্দ হ'তে নীচের দিককার ষ্টীমারের লোকদের ধর্মঘট চলছিল, ধর্মঘট চলছিল আসাম-বেঙ্গল রেলওয়েতেও। সশস্ত্র পুলিশের পাহারায় চব্বিশ ঘণ্টার ভিতরে একখানা ষ্টীমার ও একটি মাত্র ট্রেন চালু ছিল। এই অবস্থায় গোয়ালন্দ-চাঁদপুরের ষ্টীমারে ও আসাম-বেঙ্গল রেলওয়েতে ট্রেন চড়তে আমার মন কিছুতেই সায় দিচ্ছিল না। বন্ধুরা বললেন, নজরুলের যখন অসুখ তখন এত কথা ভাবলে চলে কি? পবিত্র (পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়) বল্‌ল, ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের পরিবারকে সে

চেনে, তাঁরা খুব ভাল লোক। বীরেন সেনকে সে ডাকে একখানা পত্রও লিখে দিল। শ্রীযুক্ত ফকিরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা সংস্কৃত কলেজে দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। নজরুলের নিকটে তিনি প্রায়ই আসতেন। তাঁর বাড়ীও ছিল নজরুলের দেশের দিকে। তিনি যাতায়াতের খরচ বাবদে আমাকে ত্রিশটি টাকা দিলেন। সেকালে ষ্টীমার-রেলওয়ের ভাড়া খুব কম ছিল। এই টাকার ওপরে ভরসা করে আমি কুমিল্লার শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের বাসায় গিয়ে পৌঁছলাম। দেখলাম নজরুল অনেকখানি সামলে নিয়েছে। দৌলৎপুর গ্রামে কি কি ঘটেছে তার প্রত্যেকটি কথা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নজরুল আমায় জানালো। বীরেন সেনও যা জানতেন তা' আমায় শোনালেন। আমি মনে মনে ভাবলাম আমাকে নিমিত্তের ভাগী করা যায় কি? আমার জন্যেই তো আলী আকবর খানের সঙ্গে নজরুলের পরিচয় হয়েছিল।

শ্রীইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তের ভাষায় নজরুল তাঁদের পরিবারের একজন হয়ে গিয়েছিল। আলী আকবর খানের বাড়ীর ঘটনার পরে এই বাসায় নজরুলের যত্ন আরও অনেক পরিমাণে বেড়েছিল। পাখা বিস্তার করে পাখী-মা যেমন ছানাদের আশ্রয় দেয় তেমনি আশ্রয় দিয়েছিলেন শ্রীযুক্তা বিরজাসুন্দরী দেবী নজরুলকে। দুদিন কুমিল্লায় শ্রীসেনগুপ্তের বাসায় থেকে নজরুলকে সঙ্গে নিয়ে আমি কলকাতার দিকে রওনা হলাম। তখনও চব্বিশ ঘণ্টার ভিতরে একখানা ট্রেন চলছিল। চাঁদপুর পর্যন্ত এসে দেখা গেল আমাদের টাকা কমে গেছে। আমরা চাঁদপুর ডাক বাংলায় উঠে কলকাতায় আফজালুল হক সাহেবকে কয়েকটি টাকা পাঠানোর জন্যে টেলিগ্রাম করলাম। তিনি কুমিল্লার আশরাফউদ্দীন চৌধুরীকে (সে সময় কলকাতা ছিলেন) এই কথাটা জানাতেই চৌধুরী সাহেব চাঁদপুরে শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগকে টেলিগ্রাফ করে দিলেন। টেলিগ্রাফ পেয়ে নাগ মহাশয়ের নিকট হতে শ্রীযুত কুলচন্দ্র সিংহ রায় (রাজবন্দী ছিলেন)

ডাকবাংলায় এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন এবং বারটি টাকা আমাদের দিয়ে গেলেন। তারপরে আমরা কলকাতায় এসে পৌছলাম।

জীবনের এক চরমতম আঘাতের সময় মুজফ্ফর সাহেব কবির পাশে দাঁড়ালেন। এমনি ভাবে কবির জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় জীবনের সর্বাপেক্ষা দুঃখের এবং প্রয়োজনের মুহূর্তে মুজফ্ফর সাহেব নীরবে এসে কবির পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং একান্ত বন্ধুর মত প্রীতি-প্রেমে সমুদয় ক্ষতচিহ্নগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন। কবির জীবনে এই সহৃদয় মহান ব্যক্তির ও ব্যবহারের যে একটি অনিবার্য প্রভাব পড়েছে সে কথা অস্বীকার করার আজ কোন উপায় নেই। এমন কি আমাদের মনে হয় সাম্যবাদের প্রতি কবির যে একটি ঐকান্তিক অনুরাগ দেখা গিয়েছে, তারও পাঠ তিনি সম্ভবতঃ মুজফ্ফর সাহেবের নিকট থেকেই গ্রহণ করেছেন। ১৯২১ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ৩।৪-সি তালতলা লেনের বাড়ীতে একত্র বসবাসের সময় ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। এই পার্টি গঠনের প্রারম্ভিক লগ্নে কবি মুজফ্ফর সাহেবের সঙ্গেই থেকেছেন। অবশ্য যদিও কবি কোনদিন এ পার্টির সভ্য হননি, তথাপি মূল নীতির প্রভাব যে তাঁর ওপর পড়েনি একথা স্বীকার করতে মন কিছুতেই সায় দেয় না। সুতরাং কবি কেবল বেদনার দিনগুলিতে আহমদ সাহেবের নিকট থেকে সাহায্য পাননি, তাঁর জীবনের আদর্শও কিছুটা এই স্বল্পভাষী শীর্ণকায় মানুষটির প্রভাবে গড়ে উঠেছে।

৮.

কবির মহোত্তম সৃষ্টি "বিদ্রোহী" কবিতাটি রচনার সাক্ষী জনাব আহমদ সাহেব। এই কবিতাটির সৃষ্টি-লগ্ন সম্পর্কে তিনি তাঁর গ্রন্থে

লিখেছেন, "৩।৪-সি তালতলা লেনের বাড়ীটি নজরুল ইসলামের নিকটও স্মরণীয়। এই বাড়ীর নীচের তলার দক্ষিণ-পূর্ব কোনের ঘরটিতে সে তার বিখ্যাত কবিতা "বিদ্রোহী" রচনা করেছিল। সময়টা ছিল ১৯২১ সালের দুর্গা পূজার কাছাকাছি (আগে বা পরের) একটি মাস। তখনও কলকাতায় বৃষ্টি-বাদল পুরোপুরি থামেনি। রাত্রে আমি যখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তখন নজরুল জেগে থেকে কবিতাটি লিখেছিল।"

তথ্যটি সত্য কিন্তু সময়ের কিছু গোলযোগ হ'য়েছে। এক ছুটিতে কবিতাটি লিখিত এবং সে সময় বৃষ্টিও হ'য়েছিল কিন্তু ছুটিটি ছিল বড় দিনের—দুর্গাপূজার নয়। আমাদের এখানে বড়দিনের সময় মাঝে মাঝে শীতের বৃষ্টি নামে। বড়দিনের ছুটিতে যে কবিতাটি রচিত হ'য়েছিল তার আরও প্রমাণ এই যে কবিতাটি ছাপা হয় ২২শে পৌষের "বিজলী"তে। বিজলী তখন নিয়মিত প্রকাশিত হ'তো। আর বড়দিনের ছুটি হয় পৌষ মাসেই। স্বয়ং মুজফ্‌ফর সাহেবই স্বকীয় এই ভুলটির প্রতি আমার সম্পাদিত "প্রগতি" পত্রিকার ১৯৬৪ সালের বার্ষিক সংখ্যায় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

৯.

"ধূমকেতু" প্রকাশের সময় এবং বিশেষ করে "লাঙল" ও "গণবাণী" প্রকাশ-মুহূর্তে উভয়ে একত্রিত হয়ে কাজ করেছেন। কিন্তু এই হৃদ্য মেলামেশায় এর পরে ছেদ পড়ে। কবি সাহিত্য ছেড়ে যখন সংগীতের অসীম সমুদ্রে ভাসমান হন তখন প্রকৃতপক্ষে মুজফ্‌ফর সাহেবের সঙ্গে তাঁর কোনই যোগ ছিল না। যোগ না থাকার আরো কারণ এই যে মুজফ্‌ফর সাহেবকে তখন অধিকাংশ সময় বন্দীজীবন

যাপন করতে হ'তো। কবি মুজফ্ফর সাহেবকে যে কী চোখে দেখতেন কী গভীর শ্রদ্ধা করতেন তার একটি সুন্দর প্রমাণ আমাদের হস্তগত হ'য়েছে। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ৮ই ভাদ্র তারিখে কৃষ্ণনগর থেকে কবি একটি চিঠি লিখেন সাপ্তাহিক "আত্মশক্তির" সম্পাদক শ্রীগোপাল লাল সান্যাল মহাশয়কে। এই চিঠির প্রতিটি পংক্তিতে মুজফ্ফর সাহেবের প্রতি কবির ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ব্যক্ত হ'য়েছে। চিঠিখানির প্রয়োজনীয় অংশ আমরা এখানে উদ্ধৃত করলাম :

..."চোখে জল আসে, বিশেষ করে যখন দেখি, "গণবাণীর" কর্ণধার হতভাগ্য মুজফ্ফর আহমদকে। অবস্থা ত সব "ফকির-ফোকরা, হাঁড়িতে ভাত নেই শান্‌কিতে ঠোক্‌রা!" আর শরীরের অবস্থাও তেমনি। যেন সমগ্র মানব সমাজের প্রতিবাদ! আমি হলফ করে বল্‌তে পারি মুজফ্ফরকে দেখলে লোকের শুষ্ক চক্ষু ফেটে জল আসবে! এমন সর্বত্যাগী আত্মভোলা মৌনীকর্মী, এমন সুন্দর প্রাণ, এমন ধ্যানীর দূর দৃষ্টি, এমন উজ্জ্বল প্রতিভা—সবচেয়ে এমন উদার বিরাট বিপুল মন নিয়ে সে কি করে জন্মাল গোঁড়া মৌলবীর দেশ নোয়াখালিতে, এই মোল্লা-মৌলবীর দেশ বাঙলায়, তা' ভেবে পাইনে! ও যেন আগুনের শিখা, ওকে মেরে নিবৃত্ত করা যায় না। ও যেন পোকায় কাটা ফুল, পোকায় কাটছে তবু সুগন্ধ দিচ্ছে। আজ তাকে যক্ষ্মা খেয়ে ফেলেছে, আর কটাদিন সে বাঁচবে জানিনা। ওর পায়ের তলায় বসে শিষ্যত্ব করতে পারে না, এমন অনেক মুসলমান নেতা আজ এই সাম্প্রদায়িক হুড়োহুড়ির ও যুগের হুজুগের সুবিধে নিয়ে গুছিয়ে নিলে, শুধু মুজফ্ফরই দিনের পর দিন অর্ধাশনে অনশনে ক্লিষ্ট হয়ে শুকিয়ে মরছে। আমি জানি, এই "গণবাণী" বের করতে তাকে দুটো দিন কাঠেকাঠ অনশনে কাটাতে হ'য়েছে। বুদ্ধি মিঞাও আজ লীডার আর মুজফ্ফর মরছে রক্ত বমন করে! অথচ মুজফ্ফরের মত সমগ্রভাবে নেশনকে ভালবাসতে, ভারতবর্ষকে ভালবাসতে—কোনো মুসলমান নেতা ত দূরের কথা, হিন্দু নেতাকেও দেখি না। এই সাম্প্রদায়িক

হাঙ্গামার দিনে যদি কারুর মাথার ঠিক থাকে, তা' মুজফ্‌ফরের "লাঙল" ও "গণবাণীতে লেখা প্রবন্ধ পড়লেই বুঝতে পারবেন।

দেশের ছোট-বড়-মাঝারি সকল দেশ-প্রেমিক মিলে যখন "এই বেলা নে ঘর ছেয়ে" প্রবাদটার সার্থকতা হৃদয়াঙ্গম করে পনর দিন বিনাশ্রম জেল বাসের বিনিময়ে অন্ততঃ একশত টাকার "ভাত-কাপড়ের সংস্থার করে নিলে, তখন যারা তাঁদের ত্যাগের মহিমাকে ম্লান করল না আত্মবিক্রয়ের অর্থ দিয়ে—তাদের অন্যতম হ'চ্ছে মুজফ্‌ফর। মুজফ্‌ফর কানপুর বল্‌শেভিক ষড়যন্ত্র কেসের দণ্ডভোগী অন্যতম আসামী এবং বাঙলার সর্বপ্রথম মুসলমান স্টেট প্রিজনার। বাঙলার বাইরে নাশব খোট্টাই জেলে তার উপর অকথ্য অত্যাচার চলে গেছে। শেষে যখন যক্ষ্মায় সে মৃতপ্রায় তখন তাকে হিমালয় পর্বতস্থিত আলমোড়ায় নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়! তখন ওজন তার মাত্র ৭৪ পাউণ্ড! সেখানে দিনের পর দিন কাটিয়েছে সে অনশনে, তবু সে চায়নি কিছু। সে বলে নি কোনদিনই মুখফুটে যে সে দেশের জন্যে কিছু করেছে! বল্‌বেও না ভবিষ্যতে। সে বলে না বলেই ত তার জন্যে এত কান্না পায়, তার ওপর আমার এত বিপুল শ্রদ্ধা। সেই নেতা যিনি আজ কর্পোরেশনের মোটরে চড়ে দাড়িতে মলয় হাওয়া লাগিয়ে বেড়াচ্ছেন, এবং ব্যাঙ্কে যাঁর জমার অঙ্কের ডান দিকের শূন্যটা বেড়েই চলেছে দিনের দিন, যাঁকে কলকাতায় এনে তাঁর টাউনহলের অভিভাষণ লিখিয়ে দিয়ে কাগজে কাগজে তাঁর নামে কীর্ত্তন গেড়ে বড় করে তুল্‌ল মুজফ্‌ফর,—সেই মুজফ্‌ফর তার অতি বড় দুর্দ্দিনেও একটি পয়সা বা এক ফোঁটা সহানুভূতি পায়নি ঐ লীডার সাহেবের কাছে! সে অনুযোগ করে না তার জন্য, কিন্তু আমরা করি।

যে মুসলমান সাহিত্য সমিতির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করল মুজফ্‌ফর, অথচ তার নিজের নাম চিরকাল গোপন রেখে গেল, সেই মুসলমান সাহিত্য সমিতির যখন নতুন করে প্রতিষ্ঠা হ'ল এবং তার নতুন "সভ্যগণ" মুজফ্‌ফর রাজ-লাঞ্ছিত বলে এবং তাঁদের

অধিকাংশই রাজভৃত্য বলে যখন তার বন্দী বা মুক্ত হওয়ার জন্য নাম পর্যন্ত নিলে না—তার মনের কৃতজ্ঞতা স্বীকার ত দূরের কথা, তখনও একটি কথা করে দুঃখ প্রকাশ করেনি মুজফ্‌ফর! ও যেন প্রদীপের তৈল, ওকে কেউ দেখলে না, দেখলে শুধু সেই শিখাকে, যা জ্বলে প্রদীপের তৈলকে শোষণ করে।"...

মুজফ্‌ফর সাহেবের প্রতি কবির যে ঐকান্তিক অনুরাগ ছিল তেমনি প্রগাঢ় ভালবাসা রয়েছে কবির প্রতি মুজফ্‌ফর সাহেবের। কবির বহুদিনের বন্ধু অতীতের কথা বলতে গিয়ে তাঁর মন কখনো আনন্দে বিহ্বল, কখনো বেদনায় কাতর হ'য়ে ওঠে। সম্প্রতি "বিংশ শতাব্দী" প্রকাশনি থেকে "কাজী নজরুল প্রসঙ্গে তাঁর একটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হ'য়েছে। বহুদিনের বহু স্মৃতিকথায় গ্রন্থটির প্রতিটি পৃষ্ঠা পূর্ণ। তাঁর এই সৃষ্টি বন্ধুর প্রতি বন্ধুর অকৃত্রিম অনুরপণের রাখী-বন্ধন হ'য়েই রইলো।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

১৷৹

"কেউ ভোলে না। কেউ ভোলে" গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় বিদ্রোহী কবি সম্পর্কে লিখেছেন: "আমার সৌভাগ্য, আমি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে পেয়েছিলাম এমন একটি মানুষকে— ঠিক যে সকল মানুষ সচরাচর চোখে পড়ে না। অনেকের চেয়ে স্বতন্ত্র। অজস্র প্রাণপ্রাচুর্য, অবিশ্বাস্য রকম হৃদয়ের উদারতা, বিদ্বেষ কালিমা মুক্ত, অপাপবিদ্ধ একটি পবিত্র মন, আর নিরাসক্ত সন্ন্যাসীর মত একটি আপন ভোলা প্রকৃতি।" অতি অল্প কথা উদার প্রাণ মনীষীর সত্য-স্বরূপ এমন ভাবে অন্য কোথাও তুলে ধরা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় বোধহয় কবির একমাত্র বন্ধু যিনি তাঁর ছাত্রজীবনের সকল ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। নজরুলের পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনার বড় অসুবিধা এই যে বিক্ষিপ্ত ভাবে হলেও সৈনিকোত্তর জীবনের অনেক তথ্যই তাঁর অসংখ্য বন্ধুবান্ধবের নিকট পাওয়া যায়—কিন্তু তাঁর শৈশব ও ছাত্রজীবনের কোন নির্ভরযোগ্য তথ্যের পরিবেশন আজ পর্যন্ত কেউ করেন নি। এ বিষয়ের একমাত্র ব্যতিক্রম কবির বাল্যবন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। তাঁর নিকটে আমরা যে সকল বিবরণ পেয়েছি সেগুলিতে আছে কবির ছাত্রজীবনের অনেক অজ্ঞাত তথ্যের সমাবেশ।

২.

নজরুল তখন শিয়াড়শোল রাজ হাইস্কুলের ছাত্র—এই সময় শৈলজানন্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। এই স্কুলে পড়ার সময় নজরুলের কোন বেতন দিতে হতো না উপরন্তু রাজবাড়ী থেকে মাসিক সাত টাকা হারে বৃত্তি পেতেন। থাকতেন একটি ঘরে—মাটির দেওয়াল খড়ের ছাউনি। ঘরখানির নাম কিন্তু গালভরা—'মহমেডান বোর্ডিং'। বোর্ডিং হাউসের অধিবাসীদের সংখ্যা পাঁচ—নজরুল তার মধ্যমণি।

শৈলজানন্দ পড়েন রাণীগঞ্জের হাইস্কুলে। প্রায় পাশাপাশি দুটি স্কুল। ছুটির পর প্রতিদিন দুই বন্ধু একত্রিত হন—মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ান বনে-জঙ্গলে, কখনো বা দূর প্রান্তরে। নজরুল যে মাসিক বৃত্তি পেতেন সে টাকা রাখতেন বালিশের তলায়। ঐ স্থানটি তাঁর বাক্স, আলমারী বা আয়রণসেফ। ওখান থেকেই পয়সা খরচ হতে হতে শেষ হয়ে যেত কয়েকদিনের মধ্যেই। অধিকাংশ সময় দু' বন্ধুর বিস্কুট সেবায় নিঃশেষ হ'য়ে যেত বৃত্তির টাকা—কোন কোন সময় বৃত্তি পেয়েই সম্পূর্ণ টাকাটা তুলে দিয়েছেন দুঃস্থ সংসারের সাহায্যের জন্য ছোট ভাই আলি হোসেনের হাতে।

৩.

নজরুল সাঁতার জানতেন না—কূয়োর জলেই স্নান করতেন। একদিন স্নানের সময় শৈলজাবাবু জোর করে পাকড়াও করে নিয়ে গেলেন পুকুরে। বললেন—যার বাড়ীর পাশেই অতবড় দীঘি

পীরপুকুর সে সাঁতার জানবে না একি কম লজ্জার কথা। বীরের মত দুই বন্ধুতে গেলেন সাঁতার কাটতে। শৈলজাবাবুও যে পাকা সাঁতারু তাও নন। বিপদ আসতেও বিলম্ব হ'ল না। নজরুলকে নিয়ে যখন ডুব জলে ভাসলেন কবি প্রাণ-ভয়ে জড়িয়ে ধরলেন শৈলজাবাবুকে। শেষে দুই বন্ধু তলিয়ে যান আর কি—অবশেষে স্নানরত মহবুব এসে দু'জনকে উদ্ধার করে।

৪.

একদিন স্কুলে একটা ঘটনা ঘটল। উঁচু ক্লাস রুমের কড়িকাঠে একটি চড়ুই পাখী বাসা বেঁধে ছিল। ডিম থেকে যথাসময়ে দুটি বাচ্চাও ফুটেছিল। বাচ্চাগুলো তখনো ভাল উড়তে শেখেনি—একটি বাচ্চা কেমন করে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল, পড়ে আর উড়তে পারে নি। খুব আঘাত লেগেছিল। সেই বাচ্চাটাকে ঘিরে ছেলেদের সে-কি উল্লাস। অর্ধমৃত পাখীর পায়ে সুতো বেঁধে খেলোবার চেষ্টা। ছেলেদের দলে নজরুলও ছিলেন কিন্তু এ উল্লাস তাঁর ভাল লাগেনি। সবাইকে সচকিত করে তিনি বল্‌লেন, ছেড়ে দাও পাখীটাকে—ওর বাসায় তুলে দিই।

পাখীটার করুণ অবস্থায় তিনি মনে বড় আঘাত পেয়েছিলেন। পাশের কোন একটা বাড়ী থেকে মই জোগাড় করে এনে বাচ্চাটাকে কড়ি কাঠে তার বাসায় তুলে দিয়ে তবে যেন সান্ত্বনা পেলেন মনে। এ কাজে শৈলজাবাবু ছিলেন তাঁর সাহায্যকারী। এই কল্যাণধর্মী কাজটি করে দুই বন্ধু মনে বড় রকমের অনুপ্রেরণা পেলেন। সেই দিন বাসায় ফিরে ঘটনাটিকে উপলক্ষ্য করে শৈলজাবাবু লিখলেন একটা কবিতা আর নজরুল লিখলেন একটি মনোরম কথিকা। তার ক'দিন পর নজরুল আবার লিখলেন একটি কবিতা—ঐ একই ঘটনাকে

উপলক্ষ্য করে। শৈলজাবাবুকে পড়তে দিলেন কবিতাটি—সম্ভবতঃ এটাই নজরুলের লেখা প্রথম কবিতা। কবিতাটি এতকাল অপ্রকাশিত ছিল। সম্প্রতি সেটি "কেউ ভোলে না কেউ ভোলে" এবং "নজরুল রচনা সম্ভারে" সংকলিত হয়েছে।

যে নজরুল এতকাল গদ্য লিখেছেন—কবিতা লেখা এবার তাঁকে নেশার মত পেয়ে বসল। তিন দিনের মধ্যে তিনি লিখলেন আরো দু'টি দীর্ঘ কবিতা 'রাণীর গড়' এবং 'রাজার গড়'। কবিতা দু'টি আজ পর্যন্ত অপ্রকাশিত—মূল পাণ্ডুলিপি শৈলজাবাবুর কাছে পাওয়া যাবে।

লেখার কাজ পুরোদমে চলে দুই বন্ধুর। কিন্তু কিশোর লেখকের মস্ত বড় দুর্বলতা এই যে, কোন লেখা তৈরী করে যদি সেটা কাকেও শুনিয়ে প্রশংসা আদায় করা না গেল অনুশোচনা তীব্র হ'য়ে দেখা দেবে। এ ব্যাপারে দু'জনে দু'জনার একান্ত সহায়ক হলেন। রাতের নির্জনে চলে লেখার কাজ—স্কুল ছুটির পর দু'বন্ধু একত্রিত হন সেই লেখাগুলি নিয়ে। কোলাহল ছেড়ে দূরে বৈকালের স্বর্ণ-গোধূলি বেলায় পরম নিভৃতে দুই বন্ধু ঘন সন্নিবিষ্ট হ'য়ে বসেন, প্রতি পংক্তির সাথে হৃদয়াবেগ মিশিয়ে চলে কবিতা পাঠ। প্রতিযোগিতা করে একে অপরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হ'য়ে ওঠেন। নতুন উৎসাহ আর অনুপ্রেরণা নিয়ে বাসায় ফিরে আসেন দুই বন্ধু, সঙ্গে সঞ্চয় করে আনেন নতুন রচনার মূলধন।

৫.

মাঝে মাঝে দুই বন্ধু খেলাধূলার আয়োজনে মেতে ওঠেন। কিন্তু নজরুলের খেলার ধরণই আলাদা। একবার একটা 'এয়ার গান' পাওয়া গেল, সেই বন্দুক নিয়ে চলল শীকার। শীকার বলতে পাখী

শীকার নয়, হরিণ শীকার নয়—একেবারে লাটবেলাট শীকার। নিকটেই ছিল একটি গোরস্থান। গোরস্থানের একদিকে ছিল অনেকগুলি বেদী। এই ইটের বেদীগুলিই ছিল কবির লক্ষ্য। বেদীগুলি নিছক জড় পদার্থ হিসেবে শীকারের লক্ষ্যস্থল হ'তো না—কবির নিকট এর কোনটি হ'তো বড়লাট, কোনটি ছোটলাট, কোনটি বা ডিস্ট্রীক্ট মেজিস্ট্রেট আবার সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তন বেদীটি হ'তো এস, ডি, ও। সেকালে এ সকল উচ্চ সরকারী পদ একচেটিয়া ইংরেজদের ছিল। বন্দুক চালা সেই নলের ভিতর দিয়ে গোল গোল সীসের গুলি ফট ফট করে লাগত বেদীতে—দেশ-শত্রু জাতশত্রু ইংরেজদের গায় আর সঙ্গে সঙ্গে কবির সে কী উল্লাস! এ সকল 'ছেলে খেলার' ভিতর দিয়েও কবির ভবিষ্যতের জন্য মানসিক প্রস্তুতিটি আমাদের নিকট লক্ষণীয় হ'য়ে ওঠে।

৬.

পাঠ্যাবস্থায় কিছুদিনের জন্যে হ'লেও নজরুল এক গার্ড সাহেবের বাবুর্টি হ'য়েছিলেন। ঘটনাটি কম কৌতুককর নয়। কয়লাকুঠির দেশ রাণীগঞ্জ। ব্রাঞ্চ লাইনে কয়লা ভর্তি বগি বিক্ষিপ্ত ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। সাইডিং লাইনে ইঞ্জিন দিয়ে সেগুলিকে জুড়ে মেন লাইনে পৌঁছে দেওয়াই ছিল গার্ড সাহেবের কাজ। একদিন শীতের রাতে গার্ড সাহেব সেই কাজ করতে করতে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন একটি অর্জুন গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে। ঠিক ঐ গাছটির নিম্নে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নেবার আরও একটি কারণ ছিল। অদূরে ফাঁকা মাঠে বসেছে একটা গানের আসর। ঝুমুরের সুরে কবি গান। গার্ড সাহেব সুরে আকৃষ্ট হ'য়ে দেখলেন একটি বলিষ্ঠ কিশোর সমগ্র আসরটাকে যেন সুরে সুরে আবিষ্ট করে রেখেছে। পর পর কটা গান গেয়ে আসর ছেড়ে উঠতেই সবাই হা হা

করে উঠল, আর একটা গান গাও। ছেলেটি কেবল গান গায় না—গান রচনা করে। তার গান নিয়েই আসর জমজমাট। কিন্তু সকলের শত অনুরোধ উপেক্ষা করে কিশোর বালক বাড়ীর পথে পা বাড়াল। পথে গার্ড সাহেব তাকে ধরে জানল যে ছেলেটির নাম নজরুল। সেই গার্ড সাহেব বল্‌ল একটা কাজ করবে? নজরুল জিজ্ঞেস করল, কি কাজ? গার্ড সাহেব জানাল, আমায় গান শোনাতে হ'বে। নজরুল সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে গেলেন। সেই মুহূর্ত হ'তেই তিনি এই নতুন চাক্‌রীতে বহাল হ'য়ে গেলেন। গান শোনানোর জন্যে কাজ পেলেন নজরুল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাজ হ'লো রেল ষ্টেশন থেকে মাতাল সাহেবকে নিয়ে প্রতিদিন রাত্রে দেড় মাইল হেঁটে প্রসাদপুরের বাংলোয় পৌঁছে দেওয়া, দ্বিতীয় কাজ হ'লো প্রতিদিন টিফিন নিয়ে ষ্টেশনে সাহেবের কাছে দেওয়া আর তৃতীয় এবং বিশেষ কাজ হ'লো একদিন অন্তর আসানসোলে গিয়ে বিলিতি মদ কিনে আনা।

ক'দিন কাজ করার পর নজরুল বুঝলেন এখানে টিঁকে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। আনুসঙ্গিক অন্যান্য কদর্য বিষয়গুলির সঙ্গে পরিচিত হ'য়েই নজরুল সে কাজ ছেড়ে দিলেন। এ কাজে নজরুল বহাল ছিলেন মাত্র দু'মাসের মত।

এত হৈ-হুল্লোড় এবং পড়াশুনায় এত বাধা সত্ত্বেও প্রতিটি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করতে কবিকে কোন বেগ পেতে হয়নি। একবার তিনি ডবল প্রমোশন পেয়ে সেকেণ্ড ক্লাসে উঠেছিলেন। কোন কোন পুস্তকের নজরুল-জীবনী অংশে কবিকে অত্যন্ত সাধারণ মেধার ছাত্র হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তিনি যে অধিকাংশ বার পরীক্ষায় ফেল করতেন একথা সাড়ম্বরে উল্লেখিত হয়েছে। বলাবাহুল্য এমত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। একটি চিঠিতে কবি লিখেছেন, "বরাবরই আমি ক্লাসে ফার্ষ্ট হতাম।" ছাত্র-জীবনের বন্ধু এবং প্রত্যক্ষদর্শী শৈলজানন্দের লেখাতেও কবির এ মন্তব্যের সমর্থন মেলে। কবি হয়ত নিয়মিত ক্লাসে

যেতেন না, এমন কি সকল পাঠ্যপুস্তক তিনি কোনবারই সংগ্রহ করতে পারেন নি, কিন্তু পরীক্ষায় প্রতিবারই প্রথম স্থান অধিকার করেছেন।

৭.

এখানে একটি মজার ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

শৈলজা-নজরুলের একজন বন্ধু ছিল নাম দ্বারকা। ব্যবসায়ী বংশের ছেলে—বড়লোক। কিন্তু বিদ্যা-বুদ্ধিতে সে ছিল নিতান্ত গোবেচারা। এমন কী একটি সদ্য বিবাহিত। বড়লোকের ফুটফুটে সুন্দরী কন্যা বাপের বাড়ী থেকে চিঠি লিখেছে—সেই চিঠির জবাব লিখে দিতে হবে। দ্বারকা লেখার একখানি কাগজ সঙ্গে এনেছিল—যার এক কোণে সুন্দর একটি পাখি আঁকা, পাখির ঠোঁটে একটি খাম এবং তাতে লেখা ঃ

যাও পাখী বোলো তারে
সে যেন ভোলে না মোরে।

শৈলজা এবং নজরুল দু'জনেই কাগজটি দেখলেন! দেখা শেষ হ'লে কাগজটি শৈলজাবাবুর হাতে দিয়ে নজরুল বললেন, এর নীচেয় লিখে দাও—

চিঠিখানা লিখে দেছে শৈল,
বোলো না কাউকে যেন এ-দিব্যি রইল।

বলেই দু'বন্ধু সমস্বরে হেসে উঠ্‌লেন।

শহরের অলিতে গলিতে দেওয়ালে পাঁচিলে নতুন পোষ্টারের ছড়াছড়ি। বাঙ্গালীর ছেলেকে যুদ্ধে যেতে হবে, বেঙ্গলী রেজিমেণ্টে যোগ দিতে হবে। চারদিকে তার আহ্বান।

সামনে কোয়াটার্লি পরীক্ষা (প্রি-টেষ্ট বা টেষ্ট পরীক্ষা নয়)। নজরুল সিদ্ধান্ত করে ফেললেন যুদ্ধে যাবেন। সে সিদ্ধান্তের কথা জানালেন শৈলজাবাবুকে। শৈলজাবাবু একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। পরীক্ষা না দিয়ে যুদ্ধের খোঁজ-খবর নেওয়া তাঁর কাছে ভাল মনে হ'লো না। পরীক্ষা না দিলে সে সংবাদ বাড়ীতে পৌছবে এবং তার ফল কোনক্রমেই মঙ্গলজনক হ'বে না। শেষ পর্যন্ত শৈলজাবাবু গড়িমসি করে পরীক্ষায় বসলেন—নজরুলদের স্কুলে তখনো কোয়াটার্লি পরীক্ষার তারিখ ঘোষিত হয়নি, ফলে তাঁর পক্ষে আর পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হ'লো না। শৈলজা-বাবুর পরীক্ষা শেষ হ'তেই একদিন পরিষ্কার জামা-কাপড় পরে আসানসোলে হাজির হলেন দুই বন্ধু। কোর্টে গিয়ে দেখা করলেন এস, ডি, ওর সঙ্গে। বললেন যে, তাঁরা যুদ্ধে যোগ দিতে চান। দুই তরুণের অভিপ্রায়ের কথা শুনে এস, ডি, ও ভারি খুশী। জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রয়োজনীয় সকল কিছুই তিনি একটি কাগজে লিখে নিলেন। শেষে বললেন, আমি একটি চিঠি লিখে দিচ্ছি। এই চিঠি নিয়ে তোমাদের যেতে হ'বে কলকাতায়। সেখানকার নির্বাচন হ'য়ে গেলে কাজের ভার নিয়ে তোমাদের সর্ব প্রথম করাচীতেই যেতে হবে।

এস, ডি, ও-র চিঠি নিয়ে দু'বন্ধু বাসায় ফিরলেন। এমন ব্যাকুল সাগ্রহ যে ওর সইছে না। যথা নির্দিষ্ট সময়ে কলকাতার

রিক্রুটিং অফিসারের সামনে হাজির হ'লেন দুই বন্ধু—বাংলা দেশের দুই নওজোয়ান। হেদোর উত্তর দিকের লাল রং-এর বিরাট বাড়ীটি ছিল রিক্রুটিং অফিস। যথাসময়ে পরীক্ষা আরম্ভ হ'লো। সামান্য পরীক্ষা—উচ্চতা, ওজন আর বুকের ছাতির মাপ ছিল প্রধান। নজরুল সব কটিতে সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে গেলেন কিন্তু শৈলজাবাবুর বুকের ছাতি আধ ইঞ্চি কম হয়ে যাওয়ায় আন্‌ফিট হ'য়ে গেলেন। যুদ্ধে যাওয়ার সাধ তাঁর চিরদিনের জন্য এখানে মিটে গেল।

নজরুল চলে গেলেন যুদ্ধে। প্রথমে লাহোর পার হয়ে তিন মাসের ট্রেনিং-এর জন্যে গেলেন নৌশোরা। তারপর গেলেন করাচী। দুই বন্ধুর মনের আশা-আনন্দের লেনদেন হয় চিঠিতে। শৈলজানন্দের পাশের সংবাদ যথাসময়েই পেলেন নজরুল। তার উত্তরে লিখলেন, "তোমাকেও একটা আনন্দের খবর দিই। এখান থেকে কলকাতায় কয়েকটা কাগজে গল্প পাঠিয়েছিলাম। একটাও ফিরে আসেনি। সব ছাপা হ'য়ে গেছে। 49th Regiment-এর একজন বাঙালী সৈনিক করাচী ক্যান্টনমেন্ট থেকে লেখা পাঠাচ্ছে দেখে বোধহয় ভয়েই ছেপে ফেলেছে। এন্তার লিখছি এখানে বসে বসে।"

এর কিছুদিন পরেই তিনি একটি চিঠিতে জানাচ্ছেন, "আমি 'লান্স নায়েক' হয়েছি" এবং আর কিছুদিন পরের চিঠিতে লিখছেন, "এখন আমি 'ব্যাটালিয়ান কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার' হয়েছি।' ধাপে ধাপে পদোন্নতি। বেঙ্গলী রেজিমেণ্টে আপন কর্মদক্ষতার গুণে নজরুল যে বিশেষ সুনামের অধিকারী হয়েছিলেন সে কথাই বলা-বাহুল্য।

বেঙ্গলী রেজিমেণ্টে থাকার সময় নজরুল এককালীন সাত দিনের ছুটি পেয়েছিলেন। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় তখন কাশিম-বাজার মহারাজের পলিটেকনিক ইন্‌স্টিটিউটের শর্টহ্যাণ্ড টাইপ

রাইটিং-এর ছাত্র। শৈলজানন্দ যে বাগবাজারের এই স্কুলে ভর্তি হ'য়েছেন এবং হোস্টেলে থাকেন সে'কথা নজরুল জেনেছেন। এই নতুন ঠিকানায় চিঠিপত্রেরও আদান-প্রদান হ'য়েছে। মাস খানেক নীরব থাকার পর "হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায় দেখি, একটা রিক্সায় চড়ে নজরুল এসে হাজির। চমৎকার চেহারা হ'য়েছে—নজরুলের মাথায় চুল রেখেছে, বুকের ছাতি হ'য়েছে চওড়া, পায়ে বুট জুতো, খাকি প্যান্ট, খাকি সার্ট—মানিয়েছে সুন্দর। পাশ বালিশের মত একটা ব্যাগ কাঁধে নিয়ে দোতলায় উঠে এলো।"

অনেকদিন পর দেখা। দুই বন্ধু আলাপে ভেঙে পড়লেন। কত দিনের কত কথা। একদিন তাঁরা ৩২নং কলেজ স্ট্রীটে "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার অফিসে এসে জনাব মুজফ্ফর আহমদের সঙ্গেও দেখা করে গেলেন। এই ছুটিতে ক'দিনের জন্য দেশের বাড়ীতেও গিয়েছিলেন। তারপর বর্ধমান থেকে সোজা চলে গিয়েছিলেন পল্টনে।

করাচিতে গিয়ে মাসখানেক পর একটি চিঠি দিলেন শৈলজানন্দকে। তা'তে জানালেন যে তাঁদের পল্টন ভেঙে দেবার কথাবার্তা চলছে। শৈলজাবাবু উত্তরে সোজা কলকাতায় চলে আসার উপদেশ দিলেন। জনাব মুজফ্ফর আহমদকে কবি একই কথা জানালেন—তিনিও কবিকে কলকাতায় আসার উপদেশ দিলেন।

পল্টন ভেঙে যেতে কবি সত্যসত্যই কলকাতায় চলে এলেন। এসে উঠলেন শৈলজাবাবুদের হোস্টেলে। বর্তমানে যেটি মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ হ'য়েছে ঐ বাড়ীটিই ছিল পলিটেকনিকের হোস্টেল। ক'দিন খুব আনন্দে কেটে গেল। কিন্তু দর্শনশাস্ত্রের একটি বড় সত্যকথা এই যে কোন আনন্দই চিরস্থায়ী নয়।

হোস্টেলে একটি ব্যাপার ঘটে গেল। সকলে কেমন করে জেনে ফেলেছে নজরুল মুসলমান এবং এই সামান্য ঘটনা নিয়ে

হুলস্থূল কাণ্ড। হোস্টেলের হিন্দু আবাসিকগণ দুই বন্ধুর ওপর দারুণভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠ্‌লেন। নজরুল ঘটনাটিকে অবশ্য আর বাড়তে দেন নি। সেদিনই গাঁটুরি-বোচকা নিয়ে এসে উঠলেন ৩২ নং কলেজ স্ট্রীটে—"বঙ্গীয় মুসলমান সমিতি'র অফিসে। সমিতির একমাত্র কর্মী জনাব মুজফ্‌ফর আহমদ অত্যন্ত আপনজনের মত নজরুলকে গ্রহণ করলেন। তিনি যেন এই বাঞ্ছিতজনের প্রতীক্ষায় বসেছিলেন। অবশ্য এরপর থেকে নজরুল-জীবনে নব-দিগন্তের সাড়ম্বর সূচনা হ'য়েছিল।

নজরুল হোস্টেল ছেড়ে নিজের সম্মান রক্ষা করলেন—কিন্তু শৈলজাবাবু নিষ্কৃতি পেলেন না। মুসলমান বন্ধুকে হিন্দু হোস্টেলে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে বন্ধুর সঙ্গে তাঁকেও হোস্টেলের পবিত্রতা রক্ষার জন্য হোস্টেল ত্যাগ করতে হলো। তিনি এসে উঠলেন কুড়ি নম্বর বাদুড়বাগান রো-তে।

৯.

দুই বন্ধুর জীবন সমসূত্রে গ্রথিত হ'য়ে গিয়েছিল। জীবনের সকল সুখ-দুঃখ তাঁরা এইভাবে একে অপরের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছিলেন! ঠিক এ ধরণের অন্তরঙ্গতা আজকালকার দিনে ক্রমবিলীয়মান হ'য়ে উঠেছে। এই হৃদ্য সম্পর্কের অনবদ্য রূপ আর একটি ঘটনায় অপূর্বগরিমা লাভ করেছে। ঘটনাটি এই:

উপার্জ্জন নেই এক পয়সাও অথচ নজরুলের টাকার প্রয়োজন। থাকেন তখন মুজফ্‌ফর সাহেবের আস্তানায়, কিন্তু তাঁকে তিনি একথা বল্‌তে পারলেন না, বলতে সংকোচ হ'ল। কেননা যেদিন তিনি বত্রিশ নম্বরে এসে ওঠেন সেদিনই বেশ কিছু টাকা পয়সা খরচ করে

মুজফ্‌ফর সাহেব মশারী, বিছানার চাদর ইত্যাদি কিনে দিয়েছিলেন। কবির তখন একমাত্র অন্তরঙ্গ বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, যাঁর কাছে তিনি অকপটে সকল প্রয়োজনীয়, গোপনীয় কথাটি হৃদয় খুলে বলতে পারেন। বলার সঙ্গে সঙ্গে হয়তো কোন সুরাহা হবে না, এ কথা নজরুলও জানতেন। শৈলজাবাবুরও তখন সম্বল মাত্র ত্রিশটি টাকা' দেশ থেকে তাঁর দাদামশায় মানি-অর্ডার যোগে পাঠালে তবে তাঁর হাত দরাজ হয়, নইলে বাঁধা। তবুও নজরুল কথাটি শৈলজাবাবুকে বললেন। সকল কথা শোনার পর দুই বন্ধুতে নানা রকম পরামর্শে মেতে গেলেন। দুষ্ট বুদ্ধিও মাথায় আসতে বিলম্ব হ'ল না। ঠিক হ'ল বড় মামার নিকট টেলিগ্রাম করা হ'বে। দাদামশায়ের নিকট টেলিগ্রাম করতে তাঁর ঠিক ভরসা হ'লো না। শৈলজাবাবুর বড় মামা শ্রীধরণীমোহন চট্টোপাধ্যায় তখন থাকেন উখরা রাজ ষ্টেটে। সেখানেই টেলিগ্রাম করা হ'লো। টেলিগ্রাম ভাষা এই—"আমি টাইফয়েডে আক্রান্ত' টাকা পাটান—শৈল।" আকাঙ্খিত বস্তুটি তার পরদিনই টেলিগ্রাম মনি অর্ডার যোগে এসে হাজির। ত্রিশটি টাকা পাঠিয়েছেন ধরণীবাবু। সেই টাকা নিয়ে দুই বন্ধু মহা খুশী। সারাদিন আর মেসে দেখা গেল না কাকেও। নজরুল তাঁর প্রয়োজনীয় অংশটি পেয়েছেন এবং অবশিষ্টাংশ ক্ষয় হচ্ছে হৈ-হুল্লোড়ে। সন্ধ্যেবেলা মেসে ফিরে শৈলজাবাবুর চক্ষু স্থির, মেসের দরজায় বসে ফণি, হাতে মাগুর মাছের ভাঁড়—টাইফয়েডাক্রান্ত ভাগ্নার পথ্যের জন্যে উখরা স্টেট থেকে পাঠিয়েছেন ধরণীবাবু। পরের লাঞ্ছনা-ভরা ঘটনাগুলির উল্লেখ বাহুল্য মাত্র! সেগুলি কল্পনা করতে আমাদের কোন অসুবিধা নেই। বন্ধুর সাথে নিজের জীবন এমন অবিচ্ছেদ্য ভাবেই জড়িয়ে গিয়েছিল।

বত্রিশ নম্বরে থাকাকালীন নজরুল স্বনাম ধন্য হ'য়ে উঠেছিলেন। অনেক কবি সাহিত্যিক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন, অনেকের আহ্বানে কবিও যেতেন তাঁদের কাছে। অবশেষে এল সেই বাঞ্ছিত আহ্বান—জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে কবিগুরু ডেকেছেন নজরুলকে। নজরুলের কবিতা পড়ে তিনি বিশেষ রূপে তৃপ্তি লাভ করেছেন। কবি-গুরুর সে ডাক বয়ে নিয়ে এসেছেন গিরিজা বোস, উচ্চপদস্থ রাজ কর্ম্মচারী— বেঁটে-খাঁট মানুষটি। প্রথমে কিছুটা সঙ্কুচিত হলেন তারপর যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হলেন নজরুল। একা গেলেন না—সঙ্গে নিলেন শৈলজানন্দ এবং পবিত্রবাবুকে। তিনজনে রওনা হলেন জোড়াসাঁকোর দিকে। নজরুলের আগমন-সংবাদ পেয়ে কবিগুরু ডেকে পাঠালেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুল এবং শৈলজানন্দের এই প্রথম সাক্ষাৎকার। কবি অনেকক্ষণ ধরে কিশোর কবির দিকে তাকিয়ে থাকলেন, তারপর বললেন, বস। নানাবিধ আলাপ-আলোচনার পর তিনি বললেন, তোমার গানের তারিফ শুনেছি—গান গাও দেখি একটা। নজরুল প্রথম আরম্ভ করলেন একটি রবীন্দ্র-সংগীত—"যদি বারণ কর তবে আসিব না।' গুরুদেবের পায়ে নজরুলের এই প্রথম শ্রদ্ধাঞ্জলি—গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা। প্রথম গানেই কবিগুরু তন্ময়। নজরুল মধুর কণ্ঠ গায়ক নন—অথচ গান থামলেই কবি দ্বিতীয় গানের নির্দেশ দেন। আবেগ, আকূতি এবং আন্তরিকতা নজরুলের প্রতিটি গানে এমন ভাবে মিশে থাকত যে শ্রোতারা এ তিনের আবেষ্টনীতে জড়িয়ে জড়িয়ে সম্মোহিত হ'য়ে পড়তেন। কবিগুরুর নির্দেশে নজরুল একে একে কয়েকটি গান গাইলেন—রবীন্দ্র-সংগীত, স্বরচিত গান এবং কিছু ঝুমুর। গান শেষ হলে নজরুল অনুরোধ জানালেন "এবার আমরা আপনার

গান শুনব।" শিষ্যের সে প্রাণের দাবীকে কবি উপেক্ষা করতে পারলেন না। খালি কণ্ঠে একটি গান গাইলেন—বলাবাহুল্য স্বরচিত গানের পালা শেষ হ'লে কবিগুরু বললেন' "তুমি তো চারণ কবি,' চল আমার শান্তিনিকেতনে, স্বাধীনভাবে থাকবে আর লিখবে।" জাত-বোহিমিয়ান নজরুল, বন্ধনের কাছে ধরা দিতে চাইলেন না—কথা শুনে একবার শৈলজার দিকে তাকালেন তারপর চুপ করে রইলেন। কবিগুরু অবস্থাটা উপলব্ধি করে বললেন, আচ্ছা তুমি ভেবে দেখ, পরে জানিও।' বাইরে এসে শৈলজাবাবু শান্তিনিকেতনে যাওয়ার জন্য জিদ করলেন কিন্তু নজরুলের ঐ এক কথা—'দূর! বেশ আছি। ওঁর কাছে গেলে আমি হাঁফিয়ে মরে যাব।'

১১.

শৈলজানন্দের গল্প প্রথম সিনেমা হ'চ্ছে, তিনি তো খুশীতে মশগুল। কিন্তু এই আনন্দের দিনেও চাই নজরুলকে। ডাক পড়ল নজরুলের, তিনি হ'বেন এ বইয়ের মিউজিক ডাইরেক্টর। সবই আকস্মিক যোগাযোগ। বিষয়টা গুছিয়ে বলা দরকার।

শৈলজানন্দ তখন নানান মাসিকে গল্প লিখে চলেছেন। হঠাৎ একদিন শিশিরকুমার ভাদুড়ি মহাশয়ের ভাই তারাকুমার ভাদুড়ি বললেন, 'কী এমন গল্প লিখেছ একটা যে কালী ফিল্মসের প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী মশায় পর্যন্ত তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছেন।'

সংবাদটি শৈলজানন্দকে ভাবিয়ে তুলল, কোন মাসিকে প্রকাশিত কোন গল্পের জন্য যে তিনি এই প্রশংসা পাচ্ছেন তা তিনি বুঝতেই পারলেন না। সাত-পাঁচ চিন্তায় দিন কাটছে এমন সময় একদিন হঠাৎ কালী ফিল্মস্ থেকে একটি চিঠি এলো, টালিগঞ্জের স্টুডিওতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য লিখেছেন গাঙ্গুলী মহাশয়।

যথাদিনে স্টুডিওতে প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হ'ল শৈলজানন্দের। বললেন, 'আপনার 'পাতালপুরী' গানটি আমি চাই। কী নেবেন ওর জন্যে?'

পাঁচ শো টাকায় রফা হয়ে গেল।

কথা উঠ্‌ল 'পাতালপুরী'র সঙ্গীত সম্পর্কে। বল্‌লেন, 'কাহিনী ঠিক হ'লো কিন্তু গান—গান দেবে কে?'

শৈলজাবাবু সানন্দে ঘোষণা করলেন বন্ধু কাজী নজরুল ইস্‌লামের নাম। শুধু তাই নয়, বললেন—'এ বইয়ের একমাত্র যোগ্যতম সঙ্গীত পরিচালক।' এর পরের বিবরণটি সুসাহিত্যিক শৈলজানন্দের ভাষাতেই লিপিবদ্ধ করি:…"চলে আসবার সময় আবার তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'এই লোকটি গান-টান লিখতে পারে তো?'

হেসেছিলাম মনে মনে। কবি এবং সুরশিল্পী বলে নাম তখন তার ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। কিন্তু বালিগঞ্জের স্টুডিও মহলে সব খবরই তখন একটু দেরীতে পৌছোতো।

সে যাই হোক, সেই দিনই নজরুলকে বললাম গিয়ে খবরটা। আমার প্রথম ছবি, নজরুল হ'বে তার প্রথম মিউজিক ডিরেক্টর। সংবাদটা আনন্দের।

নজরুল তখন একটা গাড়ী কিনেছে। বাড়ীটা নিজের নয় কিন্তু গাড়ীটা নিজের। …নতুন ষ্ট্যাণ্ডার্ড গাড়ীখানা দোরে দাঁড়িয়ে আছে। বল্‌লে, 'রথ তো তৈরী। চল এখুনি যাই স্টুডিওতে।'…গাড়ী চললো টালিগঞ্জের দিকে।

প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী আর সাউণ্ড ইঞ্জিনিয়ার মধু শীল। পরিচয়ের পরই প্রথম কথা, 'আপনাকে কি দিতে হবে বলুন। নজরুল বল্‌লে, 'একটি হারমোনিয়াম।' বলেই হো হো করে তার সেই চিরাভ্যস্ত হাসি! বল্‌লে, 'টাকা পয়সা যা ভাল বুঝবেন দেবেন। আমি আগে গানের সুর দিই।'

এই বলে নজরুল হাত বাড়ালো আমার দিকে, 'দাও, গান দাও।'

গান আমি কোথায় পাব? বললাম, 'গান তোমাকে লিখে নিতে হ'বে।'...

গান-পাগলা নজরুল। সেই দিনই বসে পড়লে হারমোনিয়াম নিয়ে। হারমোনিয়াম, একটা খাতা আর একটা পেন্‌সিল। সাঁওতালী গানের চলতি সুর নিয়ে গুন্‌ গুন্‌ করে, হারমোনিয়াম বাজায় আর নজরুল বলে, 'নাঃ হ'চ্ছে না। সব একঘেঁয়ে সুর। এ সুর ছবিতে দাঁড়াবে না।'

দাঁড়ালো না শেষ পর্যন্ত। আমি তো খুব ভাবনায় পড়ে গেলাম। বড় মুখ করে নজরুলকে নিয়ে এসেছি, মান-সম্ভ্রম বুঝি-বা গেল!

দিন দুই পরে নজরুল একদিন ছুট্‌তে ছুট্‌তে আমার বাড়ীতে এসে হাজির। হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌লে, 'পেয়েছি। তোমার এখানে হারমোনিয়াম থাক্‌লে শুনিয়ে দিতাম। চল ষ্টুডিও।'

নজরুলের ষ্টাণ্ডার্ড চলেছে টালিগঞ্জের দিকে। পেছনের সিটে আমরা মাত্র দু'জন। নজরুলের তখন তন্ময় অবস্থা। সারা রাস্তা চললো গুন্‌ গুন্‌ করে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে। সুর ভাঁজে, হো হো করে হাসে আর তেহাই মারে আমার পায়ের ওপর।...

সুরের যাদুকর নজরুল সাঁওতালী সুরের একঘেয়েমী কাটাবার জন্যে এক নতুন সুরের সৃষ্টি করে বসলো। রাঢ় বাংলার প্রচলিত ঝুমুরের সুরের সঙ্গে মিশিয়ে দিল সাঁওতালী ঢং। সম্পূর্ণ এক অভিনব সুরের স্বপ্নজাল বিস্তার করে যে-গানটি সেদিন সে আমাকে গেয়ে শোনালো—সেইটেই হ'লো 'পাতালপুরী' ছবির প্রথম গান। সে-সুরে ছিল বাংলার মাটির গন্ধ, সে সুরে ছিল এক বিচিত্র আস্বাদ!

নতুন ঝুমুরের জন্ম হ'লো সেইদিন। জন্ম হ'লো কালী ফিল্মস্‌ (এখন টেকনিসিয়ান ষ্টুডিও) ষ্টুডিওর পুরানো সেই 'হলঘরে'। সে ঘরখানি এখন আর নেই। 'পাতালপুরী'র জন্যে আট-খানি গান লিখল নজরুল। তার সহকারীর কাজ করল কমল দাশগুপ্ত।...

এই ছবি করতে গিয়ে সিনেমার নেশায় আমাকে পেয়ে বসল। আর নজরুলের হ'লো জয় জয়কার।

নবাবিষ্কৃত ঝুমুরের সুরে তখন সে মশগুল! গ্রামোফোন কোম্পানীর চিৎপুরের 'বিষ্ণুভবনে' বসলো তার গানের আসর। ক্রমাগত রচনা করতে লাগল ঝুমুর গান, আর নানান শিল্পীর কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগলো তার সেই অবিস্মরণীয় সুরের ঝঙ্কার। বাংলার আকাশে-বাতাসে এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে তার সেই প্রাণ-মাতানো অবিস্মরণীয় কীর্তি।

কিন্তু সেই সুরজাদুকর স্রষ্টা শিল্পী আজ নীলকণ্ঠের মত নিঃশব্দ-চারী নির্বাক। আগে মনে হ'তো এ বুঝি বিধাতার অবিচার। এখন মনে হয়—বুঝি ভালই করেছ ভগবান!

যুগের হাওয়া বইছে এলোমেলো! আত্মম্ভরিতার বৃথা দম্ভে দিনে দিনে যেন বাসের অযোগ্য করে তুলছি এই চিরানন্দময় মাতৃভূমিকে। চারিদিকে দেখি স্বার্থসর্বস্ব পরশ্রীকাতর চরিত্রহীন মানুষের মিছিল! এই মরামানুষের শ্মশানভূমিতে প্রেতনৃত্য দেখার চেয়ে নীরব নির্বিকার বিষ-জর্জর নীলকণ্ঠের মত আত্মসমাহিত হ'য়ে থাকাই ভালো!'

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য 'পাতালপুরী'তে সঙ্গীত পরিচালনার জন্য নজরুল পেয়েছিলেন মাত্র পঞ্চাশটি টাকা। তাতেই খুশী নজরুল। অর্থলোলুপতা তাঁর কোন দিনই ছিল না। আর তাঁর বড় দুর্বলতা এই ছিল যে কারো কাছে মুখ ফুটে তিনি কোনদিন কিছু চাইতে পারতেন না।

'পাতালপুরী'র একটি দৃশ্যে নজরুলকে দেখাও গিয়েছিল। তাঁর প্রদত্ত সুর কিছুতেই তুলতে পারছিল না সাঁওতাল যুবক-যুবতীরা। তাই ক্যামেরার দিকে পিছন ফিরে হারমোনিয়াম নিয়ে বসতে হ'য়েছিল নজরুলকে। অনেকেই মনে করেন এবং প্রচার করেন যে, নজরুল 'পাতালপুরী'তে অভিনয় করেছিলেন কিন্তু কথাটা সত্য নয়।

হৃদয়ের নৈকট্য, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর মমতা তথ্য দিয়ে আংশিক বোঝান যেতে পারে কিন্তু অধিকাংশ হৃদয়-নির্ভর, উপলব্ধির সামগ্রী। নজরুল-জন্মতিথিতে গিয়ে শৈলজাবাবুকে কাঁদতে দেখেছি, এই তথ্য বর্ণনার সময় বার বার তাঁর চোখ অশ্রুসজল হ'য়ে উঠেছে।

এবং সে সজল অশ্রু আমি নিজে দেখেছি যা' আর কোথাও পাইনি ॥

নিতাই ঘটক

১.

ঐতিহাসিক অনশন ভঙ্গ ও কারাবাসের পর কবি বহরমপুর ডিষ্ট্রিক্ট জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন। কারামুক্তির পর তিনি উঠেছেন ডক্টর নলিনাক্ষ সান্যালের বাড়ীতে। কবির আগমনে বহরমপুর শহরটা তেতে উঠ্ছে। সমগ্র শহরে আলোড়ন আর উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ছে। দলে দলে আবালবৃদ্ধবনিতা আসছে কবিকে দেখতে। সেই দলে এলেন নিতাই—নিত্যানন্দ ঘটক। নয়-দশ বছরের বালক। ২৪ পরগণা জেলার বিখ্যাত গোবরডাঙ্গার ঘটক পরিবারের সকলে তখন বহরমপুরে থাকতেন।

নয়-দশ বছরের এক কিশোর বালক দু'চোখে ভরা বিস্ময় নিয়ে দেখলেন কবিকে, ডাঃ সান্যালের বাড়ীতে এক গানের জলসায়। মাথা দুলিয়ে আবেগ-তন্ময় কবি গান গাইছেন। সে দিন-ই কিশোর বালকের মনে ইচ্ছা জাগল, কবির কাছে গান শিখতে হ'বে। ঠিক ঐ রকম মাথা দুলিয়ে আবেগভরে গান না গাইতে পারলে জীবনটা অর্থহীন—অন্ততঃ সেদিন বালকের কাছে তাই মনে হ'য়েছিল।

কিছুদিন পর কবি বহরমপুর থেকে চলে এলেন। তারপর বালকের আবেগও অনেকখানি থিতিয়ে এলো। কেবল মাঝে

যাকে মনে হ'তো গান শিখ্‌তে হ'বে এবং তা' কবির নিকটেই। কিন্তু কবিকে পাওয়া যাবে কোথায়?

বেশ ক' বছর পর সুযোগ মিলে গেল। কবি তখন কলকাতার রাধানাথ রোডে থাকেন। ঘটক পরিবারের সকলেও বহরমপুর থেকে এসেছেন কলকাতায়। বহরমপুরে থাক্‌তে কবির আলাপ হয় উমাপদ ভট্টাচার্য (ছোট-বড় সকলের প্রিয় ফেন্‌-দা) মহাশয়ের সঙ্গে। তিনিও বহরমপুর থেকে এসেছেন কলকতায়—আস্তানা গেড়েছেন ৬০, গোপীমোহন দত্ত লেনে। এই বাড়ীতে তখন প্রায়ই গানের জল্‌সা বসৃত—সে জলসার সম্রাট নজরুল। নামকরা এবং বহু 'হবু' গায়ক-গায়িকারাও এসে ভীড় জমাতো। পাশাপাশি বাড়ী—নিতাইবাবুও এলেন। গায়ক হিসেবে তিনি তখন কিছু নাম করেছেন। একদিন জল্‌সার শেষে কবি এবং অন্যান্যরা তাঁদের গায়ত্রী বৌদির (উমাপদ ভট্টাচার্য ওরফে ফেন্‌-দার স্ত্রী) হাতের বিখ্যাত তেলে ভাজার সদ্ব্যবহার করছেন (এই বিখ্যাত তেলেভাজা ছিল জলসার অন্যতম আকর্ষণ)—পায় পায় এগিয়ে এলেন নিতাইবাবু। ফেন্‌-দাই নিতাইবাবুর সুরেলা কণ্ঠের প্রশংসা একটু বেশী করেই কবির নিকটে প্রকাশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গেই ফল ফল্‌লো। কবি নিতাইবাবুর গান শুনতে চাইলেন। একটি গান গাইলেন তিনি, গানটি কবির বেশ ভাল লাগল। কবি পরের দিনই বাড়ীতে ডেকে পাঠালেন নিতাই বাবুকে। যথাসময়ে গেলেন তিনি। কবি দু'টি গান দিলেন এবং ক'দিন তালিম দিয়ে তার সুরও শিখিয়ে দিলেন। সব দিক ঠিক হ'য়ে গেলে মেগাফোন কোম্পানীতে রেকর্ড করারও ব্যবস্থা করে দিলেন। কবি তখন গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এক পুণ্য প্রভাতে গ্রামোফোন রেকর্ডে নিতাই ঘটকের কণ্ঠ শোনা গেল:

ক॥ তোমার কুসুম বনে আমি আসিয়াছি ভুলে—

খ ॥ চোখের নেশায় ভালবাসা সে কি কভু থাকে গো—

নিতাই বাবুর প্রথম রেকর্ড এই। ১৯৩০ সালের কথা।

এরপর নিতাইবাবু কবির অন্যতম শিষ্য হয়ে কায়ার পিছনে ছায়ার মত সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছেন। একসঙ্গে অভিনয় করেছেন; সহ-সংগীত পরিচালক হয়ে "ধ্রুব" বইতে সংগীত পরিচালনা করেছেন। কবির বহু সুখ-দুঃখের সঙ্গে তিনি জড়িয়ে আছেন। বহু দিনের বহু কথা, বহু স্মৃতি!

নিতাইবাবুর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ কয়েকটি ঘটনার কথা আমরা নিম্নে বিবৃত করলাম।

২.

কবির একটি বড় গাড়ী ছিল—'ক্রাইস্‌লার'। ড্রাইভারের নাম ছিল চণ্ডী। চণ্ডী ছিল কবির বড় প্রিয় ও অনুগত আর গাড়ীটি ছিল চণ্ডীর অনুগত। এই গাড়ীকে পাশ কাটিয়ে অন্য গাড়ী চলে যাক্ এ চণ্ডী চাইতো না আর এমন একটা ব্যাপার কবি গাড়ীতে বসে সহ্যই করতেন না। একদিন ভবানীপুরের হরিশচন্দ্র মুখার্জী রোড থেকে জয়শ্রী নাম্নী এক ছাত্রীকে (নিতাই বাবুর ছাত্রী) গান শিখিয়ে বাড়ী ফিরছেন কবি আর নিতাই—চণ্ডী চালিয়ে নিয়ে আসছে গাড়ী। রাত বেড়েছে। পথ বেশ কিছু নির্জন। এস্‌প্ল্যানেডের কাছাকাছি হঠাৎ একটি বুইক গাড়ী দ্রুত পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। সিটে গা এলিয়ে দিয়ে গল্প করছিলেন কবি—হঠাৎ সকল কথা বন্ধ করে দিয়ে সোজা হয়ে বসলেন। দৃষ্টি স্থির হ'য়ে নিবদ্ধ হ'য়েছে সম্মুখের ধাবমান বুইক গাড়ীর দিকে। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই কবি শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে ডাক্‌লেন চণ্ডী! বলাবাহুল্য চণ্ডী এ ডাকের অর্থ ও

ইংগিত বুঝল। গতি বাড়তে বাড়তে উল্কার বেগ পেল এবং মিনিটের মধ্যেই বুইককে পিছনে ফেলে তীর বেগে 'ক্রাইসলার' বেরিয়ে গেল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চীৎকার করে হেসে উঠ্‌লেন। এ হাসির নাম দেওয়া যেতে পারে 'নজরুলী হাসি।' যাঁরা কবির-হাসি শুনেছেন—বিশেষ করে সে হাসি যদি হয় প্রাণখোলা আনন্দের—তাঁরা এই নামের গুরুত্ব এবং মর্মার্থ উপলব্ধি করবেন।

আনন্দের রেশ মিট্‌তে না মিটতেই সেদিন 'ক্রাইসলার' বাড়ীর দরজায় এসে থেমেছিল।

৩.

ক্রাইসলার সম্পর্কিত আর একটি ঘটনা—

একদিন নিতাইবাবু এবং কবি ষ্টুডিও থেকে ফিরছেন। চণ্ডী যথারীতি ষ্টিয়ারিং ধরে আছে। হঠাৎ মোড় ঘুরেই সামনে একজন পথচারীকে দেখতে পাওয়া গেল। হর্ণ বাজল কিন্তু লোকটি নির্বিকার। আবার হর্ণ বাজল, আবার, আবার। লোকটি তবুও নড়ছে না। বিরক্ত হ'লেন কবি। চণ্ডী তো রাগে ফেটে পড়ে আর কি। দ্রুত পেছন থেকে এসে লোকটার পাশে গাড়ী বেঁধে এক চড় কষিয়ে দিল চণ্ডী। কবি মহা খুশী—বেশ হ'য়েছে, একটুও সিভিক জ্ঞান নেই। কবি হেসেই বল্‌লেন, বেশ করেছিস্‌ চণ্ডী।

কিন্তু মুখের কথা মুখে রয়েছে, হঠাৎ কবি গম্ভীর হয়ে গেলেন। চণ্ডীর কানের গোড়ায় মুখ এনে ব্যথাতুর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন: খুব জোরে মারিস নি তো?

চণ্ডী উত্তর না দিয়ে হাসে।

কবি বলেন, গাড়ী থামা।

পিছনের গ্লাস দিয়ে দেখা গেল পথচারিটি সেই স্থানে দাঁড়িয়ে গাড়ীটির দিকে তাকিয়ে আছে।

কবি জিদ ধরলেন গাড়ী থেকে নেমে ওর কাছে যাবেন। শেষে চণ্ডী এবং নিতাইবাবু দু'জনে তাঁকে নিরস্ত করলেন। গাড়ী আবার বেগ নিল কিন্তু কবি গুম্ হ'য়ে গেলেন। বাড়ী পর্যন্ত যেতে তিনি আর একটি কথাও বল্‌লেন না।

৪.

একদিন চিৎপুর রোডে হিজ মাষ্টার ভয়েস কোম্পানীর বিখ্যাত বাড়ী "বিষ্ণুভবনের" রিহার্সাল রুমে গল্প হচ্ছে। কবিকে ঘিরে বসে আছেন অনেক শিল্পী—ধীরেন দাস, আঙ্গুরবালা, নিতাই ঘটক, রঞ্জিত রায় ইত্যাদি। হৈ-হুল্লোড় চল্‌ছে সমানে। কবি কিন্তু নির্বিকার। সেই ভীড়ের মাঝে বসেই তিনি গান রচনা করে চলেছেন। 'হাটে' বসে তিনি কী করে যে মুহূর্তের মধ্যে গান রচনা করতেন সে এক বিস্ময়কর ব্যাপার। সে দৃশ্য যাঁরা দেখেছেন তাঁদের কাছে স্বপ্ন, যাঁরা দেখেননি তাঁদের কাছে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। গান রচনার মাঝে মাঝে তিনি তাঁর অভ্যাসমত 'হাফ কাপ চা' খাচ্ছেন আর বড় ডাবর থেকে (পানের বাটা নয়) এক সঙ্গে দু-তিনটি পান তুলে নিয়ে মুখে দিচ্ছেন, সময় সময় রসিকতায় যোগ দিচ্ছেন। অথচ গান রচনা হ'য়ে যাচ্ছে ঠিকই। বাংলা দেশে এ প্রতিভার সত্যই তুলনা নেই!

যাক্ কবির পান খাওয়া দেখে ধীরেন দাস রহস্য করে বল্লেন, "কাজীদা বড় পানাসক্ত"—অর্থাৎ পান খাওয়ায় আসক্ত।

রহস্যের রস গ্রহণ করে হেসে উঠল সবাই। কবি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, "হ্যাঁ তোমরা যেমন আমার প্রতি বেশ্যাসক্ত"—অর্থাৎ বেশী আসক্ত।

নতুন করে হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল।

৫.

হাসি সম্পর্কে এক মর্মন্তুক কাহিনী—

হাসির প্রতিহাসিকতায় কবির একমাত্র তুল্য প্রতিযোগী ছিল কমিক গান গাইয়ে শ্রীরঞ্জিত রায়। একদিন ঐ রিহার্সাল রুমেই কী একটা কথায় দারুণ হাসির রোল পড়ে গেল। কবি তো হাস্তে হাস্তে লুটিয়ে পড়ার উপক্রম। সেই সঙ্গে যোগ দিয়েছেন হাসির এ্যাটম বোম রঞ্জিত রায়। ক'টা পাগল যেন দমফাটা হাসিতে লুটোপুটি খাচ্ছে। হঠাৎ রঞ্জিত রায় বেদনার্ত কণ্ঠে 'উঃ' বলে সত্যসত্যই লুটিয়ে পড়লেন। মুখে তার হাসি নেই সকলেই মনে করলেন এ আর এক রসিকতা। কিন্তু পরক্ষণেই ভুল ভাঙল। যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করছেন রঞ্জিত রায়। উদ্দাম হাসির চোটে চোখের একটি শিরা ছিঁড়ে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হ'ল। দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা চল্‌ল। কিন্তু নিস্ফল।

হাসির 'এ্যাটোম বোম্‌' হাসির জন্যেই একটা চোখ হারালেন চিরদিনের মত।

এ ঘটনার পর বেশ কিছুদিন বিষ্ণুভবনের "রিহার্সাল" রুম্‌ থেকে হাসি বিদায় নিয়েছিল।

৬.

হোলির দিন আবীর মাখা ছিল কবির বড় আনন্দের।

সমসাময়িকভাবে একটি ঘর থেকে সকল আসবাব পত্র সরিয়ে ফেলা হ'তো। তারপর ছড়িয়ে দেওয়া হ'তো আবীর। কবিকে ধরে এনে নির্মম ভাবে এই আবীর মাখান হ'তো।

৭.

বৈঠকী খেলা-ধূলার মধ্যে কবি দু'টি খেলা বড় ভালবাসতেন—দাবা এবং তাস। গ্রামোফোন কোম্পানীতে সংশ্লিষ্ট থাকার সময় প্রতিদিন সন্ধ্যায় তাস খেলা প্রায় নেশার মত হ'য়ে গিয়েছিল। এই খেলায় অধিকাংশ দিন অংশ নিতেন কবি, কবিজায়া, নিতাই ঘটক, হেমচন্দ্র সোম, কবির শ্যালক, এক ভায়রাভাই এবং আরও অনেকেই। কবি 'ব্রে' খেলাটাই পছন্দ করতেন বেশী। এই খেলার নিয়মানুযায়ী ইস্কাফনের বিবিটি বড় অপয়া তাস। এই তাসটি যিনি পাবেন বেশী পয়েন্ট পেয়ে হারবেন। খেলতে বসে কবি সকল সময় (কখনো কখনো ছলে, বলে, কৌশলে) এই তাসটি কবি-জায়াকে দেবার চেষ্টা করতেন। এবং একবার দিতে পারলে মনে হ'তো তিনি যেন বিশ্বজয় করে ফেলেছেন। পত্নীকে হারিয়ে তার কী উল্লাস! শিশু-সুলভ এ নির্মল হাসিতে আনন্দ উপভোগ করতেন সকলেই।

'ব্রে' ছাড়া অন্য খেলায় কবির পার্টনার হ'তেন কবিজায়া।

৮.

গ্রামোফোন কোম্পানীতে সকল সময় নানাবিধ লোকজন এসে কবিকে বড় বিরক্ত করতেন। অনবরত লোকজন এসে এমন বিরক্ত করতেন যে কোন কিছু লেখা অসম্ভব হয়ে উঠতো। যাঁরা আসতেন তাঁরা চাইতেন কবির সঙ্গে গল্প করতে। এই উপদ্রব থেকে বাঁচার একটা কৌশল আবিষ্কার করেছিলেন তিনি। খাতা, কলম এবং অন্যান্য সরঞ্জাম বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ান—হঠাৎ কবি উঠে দাঁড়িয়ে এমন ভাব দেখাতেন যেন তিনি এখনি বাথরুমে যাবেন এবং যথারীতি ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'তেন। পনের মিনিট, বিশ মিনিট, আধ ঘণ্টা পার হয়—কবির দেখা নেই। অথচ সকলেই তাঁর আশায় বসে আছেন। জিনিষপত্রগুলি গুছিয়ে রাখার অছিলায় নিতাইবাবু সেগুলি নিয়ে চলে আসতেন তাঁদের বাড়ীতে—৮০নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে। তিন তলার একটি ঘরে কবি অনেক আগেই এসে গেছেন, এখন পেয়ে গেলেন লেখার সরঞ্জাম।

গভীর রাত পর্যন্ত এখানে বসে চলতো কবির সংগীত রচনার কাজ।

৯.

কবি তখন অসুস্থ। বর্তমান ব্যাধি সুস্পষ্ট। কথা বলতে তাঁর কষ্ট হয়—কিছু লিখতেও। একটি অপূর্ব গানের কয়েক লাইন তিনি লিখেছিলেন কিন্তু সমাপ্ত করেন নি। আর রোগাক্রান্ত হবার পর তিনি নতুন কিছু লেখেন নি। একদিন নিতাইবাবু সেই অসমাপ্ত

গানের পৃষ্ঠাটি এবং একটি কলম দিলেন কবিকে। বাক্‌হারা কবি প্রথমে গানটি পড়লেন তারপর কিছুক্ষণের মধ্যে জড়ানো এবং কিছুটা অস্পষ্ট হাতের লেখায় তিনি অসমাপ্ত গানটি শেষ করে ফেললেন। গান শেষ হতে অবোধ শিশুর মত কবির সে কী নির্বাক উল্লাস। নিতাইবাবু জানাচ্ছেন সম্ভবতঃ এই তাঁর শেষ রচনা। এরপর নতুন কিছু তিনি লিখতে পারেন নি। যতবার কাগজ-কলম দেওয়া হয়েছে ততবারই তিনি পুরাণো গানের কলি লিখে দিতেন। শেষের দিকে তাও পারতেন না। তাঁর সর্বশেষ রচিত যে গানটির কথা নিতাইবাবু আমাদের জানিয়েছেন তার প্রথম পংক্তি এই: "আজো কাঁদে কাননে কোয়েলিয়া।" কিন্তু এ ব্যাপারে, এই সর্বশেষ রচনা সম্পর্কে, আমরা ঠিক একমত নই।

১০.

এরপর আমরা কবির সঙ্গে নিতাইবাবুর ঘনিষ্ঠতম যোগের কথা আলোচনা করব।

নজরুল-জীবনের একটি বিশেষ অধ্যায় মঞ্চ ও সিনেমা শিল্পের সঙ্গে জড়িত হয়ে বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছিল। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি হতে তিনি এই জীবনের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন।

নজরুল-সংগীত তখন বাংলার মাটি-মনকে মাতাল করে তুলেছে। ধর্মভীরু হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায় গাইছে 'কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যারে আলোর নাচন' বা 'রমজানের ঐ রোজার শেষে এল খুশীর ঈদ'। মুটে-মজুর-কিষাণ সম্প্রদায় গাইছে 'ও বিদেশী বন্ধু' আর শিক্ষিত সম্প্রদায় তখন নজরুলের গজল গানে আত্মহারা— 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিসনে আজি দোল।' অবস্থা

যখন এমন—সে সময় নজরুল পাইওনিয়ার ফিল্মস্ কোং থেকে একটি চিঠি পেলেন। চিঠিতে তাঁরা কবিকে তাঁদের নির্মীয়মান "ধ্রুব" চিত্রের সংগীত পরিচালনার জন্যে আহ্বান জানিয়েছেন। "ধ্রুব" নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের একখানি জনপ্রিয় পৌরাণিক নাটক। এই বইতে কবি প্রথম সংগীত-পরিচালক হলেন কিনা সঠিক জানা যায় না—তবে আরো দুটি চিত্রের সংগীত-পরিচালনা করে তিনি যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। এ দুটি চিত্রের প্রথমটি হল কবি-বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'পাতালপুরী' আর দ্বিতীয়টি হল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের "গোরা"। সংগীত-পরিচালনার ক্ষেত্রে নজরুল-প্রতিভা আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

বর্তমান নিউ সিনেমার পাশে সি. সি. সাহার ঘরের দ্বি-তল, ত্রি-তল জুড়ে ছিল পাইওনিয়ার ফিল্মস্ কোং-এর বিরাট অফিস। এর স্বত্বাধিকারী হলেন ফ্রামজী ম্যাডান। ম্যাডান সাহেব পার্শী—ঝানু ব্যবসায়ী। তিনি পাইওনিয়ার ফিল্মস্ কোং-এর আওতায় "ধ্রুব" ছায়া চিত্রের নির্মাণের জন্যে প্রযোজনা থেকে শুরু করে অন্যান্য সর্ববিধ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সংগীত-পরিচালনার জন্যে নজরুল এই কোম্পানী কর্তৃক ১৩৪০ সালের অগ্রহায়ণ মোতাবেক ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে অনুরুদ্ধ হন।

সে সময় কবি হিজ মাস্টার্স ভয়েস ও মেগাফোন কোং-এর হেড কম্পোজার' ও 'চীফ ট্রেণার হিসেবে যুক্ত ছিলেন! কাজের চাপ অত্যন্ত বেশী থাকায় কবি তাঁর শিষ্য নিতাই ওরফে নিত্যানন্দ ঘটক মহাশয়কে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে হিজ মাস্টার্স ভয়েস-এ সহকারী সংগীত-পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। "ধ্রুব" ছায়াচিত্রের সংগীত-পরিচালনার ব্যাপারেও নিতাইবাবু সহকারী পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

পূর্বে বলেছি বহরমপুর ডিষ্ট্রীক্ট জেল থেকে মুক্তিলাভের পর এক সম্বর্ধনা-অনুষ্ঠানে কবি এই ঘটক পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হন এবং

এই পরিবারের কর্ত্রীস্বরূপা শ্রীযুক্তা সুনীতিবালা দেবীকে মা-ডাকায় সে পরিচয় গভীর আন্তরিকতায় পরিণত হয়। সে সময় হতেই ঘটক মহাশয় প্রায় ছায়ার মত কবির সঙ্গে সঙ্গে ফিরেছেন। বর্তমানে নিতাইবাবু পশ্চিমবঙ্গের প্রচার বিভাগের লোকরঞ্জন শাখার প্রধান সংগীত পরিচালক।

যাক্, কবি প্রধান পরিচালক এবং ঘটক মহাশয় সহকারী পরিচালক হয়ে যখন "ধ্রুব" চিত্রের সংগীত রচনা ও সুর-যোজনা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, পাইওনিয়ার ফিল্মস্ কোং-এর কর্তৃপক্ষ তখন অন্য কথা চিন্তা করছিলেন! "ধ্রুব" বইয়ের বিরাট অংশ জুড়ে ছিল নারদের ভূমিকা। তাঁরা মনে মনে কবিকে নারদের ভূমিকার জন্যে নির্বাচিত করলেন। নজরুল তখন জনপ্রিয়তার স্বর্ণ-শিখরে। সুতরাং কবিকে দিয়ে নারদের ভূমিকা অভিনয় করাতে পারলে আর্থিক লাভের দিক সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গেই কবি রাজী হয়ে গেলেন। তিনি নিজে নামলেন নারদের ভূমিকায় আর বিষ্ণুর চরিত্র রূপদানের জন্যে নির্বাচিত করলেন নিতাই ঘটককে। কর্তৃপক্ষের সাথে তাঁদের অভিনয় ও সংগীত-পরিচালনার চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর মোতাবেক ১৩৪০ সালের অগ্রহায়ণে।

ঐতিহাসিকতা রক্ষার জন্যে, অপ্রাসঙ্গিক হলেও, অন্যান্য ভূমিকায় যাঁরা নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁদের নাম এখানে দেওয়া হল: ধ্রুব—মাষ্টার প্রবোধ, মহাদেব—কুঞ্জলাল চক্রবর্তী, উত্তানপাদ—জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়, মন্ত্রী—সত্যেন্দ্রনাথ দে, লক্ষ্মী—মিস্ ভায়োলেট, মুনিপত্নী মিস্ পারুলবালা, সুনীতি—মিস্ আঙ্গুরবালা, সুরুচি—মিস্ শরিফা।

সবাক চিত্রের প্রথম যুগে অধিকাংশ চিত্রই ছিল সংগীতে ভারাক্রান্ত। নৃত্য ও গীত ছিল তখন জনচিত্ত জয়ের প্রধান অবলম্বন। সংগীত ছাড়া তখন কোন চিত্রের পরিকল্পনা অসম্ভব ছিল। বলা-বাহুল্য "ধ্রুব" চিত্রেও সংগীতের বাহুল্যই পরিলক্ষিত হয়। এই

চিত্রে মোট সংগীতের সংখ্যা আঠারো। আঠারোটি সংগীতের মধ্যে কেবলমাত্র একটি ছিল নাট্য সম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষের রচনা। অন্যান্য সতোরোটি ছিল নজরুল-গীতি। এই দুষ্প্রাপ্য সংগীতগুলির প্রতিটি সংরক্ষণের জন্য আমরা এখানে উদ্ধৃত করলাম :

(১) সুনীতির গীত

(আগো) ব্যথার ঠাকুর ব্যথার ঠকুর
আগো হে পাষাণ-দেবতা।
তুমি না হরিলে হরি
কে হরিবে প্রাণের ব্যথা ॥
তুমি সব হরিলে
ওহে নিখিল-হরণ সব হরিলে !
আমার যা কিছু ছিল প্রিয়তম
হরি হে সে সব হরিয়া নিলে ॥
আমি হয়েছি পথের ভিখারিনী,
রাজার রাণী নেমেছি ধূলায়,
হয়েছি পথের ভিখারিনী।
তাই শাপ দিই বড় দুখে,
তুমি এই দুখিনীর সন্তান হয়ে
আসিবে আমার বুকে।
তুমি আমার বক্ষে হাসিবে, কাঁদিবে,
খেলিবে কহিবে কথা।
ব্রজের গোপাল ! সেদিন ভুলিব
আমার প্রাণের ব্যথা ॥

(২) সুনীতির গীত

অবিরত বাদল বরষিছে ঝরঝর
বহিছে তরলতর পুবালী পবন।
বিজলী-জ্বালার মালা পরিয়া কে মেঘমালা

কাঁদিছে আমারি মত বিষাদ-মগন ॥
ভীরু এ মনমৃগ আলয় খুঁজিছে ফিরে,
জড়ায়ে ধরিছে লতা সভয়ে বনস্পতিরে,
গগনে মেলিয়া শাখা বন উপবন ॥

(৩) সুনীতির গীত

চমকে চপলা, মেঘে মগন গগন।
গরজিছে রহি' রহি' অশনি সঘন ॥
লুকায়েছে গ্রহতারা, দিবসে ঘনায় রাতি,
শূন্য কুটীরে কাঁদি, কোথায় ব্যথার সাথী,
ভীত চমকিত-চিত সচকিত শ্রবণ ॥

(৪) ধ্রুবের গীত

ধূলার ঠাকুর ধূলার ঠাকুর।
তোমার সাথে করব খেলা।
ধূলার আসন, ধূলার ভূষণ,
ধূলি নিয়ে হেলা ফেলা ॥
অনেক দূরে গহন বনে
খেলব দু'জন আপন মনে,
খেলার নেশায় সকাল কখন
হয়ে যাবে বিকেল বেলা ॥
খুঁজতে মাতা আসলে রাতে
দু'জন গিয়ে ধরব হাতে,
বলব, ঠাকুর আছেন সাথে
ভয় কি গো মা নই একেলা ॥

(৫) ধ্রুবের গীত

আয়রে আয় হরি ব'লে বাহু তু'লে নেচে আয়।
ডাকলে হরি রইতে নারে রাখবে তোরে রাঙা পায়।

কাজ কি আর ছার কামনা
হরি পদে প্রাণ সঁপনা
হরি নামের কারুর নয় মানা—
হরি নামের পদে হরি কেনে
নামের গুনে তরে যায়॥

৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

(৬) ধ্রুবের গীত

হরি নামের সুধায় ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারি।
হরি নাম বসন হরিনাম ভূষণ
আমি হরি-প্রেম ভিখারী॥
পরিয়া শ্রীহরি নামের মালা
ভুলিব পিতার অনাদর জ্বালা
হরিনামের সুধায় ক্ষুধা-তৃষ্ণা নীবারী॥
যাব বলে যায় সনে
শ্রীহরিরে আঁখিনীরে কব প্রাণের ব্যথা।
আমারে আর মোর জননীরে হেন
দীনবন্ধু এত দুখ দাও কেন
করুণা-সিন্ধু তুমি দুখ হারি॥

(৭) ধ্রুবের গীত

আমি রাজার কুমার পথ ভোলা,
আমি পথ ভোলা আমি পথ ভোলা
আমি পথ ভোলা,
দখিন হাওয়া দাও দোলা॥
দাও দোলা দাও দোলা
আজি আমার প্রাণের ও মনের
সকল দ্বার খোলা॥

তরুলতা বনের পাখী তোদের ডাকি

আয় শুনে যা

শোন ঝর ঝর ঝর্ণা ধারা

রাজার দুলাল আমি শোনরে ফুল

নদী উতরোল ॥

৮। ॥ মুনিপত্নীর গান ॥

হে দুখহরণ ভক্তের শরণ
অনাথ তারণ হে বিধাতা!
তুমি ধ্রুব জ্যোতিঃ চাহ যার পানে
নিমেষে সে ছুটে যায় তব সন্ধানে,
বৃথা তারে সংসার পিছু ডাকে বার বার
হে মুক্তি-দাতা হে বন্ধ-ত্রাতা ॥

৯। ॥ মুনিপত্নীর গীত ॥

শিশু নটবর নেচে নেচে যায়।
চল চরণে ধূলি মাখা গায়।
ননীর পুতুল আদুল তনু
চলিতে পথে ফিরে ফিরে চায় ॥
তাহারি পায়ের নাচের তালে
ফোটে পুলকে কুসুম ডালে,
গ্রহতারা সেই নাচের ঘোরে
ঘুরিয়া মরে তারি রাঙা পায় ॥

১০। ॥ নারদের গীত ॥

মধুর ছন্দে নাচে আনন্দে
নওল কিশোর মদন মোহন।
চারু ত্রিভঙ্গিম ঠাম বঙ্কিম,
বন্দে পদ কোটি চন্দ্র তপন ॥

বৃষ্টিধারা সম নব নবতর,
সৃষ্টি পড়ে ঝরি সে নাচে নিরুপম,
রতন মঞ্জীর বাজে ঝমঝম,
ঘোরে গ্রহতারা ঘিরি শ্রীচরণ ॥

১১। ॥ নারদের গীত ॥

গহন বনে শ্রীহরি নামের
মোহন বাঁশী কে বাজায়।
ভুবন ভরি সেই সুরেরই
সুরধনী বয়ে যায় ॥
সেই নামেরই বাঁশীর সুরে
বনে পূজার কুসুম ঝুরে,
সেই নামেরই নামাবলী
গ্রহতারা আকাশ জু'ড়ে।
অন্ত-বিহীন সে সঙ্গীতের
সুর-স্রোতে কে ভাসবি আয় ॥

১২। ॥ ধ্রুবের গীত ॥

দাও দেখা দাও দেখা
হরি পদ্মপলাশ লোচন।
এত কাঁদি ডাকি তবু শোন নাকি
হে প্রভু ব্যথা বিমোচন।
শুনিয়াছি হরি জননীর কাছে
তুমি আছ যার তার সব আছে
তুমি অনাথের নাথ—
কেহ নাই যার তুমি আছ তার
অনাথের নাথ!
(আমি) অনাথ বালক, জগৎ-পালক,
দাও শ্রীচরণে শরণ ॥

১৩। ॥ নারদের গীত ॥

ফুটিল মানস-মাধব-কুঞ্জে প্রেম কুসুম পুঞ্জে পুঞ্জে

মাধব তুমি এস হে!

হে মধু পিয়াসী চপল মধুপ, হৃদে এস হৃদয়েশ হে॥

তুমি আসিলেনা বলি শ্যামরায়

অভিমানে ফুল ফুটায় ধূলায়, মাধব তুমি এস হে॥

বনমালী বনে বন ফুলহার

হায় শুকাইয়া যায় আঁখিজলে তার

জিয়াইয়া রাখি কত আর!

এস গোপন পায়ে! চিতচোর, এস গোপন পায়ে!

যেমন নবনী চুরি করি খেতে, এস হে তেমনি গোপন পায়ে।

যেমন লুকায়ে অভিসারে যেতে, এস শ্যাম সেই মৃদুল পায়ে।

না হয় নূপুর খুলিয়ো

তুমি বাঁশরীর তানে না হয় লহরী না তুলিয়ো

যেমন নীরবে ফোটে ফুল

যেমন নীরবে রেঙে ওঠে সন্ধ্যা-গগন-কূল,

এস তেমনি নীরব পায়ে

আর রহিতে নারি এস হৃষিকেশ শ্যামরায়॥

১৪। ॥ ধ্রুব ও নারদের গীত ॥

না— হৃদি-পদ্মে চরণ রাখো বাঁকা ঘনশ্যাম।

ধ্রু— বাঁকা শিখী পাখা নয়ন বাঁকা বঙ্কিম ঠাম॥

না— তুমি দাঁড়ায়ো ত্রিভঙ্গে

ধ্রু— অধরে মুরলী ধরি দাঁড়ায়ো ত্রিভঙ্গে।

না— সোনার গোধূলি যেন নিবিড় সনীল নভে

পীত ধড়া পরো কালো অঙ্গে (হরি হে)

ধ্রু— নীল কপোত সম চপল চরণ দুটি

নেচে যাক অপরূপ ভঙ্গে (হরি হে)

উত্তরে—　　যেন নূপুর বাজে
হরি সেই পায়ে যেন নূপুর বাজে।
বনে নয় শ্যাম মন মাঝে যেন নূপুর বাজে।
ঐ চরণে জড়ায়ে পরাণ আমার
(যেন) মঞ্জীর হয়ে বাজে॥

১৫　　॥ সুনীতির গীত ॥

ফিরে আয় ওরে ফিরে আয়
শূন্য এ বুকে ফিরে আয়।
সন্ধ্যা ঘনায় তুই কোথা হায়
ওরে পাখী মোর নীড়ে আয়
তোরে না হেরিয়ে ওরে ধ্রুবতারা
ব্যথায় পাথারে কাঁদি পথহারা,
তোরে যে হরিল নিয়ে সে হরিরে
শূন্য এ মন্দিরে আয়।

১৬　　॥ ধ্রুবের গীত ॥

নাচো বনমালী করতালি দিয়া
হেলে দুলে থিয়া তাথিয়া।
মধুর ছন্দে নাচো আনন্দে
আমার প্রাণ নাচাইয়া।
একবার নাচো হে
বাঁকা শিখীপাখা বায়ে হেলায়ে, বাঁকা শ্যাম একবার নাচো হে।
বাঁকা নয়ন পীত বসন, বনমালা গলে নাচো হে।
এস ত্রিভঙ্গ ঠামে শ্যামরায়
"দক্ষিণে বামে ছন্দ নামে"
রুমুঝুমু নূপুর পায়॥
অলকা তিলক আঁকা শিরে শিখীপাখা
এস মন বন ছায়ায়।

ঐ শুনি তার বাঁশী বাজে
আসে ঐ আসে প্রাণের হরি ॥
কোটী অমল কোমল-গন্ধে,
আসে দশদিক আমোদিত করি,
এল ঐ এল প্রাণের হরি ।

১৭ । ॥ ধ্রুব ও সুনীতির গীত ॥

উভয়ে— জয় পীতাম্বর শ্যামসুন্দর
মদন মনোহর কাননচারী ।
গোপী চন্দন আমোদিত তনু
বনমালী হরি বংশীধারী ॥
ধ্রু— চাঁচর চিকুরে শোভে শিখীপাখা
বাঁকা ত্রিভঙ্গিমা চারু নয়ন বাঁকা
সু— ও বাঁকা রূপ যেন মনে রহে আঁকা
মনে বিহর কালা বন-বিহারী ॥
সু— ভক্তি প্রেম প্রীতি তব ও রাঙা পায়
ধ্রু— নূপুর হয়ে হরি যেন বাজিয়া যায়,
সু— জনমে জনমে কৃষ্ণ কথা গায়
যেন এ দেহ মন শুক-সারি ॥

১৮ । ॥ ধ্রুবের গীত ॥

কাঁদিসনে আর কাঁদিসনে মা
আমি মা তোর দুখ ঘুচাব ।
বসন ভূষণ দেব এনে
মা তোর চোখের জল মুছাব ।
তুই হবি মা রাজ-জননী
এনে দেবো রত্নমণি
রাজার আসন আনব ছিনি
তোরে সেই আসনে বসাব ॥

সংগীত পরিচালনায় নজরুল-বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্ব আলোচনার জন্তে স্বতন্ত্র প্রবন্ধের প্রয়োজন। তবে এখানে উপরোক্ত কবিতার উদ্ধৃতিগুলি লক্ষ্য করলেই পৌরাণিক নাটকের জন্য নজরুলের সংগীত রচনার দক্ষতা সহজেই ধরা পড়বে। "ধ্রুব" চিত্রের অপরিসীম জনপ্রিয়তার মূলে এই সংগীতগুলি বিশেষ রূপে কাজ করেছিল।

"ধ্রুব"-এর যুগে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দৈহিক সৌন্দর্য ছাড়াও আর একটি মস্ত বড় গুণের প্রয়োজন ছিল—সুকণ্ঠের। কেননা বর্তমানের মত গানগুলি পূর্বাহ্নে রেকর্ড করিয়ে নেপথ্যে সেই রেকর্ড বাজিয়ে ঠোঁট মেলানোর কোন ব্যবস্থাই সে সময় ছিল না। অভিনয় চলাকালীন অভিনেতা-অভিনেত্রীদের আপনাপন গান গাইতে হতো। "ধ্রুব" চিত্রে আঠারোটা গানের চারটি গান ছিল নারদের। এই চারটি গানের মধ্যে তিনটি গান (উদ্ধৃতির ১০, ১১ ও ১৩ নং গান) নজরুল একক কণ্ঠে গেয়েছিলেন এবং চতুর্থ গানটি (উদ্ধৃতির ১৪ নং গান) ছিল দ্বৈত্য সংগীত—নারদ ও ধ্রুবের (নজরুল ও প্রবোধ) গাওয়া। অন্যান্য সংগীতগুলির মধ্যে ১, ২, ৩, ১৫ ও ১৭ নং গেয়েছেন আঙ্গুরবালা ; ৪, ৫, ৬, ৭, ১২, ১৪, (দ্বৈত্য—নজরুলের সাথে) ১৬, ১৭ (দ্বৈত—আঙ্গুরবালার সাথে) ও ১৮ নং গেয়েছেন মাস্টার প্রবোধ ; ৮ ও ৯ নং-এ কণ্ঠ দান করেছেন পারুলবালা। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ রচিত যে সংগীতটির কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি সেটি হল উদ্ধৃতির ৫নং সংগীত।

নজরুলের "নারদ"-এর ভূমিকায় অভিনয় এক স্মরণীয় ঘটনা। পূর্বে যেখানে যত নারদের ভূমিকা আছে ধীরেন দাস ছিলেন ঐ ভূমিকার জন্তে সর্বাপেক্ষা দক্ষ ব্যক্তি। যেখানে যত নারদের ভূমিকা আছে ধীরেন দাস তার জন্তে বাঁধা। নারদের ভূমিকায় অভিনয় করে ধীরেন দাস একটি ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছিলেন। তবে সে অভিনয় ছিল নিতান্ত গতানুগতিক। সেই চিরাচরিত সাজ-পোষাক আর সেই পুরানো অভিনয়। তখন নারদ হতেন বুড়ো, মাথায় ধূম্র

বর্ণের জটার চূড়ো, আবক্ষ সাদা দাড়ি, আকর্ণ গোঁফ। উন্মুক্ত ভস্মমাখা দেহ, পরনে খাটো ধুতি, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। নারদ না বাল্মীকি মুনি বোঝা যেত না। কিন্তু এই চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন কবি। তাঁর নারদের সাজ হল অপূর্ব। তিনি দাড়ি রাখলেন না, আকর্ণ গোঁফ কেটে ফেললেন, আশি বছর পরিণত হল আঠাশে। বার্ধক্যের সকল চিহ্ন তিনি নারদের দেহ থেকে অবলুপ্ত করলেন। এত দিনের বার্ধক্য-পীড়িত নারদ এবার হলেন তরুণ যুবক। পরনের সাজ-পোষাকও হল বড় বিচিত্র। তিনি পরলেন পাড়ওয়ালা সিল্কের ধুতি, উন্মুক্ত বক্ষ আবৃত হল সিল্কের লম্বা পাঞ্জাবী দিয়ে। অত্যন্ত জমকালো পোশাক। কটা স্যুটিং-ও হয়ে গেল।

কবি থাকেন তখন ৩৯, সীতানাথ রোডের বাড়ীতে। একদিন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শুটিং। সেদিন কবির ষ্টুডিওতে যাওয়া বিশেষ প্রয়োজন। তিনি না গেলে কোন প্রকারে কোন দৃশ্যের শুটিং হতে পারে না। অথচ একটা ব্যাপার ঘটে গেল বাড়ীতে।

কবি শখ করে পুষেছিলেন একটা সাদা গিনি পিগ। এটি কবির অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠেছিল। সর্বাঙ্গ দুধ-বরণ সাদা রং, চোখ দুটি ছিল বড় অদ্ভুত। গোলাপী রং-এর দামী হীরের মত জ্বলন্ত সব সময়। কবির সাড়া পেলেই এটি এসে দাঁড়াত তাঁর পায়ের কাছে। সাজ-পোশাক করে ষ্টুডিওতে বেরুচ্ছেন, বাইরে নিতাইবাবু অপেক্ষা করছেন। কবি ডাকলেন তাঁর গিনি পিগকে। দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেও কোন সাড়া পাওয়া গেল না। শেষে অন্বেষণ করে খাঁচার মধ্যে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল তাকে। কবি ছেলেমানুষের মত ডুকরে কেঁদে উঠলেন, সাজ-পোশাক সব খুলে ফেললেন, দরজা দিয়ে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রইলেন সারা দিনের মত। কিছু খেলেন না, একটি কথাও বললেন না কারো সাথে।

কোম্পানী হয়তো বিরক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু মাঝ পথে তাঁরা

কিছু বললেন না কবিকে। পরদিন থেকে আবার যথারীতি শুটিং চলল। চিত্র গ্রহণ সমাপ্ত হল এবং সম্পাদনার পর বইটি ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী সোমবার ক্রাউন টকীজে (বর্তমানে উত্তরা) মুক্তিলাভ করল। বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল প্রচুর। নজরুল নেমেছে নারদের ভূমিকায়—সকলের কাছে এ এক বিরাট লোভনীয় দর্শনীয় বিষয়। কর্তৃপক্ষ ভুল অনুমান করেন নি—দীর্ঘ দিন 'হাউস ফুল' থাকার পরও দীর্ঘতর সময় সারা বাংলায় চলেছিল সাড়ম্বরে। এত টাকা আর কোন ছবি সে সময় আনতে পারেনি।

কিন্তু কবিকে নিদারুণ সমালোচনার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। কম-বেশী সকল পত্র-পত্রিকাই কবির বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়েছিল। "ধ্রুব" চিত্রে নারদের সাজসজ্জা দেখে তাঁরা সমালোচনায় লিখেছিলেন : 'এ নারদ না সদ্য বিবাহিত জামাইবাবু।' কবি তার জবাব দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন : 'নারদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে জমকালো পোষাক পরেছি বলে সর্বত্র একটা আতঙ্কের ভাব উঠেছে। অথচ একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে এর পিছনে কোন সঙ্গত কারণ নেই। কেননা নারদের বয়সের কোন সঠিক মাপকাঠি আছে বলে আমি মনে করি না। একজন অথর্ব বুড়ো—শুষ্কং কাষ্ঠং—বয়স্থ হয়ে যাবে স্বর্গের দেবতাদের কাছে এমন দৃশ্য কল্পনা করতেও আমার কষ্ট হয়। শিবের যেমন বয়সের ঠিক নেই—নারদেরও তাই। নারদ চির তরুণ—তাঁর প্রাণে থাকবে উচ্ছ্বাসের উদ্দাম প্রবাহ। তা' না হলে স্বর্গের সর্ব শ্রেণীর দেবতাদের তিনি প্রিয়পাত্র হবেন কি করে!'

বলাবাহুল্য কবি তাঁর নিজস্ব কল্পনার রং-এ নারদ চরিত্রটিকে রাঙিয়ে তুলেছিলেন। এবং তিনি আশ্চর্যরূপে সাফল্য লাভ করেছিলেন। কি কাব্যের ক্ষেত্রে, কি সংগীতের ক্ষেত্রে, কি অভিনয়ে—কবি তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যটুকু কোথাও হারিয়ে ফেলেন নি। বৈচিত্র্যময় নজরুল-জীবনের চরমতম বৈশিষ্ট্য এইখানে।

এর পরের অধ্যায়টি বড় করুণ। প্রচুর টাকা আয় করলেন ফ্রামজী ম্যাডান কিন্তু কবির পাওনার অবশিষ্টাংশ আর তাঁরা শোধ করলেন না। প্রথম প্রথম কবি নিতাইবাবুকে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু বিশেষ কোন কাজ না হওয়াতে সবশেষে পাঠালেন এটর্নির চিঠি। এতে উল্টো ফল হল। কোন কোন তারিখে চুক্তিমত কবি শুটিং-এ উপস্থিত না হওয়ায় কোম্পানীর কত টাকা ক্ষতি হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে ক্ষতি পূরণের জন্যে এটর্নির ডবল চিঠি পাঠাল কোম্পানী। শেষে অবশ্য একটা মিটমাট হয়ে গেল—কবি তাঁর ন্যায্য পাওনা ছেড়ে দিয়ে সমূহ বিপদ থেকে রেহাই পেলেন।

সেকালে অভিনয় জীবনটা খুব পবিত্র ছিল না।

"ধ্রুব" চিত্রের অভিনয় ছাড়াও কবি আর একটি চিত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন—"পাতালপুরী।" এই চিত্রের কাহিনীকার এবং পরিচালক ছিলেন শ্রদ্ধেয় শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। এ কথা সর্বজন বিদিত যে, শৈলজাবাবু বাংলা সাহিত্যে কয়লা-কুঠির দেশ আমদানী করেছেন। এই কয়লা-কুঠির দেশ সম্পর্কে সর্বপ্রথম ছবি "পাতালপুরী।" নজরুল ছিলেন এ-চিত্রের সংগীত পরিচালক। সংগীত পরিচালনা ছাড়া এ চিত্রের একটি দৃশ্যেও তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন। নির্বাক ভূমিকা। কয়েকজন সাঁওতাল তরুণী নৃত্যগীতে মশগুল—কবি ক্যামেরার দিকে পিছন ফিরে তাদের আসরে বসে হারমোনিয়াম বাজিয়েছেন। দৃশ্যটি লং শটে তোলা। কেবল দীর্ঘ বাবরি চুল ছাড়া কবিকে চেনার আর কোন উপায় ছিল না।

"পাতালপুরীর" নির্বাক ভূমিকায় অভিনেতা নজরুলের কোন পরিচয় নেই। সে পরিচয় পেতে হলে আমাদের "ধ্রুব" চিত্রের 'নারদের' ভূমিকার দিকে দৃষ্টি ফেরাতে হবে।

আবদুল ওদুদ

১.

নজরুল তাঁর সমসাময়িককালে যে ক'জনকে একটু সমীহ করে চলতেন—সদা চঞ্চল নজরুলের পক্ষে যতটা সমীহ করে চলা সম্ভব—তাঁদের মধ্যে কাজী আবদুল ওদুদ নিঃসন্দেহে একজন। এই আপাতঃ গম্ভীর পণ্ডিত ব্যক্তিকে ঘিরে সর্বদা এমনই একটা ব্যক্তিত্ব ও গাম্ভীর্য বিরাজ করে যেখানে উদ্দাম নজরুলকেও হয়ত নিজের অজ্ঞাতসারে কিছুটা সংযত হতে হয়েছে। তাই বলে তাঁদের পারস্পরিক প্রীতি ও আন্তরিকতা সংযত হয়ে থাকেনি, হয়তো বৈষ্ণব মহাজনগণের কথাই ঠিক: প্রেমে গভীরতা এলে বাচনিকচাঞ্চল্য অন্তর্হিত হয়।

নজরুলের সাথে ওদুদ সাহেবের প্রথম চাক্ষুষ পরিচয় হল ৩২ নং কলেজ স্ট্রীট বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে। জনাব মুজফ্ফর আহমদ তাঁর পুস্তকে লিখেছেন যে, কাজী আবদুল ওদুদও আসতেন নজরুলের সঙ্গে দেখা করতে একথা সম্পূর্ণ সত্য নয়। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলের প্রথমে নজরুল যখন পল্টন থেকে ফিরে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির বাসায় ওঠেন, ওদুদ সাহেব তখন ৩২ নং-এর একটি ঘরে থাকতেন—সেই ঘরটি ছিল আফজালুল হকের ভাড়া করা। অর্থনীতিতে এম, এ পাশ করে তখন তিনি আইন পড়ছেন।

সাহিত্য সমিতির সর্বসময়ের একমাত্র কর্মী জনাব মুজফ্ফর আহমদই নজরুলের সঙ্গে কাজী সাহেবের পরিচয় করিয়ে দেন। এর কিছুদিন আগেই ওদুদ সাহেবের "নদী বক্ষে" নামে বিখ্যাত উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি এক কপি নজরুলকে পড়তে দেন। দিলখোলা আবেগচঞ্চল নজরুল প্রশংসায় ভেঙে পড়েন, উপন্যাসখানি তাঁর ভাল লেগেছিল। ওদুদ সাহেবের লেখার প্রশংসা করে রবীন্দ্রনাথও একটি চিঠি দেন। বহু পরে শান্তিনিকেতনে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আহ্বান জানান। শান্তিনিকেতনে তাঁর প্রদত্ত বক্তৃতাগুলি "হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ" নামে তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ পুস্তক 'শাশ্বত বঙ্গে'র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

এ সময় সুসাহিত্যিক মরহুম মোজাম্মেল হকের সম্পাদনায় "মোসলেম ভারত" পত্রিকাখানি নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে এবং এর প্রতি সংখ্যায় নজরুলের একাধিক লেখা প্রকাশিত হয়ে নিখিল বাংলায় বিপুল আলোড়ন তুলেছে। ওদুদ সাহেবেরও কিছু কিছু লেখা প্রকাশিত হচ্ছিল। ১৩২৭ বঙ্গাব্দের কার্ত্তিক সংখ্যায় (১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা) সুধাকান্ত রায় চৌধুরীর "গান্ধীজী" শীর্ষক সুদীর্ঘ কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতাটি সত্যেন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা "বাংলা দেশ"-এর ছন্দানুযায়ী লেখা। প্রথম পংক্তিটি ছিল: "বন্দি তোমায় মানব-গুরু সত্য সেবার রত্ন গো।" এসময় সারা বাংলা দেশ জুড়ে সন্ত্রাসবাদীদের রক্তাক্ত বিপ্লবের অগ্নের শপথ ছড়িয়ে পড়েছিল। নজরুল এই রক্তাক্ত বিপ্লবে যথেষ্ট আস্থাশীল এবং গভীর বিশ্বাসী ছিলেন।

নিরুপদ্রব অহিংসা আন্দোলনের নেতা 'গান্ধীজী'র উপলক্ষে লেখা সুধাকান্ত রায় চৌধুরীর কবিতাটির শেষ পংক্তি দু'টি পাল্টিয়ে দিয়ে নজরুল কবিতাটিকে যথেষ্ট গতিশীল এবং শক্তিময়ী করে তোলেন। পরিবর্তিত পংক্তি দু'টির সুর বিপ্লববাদের অনুগামী হয়ে ওঠে। নজরুলের লেখা পংক্তি দুটি এই:

"শক্তিহীনের অন্তরে আজ গর্জে বিষাণ দুন্দুভি,
অঙ্গে নাচে মুক্তিহাওয়া দমকে শিরায় খুনখুবি।"

পংক্তি দুটি পড়লেই বিদ্যুৎ চমকের মত চকিতে নজরুলের কথাই মনে হবে। এই পরিবর্তনের নীরব সাক্ষী, হলেন কাজী আবদুল ওদুদ।

২০

রক্তাক্ত revolusion সম্পর্কে নজরুলের সঙ্গে ওদুদ সাহেবের প্রায়ই আলোচনা হতো এবং তর্কবিতর্ক হতো। মতের দিক দিয়ে দু'জনে দুই ভিন্ন পথের পথিক। ওদুদ সাহেব ছিলেন গান্ধীজীর অহিংসা মতাবলম্বী আর নজরুল ছিলেন রক্তাক্ত বিপ্লববাদে আস্থাশীল। আলোচনার সময় তিনি ওদুদ সাহেবকে প্রায়ই বলতেন: এক হাত বিষাক্ত হলে সমগ্র শরীরের সুস্থতার জন্য সে হাতকে নির্ম্মমভাবে কেটে ফেলতেই হবে। গায়ে বিষ ফোঁড়া হলে অস্ত্রোপচার ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। মোট কথা সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে এই ছিল নজরুলের থিয়োরী।

নজরুলের এই বিপ্লবী মনের সমর্থক ছিলেন সুসাহিত্যিক ইয়াকুব আলী চৌধুরী। ধর্ম্মান্ধ মুসলিম সমাজের গোঁড়ামি, জড়তা ইত্যাদি লক্ষ্য করে তিনি নজরুলকে বলেছিলেন: আপনাকে মুসলিম বারীণ ঘোষ হতে হবে।

৩২ নং কলেজ স্ট্রীটের বাসাটি তখন নজরুলের রবীন্দ্র সংগীতে গুলজার হয়ে থাকত। বন্ধুবান্ধব মহলে তখন গায়ক নজরুলের যথেষ্ট সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। ওদুদ সাহেবের মতে প্রতিটি গান যথেষ্ট দরদ আকুতি দিয়ে গাওয়ার জন্য নজরুল এই সুনামের

অধিকারী হয়েছিলেন। 'মিষ্টি কণ্ঠ' বলতে যা বোঝায় তা নজরুলের তেমন ছিল না। দরাজ উদাত্ত কণ্ঠের কাঁপনে কাঁপনে ঝরে পড়তো প্রাণপ্রবাহ আর সেই প্রাণাবেগ সুধা কণ্ঠ পান করে শ্রোতারা বিমুগ্ধ হয়ে যেতো।

এই সময় ওদুদ সাহেবকে আইন পড়া অসমাপ্ত রেখে মাতৃভূমি ফরিদপুরে চলে যেতে হয়। তাঁর স্ত্রী কঠিন পীড়ায় শয্যাশায়ী। ফলে সাময়িক ভাবে নজরুলের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বতার ছেদ পড়ে। স্ত্রী একটু সুস্থ হলেই তিনি বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপনার কাজ নিয়ে ঢাকার সরকারী ইণ্টার মিডিয়েট কলেজে যোগদান করেন। তাঁর কর্ম-জীবনের শুরু হ'ল এই ভাবে।

ঢাকায় যাওয়ার কিছুদিনের মধ্যে নিজ দক্ষতায় ওদুদ সাহেব জনপ্রিয় হ'য়ে পড়েন। এই সময় তিনি স্থানীয় মুসলিম হলে কামাল আতাতুর্ক সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ওই মূল্যবান প্রবন্ধের একস্থানে 'বুদ্ধির মুক্তি' কথাটি ছিল। তুর্কীর নবজাগরণের মূলে কামাল আতাতুর্কের দানের কথা বিশেষরূপে প্রবন্ধটিতে উল্লেখিত হয়েছিল। প্রবন্ধটির মধ্যে লেখক দেখাতে চেয়েছেন ধর্মীয় অন্ধতার মধ্যে বুদ্ধি আবদ্ধ হয়ে থাকলে সমাজের উন্নতি সুদূরপরাহত। ধর্মীয় অন্ধ আনুগত্য থেকে বুদ্ধি ও চৈতন্যকে মুক্তি দিতে হবে এবং সেই সদাজাগ্রত ও সর্বসংস্কার মুক্ত বুদ্ধি ও চৈতন্যকে মূলধন করে কর্মে এগিয়ে গেলে আদর্শ সমাজ গঠন সহজসাধ্য হবে। কামাল আতাতুর্ক সম্পর্কীয় প্রবন্ধটি সেই সভায় বিপুল আলোড়ন এনেছিল। এই "বুদ্ধির মুক্তি' কথাটিকে অবলম্বন করে জনাব আবুল হোসেন সাহেব গঠন করলেন "মুসলিম সাহিত্য সমাজ"—'বুদ্ধির মুক্তি' হলো এ সমিতির জপমালা। এ সমিতির সংগঠন কালে যাঁরা বিশেষরূপে অংশ গ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে আরো কয়েকটি স্মরণীয় নাম; ডক্টর মোহম্মদ শহীদুল্লাহ, আবদুর রহমান খান, কাজী মোতাহার হোসেন, আনোয়ারুল কাদির, আবদুল কাদির, আবদুল মজিদ

ইত্যাদি। এ সমিতি গঠিত হয়েছিল ১৯২৬ সালে। পর বৎসর মহা সমারোহ ও উদ্দীপনার মধ্যে এ সমিতির বার্ষিক অধিবেশন বসল। ডাক পড়ল নজরুল ইসলামের। কলকাতা থেকে তিনি ছুটলেন সমিতিতে যোগ দেবার জন্যে। এ অধিবেশনের উদ্বোধন গীতি গেয়েছিলেন তিনি। ষ্টীমারে যেতে যেতে রচনা করেছিলেন গানখানি :

"আসিলে কে গো অতিথি উড়ায়ে নিশান সোনালী,
ওচরণ ছুঁই কেমনে দুই হাতে মোর মাখা যে কালি ?
এল কি অলক-পথ বেয়ে তরুণ হারুণ আল রশীদ,
এল কি আল বেরুনী হাফেজ খৈয়াম কায়েস গাজ্জালী।"

সমিতির দ্বিতীয় বর্ষের অনুষ্ঠানেও নজরুলের গান, আবৃত্তি ও বক্তৃতার ব্যবস্থা ছিল। মুসলিম সাহিত্য সামাজের অনুষ্ঠানে এবং সমিতির উদার মনোবৃত্তিতে কবি মুগ্ধ হন। তিনি বলেন, "বাংলার মুসলমানকে জাগানোর জন্যে বুদ্ধিকে মুক্তি দিতে হবে সবার আগে—এ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। এরপর থেকে আমি বাংলার সর্বত্র এই বুদ্ধির মুক্তির কথাই গেয়ে বেড়াব।" হেমন্ত সরকারকে নিয়ে নজরুল তখন সমগ্র ঢাকা শহরকে গানে গানে মাতিয়ে তুলেছেন। কারার ঐ লৌহ কপাট, ভাঙ্গার গান, শিকল পরার গান, ছাত্রদলের গান ইত্যাদি সমকালীন বাংলায় যে কী বিপুল আলোড়ন এনেছিল !

মুসলমান সাহিত্য সমাজের চতুর্থ অধিবেশন বসে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের, ২৭শে জুনে মোতাবিক ১৩৩২ সালের ৩রা মাঘে। এই অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন কাজী আবদুল ওদুদ। নজরুলও আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন। এই অনুষ্ঠানে নজরুলের অংশটি কাজী আবদুল ওদুর সাহেবের নিকট সযত্নে রক্ষিত সমিতির বহু পুরাতন "মিনিট" বই থেকে উদ্ধৃত করে দেওয়া হ'ল : "কার্য সূচীর প্রথমেই ছিল তরুণ কবি কাজী নজরুল ইসলামের গান। সভাপতি সাহেব তাঁকে গান শুরু করতে বললে তিনি আলীপুর জেলের ভিতর রচিত তাঁর 'শিকল'

ও 'লাব্ণী'র গান শোনালেন। ...শেষে তিনি তিনটি গান শোনালেন—কৃষকের গান, ছাত্রদল ও কাণ্ডারী হুঁসিয়ার।"...

এই অধিবেশনে নজরুলের বক্তৃতা ছিল। বক্তৃতার এক স্থানে তরুণ কবির কণ্ঠে ক্ষোভ ও উত্তেজনার রেশ মিশে ছিল। এই ক্ষোভের মূলে ছিলেন ওদুদ সাহেব। সে সময় প্রবাসীর পৃষ্ঠায় ওদুদ সাহেবের 'রবীন্দ্রকাব্য পাঠ' নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে এবং কবিগুরুর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। "মানসী" কাব্যের 'উচ্ছৃঙ্খল' কবিতাটির আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি লেখেন :

"উচ্ছৃঙ্খল কবিতাটি এক সুন্দর সৃষ্টি। কবির মনোজগৎ এখন যথেষ্ট বিস্তৃত। সেই বিস্তৃত মনোজগতের বুকে উচ্ছৃঙ্খলকে তিনি দাঁড় করিয়েছেন :

প্রতিদিন বহে মৃদু সমীরণ
প্রতিদিন ফোটে ফুল,
ঝড় শুধু আসে ক্ষণেকের তরে
সৃজনের এক ভুল।...

নবীন কবি নজরুল ইসলামের সুবিখ্যাত 'বিদ্রোহী'র আবেগ এর চাইতে অনেক বেশী; কিন্তু সে আবেগ এমন সত্য দৃষ্টি স্রষ্টার হাতে নিয়ন্ত্রিত নয়। তাই তার অনেকখানি কাব্য হিসেবে অকিঞ্চিৎকর; সমস্ত অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও সত্যকার প্রতিভার স্পন্দনও যে এর ভিতরে বুঝতে পারা যায় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অতি বিপুল আবেগ সৃষ্টি ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত হলে কি অপরূপ কাব্য হতে পারে, বায়রণের 'চাইল্ড হ্যারল্ডের শেষের দিকে সমুদ্র-বন্দন তার এক বড় প্রমাণ।"

বলাবাহুল্য ওদুদ সাহেব বিদ্রোহী কবিতাটির প্রতি সুবিচার করেন নি। সমালোচনাটি অত্যন্ত কঠোর। দেশজুড়ে যখন বিদ্রোহী কবিতাটি নন্দিত তখন এরূপ সমালোচনা কোমল কবি-হৃদয়ে তীব্র আঘাত হেনেছিল সন্দেহ নেই। নজরুল তাঁর বক্তৃতার

মাঝে সেই সমালোচনার কথা উল্লেখ করে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন: 'বিদ্রোহী' কবিতাটি আমার গভীর অনুভূতি-লব্ধ জিনিষ, তীব্র বেদনা বোধ থেকে এর উৎপত্তি। যেদিন কবিতাটি লিখি প্রায় সারা রাত ঘুমুতে পারিনি।" মোটকথা কাজী সাহেবের আলোচনার বিরুদ্ধে সেদিন তরুণ কবির কণ্ঠে উত্তেজনা ঝরে পড়েছিল।

৩.

ঢাকায় থাকাকালীন ওতুদ সাহেব নজরুলের মধ্যে এক গভীর মহান আত্মমহিমা-বোধ লক্ষ্য করেছিলেন এবং সেকথা তিনি গর্ব ভরে তাঁর 'কবি নজরুল' গ্রন্থে লিখেছেন এই ভাবে: ..."প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে ঢাকার কয়েকজন খানবাহাদুর নজরুলের সঙ্গে এক আলাপ-আলোচনার আয়োজন করেছিলেন। ঠিক হ'য়ে ছিল গঙ্গায় এক বজরায় তাঁরা কবির সঙ্গে মিলিত হবেন। নির্দিষ্ট সময়ে খানবাহাদুরেরা সেই বজরায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। কিন্তু কবির দেখা নেই! অনেক কষ্টে কবিকে উদ্ধার করা গেল এক বন্ধু-সম্মেলন থেকে—তাঁর উচ্চ হাসি হয়ত দিয়েছিল তাঁর সন্ধান। কিন্তু যখন কবিকে বলা হলো সম্মানিত খানবাহাদুরেরা অনেকক্ষণ ধরে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছেন, তখন কবি বলেছিলেন, 'আমি দেশের কবি, খানবাহাদুর, রায়-বাহাদুর দুই পাশ থেকে আমাকে কুর্ণিশ করতে করতে এগিয়ে যাবে, এইত আমাদের মধ্যেকার সত্যকার সম্পর্ক।" নিঃস্ব গুণীর এমন আত্মমহিমাবোধের ইতিহাস বিশ্রুত দৃষ্টান্ত বেটোফেন। আমাদের দেশে নজরুল ভিন্ন আর কোনো দরিদ্রগুণী এমন কথা বলতে পেরেছেন বলে আমার জানা নেই।"

এরপর কাজী সাহেব দীর্ঘকালের জন্য ঢাকায় থেকে গেলেন আর নজরুল তখন ঝড়ের বহ্নিশিখা। সারা বাংলা দেশে আগুন জ্বালানো তাঁর কাজ। তাই পরস্পরকে দীর্ঘকাল বিচ্ছিন্ন থাকতে হয়েছিল। বেশ কিছুকাল পরে ওদুদ সাহেব অধ্যাপনার কাজ ছেড়ে দিয়ে সরকারের শিক্ষাবিভাগের উচ্চপদের চাকরী নিয়ে কলকাতায় এলেন তখন কবির সঙ্গে তাঁর পরিচয় আবার নিবিড়তর হতে পেরেছিল। এ সময় নজরুল সংগীত রচনায় নিমগ্ন; সংগীতের ক্ষেত্রে তিনি এমন তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন যে কারো মুখ থেকে তিনি সংগীতের নিন্দা সহ্য করতে পারতেন না। সঙ্গীতের সমালোচনা করলে যে তিনি বিশেষ ক্ষুণ্ণ হ'তেন এমন বহু প্রমাণ দেখেছেন ওদুদ সাহেব। এ সময় কবি বলতেন: "তোমরা আমার কবিতার সমালোচনা যত পার কর গান সম্পর্কে কিছু বলো না।"

৪.

নজরুলের ভিতর কেউ কোনো দিন প্রতিহিংসা—যা অধিকাংশ মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, মনোবৃত্তি দেখেন নি। প্রতিহিংসা বলে জিনিষটি তিনি জানতেন না। একদিনের ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কবি তখন সস্ত্রীক ৯।১ পানবাগান লেনের বাড়ীতে থাকেন। একদিন সকালের দিকে ওদুদ সাহেব তাঁর বাসায় গিয়ে গল্প করছেন এমন সময় এলেন সজনীকান্ত দাস। সজনীবাবুর সঙ্গে কবির তখন যথেষ্ট মনোমালিন্য রয়েছে এবং সেটি সম্ভবতঃ সজনীবাবুর দিক থেকেই। 'শনিবারের চিঠি' তখন নজরুলকে আক্রমণ না করে প্রকাশিতই হতো না। যা'

হোক সজনীবাবু এসে জানালেন যে তাঁর বইয়ের একটি ভূমিকা লিখে দিতে হবে কবিকে। নজরুল তখনই রাজী হয়ে গেলেন এবং অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে তখনই সেটি লিখে দিলেন। প্রতিটি পংক্তির মধ্যে সজনীবাবুর প্রতি তাঁর সহানুভূতি ও উচ্ছ্বাস ঝরে পড়েছিল। ভূমিকা নিয়ে সজনীবাবু চলে যেতেই ওদুদ সাহেবের দিকে তাকিয়ে মধুর হেসে কবি ঠিক এই কথাগুলি বলেছিলেন: "বেশ ইয়ার্কি আর কী!" কবির সে হাসিটুকু ছিল অত্যন্ত পবিত্র।

নিখিল বাংলা দেশে নজরুলের জনপ্রিয়তা তখন বিপুল। তিনি সারা বাংলার চারণ। তাঁর ডাকে সারা বাংলা দেশ সাড়া দেয়, সমাজ ব্যাকুল হয়ে আসে। বোধ হয় তাঁর এই আহ্বানের ক্ষমতা সম্পর্কে ১৯৪১ সালে একদিন তিনি ওদুদ সাহেবকে বলেছিলেন, "আল্লা ডাকবার ক্ষমতা আমায় দিয়েছেন, কিন্তু কি বলব তা আমি জানি না।"

শেষ জীবনে কবি তপ-জপের দিকে বিশেষরূপে আগ্রহী হ'য়ে ওঠেন। বর্তমান ব্যাধির কিছু কিছু সূচনাও তখন প্রকটিত হ'য়ে উঠেছে এমন সময় একদিন কাজী সাহেবের সঙ্গে দেখা হ'তে কবি বললেন: "আমি দেখলাম মুসলমানদের শয়তানে পেয়েছে।" কথাটি অত্যন্ত রূঢ়। কবি তাঁর সমসাময়িক সমাজের কোন চেহারা দেখে এমন মন্তব্য করেছিলেন—আমাদের পক্ষে তা' বুঝে ওঠা কঠিন। কালে হয়তো প্রমাণিত হ'বে কবির এই অতি রূঢ় মন্তব্যের ভিতর সত্য কতখানি ছিল।

এ ঘটনার পর আর দীর্ঘ দিন কবি সুস্থ থাকেন নি। বর্তমান ব্যাধির কবলে পড়ে সম্বিত হারালেন। কবিবন্ধু ওদুদ সাহেব দূর থেকে বন্ধুর অবস্থা দেখে নীরবে অশ্রুপাত করলেন। শেষের দিকে কতকটা তাঁর ও নজরুলের অন্যান্য বন্ধুর চেষ্টায় ও আগ্রহে ২৭-৬-১৯৫২ তারিখে গঠিত হল নজরুল নিরাময় সমিতি। এ

কমিটির সভাপতি শ্রীঅতুল গুপ্ত ও সম্পাদক হলেন কাজী আবদুল ওদুদ। উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃত চিকিৎসায় কবি ও কবি পত্নীকে নিরাময় করা। টাকা সংগৃহীত হলো সর্বমোট ২৭৫০৬৯/৫ পয়সা। এই সমিতির উদ্যোগে ২৩-৭-১৯৫২ তারিখ সস্ত্রীক কবিকে পাঠানো হল রাঁচির বিখ্যাত Mental Hospital-এ, কিন্তু বিশেষ ফল পাওয়া গেল না। ফলে কবিকে ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে ফিরিয়ে আনা হল কলকাতায়। ১৫-৫-১৯৫৩ তারিখেকবি ও কবি-পত্নীকে পাঠানো হল ইংল্যাণ্ডে—সঙ্গে গেলেন কবি পুত্র অনিরুদ্ধ ইসলাম, সমিতির সহ-সম্পাদক রবীউদ্দীন আহমদ এবং স্বেচ্ছাসেবিকা মিস লতিকা ঘোষ। Dr. Bennet অস্ত্রোপচারের কথা বলেন কিন্তু ভিয়েনার আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ডাক্তার Hans Hoft বলেন যে অস্ত্রোপচারে, আরোগ্য অপেক্ষা ক্ষতির সম্ভাবনা বেশী। ফলে মস্তিষ্ক অস্ত্রোপচারের বিষয়ে সমিতি মত দিতে পারলেন না। Dr. Hans Hoft-এর ব্যবস্থা-পত্র সমেত ১৫-১২-১৯৫৩ তারিখে কবিকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনা হয়।

কেবল নজরুল নিরাময় সমিতি গঠন নয়, নজরুলের সৃষ্টির আদর্শে একটি সমালোচনা গ্রন্থ রচনা করেছেন ওদুদ সাহেব। এ সমালোচনা গ্রন্থটি একদিকে যেমন আবেগ বাহুল্যহীন, অন্যদিকে তেমনি তথ্যনিষ্ঠ। বন্ধুর প্রতি বন্ধুর ভালবাসা ও আন্তরিকতার পরিচয় এ ছাড়া আর কি হতে পারে!

জমিরউদ্‌দীন খান

বাংলার সংগীত-শিল্পের ইতিহাসে ওস্তাদ জমিরউদ্দীন খান সাহেবের নাম স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে। প্রকৃতপক্ষে সুরের ছোঁয়ায় বাংলা সংগীতকে যাঁরা সজীব এবং জনপ্রিয় করেছেন—তাঁদের মধ্যে ওস্তাদ জমিরুদ্দীন খান নিঃসন্দেহে অন্যতম একজন।

ওস্তাদ জমিরুদ্দীন খান ছিলেন H. M. V. গ্রামোফোন কোম্পানির chief trainer আর নজরুল ছিলেন Head Composer. এই সময় উভয়ের মাঝে আলাপ-পরিচয়, পরে সে পরিচয় গভীরতর হয় এবং উভয়ের মাঝে গুরু-শিষ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়। উভয়ের মধ্যকার সে প্রীতির সম্পর্ককে তুলে ধরার আগে আধুনিক পাঠকের কাছে অপরিচিত এই ওস্তাদজীর একটা সাধারণ পরিচয় আবশ্যক।

বাংলা সংগীত যাঁর অসামান্য দানে সমৃদ্ধ সেই লোকটি আসলে কিন্তু বাঙালীই নন। ওস্তাদ জমিরুদ্দীন খান ছিলেন পাঞ্জাবী। অতি শৈশবে তিনি বাংলা দেশে আসেন এবং বাংলা দেশকে আপন করে নেন। জনসমক্ষে তিনি নিজেকে অধিকাংশ সময়ে পাঞ্জাবী বলে পরিচয় দিতেন না—সর্বদা বাঙালী বলে আত্মপরিচয় দিতেন এবং সে জন্যে তাঁর গর্বের অন্ত ছিল না। সংস্কৃতির শিরোমণি বাংলা দেশকে তিনি মনে প্রাণে ভালবেসেছিলেন।

রাজকীয় চেহারা ছিল খান সাহেবের। দীর্ঘ, ঋজু, বলিষ্ঠ দেহ,

উজ্জ্বল রং, গায়ে আদ্দির শৌখিন পাঞ্জাবি, পরনে কোঁচানো শান্তিপুর ধুতি আর একজোড়া মনোরম গোঁফ। এই নিয়ে তিনি যখন মিষ্টি করে সহজ ঘরোয়া বাংলায় আলাপ করতেন তখন মনে হ'তো সারা বাংলার সংস্কৃতি তাঁর কণ্ঠে কথা কইছে। এই দেবদূতের মত লোকটির প্রথম দর্শনে যে কেউ অভিভূত হয়ে পড়তেন।

নজরুলও তাই হ'য়েছিলেন। প্রথম দর্শনে সবাইয়ের মত তিনিও খান সাহেবকে 'ওস্তাদজী' বলে সম্বোধন করেছিলেন—তাঁর এই প্রথম সম্বোধনে হয়তো কিছু ব্যঙ্গ মিশেছিল; কিন্তু ক্ষণিকের জন্য। নজরুল তখন খান সাহেবের চেম্বারেই বসে ছিলেন—হঠাৎ সুরারোপের জন্যে একটি গান নিয়ে এলেন এক ভদ্রলোক। প্রথমে খান সাহেব অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে শুনলেন, তারপর নিজে পড়লেন এবং তার মিনিট দুই পরেই হারমোনিয়াম নিয়ে বসলেন, সুর সংযোজনা করলেন। অপূর্ব কণ্ঠ, অপূর্ব সুর! সম্পূর্ণ নতুন, সম্পূর্ণ মৌলিক! কণ্ঠের অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য ও ক্লাসিক্যাল বৈভব দেখে নজরুল একেবারে অভিভূত হ'য়ে পড়লেন। তিনি আবেগভরে খান সাহেবকে ডাকলেন, ওস্তাদজী। এ আবেগ-ব্যাকুল কণ্ঠ থেকে ব্যঙ্গাত্মক ধ্বনি ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে।

সমকালীন বাংলার সকল হিন্দু-মুসলিম গায়ক ছিলেন জমিরুদ্দীন খানের শিষ্য। তাঁর কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ না করে উপায় ছিল না। কণ্ঠের অপূর্ব কারুকার্য ও সুরের স্বর্ণমৃগ দিয়ে তিনি নিকটে আকর্ষণ করতেন সবাইকে। আঙ্গুরবালা, ইন্দুবালা, কমলা ঝরিয়া, এঁরা সকলেই খান সাহেবের শিষ্যা এবং বলতে গর্ব হয় খান সাহেবের দৌলতেই নিখিল বাংলায় আজ এঁদের এত নাম। পল্লীগীতি গায়ক হিসেবে আব্বাসউদ্দীনের তখন বেশ সুনাম। নজরুল গায়কের কণ্ঠে সূক্ষ্ম কারুকার্যের কিছু অভাব লক্ষ্য করলেন এবং তার কিছু দিন পরে খান সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দিলেন আব্বাসউদ্দীনকে। আব্বাসউদ্দীন ওস্তাদজীর সুর-সৃষ্টি

সম্পর্কে লিখেছেন: "একখানা গান দেওয়া হ'ল, গানখানা তিনি একবার পড়লেন, ব্যস হারমোনিয়াম নিয়ে তক্ষুণি সুর হ'য়ে গেল। এত বড় ত্বরিৎ সুরস্রষ্টা দেখিনি জীবনে, দেখব কিনা আর জানি না। সে সুরে কী যে যাদু মেশান থাকত জানি না, বাজারে রেকর্ড বেরোবার সাথে সাথেই বিক্রি হত গরম জিলিপীর মত। একবার দু'খানা গান নিয়ে যাই তাঁর কাছে। বললাম, 'ওস্তাদজী, আমার বড় ইচ্ছা আপনার দেওয়া সুরে দু'খানা বাংলা গান গাই।'...সেই মুহূর্তেই কী অপরূপ সুর করলেন। কবি গোলাম মোস্তাফার গানের বাণী সুরের স্পর্শে হ'ল মূর্তিমতী। একখানা হ'চ্ছে, 'ফিরে চাও বারেক ফিরে চাও, হে চির নিঠুর প্রিয়া'। আর একখানা 'সে তো মোর পানে কভু ফিরে চাহে না হায়।'... ওস্তাদজীর বাসায় বহুবার ঘরোয়ানা মজলিশে বড় বড় ওস্তাদের গান বাজনা শোনার সৌভাগ্য হ'য়েছে আমার। ওস্তাদ এনায়েত হোসেন খাঁর সেতার, প্রফেসর আজিম খাঁর তবলা, প্রফেসর ছোটে খাঁর সারেংগী, এমনি কত কী।"....

নজরুলের গানে যে ক্লাসিক্যাল তান লয়ের আধিক্য লক্ষ্য করা যায় আমার মনে হয় তার অনেকখানি খান সাহেবেরই দান। তিনি দীর্ঘ দিন খান সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে আন্তরিকতার সঙ্গে গান শেখেন। সুরের কারুকার্য, তার বহুবিচিত্র গতিপথ এবং নতুন সুর সৃষ্টির ইংগিতের প্রতি এই সময়েই তিনি আকৃষ্ট হ'ন।

নজরুলের গান বাংলার চিরন্তন সম্পদ। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে অধিকাংশ গানের কথা অত্যন্ত দুর্বল এবং মিলের অক্ষম প্রয়োগ সুপাঠ্য নয়। কবিতাটি পড়লেই তার মধ্যকার ভাবসম্পদ অনেক সময় সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে না—সেটি সুরের কসরতের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু রবীন্দ্র-সংগীতে কথাই যথেষ্ট। জনাব আবদুল কাদির 'নজরুলের গানে কথা ও সুর' শীর্ষক একটি দুর্লভ সুন্দর সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে বাংলা সংগীতের এই দুই দিকপাল

সম্পর্কে লিখেছেন: "রবীন্দ্রনাথের...গানের আবেদন আমাদের রসালু চিত্তের কাছে পৌঁছিতে উস্তাদী কসরতের অপেক্ষা রাখে না। এই গান নিঃসঙ্গ জগতের গান, এক প্রশান্ত আত্মবিরহের রসে ইহা উদাস হইয়া আছে।...অন্যপক্ষে নজরুল ইস্‌লাম সুর-ঝঙ্কারে প্রথম মত্ত হইয়া ওঠেন, কী সুরে গানটি বাঁধিবেন সেইটিই তাঁর আসে প্রথম; তারপর সেই সুরে ফেলিয়া শব্দ সংযোজনা করিয়া দেন। এজন্য তাঁর গানে রাগের রূপাবলী অপেক্ষাকৃত অধিক। কিন্তু অতুলপ্রসাদের গানের মতো তাহা সহজ ও সুনিপুণ বিন্যাস লাভ করিয়া নাই—অর্থকে সুপ্রকট করার জন্য তাহা তানের বিস্তার বা গলার কসরতের অপেক্ষা রাখে, আলাপে যথেষ্ট হয় না।...

তাঁর 'বুল্‌বুল্‌'-এর পরের রচিত অনেক গানে কাব্যের ঝলক অপেক্ষাকৃত কম দেখা যায়, এবং সে সবও অভিনব ভাবের প্রেরণায় কোন নবসৃষ্টি নয়। বস্তুতঃ, সুরের বৈচিত্র্যের জন্যই এখন তাঁর দরদ, কথার জন্য খুব নয়। উচ্চতর ভাবতন্ত্রের মধ্যে যদি তাঁর গানের কথার জন্ম হইত, তবে তাহা আমাদের চিত্তকেও উচ্চগ্রামের রস-পরিবেশনের ক্ষেত্রে আমন্ত্রিত করিয়া নিতে পারিত। কিন্তু তাঁর গানের আবেদন সেদিক দিয়া ততখানি সার্থক কোথায়। বস্তুর গভীরতম সত্তায় অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তার নিগূঢ়তম রহস্য, অন্য কথায়, তার ঐক্য-রাগ (melody) মণ্ডিত হইয়া মন যে কথা বলে তাহাকে বলা যাইতে পারে musical thought; সমস্ত অন্তরতম কথাই হইতেছে melodious, স্বভাবতঃ গানে তার অভিব্যক্তি; গান হইতেছে সেই অস্পষ্ট অতল কথা যাহা আমাদিগকে অনির্বচনীয়র মুখোমুখি দাঁড় করাইয়া দেয়, মুহূর্তের জন্য তাঁর স্পর্শ লাভের অধিকার দেয়। নজরুলের সদ্য প্রকাশিত 'জুলফিকার' ও 'বনগীতি'তে সেই musical thought, সেই passionate language—যেখানে mere accent অপেক্ষা

finer chant অধিক—আশানুরূপ কিনা সন্দেহ হয়। উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে নীতি কবিতার যাহা বৈশিষ্ট্য—rythmical melody-তে একটি ইমোশন বা আইডিয়ার সম্পূর্ণতা, Lilt এবং abandonment—তাহাও কতখানি আছে বিচার্য। গীতিকবিতা যেন পথিপার্শ্বিক পুষ্পের একটু সুরভি,—সুরের জটিল আলাপের মধ্যে যদি তাহাকে উপভোগ করিতে হয়, তবে সেরূপ রসচর্চা অনেকখানি বিড়ম্বনা বৈকি।"

নজরুল-সংগীতে সুরের 'জটিল আলাপের' এই যে মোহজাল, এই যে একাধিপত্য—আমার তো মনে হয় এর সবটুকুর জন্য কবি খান সাহেবের নিকট ঋণী। ভাবের আবেগে সংগীত রচনা করেছেন তিনি খুব কম সময়, হারমোনিয়াম নিয়ে বসেছেন, পাশে রাখা আছে পানের বাটা, চায়ের কেট্‌লি, খোলা কাগজ আর কলম। হারমোনিয়াম বাজিয়ে প্রথম্ সুর তুলছেন, সেই সুরে খাতায় লিখছেন গানের কলি। আবার সুর ভাঁজছেন আবার লিখছেন। এমনি করে গান সমাপ্ত করছেন। ফলে গানের প্রতি কলিতে সুরের উত্থান-পতন, তান-লয়ের লীলাখেলা সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। এবং এ সকল ওস্তাদী সুর তিনি শিক্ষালাভ করেছেন জমিরুদ্দীন খানের কাছে। বাল্যজীবনে নজরুল কোথাও নিয়ম-নির্দিষ্টরূপে সংগীত শিক্ষা করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। লেটো দলে থাকা কালীন তিনি কিছুটা ঐ সুরে অভ্যস্ত হয়েছিলেন সত্য কিন্তু এ সুর তাঁর সংগীতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেনি। আসানসোলে রুটির দোকানে কাজ করার সময় তিনি সুর ও সংগীতের চর্চা করতেন কিন্তু সেও পরনিরপেক্ষ হ'য়ে। সৈনিক জীবনে ওস্তাদের নিকট সংগীত শিক্ষা করার কোনো অবকাশই তাঁর ছিল না। মোটকথা কবির জীবনী আলোচনা করলে দেখা যায় একমাত্র ওস্তাদ জমিরুদ্দীন খান সাহেব ছাড়া তিনি কারো নিকট নিয়ম-নির্দিষ্টরূপে

সংগীত-শিক্ষা করেননি। তাই—এ কথা আজ মুক্ত কণ্ঠেই স্বীকার করতে হ'বে নজরুল-সংগীতকে যদি কেউ তান লয়ে অনবদ্য-অপরূপ করে থাকেন তিনি ওস্তাদ জমিরুদ্দীন খান।

খান সাহেবের সংগীত-পারদর্শিতায় নজরুল মুগ্ধ হ'য়েছিলেন এবং নিজেকে তিনি "ওস্তাদ জমিরুদ্দীনের একজন দীন ভক্ত সাগরেদ" বলে গর্ব অনুভব করেছেন। কবির কথায়ঃ "আমি ওস্তাদ জমিরুদ্দীনের একজন দীন ভক্ত সাগরেদ। আমি নিজে, গোলাম মোস্তফা ও আব্বাসউদ্দীন তাঁর কাছে গান শিখেছি। বাঙলার হিন্দু-মুসলমান তরুণ গায়কেরা, যাঁরা সংগীত জগতে নাম কিনেছেন, তাঁরা প্রায় সবাই ওস্তাদ জমিরুদ্দীনের শিষ্য।...জমিরুদ্দীন খান সাহেব ছিলেন খান্দানী গাইয়ে। তিনি ঠুংরী-সম্রাট। ওস্তাদ মইজুদ্দীন খানের পর তাঁর মত ঠুংরী-গাইয়ে আর কেউ ছিলেন না; এখন তো নাই-ই।"

কেবল সুর-সম্রাট এবং ঠুংরী-সম্রাট হিসেবেই নয়—আদর্শ মানুষ হিসেবে খান সাহেব নজরুলের বিশেষ শ্রদ্ধার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। খান সাহেবের উদার অসম্প্রদায়িকতা নজরুলকে মুগ্ধ করেছিল। তাঁর এই মানবিকতার দিক সম্পর্কে কবি লিখেছেনঃ "জমিরুদ্দীন পাঞ্জাবী ছিলেন সত্য, কিন্তু মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে।"

নজরুল তখন ৮।১ পানবাগান লেনে আস্তানা পেতেছেন। নানা সম্প্রদায়ের লোকজনের আগমনে বাড়ীটি মুখর। ওস্তাদও আসতেন মাঝে মাঝে—তখন বসত গানের আসর। সুরে সুরে বাড়ীখানি যেন উন্মনা হ'য়ে উঠত। অধিকাংশ সুর, আলাপ ও রাগিণী তিনি এই বাড়ীতে বসেই শিক্ষালাভ করেছেন।

ওস্তাদের প্রতি গভীর অনুরাগের জন্য কবি তাঁর "বনগীতি" কাব্যপুস্তকখানি খান সাহেবের নামেই উৎসর্গ করেন। উৎসর্গ পত্রে তিনি লেখেনঃ

"ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত কলা-বিদ্
আমার গানের ওস্তাদ জমিরউদ্দীন খান
সাহেবের দস্ত মোবারকে"—

এরপর ওস্তাদের উদ্দেশ্যে রচিত বার পংক্তির একটি কবিতা। কবিতাটির প্রতি ছত্রে খান সাঁহেবের প্রতি কবির কৃতজ্ঞতা যেন ঝরে পড়েছে। কবিতাটির প্রথম দুই এবং শেষ দুই পংক্তি এই ঃ

তুমি বাদশাহ্ গানের তখ্‌তে তখ্‌ত নশীন্,
সুর-লায়লীর দীওয়ানা মজ্‌নু প্রেম-রঙ্গীন্।...
...সুর-শা'জাদীর প্রেমিক পাগল হে গুণী তুমি,
মোর "বন-গীতি" নজ্‌রানা দিয়া দস্ত্ চুমি।

কলিকাতা —নজরুল ইস্‌লাম
১লা আশ্বিন, ১৩৩৯

ওস্তাদ জমিরুদ্দীন খান ও নজরুলের সম্পর্ক ও পরিচয়ের গভীরতা নিয়ে আজ পর্যন্ত কোথাও কোনো আলোচনা হয় নি। হলে হয়তো অনেক অজ্ঞাত তথ্যের দ্বারোদ্‌ঘাটন হ'বে। নজরুলের অধিকাংশ কবিতা হয়তো কালগর্ভে বিলীন হ'য়ে যাবে কিন্তু তাঁর সংগীত? আদর্শ প্রথম শ্রেণীর সংগীত তিনি অসংখ্য লিখেছেন এবং সুরের দিক দিয়েও সেগুলি অনবদ্য। এবং আমার বিশ্বাস সংগীতের ক্ষেত্রে নজরুল অমর। আর এ কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় নজরুল-সংগীতের সুরারোপে খান সাহেবের অবদান সর্বাধিক। সুতরাং কোনো সহৃদয় অভিজ্ঞ ব্যক্তি যদি এই দুই মহান সংগীত-শিল্পীর সম্পর্ক-সম্বন্ধটি তুলে ধরেন তা' হ'লে একটি বড় কাজ করা হয়।

এই অমর সংগীত-শিল্পী ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর পরলোক গমন করেন। কলকাতায় একটি শোকসভা অনুষ্ঠিত

হয় ১০ই ডিসেম্বর। এই অনুষ্ঠানের সভাপতির আসন হ'তে কবি নজরুল যে অভিভাষণটি পাঠ করেন নানা কারণে সেটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুদীর্ঘ অভিভাষণটির সর্বশেষাংশে তিনি বলেন: "গ্রামোফোন কোম্পানির রেকর্ডে তিনি (ওস্তাদ জমিরুদ্দীন খান) হাজার হাজার সুর রেখে গিয়েছেন। যে কোনো সুর তিনি adopt করতে পারতেন। বহু নূতনতর সুর তিনি আবিষ্কার করে গিয়েছেন।...তাঁর নামকে অক্ষয় করে রাখতে হ'লে ইউনিভার্সিটির সাহায্য নিয়ে একটা classical music চেয়ার সৃষ্টি করা দরকার, কিংবা তাঁর নামে ইউনিভার্সিটি থেকে একটি মেডেল ঘোষণা করা দরকার। সেজন্যে যে টাকা প্রয়োজন তা' একটা কমিটি গঠন করে করতে হ'বে। তাঁর হিন্দু-মুসলমান হাজার হাজার কৃতী ছাত্র রয়েছে। আমরা যদি এ কাজ করি তবে একটা কাজের মত কাজ করা হ'বে। দেশ যদি স্বাধীন হয়, তবে সেদিন জমিরুদ্দীনের কদর হ'বে। কিন্তু আমাদের পরবর্তী যুগে আমাদের বংশধররা যেন সেদিন মনে করবার অবসর না পায় যে, আমরা নির্বোধ ছিলাম, গুণীর আদর করতে জানতুম না।"...

বলাবাহুল্য কবির সে ইচ্ছা এবং প্রস্তাব কোনোটি পূর্ণ হয়নি।

ওস্তাদ জমিরুদ্দীন খানের মৃত্যুর পর নজরুল তাঁর পদে —H. M. V-র Chief Trainer—অধিষ্ঠিত হন।

শামসুন্নাহার মাহমুদ

এই সেদিন পর্যন্ত—বিংশ শতকের দ্বিতীয়, তৃতীয় দশকে বাংলার একজন মুসলমান মেয়ের পক্ষে উন্মুক্ত প্রকৃতির বুকে দাঁড়িয়ে মুক্ত আলো-হাওয়া গ্রহণ করা সহজ ছিল না। এই পরিবেশে বেগম শামসুন্নাহারের জন্ম এবং লালন। সুতরাং কবি নজরুলের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় চাক্ষুষ ঘটেনি, ঘটেছিল পত্র-পত্রিকার মারফত। মাসিক পত্র-পত্রিকায় কবির লেখা পড়ে তিনি মুগ্ধ হতেন। ভাই-বোনে (হবিবুল্লাহ বাহার এবং শামসুন্নাহার) মাঝে মাঝে এ নিয়ে আলোচনা হতো। অবশ্য নজরুলের কবিতা সুষ্ঠুভাবে বোঝা এবং উপলব্ধি করার বয়স তখনো শামসুন্নাহারের হয়নি—তবুও কবিতার উদ্দামতা তাঁকে মুগ্ধ করতো। তিনি তখন বাড়ীতে বন্দিনী। ন' বছর বয়সেই চট্টগ্রাম খাস্তগীর বালিকা বিদ্যালয় হতে পড়াশোনার পাট চুকিয়ে হারেমের মধ্যে বন্দিনী হতে হয়েছিল তাঁকে। তারপর পর্দা দেওয়া জানালার পাশে বসে প্রাইভেট শিক্ষকের কাছে কেমন ভাবে এ্যালজেবরা, জিওমেট্রি আয়ত্ত করে তিনি ম্যাট্রিক; আই, এ,; বি, এ এবং এম, এ পাশ করলেন সে অবশ্য অন্য ইতিহাস।

বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে কবিতায়, গানে নজরুল তখন তৎকালীন বাংলা দেশকে মুখরিত করে তুলেছেন। এদিকে হবিবুল্লাহ বাহার চট্টগ্রামের ছাত্রদল এবং তরুণ সমাজকে উৎসাহিত করে তুলেছেন—'নজরুলকে চট্টগ্রামে আনা চাই'। নজরুলকে—তরুণ কবিকে দেখার জন্যে চট্টগ্রামের যুব-সমাজ যখন ব্যাকুল, কবির নিকট দাওয়াত নিয়ে গেলেন হবিবুল্লাহ বাহার। কবি সে আহ্বানে সাড়া দিলেন। যুব-সমাজের আন্তরিক আহ্বানে কবি ১৯২৬ থেকে ১৯২৯ সালের মধ্যে বার দুই-তিন চট্টগ্রামে আসেন। বলা বাহুল্য তিনি বাহার-নাহারদের বাড়ীতেই আস্তানা গাড়েন। অবশ্য এ ব্যাপারে বাহার-নাহার ছাড়াও তাঁদের আম্মা ও নানীআম্মার আগ্রহ কম ছিল না।

এই প্রথম আগমনের পূর্বেই কবি সম্পর্কে একটি ধারণা গড়ে উঠেছিল বেগম শামসুন্নাহারের মনে। বেগম শামসুন্নাহার সাহেবার স্বামী তখন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র আর এই কলেজের পাশেই বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিস, যে অফিসের মধ্যমণি তরুণ কবি নজরুল ইসলাম। এই অফিসে বেগম শামসুন্নাহার সাহেবার স্বামী মাঝে মাঝে যাতায়াত করতেন এবং কবির সঙ্গে তাঁর হৃদ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। স্বামীর নিকট থেকেই বেগম শামসুন্নাহার কবির মোটামুটি পরিচয় সংগ্রহ করেছিলেন।

২.

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে নজরুল যখন প্রথমবার চট্টগ্রামের মাটিতে পা দিলেন সমগ্র শহরটা যেন বাঁধভাঙা আনন্দে

উদ্বেলিত হয়ে উঠল। নজরুল যখনই যেখানে গেছেন সঙ্গে সঙ্গে সে এলাকার আবহাওয়া পাল্টে গেছে। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে যখন তিনি বহরমপুরে এলেন, হৈ-চৈ পড়ে গেল চারিদিকে। মেদিনীপুরে যেতে একই অবস্থার সৃষ্টি হলো। কুমিল্লার মাটি স্পর্শ করতেই সমগ্র শহর যেন গানে-কবিতায়-আন্দোলনে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। কলকাতার সমগ্র-সাহিত্যিক মহলে তো রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। চট্টগ্রামেও ঠিক অনুরূপ আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। তরুণ দল ছুটল প্রাণের আবেগে, যুবকদল মেতে উঠল কবি-সংবর্ধনায়; এক দিকে শোনা গেল কবির উদাত্ত স্বদেশী গীতি, অন্যদিকে গজল গানের বিহ্বলতা। আন্দোলনে, অনুষ্ঠানে, সঙ্গীতে সমগ্র শহর মাতোয়ারা, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার অন্তর উদ্বেলিত। প্রাণ থাকলেই গান জাগে। উদার নীলাকাশের তলে নজরুল যেন গানের জলসাই বসিয়েছিলেন। এমন স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণপ্রবাহ, মেতে যাওয়া ও মাতানোর অসাধারণ ক্ষমতা আর কোন কবি-সাহিত্যিকের মধ্যে বিশেষ দেখা যায়নি।

চট্টগ্রামে অবস্থানকালে কবির দিনগুলি ছিল কর্মবহুল। কোন দিন তরুণদের আহ্বানে তিনি জনসভায় বক্তৃতা করছেন, কোনদিন বা চট্টগ্রামের জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে প্রাচীন এডুকেশন সোসাইটির বার্ষিক উৎসব উদ্বোধন করছেন, কোনদিন খানবাহাদুর আবদুল আজীজের সমাধির তীরে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন, আবার কোনদিন বা কবি নবীনচন্দ্র সেনের স্মৃতি-বার্ষিকীতে পাঠ করছেন স্বরচিত কবিতা। এছাড়া গৃহে গৃহে গানের বৈঠক তো আছেই। চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশও নিস্তব্ধ ছিল না। তরুণ দলকে সঙ্গে নিয়ে কোনদিন ঘোড়ায় চড়ে চললেন সীতাকুণ্ড পাহাড় আরোহণে, কোনদিন বা ঝাঁপিয়ে পড়লেন নদী-নালায়, কোনদিন পা বাড়ালেন বন-জঙ্গলের দিকে, আবার কোনদিন বা সাম্পান-ওয়ালাদের নৌকায় বসে চললেন নৌকা বিহারে কর্ণফুলী নদীর

মাঝ দিয়ে সাগরের মোহনায়। চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশ যে কবির মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং এগুলিই যে তাঁর কয়েকটি শ্রেষ্ঠ কবিতা রচনার উৎস-ভূমি হিসেবে কাজ করেছে সে কথা বলাই বাহুল্য। নজরুল-কাব্যের একটি শ্রেষ্ঠ অংশ রচিত হয়েছে চট্টগ্রামে। সারাদিন হৈ-হুল্লোড়ের মাঝে কাটিয়ে কবি মধ্যরাত্রে বাসার ফিরতেন। খাবার ঢাকা দেওয়া থাকত, থাকত পান আর কেটলি ভরা চা, আর টেবিলের ওপর সযত্নে রক্ষিত থাকত খাতা-কলম। বলা বাহুল্য, অলক্ষ্যে থেকে বেগম শামসুন্নাহার সাহেবাই এগুলি গুছিয়ে রাখতেন। রাত গভীর হতে কবি তন্ময় হয়ে যেতেন, আত্মস্থ হয়ে সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করতেন, শতধারায় তাঁর কবিতা উৎসারিত হয়ে উঠত। এ সময়ে রচিত 'স্তব্ধ রাতে' কবিতায় তিনি লিখেছেন :

> 'থেমে গেছে রজনীর গীত কোলাহল,
> ওরে মোর সাথী আঁখি জল—
> এইবার তুই নেমে আয়
> অতন্দ্র এ নয়ন পাতায়।'

নীরব নিশীথে কবি একেবারে ধ্যানস্থ হয়ে যেতেন। এ মানুষটি যেন সম্পূর্ণ আলাদা, হাস্যোতরোল নজরুল নন, কবি নজরুল। দিনের উজ্জ্বল আলোকে যিনি রাজনৈতিক আন্দোলন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক হট্টগোলের মাঝে রয়েছেন, সভা-সমিতি, সঙ্গীত ও বক্তৃতা-মজলিসে ব্যস্ত থাকছেন, রাতের গহন-গভীর অন্ধকারে নিখিল বিশ্বপ্রকৃতি তাঁকেই যেন নিবিড় ভাবে আকর্ষণ করছে, হাতে তুলে দিচ্ছে সোনার চাবি-কাটি। চট্টগ্রামের গিরি-দরি-বন উন্মুক্ত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর সৃষ্টিতে। কবির এই তন্ময়তা সম্পর্কে ১১-৮-২৬ তারিখে কৃষ্ণনগর থেকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি বেগম শামসুন্নাহার সাহেবাকে লিখেছেন :—

"আমার পনেরো আনা রয়েছে স্বপ্নে বিভোর সৃষ্টির ব্যথায় ডগমগ, আর এক আনা করছে পলিটিক্স, দিচ্ছে বক্তৃতা, গড়ছে সংঘ। নদীর জল চলেছে সমুদ্রের সাথে মিলতে, দুধারে গ্রাম সৃষ্টি করতে নয়। যেটুকু জল তার ব্যয় হচ্ছে দু'ধারের গ্রামবাসীদের জন্য, তা তার এক আনা। বাকী পনেরো আনা গিয়ে পড়ছে সমুদ্রে। আমার পনেরো আনা চলেছে আর চলেছে সৃষ্টি দিন হতে আমার সুন্দরের উদ্দেশে। আমার যত বলা আমার সেই বিপুলতাকে নিয়ে, আমার সেই প্রিয়তম, সুন্দরতমকে নিয়ে।...."

সারাদিন প্রায় হট্টগোলের মাঝে কাটিয়ে কবি গভীর রাত্রিতে এইভাবে সৃষ্টি-স্বপ্নে আত্মনিয়োগ করতেন। 'সিন্ধু হিন্দোল' কাব্যের সকল কবিতা চট্টগ্রামের মাটিতে বসে লেখা। নবীনচন্দ্র সেনের স্মৃতি-বার্ষিকীতে গিয়ে তিনি বললেন, 'অজয়ের কবি আজ কর্ণফুলীর কবিকে অর্পণ করতে এসেছে শ্রদ্ধাঞ্জলি। চট্টগ্রামের শিক্ষাগুরু আবদুল আজীজের উদ্দেশে রচনা করলেন 'বাংলার আজীজ'। বেগম শামসুন্নাহার সাহেবাদের জানালার পাশে পুকুরের কিনারায় এক লাইনে ন'টি সুপারি গাছ ছিল। শ্রেণীবদ্ধ থাকায় গাছগুলিকে দেখতে বিশেষ করে চন্দ্রের আলোকে, অদ্ভুত মনে হতো। আসন্ন বিদায়ের পটভূমিকায় এই সুপারি গাছগুলিকে নিয়ে তিনি লিখলেন 'বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি ঃ

...."বিদায় হে মোর বাতায়ন পাশে
নিশীথ জাগার সাথী,
ওগো বন্ধুরা পাণ্ডুর হয়ে
এল বিদায়ের রাতি।
আজ হতে হ'ল্ বন্ধ আমার
জানালার ঝিলিমিলি,
আজ হতে হ'ল বন্ধ মোদের
আলাপন নিরিবিলি।"....

৩.

সুপারি গাছগুলিকে নিয়ে লেখা এই কবিতাটি রচিত হবার পরদিন বেগম শামসুন্নাহার সাহেবার আম্মা তাঁর তিন মাসের দৌহিত্রকে (বেগম শামসুন্নাহার সাহেবার জ্যেষ্ঠ সন্তান) পাঠিয়ে দিলেন কবির কাছে। শিশুটিকে কবি খুবই স্নেহ-আদর করতেন। বেগম শামসুন্নাহার সাহেবার আম্মা সুকৌশলে বললেন, 'আচ্ছা, জানালার পাশে ও গুবাক তরুগুলো সুন্দর, না এই শিশুটি!' কবি জিজ্ঞাসার অন্তর্নিহিত ভাব উপলব্ধি করে হো হো করে হেসে উঠে বললেন, 'আম্মার মনের কথা জেনেছি।' সেদিন রাত্রেই রচিত হল 'শিশু যাদুকর' কবিতাটি:

"পার হয়ে কত নদী, কত সে সাগর
এই পারে এলি তুই, শিশু যাদুকর।

...লায়লার পারে দুয়ে নাহারের কোল
আলো করি এলি কে রে পুষ্প বিভোল।

পেলি হেথা ঠোঁট-ভরা মধু চুম্বন
আমি দিনু হাতে তোর নামের কাঁকন।

যাদু মোর কি দিবে এ ভিখারী আশিস,
সুন্দর হয়ে যেন ধরায় বাঁচিস।"

কবি এই শিশুটির নামকরণ করেছিলেন। নামকরণের মধ্যেও বীরত্ব প্রীতির মনোভাব রয়েছে। কবি ডাক-নাম দিয়েছিলেন 'শেলী',

আর ভাস নাম দিয়েছিলেন 'সোহরাব'। কবিদের মধ্যে নির্ভীক শেলীর চরিত্র এবং 'সোহরাব-রোস্তম' কাহিনীর সোহরাব চরিত্র কবিকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করতো। সোহরাব নামটির সঙ্গে একটি বিয়োগান্ত কাহিনী জড়িত থাকায় এ নামটি ধীরে ধীরে চাপা পড়ে গিয়েছিল।

৪.

প্রতিদিন সকালে উঠে বাহার-নাহার ভাই-বোনের প্রথম কাজ হতো কবি কী লিখেছেন সেগুলি উল্টে-পাল্টে দেখা। একদিন কথার ছলে বাহার সাহেব বললেন, 'আচ্ছা কবিদা—এবার শিশুদের উপযোগী কিছু লেখ দেখি।' পরদিন সকালে কবির খাতায় পাওয়া গেল শিশুদের উপযোগী একটি নিত্যকালীন সম্পদ—'সাত ভাই চম্পা'। এ কবিতায় এক এক ভাই তাদের নিজেদের সংকল্পের কথা প্রকাশ করেছে—যেমন প্রথম ভাই বলেছে :

আমি হব সকাল বেলার পাখী—
সবার আগে কুসুমবাগে
উঠব আমি ডাকি।'...

দ্বিতীয় জন বলেছে :

'আমি সাগর পাড়ি দেব,
আমি সওদাগর
সাত সাগরে ভাসবে আমার
সপ্ত মধুকর।......

এখানে উল্লেখযোগ্য, কবি সাত ভাইয়ের সকলের সংকল্প লিখে শেষ করতে পারেননি—তিন কি চারজনের বাসনাকেই তিনি

কবিতায় প্রকাশ করেছেন। চট্টগ্রামের সীমাভি‌‌‌‌মী হৈ-হুল্লোড় কবিতাটির সমাপ্তি-পথে প্রধান বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এইভাবে চট্টগ্রামে লিখিত অনেকগুলি কবিতার উৎসমূল হিসেবে বাহার-নাহার সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন।

৫.

কবির হাস্যরসিকতার কিছু কিছু উপকরণ আমরা বেগম শামসুন্নাহার সাহেবার লেখার মধ্যে পেয়েছি। কবি থাকেন তখন ৮।১, পান বাগান লেনে। একবার কবির পান খাওয়া ও অবিশ্রাম গান সম্পর্কে অভিযোগ উঠতেই তিনি হেসে বললেন, 'থাকি আমি পান বাগানে—পান আর গান আমার চাই-ই।'

নজরুল-স্বভাব যাঁরা অনুধাবন করেছেন তাঁরা জানেন, কবি নিজের সম্পর্কে চিরদিনই উদাসীন ছিলেন। মিসেস এস, রহমান ছিলেন কবির মাতৃস্থানীয়া। তিনি কবির জন্য 'বিনি সূতোর' একখানি চাদরের কথা বেগম শামসুন্নাহার সাহেবাকে লিখেছিলেন। সে সম্পর্কে কবির নিকট একটি চিঠি দিতে তার উত্তরে তিনি লিখে পাঠালেন, 'বিনি সুতোর' চাদরের কথা আমার বিনি গোচর। সে মা-ই জানেন, আর তোমরাই জান।'

১৯৪০ সালের মাঝামাঝি সময়। বেগম শামসুন্নাহার সাহেবারা তখন থাকতেন ভবানীপুরের পুলিশ হাসপাতালের উপর তলায়। এই সময় একদিন একটি জলসা খুব জমজমাট হয়ে উঠেছিল। কবিকে অত্যন্ত খুশী খুশী মনে হচ্ছিল। এই হাস্যোজ্জ্বল মুহূর্তগুলির পেছনে ছিল তাঁর স্বপ্নের সফলতা। সেদিনে শ্রোতাদের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন নারী। নজরুল সারা জীবন এই নারী

জাগরণের স্বপ্নই দেখে এসেছেন। মুসলিম নারীরাও অন্দরমহল থেকে পর্দার বাঁধন কেটে বাইরে আসতে শুরু করেছে। সেদিন জলসার সকল কথাই নারী জাগরণকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছিল। সকলকে সম্মোহিত করে আকবর এলাহীবাদীর 'দেওয়ান-ই-আকবর' থেকে একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন নজরুল। সে কবিতায় স্বামী বিবিকে জিজ্ঞেস করেছে, 'কি বিবি, তুমি যে নেকাব (ঘোমটা) খুলে ফেলেছ? বিবি স্বামীকে উত্তর দিয়েছে, 'হ্যাঁ নেকাব খুলেছি এবং সে নেকাব পড়েছে পুরুষের আক্কেলের উপর।'

কবিতার ব্যাখ্যা করে নজরুল হো হো করে শব্দায়মান হাসিতে ফেটে পড়লেন। কবিকে সেদিন খুবই আনন্দোজ্জ্বল দেখাচ্ছিল।

৬.

বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদের জীবনের অনেকখানি যে নজরুলের প্রভাবে গড়ে উঠেছে, সেকথা বলাই বাহুল্য। বেগম শামসুন্নাহার সাহেবার সহপাঠিনীদের মধ্যে কেউ বেথুন কলেজের ছাত্রী হয়েছেন, কেউ-বা সাগর পাড়ি দিয়ে বিলেত গিয়েছেন। হারেমে বন্দিনী বেগম শামসুন্নাহার সাহেবার কাছে তাদের চিঠি আছে—সে সকল চিঠিতে থাকে নতুন দুনিয়ার ইঙ্গিত। বন্দিনী-জীবন অসহ্য হয়ে ওঠে বেগম শামসুন্নাহার সাহেবার কাছে। ভিতরে ভিতরে এই জীবনের প্রতি যখন ঘৃণা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল, সেই সময় নজরুলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। বেগম শামসুন্নাহার সাহেবার মধ্যে যে একটি জ্বলন্ত প্রতিভা অবদমিত হয়ে রয়েছে এ-কথা কবি প্রথম আলাপেই উপলব্ধি করেছিলেন।

তাই চট্টগ্রামের এডুকেশন সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে কবিকে বলতে শুনি, 'তাঁর (আবদুল আজীজের) 'বাহারের' মত বাহার হয়ত বা থাকতেও পারে, কিন্তু তাঁর 'নাহারের' মত নাহার আপনাদের চট্টলের মুসলমানের ঘরে কয়টি আছে আমার জানা নেই।' বেগম শামসুন্নাহার সাহেবার মধ্যে এই সুপ্ত তেজস্বিতা লক্ষ্য করেই চট্টগ্রাম হতে ফিরে এসেই কলকাতা থেকে একটি চিঠিতে তিনি লিখলেন, '...আমাদের দেশের মেয়েরা বড় হতভাগিনী। কত মেয়েকে দেখলাম কত প্রতিভা নিয়ে জন্মাতে; কিন্তু সব সম্ভাবনা তাদের শুকিয়ে গেল সমাজের প্রয়োজনের দাবিতে। ঘরের প্রয়োজন তাদের বন্দিনী করে রেখেছে। এত বিপুল বাহির যাদের চায় তাঁদের ঘিরে রেখেছে বার হাত লম্বা আর আট হাত চওড়া দেওয়াল।—তাই নারীদের বিদ্রোহিনী হতে বলি। তারা ভেতর হতে দ্বার চেপে ধরে বলছে—'আমরা বন্দিনী'। দ্বার খুলবার দুঃসাহসিকতা আজ কোথায়? তাকেই চাইছেন যুগ-দেবতা।'

পরবর্তী জীবনে নাহার সাহেবা এই 'দুঃসাহসিকতার' ভূমিকাই গ্রহণ করেন। পাকিস্থানে নারী সমাজের হয়ে তিনি যা করেছেন তাতে পাক-ভারত উপমহাদেশে সকল নারী-সমাজের মুখোজ্জ্বল হয়েছে।

সেই প্রাথমিক আলাপের সময়েই প্রকাশিত হলো কবির 'সিন্ধু হিন্দোল' কাব্যগ্রন্থ। কবি সেটি উৎসর্গ করলেন সদ্য পরিচিতি বাহার-নাহারকে :

> কে তোমাদের ভালো?
> বাহার আন গুলশনে গুল, নাহার আন আলো।
> বাহার এলে মাটির রসে ভিজিয়ে সবুজ প্রাণ,
> নাহার এলে রাত্রি চিরে জ্যোতির অভিযান।
> তোমরা দুটি ফুলের দুলাল, আলোর দুলালী
> একটি বোঁটায় ফুটলি এসে—নয়ন ভুলালি!

নামে নাগাল পাইনে তোদের, নাগাল গেল বাণী
তোদের মাঝে আকাশ ধরা করছে কানাকানি।

চট্টলা —নজরুল ইসলাম
৩১।৭।১৯২৬

কবির অসীম অনুপ্রেরণায় বেগম শামসুন্নাহার লিখলেন, "পুণ্যময়ী" গ্রন্থ। কবি সাগ্রহে লিখে পাঠিয়ে দিলেন এই আশিসবাণী :

'কল্যাণীয়া শামসুন্নাহার জয়যুক্তাসু,

শত নিষেধের সিন্ধুর মাঝে অন্তরালে অন্তরীপ
তারি বুকে নারী বসে আছে জ্বালি বিপদ বাতির সিন্ধুদীপ।
শাশ্বত সেই দীপান্বিতার দীপ হতে আঁখিদীপ ভরি
আসিয়াছ তুমি অরুণিমা আলো প্রভাতী তারায় টিপ পরি।......
তুমি আলোকের, তুমি সত্যের ধরার ধূলায় তাজমহল
রৌদ্রতপ্ত আকাশের চোখে পরালে স্নিগ্ধ নীল কাজল।......
বদ্ধ কারার প্রাকারে তুলেছ বন্দিনীদের জয় নিশান।
অবরোধ রোধ করিয়াছে দেহ, পারেনি রুধিতে কণ্ঠে গান।
লও স্নেহাশিস, তোমার 'পুণ্যময়ী'র শামস পুণ্যালোক
শাশ্বত হোক, সুন্দর হোক, প্রতিভায় চিরদীপ্ত রোক।'

এই আশিসবাণী বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদের জীবনে গভীর অনুপ্রেরণার সঞ্চার করেছিল। এ আশিস বাণী পাওয়ার পর নিজের মানসিক অবস্থা সম্পর্কে বেগম শামসুন্নাহার সাহেবা লিখেছেন, 'সেদিন এক বিপুল আনন্দ ও গৌরবে দেহ-মন অভিষিক্ত করেছিল কবির প্রশস্তি। এ যে সম্মোহিত নারীচিত্তের অপূর্ব জাগরণী গান!' নতুন প্রভাতের আলোক যখন উষার দুয়ারে সলাজে আঘাত হানছে—কবি তখন তাঁর আত্মপ্রকাশের পথ করে দিলেন। কবির আন্তরিক চেষ্টায় বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদের প্রথম জীবনের বহু লেখা অনেক প্রথম শ্রেণীর পত্র-পত্রিকায়

প্রকাশিত হয়েছিল। এইভাবে নানা পথে কবি নাহার সাহেবার মধ্যকার সুপ্ত বহুমুখী প্রতিভার প্রকাশ-পথ কুসুমাস্তীর্ণ করেছিলেন।

কবি প্রথমবার (১৯২৬ খ্রীঃ) যখন চট্টগ্রামে আসেন তখন তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে কেবল স্বদেশী সংগীতই শোনা গিয়েছিল, কিন্তু দ্বিতীয়বার (১৯২৯ খ্রীঃ) এলেন গজল গানের সুরসুধায় দেহ-মন সিক্ত করে। পূর্বের বিদ্রোহাত্মক মনোভংগি যেন গজল গানের স্নিগ্ধচ্ছায়ায় অনেকখানি মনোরম হয়ে উঠেছে। তাঁর এই মানস-পরিবর্তনের স্বরূপ একটি অভিভাষণে সুন্দর রূপে ধরা পড়েছে ঃ ···'সেদিনের পশ্চিমে ঝড়···এসেছিল বন্ধ দ্বারের জিঞ্জিরে নাড়া দিতে,···আজ সে আবার এসেছে সেই পরিচিত দুয়ারে—ফুলের লোভে নয়, মালার আশায় নয়, তার স্মরণ তীর্থ জিয়ারত করতে।···এবার সেই ঝোড়ো হাওয়া এসেছে 'পূবের হাওয়া' হয়ে। তার রূপ, সুর দুই-ই হয়ত বদলে গেছে।—সে'বার যে এসেছিল তরবারির বোঝা নিয়ে, এবার সে এসেছে ফুল ফোটানোর মন্ত্র শিখে। এমনিই হয়। 'ফাল্গুনের মলয় সমীর বৈশাখে দেখা দেয় কালবৈশাখীরূপে, শ্রাবণে সে-ই আসে পূবের হাওয়া হয়ে। হৈমন্তীর আঁচল ভরে ওঠে তারি শিশিরাশ্রুতে, আঁচল দুলে ওঠে তারি হিমেল হাওয়ায়। পউষে তারি দীর্ঘশ্বাস পাতা ঝরায়।'

দ্বিতীয় বার চট্টগ্রামে আসার আগে কবি শামসুন্নাহার মাহমুদকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তাতেও তাঁর এই মানস-পরিবর্তনের আভাস ধরা পড়েছে :—'চিঠি লিখছি আর গাইছি নতুন লেখা গানের দুটো চরণ :—

হে ক্ষণিকের অতিথি,
এলে প্রভাতে কারে চাহিয়া।
ঝরা শেফালির পথ বাহিয়া।

কোন অমরার বিরহিনীরে চাহনি ফিরে
কার বিষাদের শিশির নীরে এলে নাহিয়া।

'কবির আসা ঐ ঝরা শেফালির পথ বেয়ে আসা। কোন বিষাদের শিশির জলে নিয়ে আসে সে, তা সে জানে না। তার নিজের কাছেই সে একটা বিপুল রহস্য।'

বিদ্রোহ সত্তা থেকে এই গজল গানের বিপুল সাম্রাজ্যে উত্তরণের ধাপটুকু কবির নিজের কাছেও অজ্ঞাত। এ সময় তাঁর কণ্ঠে যে গজল গানগুলি শোনা যেত তাদের মধ্যে এগুলি প্রধান ঃ

'কে বিদেশী বন-উদাসী
বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে'

'বাগিচায় বুলবুলি তুই
ফুলশাখাতে দিসনে আজি দোল—'

'আমারে চোখ ইশারায় ডাক দিলে হায়
কে গো দরদী—'

'করুণ কেন অরুণ আঁখি
দাওগো সাকী, দাও শরাব—।'

৭.

জ্যোতিষী নজরুলের পরিচয় আজ পর্যন্ত বিশেষ জানা যায়নি। শোনা গেছে, কবি গভীর আগ্রহে হাত গণণা করতেন···এই মাত্র। কিন্তু কিছু প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের হস্তগত হয়েছে। কবি বাহার-নাহার ভাই-বোনদের ভাগ্য-লিপি পৃথকভাবে কাগজে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছিলেন। নিজের ভাগ্য জানার জন্য স্বভাবতঃই মানুষ কৌতূহলী। নাহার সাহেবাও একবার ঐকান্তিক আগ্রহে নিজের হাতখানি পর্দার আড়াল হতে এগিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, 'দেখুন তো কবিদা, কতখানি পড়াশুনা লেখা আছে আমার

হাতে?' কবি অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে হাত দেখে যে সুদীর্ঘ ভাগ্য-লিপি রচনা করেছিলেন, তার কয়েকটি বিশেষ বক্তব্য এই :'…স্বাস্থ্যভঙ্গ…প্রাণ নিয়ে টানাটানি…প্রিয়জন-বিয়োগ…' সব শেষে লিখেছিলেন, স্নেহ-মমতার অভাব হবে না কোনদিন,…Partial satisfaction of ambition'….ইত্যাদি। কবি অনেকের হাত দেখে এ ধরনের মন্তব্য করতেন, এ জন্যে তাঁর পরম হিতাকাঙ্ক্ষী জনাব মুজফ্ফর আহমদের কাছে মাঝে মাঝে ভৎ'সনা শুনতেন, তবুও নিরস্ত হতেন না। তাঁর কাছে হস্তরেখা গণনা এবং জ্যোতিষ চর্চা অনেকখানি অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

৮০

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর। বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ তখন লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজের অধ্যাপিকা। শ্রেণীতে তিনি মাঝে মাঝে তাঁর শ্রদ্ধেয় কবিদা সম্পর্কে আলোচনা করতেন। তাঁরই মুখে কয়েকজন ছাত্রী জানতে পারলেন যে, কবি ক্রমেই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। বর্তমান ব্যাধির প্রকাশ ঘটছে ধীরে ধীরে। অতি কষ্টে কবি বসতে, উঠতে ও লিখতে পারেন। কয়েকজন ছাত্রী পরমাগ্রহে গেলেন কবিকে দেখতে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথায় তাদের কাছে কবি নাহার সাহেবার কথা জিজ্ঞেস করলেন। কথাবার্তার মাঝেই একজন ছাত্রী তাঁর খাতাখানি এগিয়ে দিলেন অটোগ্রাফের আশায়। কবিত্ব শক্তি তখনো অবলুপ্ত হয়নি। শেষ দিনালোকটুকু বুঝি পশ্চিম দিগন্তকে আলোকিত করে হৃদয় বিমোথিত মনোহারিত্বে হঠাৎ ঝলকিত হয়ে উঠেছিল। কম্পিত হস্তে

কলম তুলে নিয়ে কবি লিখেছিলেন ছ'পংক্তির একটি অনবদ্য কবিতা—ক্রমজাগ্রত ও অগ্রসরমান নারী শক্তির অপূর্ব প্রশস্তি-সঙ্গীত ঃ

'আঁধার হেরেমে তোমরা দিব্য রোজা অবসানে দীপ্তি সঞ্চারিকা
খুশীর ঈদের হেলালের ললাটিকা।
ফিরদৌসের গুলরুখ এলে শিশির-নেকাব খুলি
এতদিনে শিশ-মহলের দ্বার খুলিয়াছে বুলবুলি।
আনন্দ-প্রজাপতি এলে মেলি চিত্রাঞ্চল পাখা
নূতন আকাশ দেখিলাম আমি নব রামধনু আঁকা।'

—নজরুল ইসলাম
২০।৯।৪১

দাদাঠাকুর (শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত)

'বিদুষক' চরিত্র আমরা সকলে নাটকে পড়েছি—বাস্তব সংসারে সত্যকার 'বিদুষক' বড় একটা চোখে পড়ে না। কিন্তু বিচিত্র বাংলা দেশ—এর জলহাওয়ায় বুঝি সবই সম্ভব। শ্রদ্ধেয় শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর) বাংলা দেশের এক বিরল ব্যতিক্রম চরিত্র, সম্ভবতঃ একমাত্র চরিত্র। দাদাঠাকুরের পার্শ্বসহচর শ্রীনলিনীকান্ত সরকার মহাশয় এই দুর্লভ মনীষীর জীবন-চরিত গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে বাংলা সাহিত্যের একটি স্থায়ী উপকার করেছেন।

নলিনীকান্ত সরকার মহাশয়ের মাধ্যমে দাদাঠাকুরের সঙ্গে নজরুলের প্রথম আলাপ হয়। নজরুল তখন তরুণ। 'বিদ্রোহী' কবিতা তখন প্রকাশিত হয়নি। অবশ্য "মোসলেম ভারতে" প্রকাশিত কবির কয়েকটি কবিতা নিয়ে নিখিল বাংলার সাহিত্যিক-কবি-পাঠক-সমালোচক মহলে রীতিমত আলোড়ন উঠেছে। সেই সময় দাদা-ঠাকুরের সঙ্গে নজরুলের প্রথম পরিচয়। পরে সে-পরিচয় সুগভীর আন্তরিকতায় পরিণত হয়।

বাংলার সাহিত্যিক এবং রাজনৈতিক আকাশে তুমুল আলোড়ন তুলে প্রকাশিত হল সারথি নজরুলের অর্ধসাপ্তাহিক পত্রিকা "ধূমকেতু"। আশীর্বাণী পাঠালেন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বারীন ঘোষ,

বিরজাসুন্দরী দেবী, কালিদাস রায় এবং আরো অনেকে। কেবল পাঠালেন না দাদাঠাকুর। নজরুলও সরাসরি তাঁর কাছে আশীর্বাণী চাইলেন না—কেবল রটনা করে দিলেন যে দাদাঠাকুরের স্নেহের ভাণ্ডারে বোধহয় কিছু অনটন পড়েছে। জনশ্রুতি দাদাঠাকুরের কানে গেল। দাদাঠাকুরের "জঙ্গীপুর সংবাদ" তখন নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে—"জঙ্গীপুর সংবাদে"র অফিসে (পণ্ডিত প্রেস) বসে তিনি লিখলেন এক তেজদীপ্ত আশীর্বাণী, "ধূমকেতু" পত্রিকার চলার পথ, আদর্শ সে বাণীতে সুস্পষ্ট রেখাঙ্কনে বিধৃত হয়েছে। আশীর্বাণীর শিরোনামটিও অপূর্ব, 'বিতুষক' প্রদত্ত উপযুক্ত শিরোনামা : "'ধূমকেতু'র প্রতি বিষহীন ঢোঁড়ার অযাচিত আশীর্বাদ"। সম্পূর্ণ অপ্রকাশিত আশীর্বাণীটি আমরা এখানে প্রকাশ করলাম :

"ধূমকেতু"তে সওয়ার হয়ে
আসরে আজ নামলো কাজী।
আয় চলে ভাই কাজের কাজী!
তোর সাচ্চা কথার আচ্ছা দাওয়াই
পাবে যারা বেইমান পাজি,
আয় চলে ভাই কাজের কাজী!
"হাবিলদার!" আজ আবিলতার
কল্‌জে বিঁধে এপার ওপার
চালিয়ে বুলির গোলাগুলি
জাহির কর তোর গোলন্দাজী।
আয় চলে ভাই কাজের কাজী!
কোনটা বদি কোনটা নেকী
কোনটা খাঁটি কোনটা মেকী
দেশের লোকের দেখা দেখিয়ে
"নজরউলের" তীক্ষ্ণ নজর
খাক্ করে দিক দাগাবাজী।
আয় চলে ভাই কাজের কাজী!

ধরিয়ে দে সব অত্যাচারী
পাকড়া যত হত্যাকারী
জোচ্চোরেদের দোকানদারী
চোখে আঙুল দিয়ে লোকের
দেখিয়ে দে সব ধাপ্পা বাজী।
আয় চলে ভাই কাজের কাজী!

জানিস কলির বামুন মোরা
কেউটে নই যে আস্ত ঢোঁড়া
কাজেই আশিস্ ফলে থোড়া রে
মোদের হরি তোদের খোদা
তোর উপরে হউন রাজী।
আয় চলে ভাই কাজের কাজী!

এই আশীর্বাণীটি যখন নজরুলের হাতে আসে তখন "ধূমকেতু" পত্রিকাখানি ইংরাজ সরকারের বিষদৃষ্টিতে পড়েছে। পত্রিকাখানির উপর তো বটেই, কবির সম্পর্কেও সরকারের মনোভাব প্রসন্ন ছিল না। "ধূমকেতু"তে যাঁদের লেখা ছাপা হচ্ছিল ক্রমে তাঁদের সম্পর্কে সরকারপক্ষ খোঁজখবর নিতে আরম্ভ করে। সরকারের এই ঘৃণ্য মনোভাবের জন্যই কবি দাদাঠাকুর প্রেরিত আশীর্বাণীটি তাঁর পত্রিকায় ছাপেননি। কেন না আশীর্বাণীটি "ধূমকেতু"তে মুদ্রিত হলেই সরকারের ধারণা হতো যে এই পত্রিকাটির সঙ্গে দাদাঠাকুরের যোগ সুনিবিড়। তাতে দাদাঠাকুরের সমূহ ক্ষতি হতো। এই সময় দাদাঠাকুরের সাপ্তাহিক-পত্র "জঙ্গীপুর সংবাদ" সরকারের বিজ্ঞাপনের উপর বিশেষরূপে নির্ভরশীল ছিল। ইংরাজ সরকারের মুনসেফী আদালতের নীলামের বিজ্ঞাপন ছেপে যে টাকা পাওয়া যেত তাই ছিল পত্রিকাখানির একমাত্র বাঁধাধরা মাসিক আয় এবং এই আয় থেকেই দাদাঠাকুরের উদারান্নের সংস্থান হতো। "ধূমকেতু"তে লেখাটি প্রকাশিত হলে দাদাঠাকুর হয়তো আর নিলামের বিজ্ঞাপন পেতেন না—এ'তে

তিনি সমূহ বিপদে পড়তেন। ২৯, ৪, ১৯৬৩ তারিখে লেখা একটি চিঠিতে দাদাঠাকুর আমাকে জানিয়েছিলেন: "নজরুল ইংরেজ সরকারের সন্দেহভাজন ছিল। আমার আশীর্বাদ ছাপাইলে তাহার এই কর্মে যথেষ্ট উৎসাহ আছে জানিয়া সরকার আমার একমাত্র মুখের গ্রাস বন্ধ করিয়া দিবে। এ কথা আমাকে এবং নলিনীকে জানাইয়াছিল। আমার অন্নের ক্ষতি যাতে না হয় তজ্জন্যই সে ওটা প্রকাশ করে নাই।"

২.

কবির "বিদ্রোহী" কবিতা নিয়ে সারা দেশে তুমুল হৈ-চৈ পড়েছিল। "বিজলী"তে প্রকাশের সঙ্গে অনেকে "বিদ্রোহী"র ছন্দে প্রশংসামূলক কবিতা লিখে পাঠাতেন; কেউ কেউ আবার কবিকে জঘন্যভাবে আক্রমণ করে "বিদ্রোহী"র প্যারডি লিখে পাঠাতেন। নজরুল অবলীলাক্রমে প্রশংসাবাদ ও নিন্দাবাদ তাঁর পত্রিকায় ছেপেছেন। চুঁচুড়ার এক ভদ্রলোক "বিদ্রোহী"র যে নিন্দাসূচক প্যারডি লিখেছিলেন তার কয়েকটি পংক্তি এই:

"বলো দীন!
আমি সবার অধম হীন।
পথের ধূলোও শিরোপরে মোর উড়ে চলে চিরদিন।
আমি আলেয়া! দূষিত বাষ্প! পচা পুকুর!
আমি আস্তাকুঁড়ের ন্তাকড়া! মরা কুকুর!"...ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য নজরুল এ-কবিতাও বীরোচিত সাহসে আপন পত্রিকায় (ধূমকেতু) ছাপিয়েছিলেন। এবং এর জন্যে তিনি দাদাঠাকুরের অশেষ প্রশংসা অর্জন করেন।

"শনিবারের চিঠি"র মাধ্যমে নজরুল ও সজনীকান্তের বিরোধ আজ ঐতিহাসিকের গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বিরোধের দিনে দাদাঠাকুর সজীব ছিলেন। কিন্তু তিনি এই বিরোধটিকে কোনদিন সুনজরে দেখেননি। তিনি জানিয়েছেন: "নজরুলের লেখার বিরুদ্ধে সজনীকান্ত যা লিখতেন আমার তা' ভাল লাগতো না। আমি সজনীর ও-লেখা কোনদিনই সমর্থন করি নাই।" দীর্ঘ দিন বিরোধের পর নজরুল-সজনীর মিলন হলে দাদাঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে মুখে মুখে একটি দীর্ঘ রসমধুর ছড়া বেঁধে গেয়েছিলেন। ছড়াটি দীর্ঘকাল লোকমুখে ফিরেছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ সে-ছড়াটি কোন রকমেই উদ্ধার করা সম্ভব হলো না।

নজরুলের কমিক গানের বইয়ের নাম "চন্দ্রবিন্দু"। বইটি তিনি যোগ্য ব্যক্তিকেই উৎসর্গ করেছেন। বইটির উৎসর্গপত্রে কবি লিখেছেন:

"পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমদ্দাঠাকুর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের শ্রীচরণকমলে—

হে হাসির অবতার!
লহ চরণে ভক্তি-প্রণত কবির নমস্কার।"...

"শ্রীমদ্দাঠাকুর" শব্দটি আমার নিকট দুর্বোধ্য মনে হয়। প্রথমে ভেবেছিলাম এটি মুদ্রণ-প্রমাদ—ফলে শব্দটির প্রতি আমার ২৪. ৪. ৬৩ তারিখের একটি পত্রে দাদাঠাকুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তিনি উত্তরে লেখেন: "নজরুল আমাকে তার "চন্দ্রবিন্দু" বইখানি উৎসর্গ করার সময় "শ্রীমদ্দাঠাকুর" লিখেছিল তাতে আমার কোন আপত্তি ছিল না। মদ্দা বলে মরদ বা পুরুষ লোককে। নজরুল তাও মনে করতে পারে। আমি ওটাকে মনে করেছিলাম শ্রীমৎ দা'ঠাকুর। সন্ধি হয়ে শ্রীমদ্দাঠাকুর করে নজরুল উচ্চমানের রসিকতার পরিচয় দিয়েছে।"

একদিন নজরুল কথাপ্রসঙ্গে দাদাঠাকুরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে তিনি কোন্ মতের উপাসক।

নির্বিকার চিত্তে দাদাঠাকুর উত্তর দিলেন, "আমি শাক্ত।"

নজরুল রসিকতা করে বললেন, "আপনাদের শক্তি-সাধনায় পঞ্চ ম-কারের বিশেষ প্রয়োজন। বেশ মজার সাধনা যা' হোক।"

দাদাঠাকুরও ছাড়বার পাত্র নন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, "আরে আমাদের তো পঞ্চ ম-কার আর তোদের যে ম-কারের ছড়াছড়ি। গুণে দেখলে বিশটা তো পাওয়া যাবেই।"

"তাই নাকি?"

"তবে শোন"—বলে দাদাঠাকুর আরম্ভ করলেন, "তোরা ১। মুসলমান; জল আনিস ২। মশকে; জল খাস ৩। মগে; গায়ে দিস ৪। মেরজাই; লেখাপড়া শিখিস ৫। মাদ্রাসায় কিম্বা ৬। মক্তবে; পণ্ডিত হয়ে হয়ে যাস্ ৭। মৌলবী ৮। মৌলানা, না হয় ৯। মুন্সী; তীর্থস্থান ১০। মক্কা, ১১। মদিনা; ধর্মগুরু ১২। মহম্মদ; পর্ব ১৩। মহরম; পাঠ করিস ১৪। মৌলুদ শরীফ; প্রিয় খাদ্য ১৫। মাংস; তার মধ্যে রুচিকর ১৬। মুরগী; মরে পাস্ ১৭। মাটি; ভূত হলে হোস ১৮। মামদো; জবর খুব ১৯। মারামারিতে আর ২০। মামলায়।"

বিশটি ম-কার সম্পূর্ণ হলে নজরুল দাদাঠাকুরের উপস্থিত উদ্ভাবনী শক্তিতে তন্ময় হয়ে মৃদু হাসলেন।

নলিনীকান্ত সরকার

১.

"নজরুল গায় আর হাসে, নলিনী দা' গান আর হাসান। নজরুলের পার্শ্বাস্থি বলা যেতে পারে। নজরুলকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, নলিনী দা'র কাছে সন্ধান নাও। নজরুলকে সভায় নিয়ে যেতে হ'বে, নলিনী দা-কে সঙ্গে চাই। নজরুলকে দিয়ে কিছু করাতে হ'বে, ধরো নলিনী দা-কে। নজরুল সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশী ওয়াকিবহাল।" অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের এই সামান্য কটি কথার মধ্যে নজরুল ও নলিনীকান্ত সরকারের সম্পর্ক-সম্বন্ধটি সুন্দররূপে বাকবদ্ধ হ'য়েছে। নলিনীকান্ত সরকারের সঙ্গে নজরুলের হৃদ্য-সম্পর্ক সর্বজনবিদিত। নজরুলের অন্তরলোকের গোপনতম প্রদেশে মুষ্টিমেয় যে ক'জন সুহৃদের নাম লেখা ছিল, নলিনীকান্ত সরকার ছিলেন সেই বিরল সৌভাগ্যবানদের মধ্যে নিঃসন্দেহে অন্যতম একজন। কত হাসি, কত গান, কত ব্যথা, কত বিরহ, কত স্মৃতি।

১৩২৭ সাল, অগ্রহায়ণ মাস। বিপ্লবী বারীন ঘোষের সঙ্গে আরো কয়েকজন তরুণ "বিজলী" অফিসে বসেছিলেন। সন্ধ্যা-ভ্রমণ সমাপ্ত করে সেই ঘরে প্রবেশ করলেন "বিজলী"র-তদানিন্তন সম্পাদক নলিনীকান্ত সরকার। তাঁকে দেখেই বারীনবাবু তিনি নজরুলের কবিতা পড়েছেন কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। সে সময় মাসিক 'মোসলেম ভারতে' নজরুলের মাত্র কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত

হ'য়েছে। তাদের মধ্যে একটি স্মরণীয় কবিতা 'শাত-ইল-আরব'। নলিনীবাবু এ কবিতাটি পড়েছিলেন। কবিতাটির স্বতঃস্ফূর্ত উদ্দাম ভাবাবেগ তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি হেসে কিছুটা রহস্য করে উত্তর দিলেন: "নজরুলের কবিতা—সে তো হাবিলদারের মতই তেজী।" তরুণদের মধ্যে একজন হো হো করে হেসে উঠলেন। সে তরুণের কাছে রহস্যটা পীড়াদায়ক না হ'য়ে মধুর হ'য়ে উঠেছে। বারীনবাবু বললেন—"এই আমাদের নজরুল।" সেই প্রথম আলাপ। ক্ষণিকের মধ্যে নজরুলের প্রাণখোলা আলাপে ও অকৃত্রিম হৃদ্যতায় মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন নলিনীকান্ত বাবু। এই স্বচ্ছ, স্পষ্ট, নির্ভিক তরুণের সঙ্গে তাঁর হৃদয় এক গভীর আন্তরিকতার সম্পর্ক খুঁজে পেল। প্রীতির বাঁধনে বাঁধা পড়লেন দু'জনে।

২.

কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী নজরুলকে দেখতে চেয়েছেন। নজরুলকে নিয়ে যাওয়ার ভার পড়েছে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের উপর। বাগচী মহাশয়ের বাড়ীতে যাওয়ার কথা বলতেই কবি রাজী হ'য়ে গেলেন। দু'জনে রওনা হ'য়ে গেলেন যথাসময়ে। বাগচী মহাশয়ের সঙ্গে প্রাথমিক আলাপ হ'য়ে গেল কবির। প্রাথমিক আলাপ কিন্তু প্রাণের আলাপ। যাতায়াতের সঙ্গে আন্তরিকতা বাড়ল সমানে। একদিন বাগচী মহাশয়ের বাড়ীতে সান্ধ্য মজলিস জমে উঠেছে— এলেন নলিনীকান্ত সরকার। বাগচী মহাশয় বললেন, "ইনি নলিনীকান্ত সরকার, আমাদের কীর্তন শোনাবেন।" নলিনীবাবু হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে বসলেন,

পাশে নজরুল। দুই গাইয়ে বন্ধুর পুনর্মিলন। গায়ক হিসেবে নজরুলের নাম তখন প্রবাদের রূপ নিয়েছে। এই পর্বের অধিকাংশ সময় তিনি রবীন্দ্র-সংগীত গাইতেন। কখনো-কখনো নিজস্ব গান: "পথিক, ওগো চলতে পথে তোমার আমার পথের দেখা।" যা' হোক দু' বন্ধু একত্রিত হ'তেই পবিত্রবাবু বললেন, "এবার দু' গাইয়েতে আঁতাত হোক।" পরের ঘটনাটি পবিত্র-বাবুর ভাষাতেই বলি, "দে গরুর গা ধুইয়ে" বলে কাজী সামনের রেকাব থেকে এক মুঠো পান মুখে পুরে দিল।

নলিনী-দা'ই আগে গান ধরলেন:

'বঁধু, কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হয়ো তুমি।'

প্রত্যেকটি পদ স্পষ্ট উচ্চারণ করে মাথা নেড়ে আপাঙ্গ দৃষ্টিতে নজরুলের মুখের কাছে মুখখানি এগিয়ে নিয়ে আসেন।

আমি বললাম, 'সে কি দাদা, এই লড়িয়ে ছোক্‌রাটা হলো আপনার বঁধু।'

নলিনী দা' থামেন না; গানের মধ্যে আগর দিয়ে বলেন,—

'আহা এমন কানু কোথায় পাব?'

গান শেষ হলে সকলে মিলে হো হো করে হেসে ওঠে। আমি বলি, 'ওরে কাজী, দাদার কাছ ঘেঁষে বোস্‌, কীর্তনের শেষে যুগলমিলন না হ'লে কিছুই হ'লো না।'

কাজী বললেন,

'তোমারি গরবে গরবিনী হাম,
রূপসী তোমার রূপে।'

৩.

খুব অল্প কালের মধ্যে নিখিল বাংলায় স্বনামখ্যাত হ'য়ে পড়লেন নজরুল। মাত্র গুটিকয় কবিতা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বাঙালীর হৃদয় লুট করে নিলেন। সে সময় গান্ধীজীর অহিংসা অসহযোগ আন্দোলনে সমগ্র ভারতভূমি উদ্দীপ্ত। বাংলায় তার প্রতিফলন সর্বাপেক্ষা বেশী। স্কুল-কলেজ, রাস্তা-ঘাট, আইন-আদালত, পল্লী-শহর সর্বত্র সে আলোড়ন সুস্পষ্ট। এই আলোড়ন-বিক্ষুব্ধ রূপ সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠল হাবিলদার কবি কাজী নজরুল ইস্‌লামের কবিতায় ও গানে। সমগ্র বাঙালী মানস ও গণ-চেতনা যেন এটাই আশা করে আসছিল। ফলে সভা-সমিতিতে, রাজনৈতিক আন্দোলনে, হরতাল পালনে নজরুল সংগ্রামশীল কবিতা ও গান আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে মুখে ফিরতে লাগল। নজরুল ছাড়া কথা নেই। নলিনী বাবু তাই ঠিকই বলেছেন, সকালবেলাকার নবোদিত সূর্য যেন অকস্মাৎ মধ্য গগনে ভাস্বর হ'য়ে উঠে সকলকে বিস্ময় বিমোহিত করে তুল্‌লো।"

নজরুলের সঙ্গে নলিনীবাবুর প্রাথমিক আলাপের সময় কবি থাকতেন বত্রিশ নম্বর কলেজ স্ট্রীটে। এই সময় কবির অন্তরঙ্গ বন্ধুর সংখ্যা চার কী পাঁচ। এঁদের মধ্যে আবার নলিনীবাবুর সঙ্গে তাঁর হৃদয়ের লেন-দেন সর্বাধিক। উভয়ে সকলের অলক্ষ্যে হৃদয়ের গোপনতম কথাটি বলার জন্যে যেন একটু নিরিবিলি স্থানের সন্ধান করতেন। প্রকৃতপক্ষে এ সময়ে নজরুলের গতিবিধি সম্পূর্ণরূপে নলিনবাবুর জানা থাকতো। হৃদয়ের সান্নিধ্য যখন এমনতর নিবিড়—একদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত আড্ডা দিয়ে সকালে নজরুলের খোঁজে এসে নলিনীবাবু দেখেন কবি নেই। তিনি

ব্যথিত হ'লেন রীতিমত। মাসিক 'মোসলেম ভারতে'র অন্যতম পরিচালক জনাব আফজালুল হকের নিকট থেকে জানতে পারলেন যে কবি কুমিল্লায় চলে গেছেন। অবশ্য নজরুলের এই আকস্মিক অন্তর্ধানে নলিনীবাবু অপেক্ষা আফজালুল হক সাহেবই চিন্তিত হ'য়ে পড়েছিলেন বেশী। কেন না নজরুলের অভাবে 'মোসলেম ভারতে'র অবস্থা অচল। সে সময় 'প্রবাসী'র যেমন শ্রেয়তম লেখক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, 'মোসলেম ভারতে'র তেমনি নজরুল। আফজালুল হক সাহেব খিন্নিত হ'য়েছিলেন বেশী, কিন্তু নলিনীবাবুর ব্যথা অধিকতর। কুমিল্লার মত দূর প্রবাসে গেলেন, অথচ কাল রাতেও কিছু বললেন না। এই এই আকস্মিক অন্তর্ধান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় নলিনীকান্ত সরকার নজরুল-চরিত্রের এক অসামান্য বৈশিষ্ট্য সুন্দররূপে ফুটিয়ে তুলেছেন। নজরুল-চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যটুকু উপলব্ধি করার বিশেষ প্রয়োজন আছে নইলে ভুল বুঝে তাঁর প্রতি অবিচার করার সম্ভাবনা। নলিনীবাবুর ভাষাতেই বলি, "নজরুলের এই আকস্মিক অন্তর্ধানে আমি ক্ষণিকের জন্য বিস্মিত হ'লেও, না-জানিয়ে যাবার ক্ষোভ আমাকে অভিভূত করেনি। কারণ, আমি তাঁকে ভালো করেই চিনতাম। অন্তরঙ্গ ছিলাম বলেই যে আমি একাকী তাঁর হৃদয়ের পান্থশালাটি জুড়ে বসে আছি, এ ভ্রান্তবিশ্বাস আমার ছিল না।

বৈষ্ণব-কবি শ্রীকৃষ্ণের গুণ বর্ণনা করেছেন—"সো বহুবল্লভ কান্" বলে। নজরুলকে সে সময় সেইভাবে বিশেষিত করলে কিছুমাত্র সত্যের অপলাপ হ'তো না। তাঁর বলিষ্ঠ দেহ-মন পৌরুষপূর্ণ রচনা ও প্রেমদ্রবণ হৃদয়ের প্রতি স্বভাবতঃই অনেকে আকৃষ্ট হ'য়ে পড়তো। আচার্য শঙ্করের যেমন 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' নজরুলও তেমনি প্রেমতান্ত্রিক সাধনার এমন একটি স্তরে বাস করতেন, যেখান থেকে তাঁর মনে হ'তো যার কাছে

আছি সে-ই সত্য, বাকী সব মিথ্যা-মায়া। তাঁর চরিত্রের এই দিকটা জানা ছিল বলেই আমার কোন অভিমানের অভিযোগ ছিল না তাঁর উপর।

নজরুল তাঁর সমগ্র জীবনে এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে পরিচালিত হ'য়েছেন। মানুষকে যেমন তিনি আকর্ষণ করেছেন, যেমন আকৃষ্ট হ'য়েছেন, তেমনি অবহেলায় সে আকর্ষণের সবটুকু মুহূর্তে ঝেড়ে ফেলেছেন। এদিক দিয়ে নজরুল এক আশ্চর্য মানুষ!

আলী আকবর খানের সঙ্গে কুমিল্লায় চলে গেলেন কবি—আর ফিরতে চান না। ছ'মাস কেটে গেল কুমিল্লায়। কুমিল্লাতেও তখন অসহযোগ আন্দোলনের চোট। মিছিলের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে গানে কবিতায় সমগ্র শহরটিকে যেন তাতিয়ে দিয়ে এলেন নজরুল।

৪.

ছ'মাস পর কলকাতায় ফিরে 'দৈনিক সেবকে'র সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান করলেন। এই সময় রচিত হয় অমর কবিতা "বিদ্রোহী"—১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের বড় দিনের কাছাকাছি সময়ে। এই "বিদ্রোহী" কবিতাটির সঙ্গে কবি-বন্ধু নলিনীকান্ত সরকারের নাম বিশেষভাবে জড়িয়ে আছে। কবিতাটি রচিত হ'য়েছিল 'মোসলেম ভারতে'র জন্য কিন্তু স্বল্পকালের ব্যবধানে কবিতাটি প্রকাশিত হ'য়েছিল তিনটি পত্রিকায়—'মোসলেম ভারত' (কার্তিক ১৩২৮ বঙ্গাব্দ), 'বিজলী (২২শে পৌষ, ১৩২৮) এবং 'প্রবাসী' (মাঘ, ১৩২৮)। নানা অসুবিধার জন্য 'মোসলেম ভারত' নিয়মিত প্রকাশিত হ'তো না—কার্তিক সংখ্যা 'মোসলেম ভারত' প্রকাশিত

হয় পৌষের চতুর্থ সপ্তাহের শেষের দিকে, 'বিজলী' প্রকাশিত হয় ২২শে পৌষ এবং 'প্রবাসী ১লা মাঘে বাজারে আত্মপ্রকাশ করে। কবিতাটি 'মোসলেম ভারতে'র জন্য লিখিত হ'য়েছিল এবং সর্বপ্রথম মুদ্রিতও হ'য়েছিল 'মোসলেম ভারতে'। তথাপি প্রথম প্রকাশের সৌভাগ্য লাভ করলো 'বিজলী'। এটি সম্ভব হ'য়েছিল 'বিজলী' সম্পাদক নলিনীকান্ত সরকারের কূটনৈতিক চালে। এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি সবিস্তারে বলা প্রয়োজন।

'বিদ্রোহী' কবিতাটির প্রথম প্রকাশ এবং তার কৃতিত্ব নিয়ে ইতিমধ্যেই একটা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হ'য়েছে। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম থেকে ১৬-৩-১৯৬৩ তারিখে লেখা একটি চিঠিতে নলিনীবাবু আমাকে জানিয়েছেন: "নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতার রচনা ও প্রকাশের ইতিবৃত্ত নিয়ে নানাজনে নানা রকম মিথ্যা প্রচার করছে, দেখতে পাই।" ১৯৬২ সালের কার্তিক সংখ্যা মাসিক বসুমতী'র "পুরানো কথায়" 'বিজলী' সাপ্তাহিকের তদানীন্তন ম্যানেজার শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় যে মন্তব্য (বহুল প্রচারিত এই মন্তব্যটি আমি আর উদ্ধৃত করলাম না) করেছেন নানা কারণে তা সত্য বলে মনে হয় না। কেন না, 'বিজলী'তে ছাপা 'বিদ্রোহী' কবিতাটির পাদটীকায় বা মস্তিষ্কটীকায় ভট্টাচার্য মহাশয়ের মন্তব্যের পরিপূরক কোন কথা লেখা ছিল না। মস্তিষ্কটীকায় যা' লেখা ছিল তা' হলো ১৩২৮ সালের কার্তিক সংখ্যা 'মোসলেম ভারতে'র একটি সমালোচনা। তা' ছাড়া নজরুলের প্রথম কবিতা (অবিনাশ বাবুর মতে) 'মোসলেম ভারতে'র কর্তৃপক্ষ চাইবেন কেন? তাঁরা তো বহু পূর্বেই তা' পেয়েছেন। এমন কী কার্তিক সংখ্যার জন্য কবি তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'কামাল-পাশা' ইতিপূর্বে ওদের দিয়ে দিয়েছেন। সব থেকে বড় কথা অবিনাশবাবু কবিতাটি 'বিজলী'র জন্যে আনেন নি। সব মিলিয়ে অবিনাশ বাবুর কোন যুক্তি এবং মন্তব্যের সত্যতা থাকে না। আসলে

নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় যে ঘটনাটি বলেছেন সেটাই সত্য এবং সেই সত্যকার ঘটনাটি এইরূপ :

নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় একবার হাবিলদার নজরুলকে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং নলিনীকান্ত সরকার মহাশয়ের নিকট থেকে কবিকে আনবার প্রতিশ্রুতি আদায় করে নেন। সেই প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য নলিনীবাবু একদিন সকালে নজরুলের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হ'লেন। নজরুল তখন থাকেন ৩।৪ সি তালতলা লেনের একটি বাড়ীতে আর ঐ বাড়ীর একই কক্ষে থাকেন কবির দুঃখের দিনের বন্ধু জনাব মুজফ্ফর আহমদ সাহেব। যাওয়া মাত্র তিনি সদ্য রচিত কবিতাটি বন্ধুকে শোনালেন। ঐ দিন প্রায় সারারাত জেগে কবি 'বিদ্রোহী' কবিতাটি রচনা করেন। কবিতাটি শুনে নলিনীবাবু প্রায় অভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি তখন 'বিজলী'র সম্পাদক। কবিতাটি 'বিজলী'-তে মুদ্রণের আগ্রহ প্রকাশ করতেই কবি রাজী হ'য়ে গেলেন। এবং পাণ্ডুলিপি পকেটে করেই তাঁরা চললেন ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের বাড়ীতে। ক্ষীরোদবাবুর বাগবাজারের বাড়ীটি সেদিন আবৃত্তি ও গানে মুখর হ'য়ে উঠল। ভাবপ্রবণ ক্ষীরোদবাবু নজরুলকে বুকে জড়িয়ে বাংলার সাহিত্যাঙ্গনে স্বাগত জানালেন। এ ধরনের অযাচিত স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন নজরুল তাঁর চলার পথের সর্বত্র পেয়েছেন। সমকালীন শাসকরা সকল কবি-সাহিত্যিক-নাট্যকার এইভাবে কবিকে আবেগভরে বুকে জড়িয়ে ধরে আশীর্বাদ করতে বাধ্য হ'য়েছেন। নজরুলের মধ্যে এমনই একটা বিধিদত্ত প্রতিভা ছিল যে, সে প্রতিভা সকলের নিকট থেকে এমনি অনায়াসভংগীতে অভিনন্দন আদায় করেছে। আজকাল আর ঠিক এমনটি বহুকাল ধরে দেখা যাচ্ছে না।

'বিদ্রোহী' কবিতাটি ক্ষীরোদবাবু কী-ভাবে গ্রহণ করেছিলেন তা' নলিনীবাবুর নিকট থেকে জানা গেছে : 'চা-পর্ব সেরে

নজরুল আরম্ভ করলেন 'বিদ্রোহী পড়তে। কবিতাটির এক-একটি চরণ শোনেন আর নজরুলের আবৃত্তির অনুভাবে ক্ষীরোদ-প্রসাদ আনন্দোচ্ছল হ'য়ে ওঠেন। দু-এক বিন্দু আনন্দাশ্রুও গড়িয়ে পড়ে গণ্ডে। কবিতাটি পড়া শেষ হ'লে তিনি বললেন, তুমিই ভাই পারবে হিন্দু-মুসলমানকে মেলাতে। এই অসাধ্য সাধন করার জন্যই তুমি জন্মেছ।'

ক্ষীরোদবাবুর বাড়ী থেকে যখন তাঁরা ছাড়া পেলেন, তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। পথে বার হ'য়ে 'বিজলী'র জন্য কবিতাটি চাইতেই কবি ব'লেন যে, কবিতাটি ভাল করে কপি করে দেবেন। তিন চারদিন পরে কবিতাটি আনতে গিয়ে নলিনী বাবু শুনলেন যে, আফজালুল হক সাহেব 'মোসলেম ভারতে'র জন্য সেটি নিয়ে গেছেন। নলিনীবাবু খুবই মনঃক্ষুণ্ণ হ'লেন। তিনি আর কালবিলম্ব না করে 'মোসলেম ভারত' কার্যালয়ে গিয়ে আফজালুল হক সাহেবের সঙ্গে দেখা করলেন। হক সাহেব ইতিমধ্যেই 'কামাল পাশা' কবিতাটি এনেছেন—তাই নলিনীবাবু 'কামালপাশা'টি রেখে 'বিদ্রোহী' কবিতাটি তাঁকে ফেরত দেবার সকাতর প্রার্থনা জানালেন। কোন উত্তর না দিয়ে মৃদু হেসে হক সাহেব 'মোসলেম ভারতে'র ছাপানো ফর্মাগুলো দেখালেন। দেখা গেল হাবিলদার কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'কামালপাশা' এবং 'বিদ্রোহী' দু'টো কবিতাই কার্তিক সংখ্যায় ছাপা হ'য়ে গেছে। শেষের দিকের আর একটা মাত্র ফর্মা ছাপা হলেই 'মোসলেম ভারত' বাইরে আত্মপ্রকাশ করবে। কিন্তু 'বিদ্রোহী কবিতাটি নলিনীবাবুর এতই ভাল লেগেছিল যে, তিনি ওটি প্রকাশের লোভ দমন করতে পারলেন না। ফলে কূটনীতির আশ্রয় নিলেন। ছাপানো ফাইল টেনে নিয়ে তিনি মুদ্রিত সকল লেখার বিষয়বস্তু অনেকক্ষণ ধরে নেড়ে চেড়ে মোটামুটি দেখে নিলেন এবং হক সাহেবের অজ্ঞাতে লেখার শিরোনামা ও

লেখকদের নাম দেখে নিলেন। এরপর সরাসরি নজরুলের কাছে এসে 'বিদ্রোহী'র একটি কপি চাইলেন। নজরুল বিনা প্রতিবাদে আর একটি কপি করে দিলেন। সেই কপি নিয়ে 'বিজলী' অফিসে এসে তিনি কার্তিক সংখ্যা 'মোসলেম ভারতে'র সমালোচনা লিখলেন এইভাবে :

'মোসলেম ভারত'—কার্তিক ১৩২৮। সম্পাদক—মোজাম্মেল হক।

'মোসলেম ভারতে'র একটা বিশিষ্টতা এই যে, এতে বাজে জিনিষ বড় একটা থাকে না। আমাদের বিশ্বাস ভালো প্রবন্ধাদি সংগ্রহের জন্যই 'মোসলেম ভারত' ঠিক যথা সময়ে বের হয় না। এবারের 'মোসলেম ভারতে' শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 'চুরাশি লাখ' সুন্দর নিবন্ধ। মোহাম্মদ লুতফর রহমানের 'রাজনৈতিক অপরাধী' সুন্দর তেজঃপূর্ণ প্রবন্ধ। 'কামালপাশা' হাবিলদার কাজি নজরুল ইসলামের কবিতা। কবিতাটি যুদ্ধের মার্চের ছন্দে গাঁথা। এরূপ কবিতা বোধহয় বাংলার কাব্যসাহিত্যে এই প্রথম। 'বিদ্রোহী'—কাজী সাহেবের আর একটি কবিতা। কবিতাটি এত সুন্দর হয়েছে যে, আমাদের স্থানাভাব হলেও তা 'বিজলী'র পাঠক-পাঠিকাদের উপহার দেবার লোভ আমরা সম্বরণ করতে পারলাম না—"

'বিজলী'-র বাঁদিকের পৃষ্ঠার সর্বশেষ কলমের সর্বশেষাংশে ঐ ড্যাসটি টেনে দিয়ে পরের পৃষ্ঠায় মোটা অক্ষরে শিরোনামা দিয়ে পাইকা অক্ষরে পু:রা কবিতাটি ছাপানোর ব্যবস্থা হ'লো। পরের দিন সকালে 'বিজলী' জনসমক্ষে বার হ'লো। এইভাবে আফজালুল হক সাহেব 'মোসলেম ভারতে' 'বিদ্রোহী' কবিতাটি প্রথমে মুদ্রিত করেও প্রথম প্রকাশের সুনাম হ'তে বঞ্চিত হ'লেন। সেই বিরল সম্মানের অধিকারী হ'লেন 'বিজলী'। অবশ্য তার অল্প কয়েকদিন পরে 'মোসলেম ভারত' বাজারে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

জনাব মুজফ্ফর আহমদ মন্তব্য করেছেন যে অবিনাশ ভট্টাচার্যই নজরুলের নিকট থেকে বিদ্রোহী কবিতার কপি নিয়ে গিয়েছিলেন—নলিনীকান্ত সরকার নন। অথচ অবিনাশবাবুর অনেক মন্তব্যকেই তিনি প্রয়োজন মত অস্বীকার করেছেন। তাঁর লেখা থেকেই তুলে দিচ্ছি: "অবিনাশ ভট্টাচার্যও "মাসিক বসুমতী"তে (কার্তিক, ১৩৬২) পুরানো কথা লিখতে গিয়ে ঘটনা সম্পর্কে খানিকটা তালগোল পাকিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন পেন্সিলে লেখা কবিতাটি নিয়ে শুধু তাঁকে শোনাবার জন্যেই নজরুল তাঁদের প্রেসে গিয়েছিল। তিনিই জোর করে কবিতাটি "বিজলী"র জন্যে রেখে দেন।....অবিনাশবাবু বলছেন নজরুল পড়ছিল, আর তিনি তার শ্রুতিলিখন করছিলেন। নজরুল কখনো এইভাবে কবিতা ছাপতে দিত না। সে নিজ হাতে কপি করে কবিতা ছাপতে দিত। 'বিদ্রোহী'র বেলায়ও সে পেন্সিলের লেখা হ'তে নিজে কালিতে লিখে সেই কপি অবিনাশ বাবুকে দিয়েছিল। ঘটনার চৌত্রিশ বছর পরে এই সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে তাঁর স্মৃতি তাঁকে বিভ্রমে ফেলেছিল। আসলে অবিনাশ বাবু নজরুলের আপন হাতের কপি করা 'বিদ্রোহী' কবিতা 'বিজলী'তে ছাপতে নিয়ে গিয়েছিলেন। আবার কোনো এক কাগজে (আমি নিজে পড়িনি) শ্রীনলিনীকান্ত সরকার নাকি লিখেছিলেন যে 'বিদ্রোহী' কবিতা 'বিজলী'তে ছাপানোর জন্যে তিনিই নজরুলের নিকট হ'তে নিয়ে গিয়েছিলেন। আসলে নিয়েছিলেন তো অবিনাশ বাবুই, কিন্তু নলিনীকান্ত সরকারের হঠাৎ মনে এসেছিল যে তিনিই যখন নজরুলের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং 'বিজলী'তেও ছিলেন তখন তাঁরই তো 'বিদ্রোহী' কবিতা 'বিজলী'র জন্যে নিয়ে যাওয়ার কথা। এই কথা মনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি কথাটা কাগজে ছেপে দিয়েছিলেন।"

মুজফ্ফর সাহেবের এ ধরনের মন্তব্য পড়ে আশ্চর্য হ'য়ে যেতে

হয়। তাঁর মন্তব্য অনুযায়ী অবিনাশ বাবুর সব কথা মিথ্যে কেবল 'বিজলী'র জন্যে 'বিদ্রোহী' বয়ে নিয়ে যাওয়া সত্য। আর নলিনীকান্ত সরকার তো ডাহা মিথ্যার বেসাতী করেছেন। এমন কী কাগজে লেখার সময় নলিনীবাবুর মনে যে কথার উদয় হ'য়েছিল তাও তিনি এতকাল পরে ঠিক ধরতে পেরেছেন। আশ্চর্য! অন্য সকলের বেলায় সকলের স্মৃতি সকলকে বিভ্রান্ত করে আর তাঁর নিজের বেলায়? যে সংখ্যায় 'বিদ্রোহী' ছাপা হয় সে সংখ্যা 'বিজলী' কি মুজফফর সাহেব দেখেছেন? দেখলে মনে হয় নলিনীবাবু সম্পর্কে এমন বিভ্রান্তিকর মন্তব্য করতেন না। 'বিদ্রোহী' কবিতা যে 'কার্তিক' সংখ্যা 'মোসলেম ভারতে'র সমালোচনা প্রসঙ্গে 'বিজলী'তে উদ্ধৃত সে কথা অবিনাশবাবু কী মুজফ্ফর আহমদ কেউই উল্লেখ করেন নি। অথচ 'বিজলী'তে তার স্পষ্ট উল্লেখ আছে এবং নলিনীবাবুর মন্তব্য ও বক্তব্যের সঙ্গে তা' পুরো মিলে যাচ্ছে। কেউই সত্য নয়—আমার মন্তব্যই সত্য এ ধরনের মনোভাব কী প্রশংসনীয়? কারো সম্পর্কে কোন মন্তব্য করতে গেলে সমীহ হ'য়ে করাই বাঞ্ছনীয়—যদি সে মন্তব্য ভুল ও অসত্য হয়েও থাকে। নজরুলের নাম ভাঙিয়ে নিজের নামকে বড় করার ইচ্ছা যদি নলিনীবাবুর থাকতো তা' হলে তিনি তো বহু পূর্বেই এ ধরনের আরো অনেক মন্তব্য করতে পারতেন—অথচ কোথাও তা' তিনি করেন নি। তা' ছাড়া বিদ্রোহী সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যও খুব বেশী দিনের নয়।

এই 'বিদ্রোহী' কবিতাটি নিয়ে একদিন মোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গে নলিনীবাবুর রীতিমত ঝগড়া হ'য়ে গেছে। মোহিতলাল মজুমদার ১৩২১ সালের পৌষ সংখ্যা 'মানসী'-তে (৬ষ্ঠ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা) 'আমি' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। 'বিদ্রোহী' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে বেড়াতে লাগলেন যে নজরুল কবিতাটির সমগ্র ভাবসম্পদ 'আমি' কবিতা থেকে চুরি করেছেন।

বিখ্যাত গজেনদা'র আড্ডায় এক দিন কথা প্রসঙ্গে মোহিতবাবু ফলাও করে বিষয়টি উত্থাপন করলেন। 'আমি' প্রবন্ধের কোন কোন স্থান থেকে 'বিদ্রোহী' ভাব চুরি করা হয়েছে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যায় তিনি মেতে উঠেলেন। কথা-বার্তা ক্রমেই শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। নলিনীবাবু প্রথম হ'তেই আড্ডায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি থাকতে না পেরে বললেন, 'এ রকম চুরি সকলেই করে—এমন কী—রবীন্দ্রনাথও করেছেন।'

উপস্থিত সকলেই নলিনীবাবুর উপর ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠলেন—রবীন্দ্রনাথ চুরি করেছেন! নলিনীবাবু ততোধিক দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, হ্যাঁ' রবীন্দ্রনাথ চুরি করেছেন। "ঐ ক্ষ্যাপা শ্রাবণ ছুটে এল আশ্বিনেরি আঙিনায়" গানটি তাঁর সম্পূর্ণ চুরি করা।'

সকলেই জানতে চাইলেন, 'কোত্থেকে চুরি করা?'

নলিনীবাবু বললেন, 'গুপ্ত প্রেস পঞ্জিকা থেকে। কেন না ওতে শ্রাবণও আছে আশ্বিনও আছে।'

এই উত্তর শুনে সবাই হো হো করে হাসতে লাগলেন কিন্তু মোহিতলাল এমনই ক্রুদ্ধ হ'য়ে পড়েছিলেন যে বহুক্ষণ ধরে তিনি আর কোন কথা বলতে পারেন নি। চোখ তাঁর লাল হ'য়ে উঠেছিল এবং কয়েক মিনিট পর্যন্ত কাঁপুনি বন্ধ হয় নি।

৫.

কবির খেয়াল চাপল একটা কাগজ বের করবেন। যে কথা সেই কাজ। কবিগুরু-শরৎচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যরথীর আশীর্বাদসিক্ত হয়ে ১৩২৯ সালের শ্রাবণ মাসে অর্ধসাপ্তাহিক "ধূমকেতু" বের হ'ল। এই

পত্রিকার পূজা সংখ্যায় "আনন্দময়ীর আগমনে" শীর্ষক কবিতা প্রকাশিত হওয়ায় কবি বন্দী হ'লেন এবং বিচারে এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হ'লেন। হুগলী জেলে রাখা হ'ল কবিকে। এখানেই শুরু হল তাঁর ঐতিহাসিক অনশন-প্রতিবাদ।

রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, দেশবন্ধু ইত্যাদি মনীষীগণ নজরুলের অনশন-ভঙ্গের অনুরোধ জানিয়ে চিঠিপত্র ও টেলিগ্রাম পাঠালেন হুগলী জেলে— কিন্তু বৃথা। কবি অনশন ব্রতে অটল রইলেন। ক্রমেই তাঁর শরীর দুর্বল হচ্ছে। দৈনিক সংবাদপত্রে সে ব্যথার সংবাদ সাড়ম্বরে প্রকাশিত হচ্ছে। দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বিচলিত হ'য়ে পড়ছেন সে সংবাদে। অনশনের আটাশ দিনের মাথায় কয়েকজন যুবক এসে নলিনীবাবুকে ধরলেন। কেমন করে তাঁদের বিশ্বাস হয়েছিল যে নলিনীবাবু গিয়ে অনুরোধ করলে হয়তো নজরুল অনশন ভঙ্গ করবেন। কিন্তু নলিনী-বাবু বিশেষ রূপে নজরুলের স্বভাব ও চরিত্রকে জানতেন এবং চিনতেন। তিনি এক রকম নিশ্চিত ছিলেন যে এ ব্যাপারে নজরুলকে নিরস্ত করা যাবে না। তবুও যুবকদের অনুরোধে একবার চেষ্টা করে দেখার সংকল্প নিলেন। যথাসময়ে তিনি হুগলী জেলের দিকে রওনা হয়ে গেলেন। সঙ্গে গেলেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। হুগলী জেলে গিয়ে নজরুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুরোধ জানালেন জেল কর্তৃপক্ষকে। তাঁরা সরাসরি সে অনুরোধ নাকচ করে দিলেন। বিফল বেদনায় উভয়ে ষ্টেশনের পথে পা বাড়িয়েছেন। জেলখানার পাঁচিল ঘেঁষেই পথ। পাঁচিলের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ নলিনীবাবুর মনে হল পাঁচিল যদিও উঁচু তবুও ওটা ডিঙিয়ে হয়তো জেল এলাকার মধ্যে লাফিয়ে পড়া যেতে পারে। সেটা সম্ভব হ'লে নজরুলের সঙ্গে দেখা করাও সম্ভব হ'বে। পাঁচিলের ওপর ওঠার বিপদ সম্পর্কে পবিত্রবাবু হুঁশিয়ার করে দিলেন। কিন্তু সমূহ বিপদ জেনেও সে-ঝুঁকি মাথা পেতে নিলেন নলিনীবাবু। তাঁর মনে হ'ল স্পষ্ট সূর্যালোকে এই অপরাধমূলক কাজ করলে সরকারী বেতনভোগী অনুগত ভৃত্যদের চোখ

এড়াবে না এবং তাদের বিক্রমও যথেষ্ট পরিমাণে বেড়ে যাবে। ফল—কারাবাস। নজরুলের সঙ্গে দেখা হওয়ার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। সুতরাং বিপদ সম্পর্কে তিনি নির্ভয় হলেন।

পূর্বের কথা মত পবিত্রবাবু উবু হ'য়ে পাঁচিলের গোড়ায় বসলেন। তাঁর কাঁধে পা দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন নলিনীবাবু। পবিত্রবাবু অতি সাবধানে পাঁচিলের গা ধরে ধীরে ধীরে উঁচু হলেন। ইতিমধ্যেই পাঁচিলের ওপরটা নাগালের মধ্যে এসে গিয়েছিল। ফলে নলিনীবাবু ওপরটা ধরেই অতি কষ্টে তার ওপর উঠে দু'দিকে পা ঝুলিয়ে ঘোড়ায় চড়ার মত করে বসলেন। কিন্তু জেলখানার ভিতরের দিকে তাকিয়ে তিনি বিশেষরূপে চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন। ঠিক পাঁচিলের নীচেই গভীর খাদ। প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ হাত নীচেয় মাটি। কোন রকমেই সেখানে লাফিয়ে পড়া সম্ভব নয়। সুতরাং এত পরিশ্রমের পর তিনি বিশেষ রূপে মনঃক্ষুণ্ণ হ'লেন। নিরুপায় হ'য়ে তিনি জেলখানার মাঠের দিকে তাকিয়ে আছেন হঠাৎ দেখলেন তাঁর বিশেষ পরিচিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী মহাশয় বেড়াচ্ছেন। তিনিও তখন হুগলী জেলে রাজবন্দী। নলিনীবাবু তাঁকেই চীৎকার করে নজরুলকে ডেকে দেবার জন্মে বললেন। জেল কয়েদীদের অনেকেই ইতিমধ্যে মাঠের মধ্যে সমবেত হ'য়েছেন। অপ্রত্যাশিত কোন একটা ঘটনা দেখার জন্মে তাঁরা মৃদু কৌতুক অনুভব করছেন। এমন সময় জেলের ভিতর থেকে দু'জন কয়েদীর কাঁধে ভর করে নজরুল এলেন। দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। অনশনে শরীর একেবারে জীর্ণ হয়ে গেছে। নলিনীবাবু আর অপেক্ষা করলেন না। অত দূরে চীৎকার ঠিকমত পৌছবে না ভেবে তিনি ইংগিতের আশ্রয় নিলেন। কল্পিত থালায় খাবার নিলেন এবং সেই থালা থেকে খাদ্য নিয়ে মুখে দিয়ে চিবুতে লাগলেন। সবই কল্পনার ব্যাপার কিন্তু ইংগিত সুস্পষ্ট। নজরুলও ইংগিতে জানালেন যে বন্ধুর এ অনুরোধ তিনি রাখতে পারবেন না; অনশন তিনি ভাঙবেন না।

এদিকে তখন আর এক কাণ্ড। প্ল্যাটফর্মের ওপর তখন বিরাট জনতা। পাঁচিলের ওপর ওঠা এই গুণ্ডা প্রকৃতির [illegible] ধরার জন্তে তাদের হাঁকডাক আর উৎসাহের অন্ত নেই। দলে দলে লোক জমা হ'চ্ছে। নলিনীবাবু আর কাল বিলম্ব করলেন না। লাফিয়ে পাঁচিল থেকে নামলেন। নামার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে ধরে ষ্টেশনের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হ'ল। 'এই মারে তো এই মারে' ব্যাপার। তাদের ধারনা হ'য়েছিল ভদ্রলোক সন্ত্রাসবাদীদের কেউ একজন। কিন্তু নলিনীবাবু সবিনয়ে জানালেন যে তিনি বোমা-পিস্তলধারীদের দলের নন। অনেক কথা কাটাকাটির পর ষ্টেশন-কর্মীদের মনে বোধহয় কিছু করুণার উদ্রেক হ'ল। হাজার হোক স্বদেশবাসী তো। কী মনে করে তাঁরা নলিনীবাবুকে ছেড়ে দিলেন।

নলিনী ও পবিত্রবাবু উভয়ে গভীর দুঃখে কলকাতায় ফিরে এলেন।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ এবং স্বদেশবাসীর সমবেত হস্তক্ষেপে সরকারী মনোভাব অনেকখানি নরম হ'য়ে এসেছিল; উনচল্লিশ দিনের দিন মাতৃসমা বিরজাসুন্দরী দেবীর হাতে লেবুর রস পান করে তিনি অনশন ভঙ্গ করেন। অনশন ভঙ্গের কিছুকাল পরেই কবিকে হুগ্‌লী জেল থেকে স্থানান্তরিত করা হ'ল বহরমপুর জেলে।

৬.

এই বহরমপুরের জেলেও একবার কবিকে দেখ্‌তে গিয়েছিলেন নলিনীকান্ত সরকার। বেলা তখন দশটা। জেল কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করতেই তা' মঞ্জুর হয়ে গেল। একজন প্রহরী গিয়ে নলিনীবাবুকে জেল ফটক থেকে নিয়ে এলেন অফিস ঘরে।

সেখান থেকে নলিনীবাবুর আগমন সংবাদ গেল নজরুলের কাছে। যথাসময়ে নজরুল এলেন। দুই বন্ধুর পুনর্মিলন হ'ল। তিনি এসেই জেল কর্মচারীকে প্রায় নির্দেশ দিলেন চা আর জলখাবারের ব্যবস্থা করতে। বলাবাহুল্য হুগলী জেলের অনশনের পর নজরুলের সম্মান কারাপ্রাচীরের মধ্যে অন্য রকম হ'য়েছিল। কর্তৃপক্ষরা হয়তো তাকে কিছু ভয় করেই চলতেন। নির্দেশ দেওয়ার কিছু পরেই চা আর জলখাবার আসায় নলিনীবাবু কিছুটা বিস্মিত হ'য়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মতে বহরমপুরের জেলখানাকে নজরুল নিজের ঘর-বাড়ী করে তুলেছিলেন।

জলযোগের পর সেই জেল অফিসেই বসল গানের আসর। সেই সব গানই তিনি সেখানে গাইলেন যেগুলি গেয়ে তিনি হুগলী জেলের বড় কর্তাকে 'সম্মান' জানাতেন। যে সকল গান গেয়ে তিনি অন্যান্য কয়েদীদের মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার করতেন সেগুলিও বাদ গেল না। কবি নির্ভয়, হাস্যোচ্ছল। গেরেপ্তারীর পরোয়ানা বার হবার পূর্বে কবির কলকতা থেকে অন্তর্ধান হওয়া, কুমিল্লায় পুনরায় গেরেপ্তার হওয়া থেকে শুরু করে হুগলী জেলের সমুদয় ইতিহাস তিনি আদ্যোপান্ত বলে গেলেন। নলিনীবাবু বিপুল বিস্ময়ে সকল কথা শুনে গেলেন।

৭.

জেল থেকে মুক্তি পেলেন কবি। কারামুক্তির পর তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হ'লেন। কলকাতার ৬নং হাজী লেনে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে এপ্রিলে প্রমীলা সেনগুপ্তের সঙ্গে এই শুভ পরিণয়ের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন মিসেস এম, রহমান এবং মঈনুদ্দীন হোসায়েন। বিয়ের

পর তারা হুগলীতে গিয়ে বসবাস আরম্ভ করেন। এই হুগলীর বাসাতেই কবির প্রথম পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেন। এই পুত্রের আকিকায় (মঙ্গলানুষ্ঠানে) কবি সমকালীন বন্ধু-বান্ধবদের সকলকেই নিমন্ত্রণ করেছিলেন। "কল্লোল" এবং "বিজলী" গোষ্ঠীর কম-বেশী সকলেই এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। নলিনীবাবুও আমন্ত্রিত হ'য়ে গিয়েছিলেন।

এই সময়ে কবি কলকাতায় এলে অধিকাংশ সময়ে নলিনীবাবুর বাসায় গিয়ে উঠ্‌তেন। একদিন দুপুরে তিনি নলিনীবাবুর বাসাতেই অবসর যাপন করছেন—এমন সময় তার কর্ণে এল মধুর সংগীতের রেশ। চারপাশের আকাশ-বাতাস সুরে সুরে ভরে উঠেছে। দু'জন পথচারী হিন্দুস্থানী ভিখারী—একজনপুরুষ অন্যজন নারী—গলায় হারমোনিয়াম বেধে 'জাগো পিয়া' শীর্ষক গজল গেয়ে চলেছে। উর্দু গজল। তানে লয়ে সুরে নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন যেন প্রাণ পেয়ে জেগে উঠেছে। সুর-পাগল কবি বাইরে এসে বৈঠকখানায় তাদের ডাকলেন। তারাও এল যথাসময়ে। এমন শ্রোতার জন্যে তাদের আকুলতা কিছু বেশী। একের পর এক তারা অনেকগুলি গান গেয়ে শোনাল। কবি সুরে তন্ময় হ'য়ে নিমিলীত চক্ষে মাঝে মাঝে আবেগ ভরে 'আহা আহা' বলে ওঠেন। গজল গানগুলি তাঁর কাছে নতুন রূপে প্রতিভাত হ'ল। কয়েকটি গান গেয়ে তারা চলে যেতেই কবি তখনই সংগীত রচনায় তন্ময় হ'য়ে উঠ্‌লেন। তাদের 'জাগো পিয়া' গানটির সুর ছিল "ভৈরবী রাগিণী"—ঐ একই রাগিণীর কাঠামোতে কবি রচনা করলেন 'নিশি ভোর হ'ল জাগিয়া, পরাণ পিয়া' গজলটি। অপূর্ব সুন্দর গজল গান। ছন্দ, শব্দ, লয়ে নিটোল। নলিনীবাবুর মতে এখান হতেই কবির গজল গান রচনার সূত্রপাত। মন্তব্যটির সত্যতা বিচার সাপেক্ষ—কেন না এর পূর্বেই কবি কিছু কিছু গজল গান রচনা করেছেন এবং সেগুলি মাসিক পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছে। তবে হয়তো এইটুকু

বলা যেতে পারে এই ঘটনার পর হ'তে কবি বিশেষরূপে গজল গান রচনার দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। এর ফলে তাঁকে তাঁর অনেক উগ্রপন্থী রাজনৈতিক বন্ধুদের বিরাগভাজন হ'তে হ'য়েছিল। 'রণতূর্য' ছেড়ে বাঁশের বাঁশরী ধরায় তাঁরা সকলেই ক্ষুব্ধ হ'য়েছিলেন।

কিন্তু স্বাগত জানালেন গ্রামোফোন কোম্পানি। তাঁরা নতুন আশার আলোক দেখ্‌তে পেলেন নজরুলের গজল গানের মধ্যে। ফলে অনুরাগের ডালি নিয়ে ছুটে এলেন। ঘটনাটি গুছিয়ে বলা আবশ্যক।

শ্রীহরেন্দ্র ঘোষ নামে এক ভদ্রলোক নজরুলের দু'টি কবিতার অংশ বিশেষ সুর দিয়ে রেকর্ড করেন। অবশ্য রচয়িতা নজরুলের নামটি গোপন রাখা হয়—কেন না সরকার তখন কবিকে সুনজরে দেখতেন না। ফলে খোদ ইংরেজ কোম্পানি H. M. V.-তে যে নজরুলের কদর বাড়বে এমন আশা করা বৃথা। কিন্তু রেকর্ড দু'টি ভাল বিক্রি হ'য়েছিল। অন্যদিকে দিলীপকুমার রায়ের কণ্ঠে নজরুলের গজল গানগুলি তখন বিশেষ জনপ্রিয় হ'য়ে পড়েছে। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কবির গজল গানগুলি শিক্ষিত জনসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কবির গরাদ ভাঙা বিদ্রোহাত্মক গানগুলির তো কথাই নেই। বাংলা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গ্রামোফোন কোম্পানিতে চিঠি আসতে লাগল যে নজরুলের গান রেকর্ড করা হোক। এমন সময় গ্রামোফোন কর্তৃপক্ষ লক্ষ্য করলেন যে নজরুলের সংগীত-জীবনের নতুন দিগন্ত গজল গানের মহানালোকে আলোকিত। এই সময় তখনকার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় গায়ক কে মল্লিক কবির নিকট হ'তে দু'টি গজল গান নিয়ে আসেন। কর্তৃপক্ষ অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠে অবশেষে গান দু'টি রেকর্ড করার অনুমতি দেন। দেশের জনগণ যেন এই শুভ মুহূর্তের জন্যে অপেক্ষা করছিল। রেকর্ডখানা হু হু করে বিক্রি

হয়ে গেল। কর্তৃপক্ষ চঞ্চল হ'য়ে উঠলেন। আর কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নয়—নজরুলের কাছে ছুটলেন তাঁরা।

সে সময়ে H. M. V-র Recording Representative ছিলেন ভগবতী ভট্টাচার্য মহাশয়। তাঁর উপরেই কবির সঙ্গে একটা চুক্তিতে আসার ভার পড়ল। স্বর্গীয় ধীরেন দাস মহাশয় তখন গ্রামোফোনের সঙ্গে যুক্ত। এই ধীরেন দাস মহাশয়কে সঙ্গে নিয়ে ভগবতী ভট্টাচার্য মহাশয় ছুটলেন কবির নিকটে। নলিনীকান্ত সরকার মহাশয়ের বাড়ী জেলেটোলা স্ট্রীটে। কবি তখন ওখানেই থাকেন। সংবাদ পেয়ে ভগবতী বাবুর সঙ্গে দেখা করলেন। বহুক্ষণ ধরে ব্যবসায়ী কথাবার্তা চলল। গ্রামোফোন কোম্পানিতে তখন ঠিক র‍্যায়ালটি প্রথা চালু হয়নি। রচয়িতাকে নগদ কিছু দিয়েই বিদায় করা হ'ত। র‍্যায়ালটি পেতেন মাত্র তিনজন—রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল। তরুণ কবি নজরুলকেও কর্তৃপক্ষ সর্বোচ্চ মূল্য দিতে স্বীকৃত হ'লেন। কথা দিলেন কবিও রয়্যালটি পাবেন। পরিবর্তে তাঁর সকল গজল গান রেকর্ডের জন্যে কোম্পানিতে দিতে হ'বে। কবিও রাজী হ'লেন। চুক্তির সময় বাধল গোলযোগ। কবি বললেন যে, গান রেকর্ড করার জন্যে রেকর্ড শিল্পীদের শিখিয়ে দেবেন তাঁর বন্ধু নলিনীকান্ত সরকার। ভগবতীবাবু বেঁকে বসলেন। তিনি জানালেন যে রেকর্ড-শিল্পীদের শেখানোর জন্য কোম্পানির মাইনে করা লোক আছে। সুতরাং একাজের জন্য তাঁরা আবার নলিনীকান্তবাবুকে নিয়োগ করতে পারবেন না। কবিও জিদ ধরলেন নলিনীবাবুকে না নিলে তিনি গান দেবেন না। ফলে সেবারের মত গ্রামোফোন কোম্পানি কবির সঙ্গে কোনো চুক্তি সম্পাদন করতে পারলেন না বটে কিন্তু সুযোগের সন্ধানে রইলেন। মাঝে মাঝে গ্রামোফোন কোম্পানির গানের জলসায় কবি নিমন্ত্রিত হতেন। বলাবাহুল্য কবি আনন্দ চিত্তে সে নিমন্ত্রণ

গ্রহণ করতেন। এইভাবে সৌহার্দপূর্ণ ব্যবহারের ভিতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত একটা সমন্বয়ধর্মী চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল।

এই অর্থকরী চুক্তিকে নলিনীবাবু সুনজরে দেখতে পারেন নি। তিনি এর নাম দিয়েছেন "নজরুলদোহন"। বলাবাহুল্য চুক্তি সম্পাদিত হবার পর থেকে গ্রামোফোন কোম্পানি যেন নজরুলকে কিনে নিলেন। স্বাধীন রচনার সুযোগ খুব কমই রইলো। ফরমায়েসী গান রচনা করতে হ'তো কবিকে। "এই সুরে, এত লাইনে, এত সময়ে, এই বিষয়ে গান রচনা করতে হ'বে"—না বলার উপায় নেই। বাঁধা ধরা গৎ ও সময়। অবশ্য শেষ পর্যন্ত এই অর্ডারী গান রচনায় নজরুল বিশেষ সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠেছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর অসামান্য সার্থকতা বিশেষ রূপে স্মরণীয়। তবুও বাংলা কাব্য সাহিত্যের যে বিপুল ক্ষতি হ'য়েছে সে দুঃখ কোন কালেই ভোলা যাবে না।

জগৎ ঘটক

১.

১৯২৪ সালের এপ্রিল-মে। নজরুল তাঁর ঐতিহাসিক কারাবরণের পর সবেমাত্র বহরমপুর ডিষ্ট্রিক্ট জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন। সেই সময় বহরমপুর সাইন্স কলেজ হোষ্টেলের ১নং ব্লকে কবিকে সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। এই সভাতেই কবির সঙ্গে জগৎ ঘটকের প্রথম পরিচয়। ঘটক মহাশয় তখন সবেমাত্র বি. এ পরীক্ষা দিয়েছেন।

বহরমপুর জেলে থাকালীন কবি কুখ্যাত আশু দারগার সঙ্গে পরিচিত হ'লেন ঐ কারাপ্রাচীরের মধ্যে। আশু দারগা সম্পর্কিত সম্পূর্ণ তথ্যটি জগৎবাবু আমাদের যে ভাবে জানিয়েছেন আমরা তা' নিম্নে প্রকাশ করলাম।

আশু দারগা। অনেক অঘটনের নায়ক। অনেকের অনেক দীর্ঘশ্বাসের সাথে গাঁথা যে নাম সেই আশু দারগা। এখন ও নাম শুনে বহরমপুরের পাখী-পাকুল ডরায় কিনা জানি না—কিন্তু তখন ডরাত। লোকটি ছিল সি. আই. ডি। স্থানীয় থানায় কাজ করতো। জেল কর্তৃপক্ষের সাথেও গভীরভাবে যুক্ত ছিল। গুপ্তভাবে সংবাদ সংগ্রহ করে সে কর্তৃপক্ষের কানে তুলতো এবং তারই নির্দেশক্রমে পুলিশের লোক গিয়ে নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে

গ্রেফতার করে নিয়ে আসতো। জেলে কয়েদীদের ওপর যে বিভিন্ন প্রকার অত্যাচার চালানো হ'তো—তা'তেও আশু দারগার হাত ছিল অনেকখানি। তারই নির্দেশক্রমে কখনো কখনো কয়েদীদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়ান-কমান হ'ত।

নজরুল বিশেষ কয়েদীরূপে গণ্য হয়ে এসেছিলেন বহরমপুর জেলে। কিন্তু সে নামে মাত্র। প্রকৃতপক্ষে বেশ কিছুদিন এখানে নজরুলকে বিশেষ কয়েদী নামের আড়ালে সাধারণ কয়েদী হিসেবে থাকতে হয়। পূর্ব হ'তেই আশু দারগা নজরুলের নাম শুনেছিল—নিজের আওতায় পেয়ে কবির ওপর অত্যাচারের মাত্রা শতগুণ বাড়িয়ে দিল। হুগলী জেলে দীর্ঘ উনচল্লিশ দিন অনশন করে কবির দেহ অত্যন্ত দুর্বল হ'য়ে পড়েছিল তবুও এখানের এই নির্বিচার অত্যাচারকে তিনি মেনে নিতে পারলেন না। অন্যান্য কয়েদীদের সহযোগিতায় তিনি জেলের মধ্যে ধর্মঘট শুরু করে দিলেন। কর্তৃপক্ষের হৃদয়হীন অত্যাচার ও ধর্মঘটের সংবাদ জেলের কঠিন প্রাচীর ডিঙিয়ে বাইরে এল। সে সময় নলিনাক্ষ সান্যাল ছিলেন বহরমপুরে। তিনি সভা-সমিতির দ্বারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে বলিষ্ঠ জনমত গঠন করে এই অনাচারের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন শুরু করলেন। পূর্বে অনশন ধর্মঘটের সময় নিখিল বাংলার জনগণ বিক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠেছিল—তার ওপর নলিনাক্ষ সান্যালের মাধ্যমে আন্দোলন গড়ে ওঠায় সরকার পক্ষ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন—ফলে কারাবাসের নির্দিষ্ট সময়ের একমাস পূর্বেই নজরুলকে জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। কিন্তু আশু দারগার সাথে তাঁর সম্পর্ক এখানে শেষ হ'ল না।

বহরমপুরের গোরাবাজার এলাকায় আশু দারগার তিনখানি নিজস্ব বাড়ী ছিল। পশ্চিম দিকে দু'খানা বাড়ী ও পূবদিকে একখানা। মাঝে রাস্তা। পূবদিকের বাড়ীতে দারগা নিজে থাকতো আর পশ্চিম দিকের একখানা বাড়ী ভাড়া নিয়ে থাকতেন ২৪

পরগণার অন্তর্গত গোবরডাঙ্গার বিখ্যাত ঘটক পরিবার—জগৎ ঘটক, তাঁর মা শ্রীমতী সুনীতিবালা দেবী ও জগৎ ঘটকের ছোট ভাই নিতাই ঘটক ও বোন গৌরী। নলিনাক্ষ বাবু ছিলেন ঘটক পরিবারের শিক্ষক। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে নজরুল নলিনাক্ষ বাবুর বাসায় ওঠেন এবং পরে ঘটক পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হ'ন।

জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরের দিনগুলিতে নজরুল অধিকাংশ সময় আশু দারগার বাড়ীতে (যে বাড়ী জগৎ ঘটকেরা ভাড়া নিয়েছিল) বসে গানের আসরে মেতে থাকতেন। তাঁর এ গানের আসরের লক্ষ্য ছিল ঐ আশু দারগা। ঘটনাটা একটু গুছিয়ে বলা দরকার।

আশু দারগার স্ত্রী ছিল অত্যন্ত শুচিবায়ুগ্রস্ত। জাত বিচার ও ছোঁয়াছুয়ির ব্যাপারটা তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চল্‌তেন। তাঁর স্বামীকে থানায় কিংবা জেলে বিভিন্ন জাতের লোকের সাথে মিশতে হয়। তাই স্বামীর প্রতি তাঁর কড়া নির্দেশ ছিল যে অফিস ছুটির পর বাড়ীতে এসে সে যেন সোজাসুজি অন্দর মহলে প্রবেশ না করে। গেটের সম্মুখের সিঁড়িতে একটি গামছা পড়ে থাক্‌তো। দারগা বাড়ীতে এসে সেই সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে প্রথমেই খুলে ফেলতো তার পোশাক—uniform. তারপর গামছা পরে দাঁড়িয়ে থাক্‌তো নীচেয়। তারপরেই যথা নিয়মে ভিতর হ'তে তার স্ত্রী এসে ওপর থেকে এক বাল্‌তি গঙ্গাজল ঢেলে দিতেন মাথায়। অসুখ-বিসুখে, শীত বর্ষায় বার মাস এ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম ছিল না। এ ঘটনাটি নজরুলের কাছে দারুণ এক কৌতুকের বিষয় হ'য়ে দাঁড়ায়। তিনি এই বিষয়টি অবলম্বন করে প্রতিদিন নতুন নতুন গান ও ছড়া রচনা করতেন এবং হারমোনিয়াম সহযোগে চিৎকার করে গাইতেন। এই প্রবন্ধের উপাদান সংগ্রহের জন্য যখন আমি জগৎ বাবুর কাছে যাই তখন তিনি শত চেষ্টা করে সেদিনকার সে গানের

একটি কলিও সঠিকভাবে মনে করতে পারেননি। তবে মোটামুটি সে গানের ভাব ছিল এই রকম: 'দারগা গো—দারগা, জেলে নিরীহ কয়েদীদের ওপর ডাণ্ডা চালাও আর বাড়ীতে এসে স্ত্রীর ডাণ্ডা খেয়ে ঠাণ্ডা হও।"

এই গানের আক্রমণে দারগা এমনই অপমানাহত হ'য়ে পড়ে যে সদর পথে বাড়ীতে প্রবেশ করার সাহস হারিয়ে ফেলেন। পিছনের দরজা দিয়েই বাড়ীর সাথে তার সংযোগ রক্ষা হয়।

আশু দারগার মৃত্যুটি কিন্তু বড় করুণ।

একদিন সকালে উঠে দেখা গেল আশু দারগা মরে পড়ে আছে। পুলিশের সঙ্গে জনতা এগিয়ে এল। দেখা গেল পার্শ্বে একটি পিস্তল পড়ে আছে আর একটি কি দুটি বুলেট কণ্ঠনালীতে বিদ্ধ হয়ে ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে বার হ'য়ে গেছে। কোর্টে মামলা রুজু হ'ল। হত্যাকারী হিসেবে প্রস্তাব করা হ'ল ডক্টর নলিনাক্ষ সান্ন্যাল মহাশয়ের নাম। শেষ পর্যন্ত কিন্তু ডাঃ সান্ন্যাল বেকসুর খালাস পেলেন কেন না পুলিশী তদন্তে দেখা গেল মৃতদেহ যে ভাবে গুলিবিদ্ধ হ'য়েছে তা' একমাত্র আত্মহত্যার বেলাতেই সম্ভব, পার্শ্ব থেকে বা সম্মুখ থেকে কেউ মারলে ঠিক ঐ ভাবে বুলেট বিদ্ধ হতে পারে না।

২.

বহরমপুর থেকে কবি এলেন কলকাতায়। কিছুকালের মধ্যে ঘটক পরিবারের অনেকেই কলকাতায় এলেন। এই সময় কবির সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিল। এই ঘনিষ্ঠতার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল সংগীত। ঘটক পরিবারের

সকলেই ছিল সংগীতপ্রিয়—বিশেষ করে জগৎ ঘটক এবং নিতাই ঘটক। কবির অনেক সংগীত রচনার সঙ্গে জগৎবাবুর যোগ অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। কবির সংগীত রচনার শ্রেষ্ঠতম কাল ১৩৩৯ সাল হ'তে ১৩৪৯ সাল পর্যন্ত। সংগীত রচনার এই ঐশ্বর্যপূর্ণ সময়ের অধিকাংশ মূল্যবান মুহূর্ত কবি জগৎবাবুর সঙ্গে অতিবাহিত করেছেন। অধিকাংশ সময়ে কবি ভাবের ঘোরে তন্ময় হয়ে পংক্তির পর পংক্তি বলে যেতেন—জগৎবাবু অতি দ্রুত সেগুলি তুলে নিতেন। সম্পূর্ণ গানটি রচিত হয়ে যাওয়ার পর তিনি স্বরলিপি তৈরী করতেন। নজরুল সংগীতের অধিকাংশ গানের সুর নজরুলের আর সেই সুরকে স্বরলিপির মধ্যে ধরে রেখেছেন জগৎবাবু!

নজরুল-সংগীতের প্রথম স্বরলিপির বই প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালের শেষে অথবা ১৯২৮ সালের প্রথমে—নাম "নজরুল স্বরলিপি"। ছাপা হয় কালিকা প্রেস থেকে, পরে ডি. এম. লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী শ্রীগোপালদাস মজুমদার মহাশয় বইখানির "কপি রাইট" কিনে নেন। এই পুস্তকের স্বরলিপি নির্মাণে জগৎবাবুকে আর যাঁরা সাহায্য করেছিলেন তাঁদের মধ্যে স্বর্গীয় উমাপদ ভট্টাচার্য, অন্ধ-গায়ক গোপাল সেন, অনিল বাগচী প্রধান। প্রথম সংস্করণে বহু ভুল-ত্রুটি ছিল। ১৩৬৬ সালে যখন বইটির চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয় তখন ডি, এম, লাইব্রেরী কর্তৃক অনুরুদ্ধ হ'য়ে জগৎবাবু অনেক কিছু সংশোধন করে দিয়েছেন।

১৩৪০ সালে জগৎবাবু মাসিক "ভারতবর্ষের" সংগীত বিভাগের প্রধান হিসাবে নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি "ভারতবর্ষে"র পৃষ্ঠায় অসংখ্য নজরুল-সংগীতের স্বরলিপি প্রকাশ করেন। অন্যান্য মাসিক পত্রিকাতেও এ সময় কিছু কিছু স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছিল। মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত এই সময়ের গানগুলি কবির কোনো গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এগুলি সংগ্রহ

করে প্রকাশ করলে নজরুল-সংগীতের একটি উচ্চমানের বই হ'তে পারে।

সজ্ঞান অবস্থার শেষের দিকে কবি ক্লাসিক্যাল সুরে বাংলা গান রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। এ সময়ে অধিকাংশ দিন কবি গ্রামোফোন কোম্পানির রিহার্সাল রুম হতে চলে আসতেন ৮৭ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে ঘটক মহাশয়ের বাড়ীতে। এখানে তিন তলার একটি ঘর কবির জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এই সময় সংগীত রচনায় কবি এমন তন্ময় হয়ে যেতেন মনে হতো তিনি যেন সমাধিস্থ হয়ে গেছেন। "নীলাম্বরী শাড়ী পরি", "সন্ধ্যা মালতী যবে", "শাওন আসিল ফিরে" প্রভৃতি গানগুলি এই সময়ের রচনা।

৩.

নজরুল সম্পর্কে আমাদের সব থেকে বড় সার্টিফিকেট বোধ হয় এই যে, তিনি রবীন্দ্র-যুগে 'good poet' হিসেবে বাংলা সাহিত্যে কিছুটা বৈচিত্র্য এনেছেন! কিপ্লিং-এর মত একটুখানি হৈ-চৈ করে স্তব্ধ হ'য়ে গেছেন চিরদিনের মত। এসেছিলেন একটা ধূমকেতুর মত—শেষ দিনালোকটুকুর ন্যায় পশ্চিমাকাশকে একটুখানি রাঙিয়ে দিয়ে নিভে গেছেন চিরকালের জন্যে।

কিন্তু নজরুলকে যাঁরা গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন, চিন্তা করেছেন, বোধহয় তাঁরা এ মত সমর্থন করবেন না। নজরুলের সমগ্র কাব্য-সৃষ্টি, গল্প, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদির কথা বাদ দিয়েও (যদি কবি ওসব না-ও লিখতেন) কেবলমাত্র সঙ্গীতের কথা স্মরণ রেখেই এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাবে নজরুল অমর। কিন্তু নজরুল-সঙ্গীত নিয়ে আজ পর্যন্ত কোথাও ব্যাপক ও সুষ্ঠু আলোচনা হ'য়েছে এ কথা বলা যায় না।

কথাটির ওপর আমি একটু বিশেষ জোর দিতে চাই। কয়েকজন নজরুল-গবেষক 'গীতিকার ও সুরকার নজরুলের" যে আলোচনা করেছেন তা' অনেকেরই চোখে পড়ার কথা। কিন্তু এ আলোচনা নামে মাত্র এবং সম্পূর্ণরূপে অসম্পূর্ণ। কেননা, বর্তমানে নজরুলের যে গানের বইগুলি বাজারে পাওয়া যাচ্ছে তাতে মুদ্রিত গানের সংখ্যা পাঁচ শ' থেকে ছয় শ' কি তারও কম। অথচ নজরুল গান লিখেছেন তিন হাজার। এবং এটাই সম্ভবতঃ গীতি রচনার বিশ্ব-রেকর্ড। সুতরাং আলোচকের কাছে কবির তিন হাজার গানের মধ্যে আড়াই হাজার গানেরই যদি কোন হদিস না থাকে তা'হলে তাঁর আলোচনা যে কতখানি অসম্পূর্ণ হয় তা' সহজেই অনুমেয়।

কেবল সংখ্যায় নয়—সুর সৃষ্টি ও সুর-বৈচিত্র্যের দিক থেকেও সংগীতে নজরুলের অবদান চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকবে। নজরুল-গীতির সুর-বৈচিত্র্যে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরী, লাউনি, পিলু, সাহানা, তোড়ী, বেহাগ, ছায়ানট, আশাবরী, ভৈরবী, খাম্বাজ, গজল, কীর্তন, বাউল, সারি, ভাটিয়ালী, রামপ্রসাদী, ঝুমুর, মুর্শিদী, ভাওয়াইয়া ইত্যাদি কোন অঙ্গের রাগ-রাগিণী, কোন ঢংগের সুরই তাঁর গানের মহফিল থেকে বাদ পড়েনি। এ ছাড়াও আরবী সুর, আরবী নৃত্যের সুর, নৌ রোচকা সুর, কিউবান নৃত্যের সুর, উর্দু গজল গানের সুর ইত্যাদি বিদেশী তানলয়গুলিকে তিনি বাংলার সজল আবহাওয়ায় এনে আশ্চর্য ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্য দান করেছেন। নজরুল এখানেও থামেননি, তিনি নতুন সুর সৃষ্টির দিকেও মনোনিবেশ করেছিলেন। রূপ-মঞ্জরী, শিবানী ভৈরবী, দোলন-চাঁপা, বনকুন্তলা, আশা-ভৈরবী, সন্ধ্যামালতী, অরুণ ভৈরবী, মীনাক্ষী, উদাসী ভৈরবী, রেণুকা, অরুণরঞ্জনী, নির্ঝরিণী ইত্যাদি রাগিণীগুলি তাঁর নিজের সৃষ্টি। মোটকথা যদি কেউ গভীর মনোনিবেশ সহকারে নজরুল-সঙ্গীত

ও সুর অধ্যয়ন করেন তা' হলে পাক-ভারতের সংগীতের রূপ-বৈচিত্র্য ও রসমাধুর্য তাঁর উপলব্ধি ও উপভোগের আওতায় আসবে। সুদূর অতীতের 'রস ভর ভর' বৃন্দাবন-সংস্কৃতি হতে বিংশ শতাব্দীর দ্বন্দ্ব-সমাকীর্ণ সংস্কৃতিও নজরুল-সংগীতে বিধৃত। মোটকথা নজরুল সংগীত একাধারে জাতীয় সম্পদ ও সংস্কৃতির প্রতিভূ।

উপরে যে সুর-বৈচিত্র্যের কথা বলা হয়েছে তারই একটি নমুনা তাঁর 'হারামণি'।

এক সময় কলকাতা বেতার-কেন্দ্রের সংগীত বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী। তিনি নজরুল-সংগীতের অসাধারণ জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে কবিকে নিয়ে এলেন কলকাতা বেতার কেন্দ্রে। নতুন সুরসৃষ্টি ও সংগীত রচনার কাজ দেওয়া হল তাঁকে। ইতিপূর্বে কবি 'হিজ মাষ্টার্স ভয়েস'-এর সংগে যুক্ত ছিলেন। বেতারে কাজ পেয়ে সে সম্পর্ক ত্যাগ করলেন।

সে সময় আকাশবাণীতে তিনটি আশ্চর্য প্রতিভার মিলন ঘটেছিল—সংগীত রচনা ও সুর যোজনায় নজরুল ইসলাম, পরিচালনায় সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী আর যন্ত্রসংগীতে সুরেন্দ্রলাল দাস। সংগীতের এই ত্রিবেণী সঙ্গমে গান সেদিন সত্যিকার 'গান' হয়ে বাংলার মাটি-মনকে পাগল করে তুলেছিল। এ সময় বেতারে দু'টি অনুষ্ঠানের ওপর কবি বিশেষ জোর দিয়েছিলেন—একটি 'নবরাগ মালিকা' আর দ্বিতীয়টি 'হারামণি'। নতুন রাগিণী সৃষ্টি করে তিনি 'নবরাগ মালিকা' অনুষ্ঠানে তা' পরিবেশন করতেন আর 'হারামণি' অনুষ্ঠানে পরিবেশিত হ'ত বহু পুরাতন হারিয়ে যাওয়া অপ্রচলিত রাগ-রাগিণী। জগৎবাবুর মতে 'হারামণি' অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হ'তো সপ্তাহে একবার—প্রতি বৃহস্পতিবার, সন্ধ্যাবেলা। কিন্তু তৎকালীন বেতারের সংগীত পরিচালক শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় বলেছেন যে অনুষ্ঠানটি মাসে একবার প্রচারিত হ'তো। জগৎ ঘটক মহাশয় 'হারামণি'-র

পরিকল্পনা, জন্ম, লালন এবং মৃত্যুর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। অত্যন্ত নিকট থেকে তিনি এর সব কিছুই লক্ষ্য করেছেন।

কবি থাকেন তখন সীতানাথ রোডের বাড়ীতে। একদিন সন্ধ্যাবেলা সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী আসেন ওখানে। সান্ধ্য মজলিশটা অত্যন্ত জমজমাট হ'য়ে ওঠে। সেই মজলিশেই হারামণি-পরিকল্পনার প্রস্তাব, সমর্থন ও অনুমোদন পর্ব সমাপ্ত হয়। বলাবাহুল্য, জগৎবাবু সে আসরে উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় কবি-পত্নী প্রমীলা দেবী, গৌরী (জগৎ ঘটকের বোন) এঁদের উভয়ের শরীর অত্যন্ত ভেঙে পড়েছিল। বায়ু পরিবর্তনের জন্য কবি এঁদের সকলকে (প্রমীলা নজরুল ইসলাম, কবির শাশুড়ী, কবির দুই পুত্র এবং গৌরী ঘটক) রাঁচীতে রেখে আসেন। কলকাতায় ফিরে তিনি ড্রাইভার চণ্ডী ও মণি অধিকারীকে তাঁর বিখ্যাত Christler গাড়ীসহ কিছু মালপত্র দিয়ে রাঁচীতে পাঠিয়ে দেন। বাড়ীতে তিনি তখন একা। মনের অতলে ডুব মারার উপযুক্ত সময়। তিনি দুরূহ তপস্যায় 'হারামণি'-র সৃষ্টিতে তন্ময় হ'য়ে গেলেন। এ ব্যাপারে জগৎ ঘটক মহাশয় ছায়ার মত তাঁর পিছু পিছু ফিরেছেন—প্রচুর সাহায্যও করেছেন। খেয়ালী কবি টুক্‌রো টুক্‌রো কাগজে গভীর রাত পর্যন্ত জেগে, অন্যান্য বই ছাড়াও নবাব আলী চৌধুরীর ফার্সী বই ঘেঁটে বহু দুর্লভ সুপ্রাচীন রাগ-রাগিণীতে গান রচনা করতেন। গান রচনা সমাপ্ত হ'লেই কবি সে'টি ঘটক মহাশয়কে শোনাতেন। জগৎবাবু সঙ্গে সঙ্গে বাঁধান মোটা খাতায় গানটি টুক্‌রো কাগজ থেকে স্পষ্ট করে তুলে নিতেন এবং কবির নির্দেশে স্বরলিপিও তৈরী করে ফেলতেন। এইভাবে অমানুষিক পরিশ্রম করে তিনি 'হারমণি'র ৪০টি গান রচনা সমাপ্ত করেন।

ঘটক মহাশয় সে সময় 'মাসিক ভারতবর্ষের' সংগীত বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন। এর দু' একটি গান সে সময় স্বরলিপি সমেত 'ভারতবর্ষে' ছাপা হয়েছিল।

একদিন 'হারামণি' অনুষ্ঠানে নির্দেশাদি দেবার জন্তে কবি সেই মোটা বাঁধান খাতাটি নিয়ে যান। পরদিন ভোরে হন্তদন্ত হয়ে এসে তিনি ঘটক মহাশয়কে কেউ একটি খাতা ফেরত দিয়ে গেছেন কিনা জিজ্ঞাসা করেন। সেদিন রাত্রেই কবি পুনরায় রেডিও ষ্টেশনে যান এবং সেখান থেকে বালিগঞ্জেও গিয়েছিলেন; কিন্তু বৃথা! সেদিন প্রায় সকল দৈনিকেই বিজ্ঞাপন দেবার ব্যবস্থা হ'য়েছিল। বিজ্ঞাপনও বেরিয়েছিল পরদিন—কিন্তু সে খাতা আর ফেরত পাওয়া যায়নি।

সেদিন তো মাত্র 'হারামণি'র ৪০টি গান হারিয়েছিল, কিন্তু আজ যে কবির সাড়ে তিন হাজার গানই নিরুদ্দেশ!

৪.

রয়্যালটির অক্টোপাশের বাঁধনে পড়ে তাঁর বইগুলি বর্তমানে যে দুর্দশায় এসে ঠেকেছে—তা' রীতিমত চিন্তার কারণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিটি সংস্করণের প্রতিটি বইয়ের কী বিপুল পরিবর্তন! মুদ্রণ প্রমাদ ও অঙ্গসজ্জা কথা তো ধর্তব্যের বাইরে। বেশ কিছুসংখ্যক বই তো আর ছাপাই হ'চ্ছে না।

আর গান?

কবি বলতেন: "তোমরা আমার কাব্য সম্পর্কে যা' ইচ্ছে তাই বলতে পার—কিন্তু গান সম্পর্কে কিছু বলতে এসো না। গান আমার ধ্যানের, আমার স্বপ্নের সৃষ্টি।" সত্যই নজরুলের গান আজ স্বপ্নের বস্তু হ'য়ে উঠেছে। দু'দিন পর বিলীন হয়ে যাবে। তখন গবেষকেরা লিখবেন: "নজরুল নামে এক কবি ছিলেন। শোনা যায় তিনি সাড়ে তিন হাজার গান লিখিয়াছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত

পরিশ্রম করিয়াও আমরা তাঁহার মাত্র দেড় শত গান উদ্ধার করিয়াছি। তাই সন্দেহ হয়, তিনি তিন হাজার গান লেখেন নাই। লিখিয়াছিলেন তিন শত,—বন্ধু-বান্ধব তাহার পেছনে আর একটি 'শূন্য' বসাইয়া তিন হাজার করিয়াছিলেন।

গত বছর কলকাতার কোন এক শিক্ষিত পল্লীতে নজরুল-জয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। সভা শেষ হ'তে চলল, অথচ গানের কোন অনুষ্ঠান নেই। কর্তাব্যক্তিকে কারণ জিজ্ঞাসা করতেই তিনি অত্যন্ত বিনীতভাবে বলেন: "আধুনিক গানের গাইয়ে আছে শ' খানেক—এই সভাতেই, কিন্তু কেউ নজরুল-গীতি জানেন না।

আকাশবাণী ও রেডিও-পাকিস্থান উভয় কেন্দ্র থেকেই নজরুল-গীতি শুনি। মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগে "সত্যি কি এ নজরুল-গীতি"? বহু গানেই সুরকে যেন জবাই করা হয়।

কিন্তু আমাদের এ বিরাট সংস্কৃতি ও সম্পদভাণ্ডারকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার সময় এখনো শেষ হ'য়ে যায়নি। একটু সচেষ্ট হ'লে হয়তো এখনও পুরোটাই রক্ষা করা সম্ভব।

সরকারী উদ্যোগেও এই জাতীয় সম্পদ রক্ষা করা যেতে পারে অথবা যে কোন সহৃদয় ব্যক্তি বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও এ কাজ করতে পারেন।

আজকাল 'টেপ রেকর্ডার' হয়েছে। জিনিসটি এ ব্যাপারে অত্যন্ত উপযোগী। এ'তে একবার রেকর্ড করতে পারলে তা বহুকাল নিখুঁত অবস্থায় থাকে। গ্রামোফোন কোং-এ গিয়ে কিংবা বিভিন্ন স্থান থেকে নজরুল-গীতির রেকর্ড সংগ্রহ করে তা' থেকে রি-রেকর্ডিং করে নেওয়া যেতে পারে। কবির বহু গায়ক-বন্ধু বেঁচে আছেন, যাঁদের গান শিখিয়েছেন কবি নিজে তাঁদের সংখ্যাও নিতান্ত নগণ্য নয়, কিংবা যাঁরা কবির গানের রেকর্ড করেছেন তাঁদের কাছে গিয়েও অনুরোধ করলে অবিকল সুর ও সংগীতটি পাওয়া যেতে পারে।

কাজটি পরিশ্রমের। অপরিসীম ধৈর্য দরকার। কিন্তু আর বিলম্ব করা উচিত নয়। নজরুল জীবনী সংগ্রহের জন্য আমি কবিবন্ধু মুজফ্‌ফর আহমদ সাহেবের কাছে গেলে তিনি কবির জীবনের কোন এক বিশেষ অধ্যায়ের ঘটনা বিশেষরূপে জানেন বলে আমাকে পাঠালেন ধর্মতলা ও ওয়েলেসলির সংযোগ স্থলের দাদাজী ফার্মেসীর শ্রীউমেশ চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকটে। যথাসময়ে গেলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু গিয়ে শুনলাম তার কিছুদিন পূর্বেই তিনি মারা গেছেন। কবি-জীবনীর খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহের আশায় একদিন গেলাম শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাসায়। আমার আসল উদ্দেশ্য শুনে তিনি অত্যন্ত খুশী হলেন এবং জানালেন যে অসুস্থতার কারণে মাসখানের জন্য তিনি হাওয়া বদল করতে পুরী যাচ্ছেন—ওখান থেকে ফিরে এসে তিনি নিজেই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আগ্রহে ডাইরীতে আমার ঠিকানা লিখে রাখলেন। এর ঠিক দিন দশেক পরে একদিন কাগজে দেখলাম নৃপেনবাবু আর ইহজগতে নেই। এ রকম ঘটনা ঘটবে। নজরুল-পরিচিতদের সংখ্যা ক্রমেই বিরল হবে। তাই সময় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।

রেকর্ডিং আরম্ভ হলে অনেক সহৃদয় ব্যক্তি এগিয়ে আসবেন সাহায্য করতে। কাজ করা তখন অনেক সহজ হবে। পরে এর থেকে গানের বই প্রকাশ করা বা স্বরলিপি তৈরী করা কিছুমাত্র কঠিন হবে না।

আমাদের পক্ষে আনন্দের কথা যে রবীন্দ্র-সংগীতের আজ আর হারাবার ভয় নেই। এর সুর ও বাণী সম্পূর্ণ সুরক্ষিত।

কিন্তু নজরুল? তিনি তো আজও ঠিক অতীতের বিষয় নন। অথচ এত অল্প সময়ে এমন একটি বিরাট জাতীয় সম্পদ যে এভাবে ক্রমাবলুপ্তির পথে এগিয়ে যেতে পারে তা' ধারণা করতেও কষ্ট হয়।

আশ্চর্য! আমরা ক'জন গুরুত্ব দিয়ে আজ সে কথা ভাবছি?

প্রফুল্লচন্দ্র রায়

১.

নজরুলের সঙ্গে যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এমন কথা জোর করে বলা যায় না। পারস্পারিক দেখা-সাক্ষাৎও খুব কম সময়ের জন্যই হ'তো। তথাপি উভয়ের মধ্যে এক অপূর্ব অনুরাগের রাখীবন্ধন হয়েছিল। বোধহয় এ জন্যেই দেশবাসীর পক্ষ থেকে ১৩৩৬ সালের ২৯শে অগ্রহায়ণে যে নজরুল সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয় তার সভাপতি নির্বাচিত হন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। এই অনুষ্ঠানের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন মিঃ এস ওয়াজেদ আলী, যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন "কল্লোল"-সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাস ও "সওগাত"-সম্পাদক এস, নাসিরউদ্দীন। সভায় বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দের মধ্যে জলধর সেন, সুভাষচন্দ্র বসু, অপূর্বকুমার চন্দ, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতির নাম বিশেষ রূপে স্মরণীয়।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর ভাষণে নজরুলকে বাংলার "প্রতিভাবান মৌলিক কবি" বলে স্বীকার করেন। তিনি বলেন: "আজ বাংলার কবিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করবার জন্য আমরা এখানে সমবেত হ'য়েছি। রবীন্দ্রনাথের যাদুকরী প্রতিভায় বাঙলাদেশ সম্মোহিত হয়ে আছে। তাই অন্যের প্রতিভা তেমন করে ধরা পড়ছে না।

আধুনিক-সাহিত্যে মাত্র দু'জন কবির মধ্যে আমরা সত্যিকার মৌলিকতার সন্ধান পেয়েছি। তাঁরা সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল। নজরুল কবি—প্রতিভাবান মৌলিক কবি। রবীন্দ্রনাথের আওতায় নজরুলের প্রতিভা পরিপুষ্ট হয়নি। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কবি বলে স্বীকার করেছেন। আজ আমি এই ভেবে বিপুল আনন্দ অনুভব করছি যে নজরুল ইস্‌লাম শুধু মুসলমানের কবি নন, তিনি বাঙলার কবি, বাঙালীর কবি। কবি মাইকেল মধুসূদন খৃষ্টান ছিলেন। কিন্তু বাঙালী জাতি তাঁকে শুধু বাঙালী রূপেই পেয়েছিল। আজ নজরুল ইস্‌লামকেও জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন। কবিরা সাধারণতঃ কোমল ও ভীরু, কিন্তু নজরুল তা' নন। কারাগারের শৃঙ্খল পরে বুকের রক্ত দিয়ে তিনি যা লিখেছেন, তা বাঙালীর প্রাণে এক নূতন স্পন্দন জাগিয়ে তুলেছে।"

সভাপতির ভাষণের পর সমগ্র জাতির পক্ষ থেকে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মিঃ এস ওয়াজেদ আলী এই অভিনন্দন-পত্র পাঠ করেন :

"কবি,

তোমার অসাধারণ প্রতিভার অপূর্ব অবদানে বাঙালীকে চির-ঋণী করিয়াছ তুমি। আজ তাহাদের কৃতজ্ঞতা-সিক্ত সশ্রদ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ কর।

তোমার কবিতা বিচার-বিস্ময়ের ঊর্ধ্বে সে আপনার পথ রচনা করিয়া চলিয়াছে পাতাল ঝোরার জলধারার মতো। সে স্রোতধারায় বাঙালী যুগ-সম্ভাবনার বিচিত্র লীলা-বিম্ব দেখিয়াছে। আজ তুমি তাহাদের বিস্ময়মুগ্ধ কণ্ঠের অভিনন্দন লও।

বাঙালীর সরস কাব্যকুঞ্জ তোমার প্রাণের রঙে সবুজ মহিমায় রাঙিয়া উঠিয়াছে। তাহার ছায়া বাঙালীর পলক হারা নীল নয়নে নিবিড় স্নেহ-অঞ্জন মাখাইয়া দিয়াছে। আজ তুমি তাহাদের মুগ্ধ নয়নের নির্বাক-বন্দনা গ্রহণ কর।

তুমি বাঙালীর ক্ষীণ কণ্ঠে তেজ দিয়াছ, মূর্চ্ছাতুর প্রাণে অমৃতধারা সিঞ্চন করিয়াছ। আজ অরুণ উষার তোরণ দ্বারে দাঁড়াইয়া তাহারা তোমার মরণ-জিগীষু কণ্ঠের জয়-ইঙ্গিত নত মস্তকে বরণ করিতেছে,—তাহাদের হাতের পতাকা তোমার মহিমার উদ্দেশ্যে অবনমিত হইয়াছে। জাতির এ-অভিবাদনে তুমি নয়নপাত কর।

তুমি বাঙলার মধুবনের শ্যামা কোয়েলার কণ্ঠে ইরানের গুল-বাগিচার বুলবুলের বুলি দিয়াছ, রসালের কণ্ঠে সহকার-সাথে আঙুর লতিকার বহু বন্ধন রচনা করিয়াছ। তুমি বাঙালীর শ্যামশান্ত কণ্ঠে ইরাণী-সাকীর লাল শিবাজীর আবেশ বিহ্বলতা দান করিয়াছ। আজ তোমার আসন প্রান্তে হাতের বাঁশী রাখিয়া তাহারা তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। তুমি তাহাদের শ্রদ্ধা-সুন্দর চিত্ত নিবেদন গ্রহণ কর।

ধূলার আসনে বসিয়া মাটির মানুষের গান গাহিয়াছ তুমি। সে গান অনাগত ভবিষ্যতের। তোমার নয়ন-সায়রে তাহার ছায়াপাত মানুষের ব্যথাবিষে নীল হইয়া সে তোমার কণ্ঠে দেখা দিয়াছে। ভবিষ্যতের ঋষি তুমি, তোমাকে আজ আমাদের সবাকার মানুষের নমস্কার।

গুণমুগ্ধ বাঙালীর পক্ষে
নজরুল-সম্বর্ধনা সমিতির সভ্যবৃন্দ

কলিকাতা, ২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬
১৫ই ডিসেম্বর, ১৯২৯

২.

অভিনন্দন পত্রটি পাঠের পর রূপোর কাস্কেটে ভরে কবির হাতে দেওয়া হয় আর সঙ্গে উপহার স্বরূপ দেওয়া হয় সোনার দোয়াত-কলম।

কবি বন্ধু নলিনীকান্ত সরকার ও উমাপদ ভট্টাচার্য যুগ্মকণ্ঠে একটি আবাহন গীতি গীত হ'লে কবি অভিনন্দের উত্তরে নিম্নের প্রতিভাষণ দান করেন। প্রতিভাষণটি মূল্যবান। এ'তে কবিহৃদয়ের অনেকগুলি সত্যকথা ব্যক্ত হ'য়েছে। কিন্তু প্রতিভাষণটি আজ পর্যন্ত বিশেষ কোথাও মুদ্রিত হয়নি। আমরা নিম্নে সম্পূর্ণ প্রতিভাষণটি তুলে দিলাম। এটি সংরক্ষিত হওয়া উচিত :

"বন্ধুগণ!

আপনারা যে সওগাত আজ হাতে তুলে দিলেন, আমি তা' মাথায় তুলে নিলুম। আমার সকল তনু মন প্রাণ আজ বীণার মত বেজে উঠেছে। তাতে শুধু একটি মাত্র সুর ধ্বনিত হয়ে উঠছে, আমি ধন্য হলুম, আমি ধন্য হলুম।

এক-বন ফুল মাথা পেতে নেবার মত হয়ত মাথায় আমার চুলের অভাব নেই, কিন্তু এত হৃদয়ের এত প্রীতি গ্রহণ করি কি দিয়ে? আমার হৃদয় ঘট যে ভরে' উঠলো! নদীর জল মঙ্গল—অভিষেকের ঘটে বন্দী হয়ে তার ভাষা হারিয়েছে। আজ যদি আমি কিছু বলতে না পারি, আপনারা আমার সে অক্ষমতাকে ক্ষমা করবেন। আমি যে নদীর জলধারা, সেই নদীকূলে যাবেন আপনারা, তবে না চাইতেই আমার ভাষা, আমার গান সেখানে শুনতে পাবেন।

আজ বলবার দিন আপনাদেরই, আমার নয়। তা'ছাড়া আপনাদের ভালবাসার অতিশয়োক্তিকে অন্ততঃ আজকের দিন যে হারিয়ে দিতে পারব, সে ভরসা আমার নেই। আজ আমার ভাষা শুভদৃষ্টির বধূর মত লাজকুণ্ঠিতা এবং অবগুণ্ঠিতা। সে যদি নাচুনে মেয়েই হয় অন্ততঃ আজকের দিন তাকে নাচতে বলবেন না।

আজ হয়ত সত্যসত্যিই আমার অভিনন্দন হয়ে গেল। এ শুধু আপনাদের যাঁরা এ সভায় এসেছেন ফুলের সওগাত নিয়ে, তাঁদের বলছিনে। আমি নেপথ্যের সেই বড় বন্ধুদের কথা বলছি,

যাঁরা এখানে না এলেও আমার কথা ভুলতে পারছেন না এবং হয়ত একটু বেশী করেই স্মরণ করছেন,—ফুল ফোটানর চেয়ে হুল ফোটানোতেই যাঁদের আনন্দ।

ওদিক দিয়ে আমার ভাগ্যলক্ষ্মী সত্যই একটু বেশী রকমের প্রসন্ন। যাঁরা আমার বন্ধু, তাঁরা যেমন সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমায় ভালবাসেন, যাঁরা বন্ধুর উল্টো, তাঁরা তেমনি চুটিয়ে বিপক্ষতা করেন। ওতে আমি সত্যিসত্যিই আনন্দ উপভোগ করি। পান্‌সে বন্ধুত্বের চেয়ে চুটিয়ে শত্রুতা ঢের ভালো। বড় বন্ধুত্ব আর বড় শত্রুতা বেশ লাগসই করে জড়িয়ে ধরতে না পারলে হয় না। যিনি আমার হৃদয়ের এত কাছাকাছি থাকেন, তিনি আমার নিশ্চয়ই পরম অথবা চরম আত্মীয়। আজকের দিনে তাঁদেরও আমার অন্তরের শ্রদ্ধা নমস্কার নিবেদন করছি।

আমার বন্ধুরা যেমন পাল্লার একধারে প্রশংসার পর প্রশংসার ফুলপাতা চড়িয়েছেন, অন্য পাল্লায় অ-বন্ধুর দল তেমনি নিন্দার ধুলো-বালি-কাদা-মাটি চড়িয়েছেন; এবং ঐ দুই তরফের সুবিবেচনার ফলে দুই ধারের পাল্লা এমন সমভার হয়ে উঠেছে যে মাঝে থেকে আমি ঠিক থেকে গেছি, এতটুকু টলতে হয়নি।

আমায় অভিনন্দিত আপনারা সেইদিনই করেছেন, যেদিন আমার লেখা আপনাদের ভালো লেগেছে। সেই 'ভালো লেগেছে'-টাকে ভালো করে বলতে পারার এই উৎসবে আমার একটি মাত্র করণীয় কাজ আছে। সে হচ্ছে সবিনয়ে সস্মিত মুখে সশ্রদ্ধ প্রতি-নমস্কার নিবেদন করা আমার কাছে আজ সেইটুকুই গ্রহণ করে মুক্তি দিন। আমাকে বড় বলার বড়-বলি করবেন না। সভার যূপকাষ্ঠে বলি হবার ভয়েই আমি সভার এবং সভার অন্তরালে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। আমি পলাতক বলেই যদি আমায় ধরে এনে শাস্তির ব্যবস্থা করে থাকেন, তা'হলে আপনাদের অভিষ্ট সিদ্ধ হয়েছে। প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে কলঙ্কি চাঁদকে ধরে এনে তাঁকে যথেষ্ট লজ্জা দিয়েছেন।

শুধু লেখা দিয়ে নয়, আমায় দিয়ে যাঁরা চেনেন, অন্ততঃ তাঁরা

জানেন যে, সত্যিসত্যিই আমি ভালোমানুষ। কোন অনাসৃষ্টি করতে আসিনি আমি। আমি যেখানে যা দিয়েছি, সেখানে যা খাবার প্রয়োজন অনেক আগে থেকেই তৈরী হয়েছিল। পড় পড় বাড়ীটাকে কর্পোরেশনের যে-কর্মচারী এসে ভেঙে দেয়, অন্যায় তার নয়, অন্যায় তার, যে ঐ পড় পড় বাড়ীটাকে পুষে রেখে আরো দশজনের প্রাণনাশের ব্যবস্থা করে রাখে।

আমাকে 'বিদ্রোহী' বলে খামাখা লোকের মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছেন কেউ কেউ। এ নিরীহ জাতিটাকে আঁচড়ে কামড়ে তেড়ে নিয়ে বেড়াবার ইচ্ছা আমার কোনদিনই নেই। তাড়া যারা খেয়েছে, অনেক আগে থেকেই মরণ তাদের তাড়া করে নিয়ে ফিরছে। আমি তাতে এক-আধটু সাহায্য করেছি মাত্র।

এ কথা স্বীকার করতে আজ আমার লজ্জা নেই যে, আমি শক্তি-সুন্দর রূপ সুন্দরকে ছাড়িয়ে আজো উঠতে পারিনি। সুন্দরের ধেয়ানী দুলাল কীটসের মত আমারও মাত্র—"Beauty is truth, truth beauty."

আমি যেটুকু দান করেছি, তাতে কার কতটুকু ক্ষুধা মিটেছে জানিনে, কিন্তু আমি জানি, আমাকে পরিপূর্ণরূপে আজো দিতে পারিনি। আমার দেবার ক্ষুধা আজো মেটেনি। যে উচ্চ গিরি শেখরের মহিমাকে। পলাতকা সাগর-সন্ধানী জলস্রোত আমি, সেই গিরি শিখরের মহিমাকে যেন খর্ব না করি। যেন মরু পথে পথ না হারাই! এই আশীর্বাদ আপনারা করুন।

বিংশ শতাব্দীর অসম্ভবের সম্ভাবনার যুগে আমি জন্মগ্রহণ করেছি। এরি অভিযান সেনাদলের তূর্য বাদকের একজন আমি—এই হোক আমার সবচেয়ে বড় পরিচয়। আমি জানি, এই পথযাত্রার পাকে পাকে বাঁকে বাঁকে কুটিল-ফণা ভুজঙ্গ প্রখর দর্শন শার্দুল পশুরাজের ভ্রূকুটি! এবং তাদের নখর দংশনের মত আজো আমার অঙ্গে অঙ্গে। তবু ওই আমার পথ। ওই আমার গতি, ওই আমার ধ্রুব।

ঈশানকোণের যে কালো মেঘ পাহাড়ের বুকে ঘুমিয়ে থাকে, তাকে অভিশাপ দেবেন না তার তুষার ঘন প্রশান্তি দেখে, নির্লিপ্ততা দেখে। ঝড়ের বাঁশী যেদিন, ও উন্মাদ সেদিন আপনি ছুটে আসবে তার পূর্ণ পরিচয় নিয়ে। নব বসন্তের জন্য সারা শীতকাল অপেক্ষা করে থাকতে হয়।

যাঁরা আমার নামে অভিযোগ করেন তাঁদের মত হলুম না বলে—তাঁদেরকে অনুরোধ, আকাশের পাখীকে, বনের ফুলকে, গানের কবিকে তাঁরা যেন সকলের করে দেখেন। এই দেশে এই সমাজে জন্মেছি বলেই শুধু এই দেশেরই এই সমাজেরই নই। আমি সকল দেশের সকল মানুষের। সুন্দরের ধ্যান তাঁর স্তব গানই আমার উপাসনা, আমার ধর্ম। যে কুলে, যে সমাজে, যে ধর্মে, যে দেশেই জন্মগ্রহণ করি, সে আমার দৈব। আমি তাকে ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছি বলেই কবি। বনের পাখী নীড়ের উর্ধ্বে গান করে বলে বন তাকে কোনদিন অনুযোগ করে না। কোকিলকে অকৃতজ্ঞ ভেবে কাক তাড়া করে বলে কোকিলের কাক হয়ে যাওয়াটাকে কেউই হয়ত সমর্থন করবেন না। আমি যেটুকু দিতে পারি, সেটুকুই প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করুন। আমগাছকে চৌমাথায় দাঁড় করিয়ে বেঁধে যতই ঠেঙান, সে কিছুতেই প্রয়োজনের কাঁঠাল ফলাতে পারবে না। উল্টো এ ঠেঙানি খেয়ে তার আম ফলাবার শক্তিটাও যাবে লোপ পেয়ে।

যৌবনের রক্তশিখা মশাল ধরে মৃত্যুর অবগুণ্ঠন মোচন করতে চলেছে যে বরযাত্রী, আমি তাদের সহযাত্রী নই বলে যাঁরা অনুযোগ করেন, তাঁরা জানেন না—আমিও আছি তাঁদের দলে। তবে হাতের মশাল হয়ে নয়। কণ্ঠের কুণ্ঠাহীন গান হয়ে। ফুলমেলার নওরোজে আমার খরিদ্দার রূপে না দেখতে পেয়ে যাঁরা ক্ষুব্ধ হয়েছেন, তাঁদেরও বলি, আমার ভাবী তাজমহলের ধ্যানমূর্তি আজো পরিস্ফুট হয়ে ওঠেনি। যেদিন উঠবে সেদিন আমিও আসব ঐ মেলায় শাহ্‌জাদা খুররমের মতই আমার চোখে তাদের স্বপ্ন নিয়ে।

আমি শুধু সুন্দরের হাতে বীণা, পায়ে পদ্মফুলই দেখিনি, তাঁর চোখে চোখভরা জলও দেখেছি। শ্মশানের পথে, গোরস্থানের পথে, তাঁকে ক্ষুধাজীর্ণ মূর্তিতে ব্যথিত পায়ে চলে যেতে দেখেছি। যুদ্ধ ভূমিতে তাঁকে দেখেছি, কারাগারের অন্ধকূপে তাঁকে দেখেছি, ফাঁসির মঞ্চে তাঁকে দেখেছি। আমার গান সেই সুন্দরকে রূপে রূপে অপরূপ করে দেখার স্তব স্তুতি

কেউ বলেন আমার বীণা যবন, কেউ বলেন কাফের। আমি বলি ও দুটোর কিছুই নয়। আমি মাত্র হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় ধরে হ্যাণ্ডসেক করাবার চেষ্টা করেছি, গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি। সে হাতে হাত মিলানো যদি হাতাহাতির চেয়েও অশোভন হয়ে থাকে, তাহলে ওরা আপনি আলাদা হয়ে যাবে। আমার গাঁট ছড়ার বাঁধন কাটতে তাদের কোন বেগ পেতে হবে না। কেন না, একজনের হাতে আছে লাঠি, আর একজনের আস্তিনে আছে ছুরি।

বর্তমানে সাহিত্য নিয়ে ধুলো-বালি, এত ধোঁওয়া, এত কোলাহল উঠেছে যে, ওর মাঝে সামান্য দীপবর্তিকা নিয়ে পথ খুঁজতে গেলে আমার বাতিও নিভবে, আমিও মরব।

কিন্তু এ যদি বেদনা সাগর মন্থনের হলাহলই হয় তাহলে ঐ সমুদ্র মন্থনের সব দোষ অসুরদেরই নয়, অর্ধেক দোষ এ দেবতাদের। তাঁদের সাহায্য ছাড়াও এ সমুদ্রমন্থন ব্যাপার সহজ হত না তবু তাঁদের বলি আজকের হলাহলটাই সত্য নয়, অসহিষ্ণু হবেন না দেবতা—রসে থান, ও অমৃত আছে, সে উঠল বলে।

আমি আবার আপনাদের সমস্ত অন্তরের শ্রদ্ধা প্রীতি নমস্কার জানাচ্ছি।

আমি ধন্য করতে আসিনি, ধন্য হতে এসেছি আজ। আপনাদের অজস্র ধন্যবাদ।"

নজরুল যে প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে বিশেষরূপে শ্রদ্ধা করতেন তাঁর লেখার বহু স্থলে তার প্রমাণ রয়েছে। এই প্রতিভাষণের একস্থানে রয়েছে: "প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে কলঙ্কী চাঁদকে ধরে এনে যথেষ্ট লজ্জা দিয়েছেন।" ১৩২৯ সালের ১৪ই কার্তিকের "ধূমকেতু"র সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তিনি লেখেন: "রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, প্রফুল্ল বাঙলার দেবতা, তাঁদের পূজার জন্যে বাঙলার চোখের জল চিরনিবেদিত থাকবে।"

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

১.

পল্লীকবি কুমুদরঞ্জনের কর্মজীবনের শুরু হয় মাথরুন হাইস্কুলে। দীর্ঘকাল তিনি এই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কাশিমবাজারের দানবীর মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয় ছিলেন এই বিদ্যায়তনের প্রতিষ্ঠাতা।

কাজী নজরুল ইসলাম তখন এই বিদ্যায়তনের পঞ্চম শ্রেণীর (বর্তমানের ষষ্ঠ শ্রেণীর) ছাত্র ছিলেন। এখানেই উভয়ের আলাপ এবং পরিচয়। কুমুদবাবু নিম্নশ্রেণীতে পড়াতেন না বটে কিন্তু শ্রেণী পরিদর্শনে এসে নজরুলকে তিনি বিশিষ্ট এবং পৃথকরূপে চিনেছিলেন। নজরুলের প্রতি এই বিশেষ দৃষ্টি পড়ার পিছনে অনেকগুলি কারণ আছে। এই কারণগুলির প্রতিটি নজরুলের উজ্জ্বল ছাত্র-জীবনের পরিচয় বহন করে। প্রথমতঃ কুমুদবাবু শ্রেণী পরিদর্শনে এলে সকল ছাত্রের প্রথমেই উঠে দাঁড়াতেন নজরুল এবং সঙ্গে সঙ্গে এক বিশিষ্ট বিনয়ের ভংগীতে আদাব জানাতেন। দ্বিতীয়তঃ শৈশবাবধি তাঁর চোখেমুখে প্রতিভার এক বিশেষ চিহ্ন ছিল, যে কেহ তাঁর মুখের দিকে তাকালে আকৃষ্ট হয়ে পড়তেন। তৃতীয়তঃ খেলার মাঠে, কী স্বগৃহে, কী স্নানের ঘাটে নজরুলের দুরন্তপনার বিশেষ পরিচয় পাওয়া গেলেও বিদ্যায়তনের মধ্যে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী। তাঁর শিশুসুলভ

বিনয়ভাব যে কোনো শিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। চতুর্থতঃ শ্রেণীতে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। কোনো কোনো নজরুল-জীবনীকার কবির ছাত্র জীবনকে কটাক্ষের চোখে দেখেছেন এবং শ্রেণীর মধ্যে কবিকে 'লাষ্ট বয়'-এর শিরোপা দিয়েছেন। কিন্তু এ কথা অত্যন্ত ভ্রান্ত। কবির ছাত্রজীবন বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল। শ্রেণীতে তিনি ছিলেন 'ফার্স্ট বয়'।

এ সকল নানাবিধ কারণে ছাত্র নজরুল প্রধান শিক্ষক কুমুদবাবুর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। পরবর্তী জীবনে শিষ্য ও গুরু উভয়েই নিখিল বাংলায় বিপুল কবি খ্যাতি লাভ করলে তাঁদের মধ্যকার এই সম্পর্ক দৃঢ়তর হয়েছিল। তাঁর প্রতিভা-স্বীকৃতির উজ্জ্বলতম দিন-গুলিতেও নজরুল কুমুদবাবুর কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন। কুমুদ কবিও তাঁর এই ছাত্রটির জন্য গর্বিত। নজরুলের ছাত্র জীবনের উপকরণ সংগ্রহের জন্য পশ্চিমবঙ্গ মুসলিম অনুসন্ধান সমিতির সম্পাদক জনাব এম্ আবদুর রহমান কুমুদবাবুকে একটি পত্র লেখেন। কুমুদ-রঞ্জন সেই পত্রের যে উত্তর দেন তার অনুলিপি এই :

শ্রীহরি শরণং

কোগ্রাম
২৪।৬।৫৯

প্রিয়বরেষু,

চিঠি পাইয়া আনন্দিত হইলাম। নজরুল তখনকার 6th, 5th Class পর্যন্ত পড়িয়াছিলেন। কলিকাতায় বহুবার আমার সঙ্গে দেখা করিয়াছেন এবং আমার Class পরিদর্শনের কথা বলিয়াছেন ভক্তিপ্লুত বাক্যে। একান্ত ভক্ত ছাত্র ছিলেন। প্রতিভাব্যঞ্জন বলিয়া আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। কবিতা তখন লিখিবার কথা জানি না। অনেকগুলি চিঠি কর্ম-জীবনে লিখিয়াছিলেন। খোয়া গিয়াছে। একখানা

বোধহয় আছে, পাইলে পাঠাইব। কলিকাতায় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন—সেই একান্ত বিনীত ছাত্রের মত দু'পায়ের ধূলা মাথায় নিতেন। কোন সালে পড়িতেন মনে নাই।

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

এই পত্রের মধ্যে নজরুল লিখিত যে পত্রের কথা উল্লিখিত হয়েছে তা' কবি পেয়েছিলেন এবং যথাসময়ে এম আবদুর রহমানের নিকট পাঠিয়েছিলেন—মূল পত্রটি রহমান সাহেবের নিকটেই আছে, আমরা নিম্নে তার অনুলিপি প্রকাশ করলাম:

The Gramophone Company Ltd.
(Incorporated in England)
HIS MASTER VOICE
Head office and Factory in India
33, Jessore Road, Dum Dum
37/1, Sitanath Road, Calcutta
6. 4. 36

শ্রীচরণারবিন্দেষু,

বহুদিন আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিনি। কলকাতায় এলে খবর দেবেন যেন। আমি বর্তমানে H. M. V. Companyর Exclusive Composar। তাদেরই নির্দেশ মত আপনার কাছে একটি নিবেদন জানাতে এই পত্র লিখছি। আপনার 'অধরে নেমেছে মৃত্যু কালিমা' গানটির permission (রেকর্ড করার জন্য) চান কোম্পানী। এর আগে আপনার দু' চারটি গান আছে রেকর্ডে। আপনি যদি উক্ত কোম্পানীকে চিঠি দেন, আপনার গানের Royalty (5%

Commission) পাবেন। আপনার অনুমতি পেলেই কোম্পানী আপনাকে Royalty দেওয়ার অঙ্গীকার-পত্র পাঠিয়ে দেবে। আশা করি পত্রোত্তর পাব। নিবেদন ইতি—

প্রণত:

নজরুল ইসলাম

Ps.

আপনার ঐ গানের সঙ্গে আরও কোন গান গেলে ভাল হয় তা যদি নির্দেশ করেন বা লিখে পাঠান সেই গানটি ভাল হয়।

নজরুল

নজরুলের সাথে গ্রামোফোন কোম্পানীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য পত্রটি নিঃসন্দেহে মূল্যবান। বস্তুতঃপক্ষে নজরুল ছিলেন সে সময় গ্রামোফোন কোম্পানীর সর্বেসর্বা। আভ্যন্তরীণ অনেক কিছুই তাঁর নির্দেশে পরিচালিত হতো। এই সুযোগে বুঝি তিনি গুরু ঋণ কিছু পরিমাণে পরিশোধ করতে চেয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে গ্রামোফোন কোম্পানীতে সংশ্লিষ্ট থাকাকালে তিনি অনেককে প্রতিষ্ঠিত এবং প্রসিদ্ধ করে দিয়েছেন।

কুমুদরঞ্জন অন্য ধাতের মানুষ। সুনাম যশের লোভ তাঁকে কোনো দিনই গ্রাস করেনি। তাঁর কাছে কবিতা রচনা আর দেবার্চনা একই কথা। তাই কবিতা লেখার পর তিনি তার প্রকাশের জন্য এতটুকু বিচলিত হন না। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর প্রকাশিত কবিতা তো দূরের কথা, এমন কী প্রকাশিত বইয়ের খোঁজ খবর পর্যন্ত তিনি রাখেন না। এ এক অদ্ভুত ধরণের মানুষ এবং ঠিক এই কারণেই তিনি নজরুলের চিঠি পেয়েও নীরবই থেকে গেছেন। গ্রামোফোনে রেকর্ডের মাধ্যমে তাঁর দেবার্চনার পুষ্প (কবিতা) জনসমক্ষে প্রকাশিত হোক হয়তো এটা তিনি চাইতেন না। যা হোক প্রথম পত্রের দেড় বছর পর নজরুল আবার পত্র দিলেন গুরুকে। একই অনুরোধ—গ্রামোফোন কোম্পানী তাঁর কবিতা চায় রেকর্ড করার জন্যে:

৫৩জি, হরি ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

২৮, ১০, '৩৭

শ্রীচরণারবিন্দেষু,

প্রণাম শতকোটি অন্তে নিবেদন: বহু পূর্বে আপনার এক আশীর্বাদী পত্র পেয়েছিলাম। আপনার 'অধরে নেমেছে মৃত্যু কালিমা' শীর্ষক গানটীর কথাগুলি ও তার সাথে অন্য একটি গান (যা ওর জোড়া হতে পারে) যদি অনুগ্রহ করে পাঠিয়ে দেন, তাহলে বিশেষ বাধিত হব। শ্রীমতী ইন্দুবালা ঐ গান দুটী গাইতে চান। আপনার প্রেরিত গান দুটী পেলেই রেকর্ড করা হবে। গ্রামোফোন কোম্পানী আপনাকে প্রত্যেক রেকর্ডে শতকরা আড়াই টাকা হিসেবে রয়্যালটী দিতে চান—এক সঙ্গে টাকা নেওয়ার চেয়ে এতে বেশী লাভ হবে। গ্রামোফোন কোম্পানী আপনার গান পেলে ঐ সর্ত অনুসারে লিখিত এগ্রিমেণ্ট দেবে। যত শীঘ্র পারেন, গান দুটী পাঠিয়ে দেবেন।

৺বিজয়ার প্রণাম নেবেন। আশা করি কুশলে আছেন।

নিবেদনমিতি—

প্রণত:

নজরুল

নজরুলেরই অনুরোধে গানটি অবশেষে রেকর্ড করা হয় এবং এই একটি মাত্র রেকর্ডের জন্যে, সাময়িকভাবে হলেও, সংগীত রচয়িতা হিসেবে কুমুদবাবুর কবি খ্যাতি বহু দূর ছড়িয়ে পড়েছিল।

২.

'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশিত হয়ে সারা বাংলায় তখন আলোড়নের ঢেউ উঠেছে। এই কবিই যে মাথরুণ স্কুলে তাঁর ছাত্র নজরুল এটা জানতে পেরে কুমুদবাবুর আর গর্ব ধরে না। নজরুলের সঙ্গে সাক্ষাতের

জন্য তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। একটা সুযোগও মিলে গেল। বিশেষ কার্যোপলক্ষে তিনি এলেন কলকাতায়। পথিমধ্যে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা। নজরুলের কথা উঠতেই পবিত্রবাবু কুমুদরঞ্জনকে নিয়ে সোজা চলে এলেন 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে—৩২ নম্বর কলেজ স্ট্রীটের বাড়ীতে। নজরুল তখন দু' তলার সমিতির অফিসে উপস্থিত ছিলেন। পবিত্রবাবু উপরে এসে সংবাদ দিলেন যে কবি কুমুদরঞ্জন নিচের নজরুলের জন্য অপেক্ষা করছেন। কুমুদবাবু উপরে যান নি তার কারণ দীর্ঘদিন ব্যবধানের এই সাক্ষাৎ যে নজরুল কেমন ভাবে নেবে সে সম্পর্কে তিনি সংশয়মুক্ত হতে পারেন নি। কিন্তু নজরুল কুমুদবাবুর আগমন সংবাদ পেয়ে একেবারে পাগল হয়ে উঠলেন। এমন কী জুতো জোড়া পায়ে দেবার সামান্য দেরীটুকুও তিনি সহ্য করতে পারলেন না। সাগর-সঙ্গমে নদীর দুরন্ত গতিবেগের মত উন্মত্ততা নিয়ে তিনি নেমে এলেন নীচের। তারপর কোনো কথা বলার অবকাশ না দিয়ে দু'পা জড়িয়ে ধুলো নিলেন মাথায়। এর পরের ঘটনাটি সেদিনের প্রত্যক্ষদর্শী জনাব মুজফ্‌ফর আহমদের ভাষাতেই বলা যায়: "কত দীর্ঘ বছর পর ছাত্র-শিক্ষকের সাক্ষাৎ হলো। শুধু ছাত্র-শিক্ষকের সাক্ষাৎ বললে ভুল হবে, কবির সঙ্গে কবির মিলনও হলো। তাঁরা সঙ্গে সঙ্গেই কবিতার আবৃত্তি শুরু করলেন না দেখে আমরা অ-কবিরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। কুমুদরঞ্জনের সঙ্গে নজরুলের নানাকথা হচ্ছিল। কথায় কথায় নজরুল বলে ফেললো, 'স্যার, আমিও আপনার মতো পাগল।' তখনই আমার মনের ভিতরটা কি রকম করে উঠল, ভাবলাম খেপাটা আবার একি বলে বসল। কিন্তু কবি কুমুদরঞ্জনের দিকে চোখ ফেরাতেই দেখলাম তাঁর চোখ-মুখ হতে নজরুলের প্রতি স্নেহ ঝরে পড়ছে।"

আজ জীবনের সায়াহ্ন সীমান্তে উপনীত হয়েও নজরুলের প্রতি পল্লী-কবির সে স্নেহদৃষ্টি এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি।

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ নজরুল রচনার উৎস

'কবির সত্তা দ্বৈত।

তিনি একাধারে রূপ-স্রষ্টা এবং রস-স্রষ্টা। এক রূপে তিনি নিখিল-বিশ্বের সৌন্দর্য অবলোকন করেন, অন্য রূপে তিনি সেই সৌন্দর্য হতে রস সৃষ্টি করেন।' কবির দায়িত্ব তাই দ্বিবিধ। এই দ্বিবিধগুণের সংমিশ্রণ না ঘটলে মহৎ কবি হওয়া যায় না। একটি আদর্শ কবিতা রচনার জন্য সর্বপ্রথম যে গুণটির প্রয়োজন সেটি হলো কবির স্রষ্টা-সত্তা। নিখিলের অণুতে-পরমাণুতে যে রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ ও সৌন্দর্য সম্ভার ছড়িয়ে রয়েছে তা প্রথম দেখতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে। এই উপলব্ধিজাত প্রেরণা হ'তেই সৃষ্টি হ'বে মহোত্তম কবিতার।

সুতরাং কবিতা বা রস-সৃষ্টির জন্য প্রথম প্রয়োজন প্রেরণা— প্রেরণা আবার দৃষ্টিনির্ভর, ঘটনার সাথে ঘনসম্পৃক্ত। ঘটনার আবর্ত হ'তে আবেগের সৃষ্টি, সেই আবেগ হ'তে কবিতার, সাহিত্যের।

যুগে যুগে এই-ই হয়েছে। রস সৃষ্টির ইতিহাসই তাই।

মহান কবি শেলীর কথা ধরা যাক। তাঁর Odd to the West Wind কবিতাটি বিশ্ব-সাহিত্যে একটি অনন্যসৃষ্টি বলে স্বীকৃত। অথচ তিনি এ কবিতাটির প্রেরণা পেলেন কোথায়? একদিন উন্মুক্ত মেঘাবৃত ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ আকাশ তলে দাঁড়িয়ে পশ্চিম ঝড়কে অবলোকন করেছিলেন, তার স্বরূপ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। সেই উপলব্ধি হতেই কবিতার সৃষ্টি। কবিতাটির ছত্রে ছত্রে পশ্চিমা ঝড়ের যে দুর্বার

গতিবেগের স্বরূপ, সর্বধ্বংসী যে প্রলয়ের রূপ ফুটেছে তার সবটুকুই কবির উপলব্ধিজাত।

কীটসের 'Odd to the grecean urn' কবিতাটির কথাও স্মরণ করা যেতে পারে। কবি তখন যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত। অধিকাংশ সময় তিনি নির্জন দ্রাক্ষাকুঞ্জে চিন্তামগ্ন হ'য়ে বসে থাকতেন। সেদিনও বসে ছিলেন। নির্জন শান্ত দুপুর। অনতিদূরে মৃত্তিকার মধ্যে কবি একটি ছবি দেখতে পেলেন। সম্পূর্ণ ছবি নয় ছবির একটি মনোরম অংশ। তিনি হাত বাড়ালেন। মৃত্তিকার মধ্যে বসে আছে ছবিটি। সযত্নে মাটি সরিয়ে সরিয়ে তিনি ছবিটিকে বার করলেন। ভগ্ন ছবি— ভাঙ্গা পেয়ালার একটা টুক্‌রা। অসম্পূর্ণ ছবিতে দেখা গেল এক তরুণ আনন্দোচ্ছল ভঙ্গীতে এক তরুণীকে স্পর্শ করার জন্যে ধাবমান। প্রেমিক-প্রেমিকার এই সৌন্দর্যময় 'আনন্দোজ্জল মুহূর্তটি যুগ যুগ ধরে ধরা রইলো পেয়ালায় গায়—তার লয় নেই, ক্ষয় নেই। ঘটনা সামান্য কিন্তু কবি মহোত্তম প্রেরণা অনুভব করলেন। লিখলেন কবিতাটি এবং তার এক ছত্রে একথাও লিখলেন 'Beauty is truth, truth Beauty'—পৃথিবীর কাব্য সাহিত্যে এ ধরনের আর একটি দুর্লভ পংক্তি আবিষ্কার করা কঠিন।

বিদেশ কেন দেশের মাটিতে ফেরা যাক।

কবিগুরুর 'বলাকা' কবিতাটির কথাই ধরি।

কবি ছিলেন তখন ঝিলাম নদীতে—একটি বোটে। পাহাড়ী পথ ভেঙ্গে ভেঙ্গে সরু নদী বয়ে গেছে। দু'পাশে পাহাড়ের উপরে ঘন সংবদ্ধ বৃক্ষশ্রেণী। বোট থেকে নেমে অন্যান্য লোকজনেরা চলে গেছে অনেক দূরের পাহাড়ী পথে। বোটে কবি একা। শান্ত অপরাহ্ন। নির্জন, নিস্তব্ধ। এক অপূর্ব রূপ-তন্ময় পরিবেশ। কবিও বুঝি ধ্যানমগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন হঠাৎ একটি শব্দে তাঁর ধ্যান ভাঙল। তিনি দেখলেন বিকেলের সোনালী সূর্যের রং মেখে একদল শুভ্র

বলাকা শব্দের আলোড়ন তুলে আকাশপথ পরিক্রমণে ব্যস্ত। দৃশ্যটা এই—এর থেকে এলো গতিবেগের মহোত্তম উপলব্ধি, সৃষ্টি হ'লো অসাধারণ কবিতা 'বলাকা'। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতা রচনার পিছনেও অনুরূপ ইতিহাস রয়েছে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর দ্বিতল আঙ্গিনা থেকে তরুণ কবি প্রভাত সূর্যের যে কী মহান রূপ দেখেছিলেন তা তিনিই জানেন।

ওমর-হাফিজ-শাদীর বিভিন্নতর কবিতা সৃষ্টির পিছনেও অনুরূপ ইতিহাস রয়েছে। চলমান জীবনের ঘটনা থেকে বেগ নিয়ে তাঁরা বহুতর কবিতা সৃষ্টি করেছেন।

রস-সৃষ্টির ইতিহাসই তাই।

ঘটনা থেকে প্রেরণা, প্রেরণা থেকেই সাহিত্য।

কবি নজরুলের অসংখ্য কবিতা এমনিতর ঘটনার আবর্ত থেকে, জন্মলাভ করেছে। ঘটনাটি হয় তাঁর জীবনে ঘটেছে অথবা তিনি ঘটতে দেখেছেন। মোট কথা বিশেষ ঘটনাটি বিশেষ কবিতা সৃষ্টির মূলে সক্রিয় বেগ সঞ্চার করেছে।

নজরুলের সমগ্র জীবনটাই আবেগ চঞ্চল, তিনি আবেগ-তাড়িত। ফলে তাঁর অনেক সৃষ্টিই ঘটনাকেন্দ্রিক হ'য়ে উঠেছে। ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তাঁর কবিতা মহৎ হয়েছে কিনা সে বিচার রসিকজনেরা করবেন। কিন্তু সবিশেষ ঘটনাই যে বহুতর কবিতা-রচনার উৎস হয়ে আছে সেটাই আমার নিম্নের আলোচনাগুলিতে বিশেষ করে দেখেছি। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা "মুক্তি-"র কথাই ধরা যাক।

॥ মুক্তি ॥

সেকালে কয়েকজন সাহিত্য-রসিক ও সাহিত্য-দরদী ব্যক্তির অক্লান্ত পরিশ্রমে বত্রিশ নম্বর কলেজ স্ট্রীটে একটি সমিতি গড়ে উঠেছিল। নাম : "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি।" এ সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সাহিত্য সৃষ্টির আগ্রহ তৈরী করা। এই শুভ প্রচেষ্টার বাস্তব রূপায়ণের জন্য সমিতির পক্ষ থেকে একটি ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের আয়োজন করা হয়। পত্রিকাটির নামকরণ হয় "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা।" সম্পাদক নির্বাচিত হন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ এবং কবি মোজাম্মেল হক।

কবি তখন করাচীর সেনানিবাসে অবস্থান করছেন। সেখান থেকে এই পত্রিকাটির জন্য পাঠালেন একটি সুদীর্ঘ কবিতা—"মুক্তি"। কবিতাটি "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা"র দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় (শ্রাবণ, ১৩২৬ সাল মোতাবেক জুলাই আগস্ট ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে) প্রকাশিত। এটাই কবির সর্বপ্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত কবিতা।

নজরুল কবিতাটির নাম দিয়েছিলেন "ক্ষমা" কিন্তু সম্পাদনা কালে উক্ত পত্রিকার সম্পাদক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ "ক্ষমা"র পরিবর্তে "মুক্তি" নামকরণই করেন। অবশ্য "মুক্তি" নামকরণ অধিকতর সার্থক হয়েছিল—একটি চিঠিতে কবিও এই পরিবর্তনের সমর্থন জানিয়েছেন। কবিতাটির পাদটীকায় নজরুল লিখে দিয়েছেন, "ইহা সত্য ঘটনা"। ১৯১৬ সালের এপ্রিল মাসে এই দরবেশের কথিতরূপ শোচনীয় মৃত্যু ঘটে। তাঁহার পবিত্র সমাধি এখনও 'হাত বাঁধা ফকিরের মাজার শরীফ' বলিয়া কথিত হয়।

—"নজরুল ইসলাম।"

যে ঘটনাটির উপর নির্ভর করে কবি 'মুক্তি' কবিতাটির রচনা করেছেন, সেই সত্য ঘটনাটি কী ?

রাণীগঞ্জ শহরে হঠাৎ এক অদ্ভুতদর্শন ফকিরের আবির্ভাব ঘটে। গোঁফ-দাড়িতে মুখ ভর্তি, মাথায় লম্বা জটা, হাত-পায়ের নখ কোনদিন কাটা হয়নি। সমগ্র দেহের তুলনায় পা দু'টো অত্যন্ত ছোট। মোটা লোহার শিকল দিয়ে হাত দু'টো তার সব সময়ই বাঁধা থাকতো। হাত দিয়ে সে কোন কিছু গ্রহণ করতো না। এটি বুঝি ছিল তার পার্থিব সকল কিছু বিসর্জনের প্রতীক। গলায় ঝুলত একটা মগ জাতীয় টিনের পাত্র। মলিন ছিন্ন বসন পরে ফকির শহরের পথ ধীরে ধীরে পরিক্রমণ করতো। নিশ্চল ভাবে কোথাও দাঁড়াত না। ফকিরটি সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো যে, তার মুখের কথা কেউ কোনদিন শুনতে পায়নি। নির্বাক হাত বাঁধা এই ফকিরকে কেউ কেউ 'মৌনী ফকির' বলে অভিহিত করতেন। ছেলেমেয়েদের দল নানা ভাবে ফকিরকে অত্যাচার করতো—কখনো কখনো রক্তাক্ত দেহেও তাকে পথে পথে ফিরতে দেখা গেছে। চলতি পথের কিনারায় ছিল এক বিরাট বটগাছ—সেই বটগাছের তলায় ছিল ফকিরের আস্তানা। কিশোর কবিও মাঝে মাঝে ফকিরের আস্তানায় যেতেন, গভীর ভাবে লক্ষ্য করতেন মৌনী ফকিরকে। সকল সময় হাত বাঁধা থাক্‌তো বলে নিতান্ত স্বাভাবিক কারণেই ফকিরের প্রতি সকল কিশোরের এক অদম্য কৌতূহল জন্মেছিল—কবিরও। তিনি মাঝে মাঝে তার খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধার কথা চিন্তা করতেন। ফলে অস্বস্তিতে তাঁর সারা দেহ মন ভরে যেত।

একদিন ভোরের আলো-আঁধারিতে এক কাণ্ড ঘটল। মাল বোঝাই এক গরুর গাড়ী চলছিল নিতান্ত স্বাভাবিক গতিতে। পথ তখনো স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। গাড়ীটা ফকিরের কাছাকাছি আসতেই আচমকা ফকির বিকট ভাবে চিৎকার করে উঠ্‌ল। সেই হ'লো

কাল। অতর্কিত চিৎকারে ভয় পেয়ে গরু লাফ দিয়ে ফকিরের উপর এসে পড়ল—মাল বোঝাই গাড়ীর চাকা চলে গেল ফকিরের দেহের উপর দিয়ে। সেই আঘাতেই বীভৎস ভাবে হাত বাঁধা মৌনী ফকিরের মৃত্যু ঘটে। এই করুণ মৃত্যু কবি প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং তিনি বিশেষরূপে বিচলিত হ'য়ে পড়েছিলেন। যা হোক এই মর্মন্তুদ ঘটনাকে অবলম্বন করে কিশোর কবি নজরুল লেখেন 'মুক্তি' কবিতাটি।

কোনো কোনো নজরুল-জীবনীকার বলেছেন যে, নজরুল যখন পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে আসানসোলে আব্দুল ওয়াহেদের রুটির দোকানে কাজ করতেন (১৯১৪ খ্রীঃ) তখন এই কবিতাটি লেখেন ; কিন্তু এ কথা সত্য নয়। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলের শেষে কবিতাটি লিখিত হয়েছিল— নজরুল তখন রাণীগঞ্জের শিয়াড়শোল রাজার স্কুলের সেকেণ্ড ক্লাশ অর্থাৎ নবম শ্রেণীর ছাত্র।

প্রকাশভংগীর দিক থেকে নজরুল এ কবিতায় তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারেন নি। কবিতাটির আগাগোড়া রবীন্দ্রনাথের 'পলাতকা'র সামিল মুক্তক স্বরবৃত্ত ছন্দের অনুকরণ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তবে কবির শেষ জীবনে অধ্যাত্মবাদের প্রতি যে আকুতি দেখা গিয়েছে, তার স্পষ্ট সূচনা বাল্যে রচিত এ কবিতায় রয়েছে। কবিতাটি এতকাল কোথাও পুনর্মুদ্রিত হয়নি, সম্প্রতি আবদুল কাদির সম্পাদিত 'নজরুল রচনা সম্ভার'-এর প্রথম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। নজরুলের প্রথম প্রকাশিত কবিতা হিসেবে এর একটা স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার' উক্ত সংখ্যাটি আজকাল পাওয়া সহজসাধ্য নয়। কালের অগ্রগতিতে যেখানে যা' দু' এক কপি আছে তাও অল্প দিনের মধ্যেই হয়তো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কবিতাটি সংরক্ষিত হওয়া উচিত। ১০৬ লাইনের এই সুদীর্ঘ কবিতাটি হতে আমরা মাত্র সামান্য অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করলাম।

কবিতাটির সূচনা এই :

রাণীগঞ্জের অর্জনপটির বাঁকে—
যেখান দিয়ে নিতুই সাঁঝে ঝাঁকে ঝাঁকে
রাজার বাঁধে জল নিতে যায় শহুরে বৌ কলস কাঁখে।
সেই সে বাঁকের শেষে···
ভুলে যাওয়ার সে কোন নিশিভোর,
'আজান' যখন শহুরেদের ভাঙলে ঘুমের ঘোর,
অবাক হয়ে দেখলে সবাই চেয়ে,
শুক্‌নো নিমের গাছটা গেছে ফলে ফুলে ছেয়ে!···

দরবেশ ফকিরের বর্ণনা :

দেখে কিন্তু লাগ্‌ল সবার তাক্‌,
এ কোন মহাব্যাধিগ্রস্ত অবধূত নির্বাক?
সে কী ভীষণ মূর্তি!
ঈষৎ তার এক চাহনিতে থেমে গেল
গোলমাল সব স্ফূর্তি।
জটপাকান বিপুল জটা,
মেদিনী চুম্বিত শ্মশ্রু, গুম্ফগুলো কটা,
সে যেন এক জটিলতাব সৃষ্টি—
অনায়াসে সইতে পারে ঝড়-ঝঞ্ঝা-বৃষ্টি—
পা দু'টো তার বেজায় খাটো বিঘৎ খানি মোটে,
দন্ত-প্রাচীর লঙ্ঘি অধর ছুঁতেই পায় না ঠোঁটে,
চক্ষু ডাগর, নাকটা বেজায় থাঁদা
মস্ত দু'টো লোহার শিকল দিয়ে হাত দুটো
তার সব সময়ই বাঁধা।

দরবেশের মৃত্যুর দৃশ্য :

হঠাৎ সেদিন সেই পথের বাঁকে,

নিশিভোরেই,
বোঝাই গরুর গাড়ী হেঁকে যাচ্ছিল খুব জোরেই
খোট্টা গাড়োয়ান,
ভৈরবীতে গেয়ে গজল গান।
'হো হো' করে হঠাৎ ফকির উঠল বিষম হেসে,
গাড়ী সুদ্ধ দামড়া বলদ চমকে উঠে, এসে
পড়ল হঠাৎ ফকিরেরই ঘাড়ে,
চাকা ছুটো চলে গেল একেবারে বুকের হাড়ে,
মড়মড়িয়ে উঠল পাঁজর যত। ইত্যাদি।

॥ চড়ুই পাখীর ছানা ॥

ছাত্র জীবনে নজরুল যে সকল কবিতা লিখেছেন 'চড়ুই পাখীর ছানা' কবিতাটি তাদের মধ্যে অন্যতম। 'মুক্তি' কবিতা রচনার মত এই কবিতা রচনার পটভূমিতেও একটি করুণ কাহিনী জড়িয়ে রয়েছে।

বিরাট এক দালান বাড়ীর কড়ি কাঠের ফাঁকে বাসা বেঁধেছিল নিতান্ত ছোট্ট একটি পাখী—চড়ুই। ডিম পেড়ে তা' দিয়ে একটা বাচ্চাও তুলেছিল সে। একদিন উড়তে গিয়ে ছানাটা মাটিতে পড়ে গেল। ভাল উড়তে শেখেনি, উড়ে কিছুটা দূরে গিয়ে আবার পড়ে গেল মাটিতে। কিশোর নজরুল সবান্ধবে বসে ছিলেন সেখানে। দৃশ্যটা কারুর চোখ এড়াল না। ছুটে এলেন সবাই—নজরুল, শৈলজানন্দ এবং আরো অনেকে। তাড়া দিয়ে পাখীটাকে ধরা হলো। দুষ্ট বুদ্ধিতে কেউ কম যায় না। বাচ্চাটার পায়ে বাঁধা হ'লো সুতো। তারপর হৈ হৈ করে তাড়া দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হ'লো পাখীটাকে। চলল খেলা—নিষ্ঠুর খেলা। একজনের বিপন্ন প্রাণ নিয়ে আর

একজনের আনন্দ। প্রথম প্রথম পাখীটা উড়ল কিছুক্ষণ—এ কড়ি থেকে ও কড়ি, ওখান থেকে সেখান। তারপর ক্লান্ত হয়ে এক সময় পড়ে গেল মাটিতে। ইতিমধ্যে আরো অনেক চড়ুই এসে জমেছিল—হয়তো সেই বাচ্চাটার মাও। তারা অসহায় ভাবে মাথার উপর উড়ে উড়ে চিৎকার করল। পাখীটা তখন প্রায় আধমরা হয়ে এসেছে। আর উড়ছে না, মাটিতে বসে থর থর করে কাঁপছে। কিছুটা ভয়ে, কিছুটা মৃত্যু আশঙ্কায়। শত চেষ্টাতেও যখন আর বাচ্চাটাকে উড়ান গেল না তখন কিশোরদের টনক নড়ল। নিষ্ঠুর খেলার একটা পরিণতি আছে, অনুশোচনায় তখন সবাই আচ্ছন্ন, এমন সময় বিরাট এক মই ঘাড়ে করে উপস্থিত হলেন নজরুল। পাখীটার অসহায় অবস্থা তিনি দেখে গিয়েছিলেন কিন্তু বর্তমানের শোচনীয় পরিণতি দেখে তিনি মর্মাহত হলেন। কাকেও কিছু বললেন না—একটি কথাও না। পাখীটির পা থেকে সুতো খুললেন তারপর দেওয়ালে মই লাগিয়ে আস্তে আস্তে উঠে গেলেন উপরে। পাখীটাকে সযত্নে বাসায় রেখে নেমে এলেন ধীরে ধীরে। বন্ধুরাও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

ভাল কাজ করার একটা আনন্দ আছে। আপনা থেকেই চিত্তে একটা প্রসন্নতা নেমে আসে। যারা করে না তারা দুঃখ পায়। মাথা হেঁট করে সেই দুঃখের বোঝা নিয়ে চলে গেল অন্যান্য বন্ধুরা, নজরুল ফিরে এলেন অনাবিল প্রসন্নতা নিয়ে। সেদিন বাড়ীতে এসে তিনি লিখলেন একটি কথিকা। অনেকে মনে করেন সে সন্ধ্যায় নজরুল 'চড়ুই পাখীর ছানা' কবিতাটি লিখেছিলেন কিন্তু একথা সত্য নয়। সেদিন রাতে তিনি লিখলেন কথিকা এবং তার কিছু দিন পরে লিখলেন কবিতাটি। ২৬ লাইনের কবিতা :

মস্ত বড় দালান বাড়ীর উই-লাগা ঐ কড়ির ফাঁকে
ছোট একটি চড়াই ছানা কেঁদে কেঁদে ডাক্‌ছে মাকে।...

হৃদয়-আবেগ রুধতে নেরে উড়তে গেল অবোধ পাখী
ঝুপ করে সে গেল পড়ে—ঝরল মায়ের করুণ আঁখি।...ইত্যাদি।

কবিতাটি এতদিন অপ্রকাশিত ছিল। সম্প্রতি কবি বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় 'কেউ ভোলে না কেউ ভোলে' গ্রন্থে কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করেছেন এবং এটি আবদুল কাদির সম্পাদিত 'নজরুল রচনা সম্ভারে' পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

॥ কোরবানি ॥

কোরবানি নিখিল বিশ্বের-মুসলিম সমাজে একটি পরম পবিত্র অনুষ্ঠান। সুদূর অতীতে হজরত ইব্রাহীমের সময় থেকে এর প্রথম প্রচলন। এই উৎসবে আমরা পশু জবাই করি। বলা বাহুল্য, পশু জবাইটা একটা প্রতীক মাত্র। এর মূল উদ্দেশ্য হ'লো উৎসর্গীকরণ—আত্মত্যাগ, নিজের যা' কিছু পরমপ্রিয় তা' করুণাময় আল্লার নামে উৎসর্গ করতে হবে। পশু কোরবানির সঙ্গে সঙ্গে নিজের সকল রিপুকে জবাই করে মনকে কালিমাশূন্য করাই হ'লো এই অনুষ্ঠানের মূল কথা। কিন্তু তরীকুল আলম নামে একজন উচ্চ শিক্ষিত মুসলমান কোরবানির কদর্থ অর্থ করেন। আলম সাহেব একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি কোরবানির মধ্যে আদিম বর্বর যুগের চিহ্ন দেখতে পান। তাঁর নিজস্ব ধারণা দিয়ে তিনি একটি প্রবন্ধ লেখেন। প্রবন্ধটির সর্বত্র এই পবিত্র অনুষ্ঠানকে জঘন্যভাবে আক্রমণ করে বহুতর যুক্তি তর্কের অবতারণা করা হয়। তাঁর মূল বক্তব্য হ'লো এই: কোরবানি উৎসবে আমরা ব্যাপকভাবে যে নিরীহ পশু হত্যা করি তা' বর্তমান সভ্য সমাজের উপযোগী নয়। এই অযথা রক্তপাতের মধ্যে আদিম যুগের বর্বরতা লুকিয়ে রয়েছে। গুহাবাসী বর্বর মানুষেরা যে নিষ্ঠুরভাবে নিজেদের মধ্যে হানাহানি ও রক্তপাতের সূচনা করতে

এই অনুষ্ঠানের মাঝে তার সব কিছুই বর্তমান। কোরবানি করে আমরা যে আনন্দলাভ করি তা' পৈশাচিক উল্লাস ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং আমরা যদি নিজেদের সভ্য ও মার্জিত বলে প্রচার করতে চাই তা' হলে এই অনুষ্ঠানকে এখনই পরিত্যাগ করা উচিত।

তরীকুল আলমের এই প্রবন্ধটি পড়ে নজরুল অত্যন্ত ব্যথিত হন। এই বিকৃত ব্যাখ্যায় তিনি মর্মাহত হন। তাঁর বিদ্রোহী আত্মা গর্জন-মুখর হ'য়ে ওঠে এবং তিনি সমুচিত জবাব দেবার জন্যে প্রস্তুত হন। ফলে অল্পকালের ব্যবধানে তিনি লেখেন তাঁর প্রথম যুগের সর্ববিখ্যাত কবিতা 'কোরবানি'। এ কবিতার একদিকে যেমন আছে তরীকুল আলমের ভিত্তিহীন মন্তব্যের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণধার প্রতিবাদ তেমনি অন্য-দিকে আছে ইসলামের এই পবিত্র অনুষ্ঠানের প্রতি দৃঢ় সমর্থন। তা' ছাড়া এ কবিতাটি লেখার সময় খেলাফৎ আন্দোলন চরম পর্যায়ে উন্নীত হয়। নবীন তুর্কীর নওজোয়ানেরা দেশের আজাদীর জন্য অকাতরে নিজেদের 'জান কোরবান' করছিল। 'কোরবানি' কবিতায় স্পষ্ট প্রত্যক্ষরূপে এ ঘটনার ছায়াপাত ঘটেছে। জীবনকে যারা উৎসর্গ করতে জানে না তারা তো ভীতু—কাপুরুষ। আর এই আত্মত্যাগের দীক্ষা যাদের ভেতর নেই জীবন সম্পর্কে মহোত্তম উপলব্ধিও নেই তাদের ভিতরে। মরণ ভীতু ভারতবাসীদের প্রতি লক্ষ্য রেখে বীর নেতাজী একদিন সোচ্চার কণ্ঠে বলেছিলেন, "Give me blood and I will give you freedom" তাঁর এ বাণীতে একটি কথাই ধ্বনিত হয়েছে এবং তা হলো আত্মত্যাগের দীক্ষা। তেমনি খুন দেখে যারা ভয় পায় তাদের উদ্দেশ্যে কবি লিখলেন :

দুর্বল! ভীরু! চুপ রহো, ওহো খাম্‌খা ক্ষুব্ধ মন। এ পংক্তির মধ্যেও ঐ একই আহ্বান রয়েছে—ভীরুতা নয়, দুর্বলতা নয়, ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা নিতে হবে। খুনের মধ্যে রয়েছে গৌরবদীপ্ত নবজীবনের সূচনা, কোরবানিতে হয় "সত্যাগ্রহ শক্তির উদ্বোধন"।

একটি প্রবন্ধে তিনি কোরবানির দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই ভাবে "ভোরের আকাশে প্রথমে সোনালী আলো দেখা দেয়, তারপর আসে রক্তবর্ণ, সবশেষে উদিত হয় সূর্য। তেমনি মানব জীবনের ঐশ্বর্যের সোনালী ছটাকে রক্তে রাঙিয়ে আসে কোরবানি, ত্যাগ বিসর্জন। তারপর মানুষের জীবনে গৌরব ও মহিমার সূর্য উদিত হয়।"

সুতরাং কোরবানিকে যে ভীরু কাপুরুষের দল বর্বর যুগের চিহ্ন বলে উল্লেখ করেছেন কবি সেই তুহীনকাতর মৃত্যুভীতদের উদ্দেশ্যে বলেছেন 'চুপ! খামোশ।' খুন না দিলে স্বাধীনতা পাওয়া যায় না: "আজাদী মেলে না পস্তানোয়।" তাই বীরের এ রুধির ধারা বৃথা যায় না—

এ স্বাধীনতা অর্জনের জন্ম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ:

ঐ খুনের খুঁটিতে কল্যাণ-কেতু, লক্ষ্য ঐ তোরণ!

আজ আল্লার নামে জান কোরবানে ঈদের পূত বোধন।

সুতরাং কোরবানিতে যে রক্তপাত ঘটে তা বীরধর্ম উদ্‌যাপনের প্রতীক। দুর্বল, ভীরুদের কাছে এ পবিত্র অনুষ্ঠান ভীতির অনুষঙ্গ হিসেবে দেখা দেবে।

কবিতাটি প্রথমে 'মোসলেম ভারতে'র ১ম বর্ষের ৫ম সংখ্যা মোতাবেক ১৩২৭ সালের ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয় এবং পরে কবির অমর কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণায়" সংকলিত হয়েছে।

॥ শিশু পথিক ॥

মানুষকে আপন করে নেবার কী দুর্লভ ক্ষমতা নিয়েই যে কবি জন্মেছিলেন। সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ব্যক্তি—অজ্ঞাত; অনাত্মীয়, অথচ কয়েক মিনিটের আলাপে একেবারে আপন জন হয়ে গেলেন তন্ময়, বিভোর। কবির জন্য বড় রকমের আত্মোৎসর্গ করতেও তখন তিনি পিছপাও নন। হৃদয়ের অসাধারণ উদারতার জন্য এমনটি হওয়া সম্ভব হয়েছিল। কবির জীবনে এমন ঘটনা বার বার ঘটেছে। যাঁরা দূরে ছিলেন তাঁরা নিকটে এসেছেন, যাঁরা পর ছিলেন তাঁরা আত্মীয় হয়েছেন। কবির দুঃখে তাঁরা বেদনা অনুভব করেছেন, কবিও তাঁদের ব্যথা-আনন্দে অংশীদার হয়েছেন। দেওঘরে থাকতে এমনি একটা ঘটনা ঘটে। এখানে শ্রীমতী কুমদিনী বসুর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। আলাপ হতে ঘনিষ্ঠতা। এই পরিবারের সকলের সঙ্গে বসে নজরুল মাঝে মাঝে গল্প করেন।

একদিন দুপুরে কবি গেলেন তাঁদের বাসায় নিতান্ত বৈঠকী আড্ডার জন্য। কিন্তু দুর্ভাগ্য, ভদ্রমহিলা তাঁর ছেলেমেয়ে নিয়ে অন্যত্র বার হয়ে গেছেন। কবি ব্যথিত হলেন। একটা কাঠ কয়লা কুড়িয়ে নিয়ে দেওয়ালে বড় বড় করে লিখে দিয়ে এলেন :

আজ দুপুরে দেওঘরে
কেউ ঘরে নেই, কেউ ঘরে।

বাসায় ফিরেই লেখাটা ভদ্রমহিলার নজরে পড়ল। তিনি পড়লেন আর হাসলেন। এক অপরিসীম স্নেহ ও আন্তরিকতা ঝরে পড়ল সে হাসিতে।

অবশেষে তাঁরা এক সময় কলকাতায় চলে এলেন। মুখের আলাপ, পথের পরিচয় কী এখানেই শেষ হয়ে গেল? নজরুলকে ভুলে যাওয়া কারো পক্ষে এত সহজ ছিল না।' ভদ্রমহিলার ছোট

মেয়ের জন্মদিন। ১৯২২ সালের কথা। নজরুল তখন 'ধূমকেতু' পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। শ্রীমতী বসু নিজে এসে নিমন্ত্রণ করে কবিকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। এই উপলক্ষে কবি লিখলেন। "শিশু পথিক" গানটি—ভাগ্যবান শিশুর জন্মদিনের মহোত্তম উপহার :

নাম-হারা তুই পথিক শিশু এলি অচিন দেশ পারায়ে।
কোন নামের আজ পরলি কাঁকন? বাঁধন-হারা কোন কারা এ?
আবার মনের মতন করে কোন নামে বল ডাকবো তোরে।
পথ ভোলা তুই এই সে ঘরে ছিলি ওরে, এলি ওরে
বারে বারে নাম হারায়ে॥

কবিতাটি "তাঁর পূবের হাওয়া" কাব্যগ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে।

॥ কল গাড়ী যায় ॥
(একটি কমিক গান)

নজরুল তখন গ্রামোফোনে যোগ দিয়েছেন। যথারীতি যান বিষ্ণুভবনে—হিজ মাস্টার্স ভয়েস কোম্পানির রিহার্সাল রুমে। নতুন আগন্তুকদের ভিড় সেখানে সর্বদাই, রেকর্ডে গান দেবার জন্যে নানান ধরনের লোকজন আসে, মাতাল হবু গায়ক-গায়িকারা নেশাগ্রস্তের মত এসে হত্তে দেয়···পুরানো গায়ক-গায়িকাদের জমজমাট আসর তো আছেই। এঁদের মধ্যে আবার প্রধান হলেন ধীরেন মিত্র, ইন্দুবালা, আঙুরবালা, কমল দাশগুপ্ত, আর কে, মল্লিক। নজরুল তখন এইচ, এম, ভি-র chief trainer কিন্তু নতুন গায়ক-গায়িকাদের দিকে তিনি লক্ষ্য দিতে পারেন না। সে ভার পড়েছে তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ক কে, মল্লিকের (আবুল কাসেম মল্লিকের) ওপর। রেকর্ড করার জন্যে কোন নতুন গায়ক-গায়িকা এলে তাদের কণ্ঠের পরীক্ষা নিতেন কে, মল্লিক।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবে নজরুল সেই শিল্পীদের জন্যে গান নির্দিষ্ট করে দিতেন।

সেদিন বিষ্ণুভবনে কে, মল্লিক বসে গল্প করছিলেন—এমন সময় এক ভদ্রলোক এসে হাজির। অন্য কোন রকম ভূমিকা না করে তিনি বললেন, আমি আপনার দেশের লোক—আমাকে রেকর্ড করার সুযোগ দিতে হ'বেই।

মল্লিক সাহেব প্রথমে কোন কথা বললেন না—মনে মনে হয়তো খুশীই হয়েছিলেন। দেশের লোক যদি রেকর্ডে নাম করতে পারে তাতে তাঁর আনন্দিত হবার-ই কথা। তিনি বললেন, রেকর্ড করার আগে,আমরা সামান্য একটু পরীক্ষা নিই।

ভদ্রলোক রীতিমত উৎসাহিত হলেন। কিছুটা গর্বিতও। গর্ব ভরে বললেন, আমার নাম প্রফেসর জি দাস, পরীক্ষা আমি থোড়াই কেয়ার করি।

কণ্ঠের পরীক্ষা নিয়ে কে, মল্লিক নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়লেন। একেবারে অনুপযুক্ত কণ্ঠ। ফলাফল শুনে প্রায় কাঁদ কাঁদ ভাব। সে অহংকার নেই। তিনি যে আঙুরবালাকে মা এবং ইন্দুবালাকে মাসি ডেকেছেন—সে কথাও বললেন নিতান্ত দুঃখের সঙ্গে। অবস্থা ক্রমেই সঙ্গীন হ'য়ে উঠছিল। শেষে দাস মহাশয় বললেন, আমার এতগুলো মিষ্টি খাওয়ান কী বৃথা গেল। বলেই সত্য সত্য হাউ মাউ করে কেঁদে ফেললেন।

ধীরেন মিত্র আর কমলা দাশগুপ্ত তখন দূরে দাঁড়িয়ে হেসে লুটোপুটি। কৌশলে টাকা আদায় করে তাঁরা মিষ্টি খেয়েছেন। কে, মল্লিক সব দেখে-শুনে হতভম্ব হ'য়ে বসে আছেন। এমন সময় হন্তদন্ত হ'য়ে এলেন নজরুল। দিল দরিয়া মানুষ। সব শুনে তিনি সকলের কথা ও মতামত উপেক্ষা করে জি, দাসকে দিয়ে একটা রেকর্ড করাবার মনস্থ করলেন। বললেন, কাল এসো—একখানা গান রেকর্ড করাবো তোমাকে দিয়ে।

হাসি মুখে চলে গেলেন জি, দাস।

চলে যেতেই মল্লিক বললেন, কী করলেন কাজী সাহেব—লোকটা যে নির্বোধ।

কবি দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলেন, কিন্তু বাংলা দেশেও হুজুগে মাতা নির্বোধের সংখ্যা কম নয়—সেই সঙ্গে তারা পাগলও।

পরদিন যথা সময় সকল ব্যবস্থা করা হ'লো। রেকর্ডিং রুমে গেলেন চারজন—কবি, কে মল্লিক, জি দাস আর একজন তবলচি। সব কাজ খুব সংগোপনে করা হ'লো। রেকর্ডিং রুমে গিয়ে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হ'লো, সর্বময় কর্তা হিগিনস সাহেবও জানতে পারলেন না যে ভিতরে কী কাণ্ড হ'চ্ছে।

কবি নজরুল একটা নতুন গান লিখে এনেছেন জি দাসের জন্য, কমিক গান। খাতা এগিয়ে দিয়ে বললেন, এই নাও গান। দু' একবার মহড়া দিয়েই রেকর্ড কর—কিন্তু সাবধান—রেকর্ড বাজারে বার না হওয়া পর্যন্ত যেন কেউ না জানে।

মহড়ার জন্য খাতার ওপর চোখ রেখে গান ধরল প্রফেসর জি দাস :

কলগাড়ী যায় ভষড় ভষড়,
ছ্যাকড়া গাড়ী খচাং খচ,
ইচিং বিচিং জামাই চিচিং
কুলকুচি দেয় ফচর ফচ্।...
ইত্যাদি।

॥ মরি হায় হায় হায় ॥

(আর একটি কমিক গান)

এক পিঠের গান তো রেকর্ড করা হ'লো কিন্তু উল্টো পিঠে কী দেওয়া যায়? এবং এ গানের যা ঢং তাতে উল্টো পিঠে অন্য কাকেও দিয়ে অন্য গান গাওয়ান যাবে না। কবি বললেন, আবার এসো আগামী কাল।

খুব খুশী জি, দাস।

পরের দিন ঠিক ঐ একই নিয়মে আর একখানি গান রেকর্ড করা হ'লো। এ গানখানি মারাত্মক— অন্ততঃ প্রফেসর জি, দাসের কাছে মারাত্মক হওয়া উচিত ছিল। কেন না এই গানে জি, দাসকে চতুষ্পদ বানানো হ'য়েছে কিন্তু জি, দাস মূল রহস্য একেবারেই ধরতে পারল না। লোকটা সত্যই নির্বোধ ছিল। এ গানের কথাগুলো এই :

মরি হায় হায় হায়
কুব্জার কী রূপের বাহার দেখো
তারে চিৎ করলে হয় যে ডোঙা
উপুড় করলে হয় সাঁকো!
হরি ঘোষের চার নম্বর খুঁটো
মরি হায় হায় হায়।
ইত্যাদি।

গান রেকর্ড করা সমাপ্ত হ'লো। এবং কয়েক দিন পর বাজারে বার হ'লো। সাহেব হিগিনস বাংলা জানেন না। সুতরাং কী গান রেকর্ড করা হ'লো তা' তিনি বুঝলেন না। তিনি দৃষ্টি রাখলেন বিক্রির দিকে।

গান দুটি রেকর্ড করার পর কবিও খুব নিশ্চিন্ত ছিলেন না। দু'টি অর্থহীন প্রলাপ রেকর্ড করা হ'লো—বিক্রি হ'বে তো! তিনি চুপি চুপি এসে কে, মল্লিককে বললেন, একবার গোপনে সংবাদ নিন তো—কেমন কাটতি হ'চ্ছে।

হো হো করে হেসে মল্লিক বললেন, আপনার অনুমান সত্য কাজী সাহেব। খোঁজ নিয়েছি, খুব কিনছে লোকে—অসংখ্য কাটতি হ'চ্ছে প্রতিদিন। রাস্তায় বেরুলে আপনিও শুনতে পাবেন পরমানন্দে হুজুগপ্রিয়রা মাথা দুলিয়ে গাইছে, রেলগাড়ী ভষড় ভষড়।

হিগিন্‌স খুশী হ'য়েছেন সব চাইতে বেশী। তিনি তাঁর রুমে ডাকলেন কবিকে। বললেন, লোকটাকে দিয়ে এ ধরনের গান আরো রেকর্ড করান।

কবি হেসে বল্‌লেন, এবার এ ধরনের গান রেকর্ড করালে গালিগালাজের অন্ত থাকবে না। বাংলা দেশে মাতলামি একবারই চলে।

॥ জাতের বজ্জাতি ॥

নজরুল একটি মাত্র ধর্মকে বিশ্বাস করতেন—সে হ'লো মানবধর্ম। সারা জীবনের সাহিত্য-সাধনার মধ্য দিয়ে তিনি এই ধর্মের জয়গান করেছেন। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন মানুষের জন্য ধর্ম—ধর্মের জন্য মানুষ নয়। সুতরাং মানুষকে অবহেলা করে, মানবতাকে অপমান করে ধর্ম কখনো বড় হ'তে পারে না। যে ধর্মীয় আচার মানুষকে, মানবতাকে অসম্মান করে বড় হ'য়ে উঠেছে তা' মিথ্যা ও ভণ্ডামির নামান্তর। তাঁর কাব্য-গানে এই সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে বার বার সরব প্রতিবাদ ধ্বনিত হ'য়েছে।

ছোঁয়াছুঁয়িতে যে মানুষের জাত যেতে পারে এই অদ্ভুত তত্ত্ব বিজ্ঞানালোকিত বিংশ শতাব্দীতে বাস করে নজরুল কোন দিনই বুঝতে পারেন নি। এর জন্যে তাঁকে বহুবার মনে মনে কঠিন আঘাত পেতে হ'য়েছে।

শ্রদ্ধেয় হেমেন্দ্রকুমার রায় আন্তরিক ভাবে নজরুলকে স্নেহ করতেন। বহুদিন তাঁরা একত্রে থেকেছেন, বহুবার নজরুল রায় মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়ে রাত্রি যাপন করে এসেছেন, থিয়েটারে নাটক ও গান রচনা এবং প্রযোজনা উপলক্ষে বহুদিন তাঁরা একত্রে কাজও করেছেন—সুতরাং তাঁদের মধ্যে কোন সংকীর্ণতা থাকা উচিত নয়। কিন্তু হেমেন্দ্রবাবু সেই সংকীর্ণতায় সংকুচিত হ'য়ে পড়লেন।

তাঁর বড় মেয়ের বিবাহ অথচ তিনি সাহস করে নজরুলকে নিমন্ত্রণ করতে পারলেন না। হেমেন্দ্রকুমার রায় উদার প্রকৃতির মানুষ কিন্তু সামাজিক বন্ধন তাঁকে বিশেষ রূপে বিচলিত করে তুলেছিল। তাঁর মনে মনে ভয় ছিল নজরুল এলে হয়তো নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অসন্তোষের সাড়া পড়ে যেতে পারে।

কিন্তু নজরুলকে নিমন্ত্রণ না করলে কী হ'বে বিয়ের দিন সন্ধ্যা বেলা যথারীতি 'দে গরুর গা ধুইয়ে' রব তুলতে তুলতে নজরুল নিরুদ্বেগ চিত্তে বিবাহ-বাসরে এসে হাজির। মহৎপ্রাণ নজরুলের অন্য কোন অসুবিধার কথা মনেই হয়নি—তিনি ভেবেছিলেন আকস্মিক উদয় হ'য়ে তাঁর হেমেন দাকে চমকে দেবেন! নজরুলকে দেখে তাঁর হেমেন দা' চমকিতই হ'লেন—তিনি কী করবেন ভেবেই পেলেন না। কিন্তু ততক্ষণে কাজীর উপস্থিতিতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অসন্তোষ ঘনীভূত হ'য়ে উঠতে শুরু করেছে। চাপা অসন্তোষ মৃদু গুঞ্জরনের রূপ নিচ্ছে আস্তে আস্তে। আর অপেক্ষা করা যায় না। উপস্থিত বুদ্ধিতে রায় মহাশয় অতি দ্রুত ব্যাপারটিকে মীমাংসার পথে নিয়ে গেলেন। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের

তিনি পৃথক পৃথক আহারের ব্যবস্থা করলেন, ফলে দু'কূল রক্ষা পেল। কিন্তু ব্যাপারটি নজরুলের মনে নিদারুণ আঘাত হেনেছিল।

এ ধরনের একটি চরম আঘাত পেয়েছিলেন তিনি তাঁর বন্ধু নলিনাক্ষ সান্যালের বিয়েতে। ঘটনাটি সবিস্তারে বলা প্রয়োজন।

বহরমপুর জেল থেকে মুক্তি পেয়ে কবি উঠেছিলেন নলিনাক্ষ সান্যালের বাসায়—এখানেই সান্যাল মহাশয়ের সঙ্গে কবির পরিচয় এবং বন্ধুত্ব। সান্যাল মহাশয়ের পণ ছিল যে তিনি কোন দিন বিয়ে করবেন না। কিন্তু হঠাৎ বিয়েতে সম্মত হওয়ায় কবি তাঁকে নিয়ে টিপ্পনী কাটতে শুরু করলেন এমন কী এর রেশ ছাপান প্রীতি উপহার পর্যন্ত গিয়ে গড়াল। এ প্রীতি উপহারটি নজরুল লিখেছিলেন এবং প্রথম দু'টি পংক্তি ছিল এই :

"রাখালি রে রাখালি কতই খেলা দেখালি।" —ইত্যাদি

সান্যাল মহাশয়, তাঁর বন্ধুবর্গ এবং আত্মীয় স্বজনকে নিয়ে মহাধুমধামের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বিবাহ-বাসরে এসে হাজির হ'লেন। কিন্তু সেখানেও ঐ একই অসন্তোষ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। হিন্দুর বিয়েতে একজন মুসলমান—অসহ্য! প্রবল গোড়ামি নিদারুণভাবে উদ্ধত হ'য়ে উঠল। বিষয়টা কেবল চাপা অসন্তোষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল না, গুঞ্জরন থেকে চিৎকার। শেষে এমন হ'লো কন্যাপক্ষ বিবাহবাসরে তাঁদের শালগ্রাম শিলা পর্যন্ত আনলেন না। সব দেখে-শুনে কবি একেবারে নির্বাক হ'য়ে গিয়েছিলেন। এ আঘাত এবং অপমান তাঁর হৃদয়ে-গভীর ভাবে বেজেছিল। অনেকে মনে করেন যে কবি বিবাহ-বাসর ত্যাগ করে চলে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি চলে আসেন নি। বিবাহ-বাসর থেকে পাশের ঘরে গিয়ে সেই কলগুঞ্জনের মাঝে বসেই তিনি লিখলেন একটি কবিতা, রক্তের আখরে লেখা একটি গান—ভণ্ডামি ও গোঁড়ামির সমুচিত জবাব। নাম দিলেন 'জাতের বজ্জাতি'। গানটি তিনি কেবল রচনা করেই

ক্ষান্ত হলেন না সঙ্গে সঙ্গে তাতে সুর দিয়ে বিবাহ মজলিসে উদাত্ত কণ্ঠে সকলকে গেয়ে শোনালেন :

"ঐ জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াৎ খেলছে জুয়া,
ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয়ক মোয়া।
হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি, ভাবলি এতে জাতির জান,
তাইত বেকুব করলি তোরা এক জাতিকে এক শ' খান।
এখন দেখিস ভারত জোড়া,
পড়ে আছিস বাসি মড়া,
মানুষ নাই আজ, আছে শুধু জাত শেয়ালের হুক্কাহুয়া।" ইত্যাদি।

কবিতাটির প্রতিটি পংক্তিতে সারশূন্য ভণ্ডামির বিরুদ্ধে তিনি যেন জেহাদ ঘোষণা করলেন। ফল ফললো অনিবার্য রূপে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে স্পষ্টতঃ দু'টি দলের সৃষ্টি হ'লো। কেবল পুরুষদের মধ্যে নয়—অন্তঃপুরেও আলোড়ন উঠলো। কবির আবেগপূর্ণ সংগীত যেন মন্ত্রের মত কাজ করল। শিক্ষিতা তরুণীরা বিদ্রোহের ভংগীতে বেঁকে দাঁড়াল—বাইরে তরুণদের তো কথাই নেই। শেষে প্রস্তাব এলো—প্রবীণেরা মজলিসে বসে আহার করবেন আর নবীনদের জন্যে ব্যবস্থা হ'বে অন্যত্র—আবার দলবদ্ধ আন্দোলন শুরু হ'লো। তরুণ দল স্পষ্ট বললেন, যাঁদের আপত্তি থাকে তাঁরা অন্যত্র আহার করবেন, মজলিস তাঁদের জন্য নয়।

তাই-ই হ'লো। প্রবীণেরা অন্যত্র বসে নীরবে আহার করে চলে গেলেন।

নবীনদের বিজয় সূচীত হ'লো। এ জয় কেবল নবীনদের নয়—এ জয় মানবতার। পুঞ্জীভূত কুসংস্কারের উপর উদার উষার সোনালী কিরণমালা ঝলমল করে উঠল। শতাব্দীর অন্তঃসারশূন্য জরাজীর্ণ শবের উপর দিয়ে তাজাপ্রাণ নবীনের বিজয়রথ চ'লে গেল। মাত্র একটি কবিতা অথচ যেন একটি যুগের মোড় ঘুরিয়ে দিলে।

১৩৩০ সালের শ্রাবণ সংখ্যা ত্রৈমাসিক "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় 'জাতের বজ্জাতি' শীর্ষক বলিষ্ঠ প্রতিবাদ কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হ'য়েছিল। পরে এটি কবির 'বিষের বাঁশি' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হ'য়েছে।

পরে এ গানটি সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া গেছে আমি এখানে তার উল্লেখ করলাম। তথ্যটি দিয়েছেন জনাব মুজফফর আহমদ এবং মনে হয় এ তথ্যটিই ঠিক।

ডক্টর নলিনাক্ষ সান্ন্যালের বিয়ে হয় ১৩৩১ সালের ৩রা বৈশাখ। কিন্তু "বিজলী"র পুরানো ফাইল ঘাঁটতে গিয়ে জনাব মুজফফর আহমদ দেখতে পান যে কবিতাটি "জাত জালিয়াৎ" শিরোনামে ১৩৩০ সালের ৫ঠা শ্রাবণের "বিজলী"তে ছাপা হ'য়েছে। এবং ফুট-নোটে লেখা আছে "মাদারীপুর শান্তি-সেনা চারণদলের জন্য লিখিত অপ্রকাশিত নাটক হ'তে"। সুতরাং নলিনাক্ষ সান্ন্যালের বিয়েতে যে কবিতাটি রচিত হ'তে পারে না সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। আসলে হয়তো কবিতাটি উল্লিখিত নাটকের জন্য লিখিত হ'য়েছিল—বিয়ের ঘটনায় আহুত হ'য়ে কবির পাশের ঘরে বসে আপন স্মৃতি হ'তে কবিতাটি লিখে এনেছিলেন। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে কবিতাটি আশ্চর্যরূপে খাপ খেয়ে গিয়েছিল।

আমি এখানে দু'টি ঘটনারই উল্লেখ করলাম। শ্রীনলিনাক্ষ সান্ন্যালের বিয়েতে কবিতাটি রচিত না হলেও এই ঘটনাটির পর হ'তে কবিতাটি নবরূপে চিহ্নিত হ'য়েছে।

॥ খেয়াপারের তরণী ॥

নিজের অপ্রত্যাশিত জনপ্রিয়তার কথা বলতে গিয়ে বায়রণ লিখেছেন : 'I woke up one morning and found myself famous.' নজরুলের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে এই উক্তিও মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে, তিনি বুঝি এই উক্তির মর্মনির্যাসকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সম্পর্কে বীর-যোদ্ধা নেপোলিয়ানের উক্তিই বোধহয় অধিকতর সত্য : 'VINI VIDI VICI' এলাম দেখলাম জয় করলাম। দেশের মানুষের মনের শ্রদ্ধা আকর্ষণের জন্য তাঁকে একটা রাতও অপেক্ষা করতে হয়নি, সাহিত্যাঙ্গনে বলিষ্ঠ পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিখিল বাংলার আপামর জনসাধারণের হৃদয় একেবারে লুট করে নিয়েছেন। তাঁর কাজের প্রতি পংক্তিতে যে বলিষ্ঠ সুরালাপন সোচ্চার হয়ে উঠেছে তা' বাংলা সাহিত্যে একেবারে নতুন। বর্ণোজ্জ্বল চিত্র গরিমায় কবির প্রথম যুগের কাব্যগুলি কেবল সুন্দর নয়, মনোহর—দুষ্প্রাপ্য মনোহর। নজরুল-কাব্যে রূপ সম্পূর্ণতা (finishing touch) নেই বলে রসিকজনেরা যে কঠোর মন্তব্য করে থাকেন, কবির প্রথম যুগের কাব্যগুলি সেই দোষ দুর্বলতা হতে আশ্চর্যরূপে মুক্ত। তাঁর এ যুগের কাব্যগুলি রূপ (quality) এবং রীতির (style) দিক থেকে অনবদ্য, প্রাণ এবং ভঙ্গীর আশ্চর্য সম্মিলনে সুমহান সমোন্নতি লাভ করেছে। তাঁর প্রথম যুগের কবিতাগুলি অনায়াস ভংগীতে fine excess-এর (কবি কীটস যাকে fine excess বলেছেন) এলাকায় যাতায়াত করেছে। কবির প্রথম পর্বের কাব্যে এই গুণগুলি ছিল বলেই তিনি মানুষের হৃদয়কে এত তাড়াতাড়ি জয় করেছিলেন। বাঙালী চিত্তকে অনিবার্য রূপে

আকর্ষণ করার জন্যে চারটি কী পাঁচটি কবিতাই যথেষ্ট ছিল। মধুসূদন এবং বিশ্বকবির কথা স্মরণ রেখেও এ কথা বলা যায় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এ একেবারে নতুন, প্রথম পদক্ষেপের সংগে সংগে এমন বিপুলভাবে আর কেউ সংবর্ধিত হয় নি।

প্রথম পর্বের সেই চারটি কী পাঁচটি সাড়া জাগানো কবিতাবলীর মধ্যে 'খেয়াপারের তরণী' অন্যতম একটি। কবিতাটি কবি মোজাম্মেল হক সম্পাদিত 'মোসলেম ভারত" পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছিল।

'মোসলেম ভারতে'র সমালোচনা প্রসংগে উক্ত কবিতা সম্পর্কে ১৩২৭ সালের (১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে) 'নারায়ণ পত্রিকা' মন্তব্য করেন: "গোড়ায় একটি ছোট মেয়ের আঁকা ছবি—খেয়া পার। নজরুল তাঁর উপযোগী একটি কবিতা লেখেন।' এ তথ্যটি ভুল। ছবিটি প্রথম দিকে আর্ট পেপারে মুদ্রিত হয়েছিল ঠিক-ই কিন্তু ছোট মেয়ের আঁকা নয়। শিল্পী যখন ছবিটি আঁকেন তখন তিনি অনেকগুলি সন্তানের জননী। এই চিত্রশিল্পীর নাম নওয়াবজাদী মেহেরবানু খানম। ইনি ঢাকার বিখ্যাত নওয়াব স্যার আহসান উল্লাহ বাহাদুরের কন্যা। এবং নওয়াব স্যার সলিমুল্লা বাহাদুরের ভগিনী। এঁর স্বামীর নাম খান বাহাদুর খাজা মোহাম্মদ আজম।

নজরুল-জীবনীকার ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্ত তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন: "ঢাকার নবাব পরিবারের কোন মহিলা 'মোসলেম ভারতে' প্রকাশের জন্যে একটি ছবি পাঠান।" এ তথ্যটিও ঠিক নয়। ভদ্রমহিলা ছবি পাঠাননি বরং তাঁর নিকট থেকেই ছবিটি সংগ্রহ করে এনেছিলেন জনাব আফজালুল হক। কবি মোজাম্মেল হক সাহেব নামেমাত্র সম্পাদক ছিলেন আসলে পত্রিকাটির মর্যাদাপূর্ণ প্রকাশনার ব্যাপারে আফজালুল হক সাহেবকেই দায়িত্ব বহন করতে হ'তো। এবং এ জন্যে পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করতে তিনি কোন রকমে কুণ্ঠিত হতেন না। সেকালে 'মোসলেম ভারতে'র মত রুচিপূর্ণ পত্রিকা খুব কম

ছিল। পত্রিকার মান বজায় রাখার জন্য আফজালুল হক নিখিল বাংলার সর্বত্র যাতায়াত করেছেন। যেখানে কোন ভাল লেখা বা ছবির সন্ধান পেয়েছেন তিনি সেটি পরমাগ্রহে সংগ্রহ করে এনেছেন।

পত্রিকাটির ব্যাপারে তিনি একবার ঢাকায় এসেছিলেন। সেই সময় তিনি নবাব পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হন এবং নবাবজাদী মেহের-বানু খানমের ছবি দু'টি নিজ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য সংগ্রহ করে আনেন। এই ছবি দু'খানি প্রথম বর্ষ 'মোসলেম ভারতে'র চতুর্থ সংখ্যায় ছাপা হয়। প্রথমটি তিন রং-এর tricolour এবং দ্বিতীয়টি এক রং-এর। দ্বিতীয় চিত্রখানি ছিল একখানি প্রকৃতি চিত্র। চিত্রটিতে নদীমাতৃক পূর্ব বাংলার এক নয়নাভিরাম দৃশ্য ফুটে উঠেছে। বিক্রমপুরের উত্তরে প্রবহমানা ধলেশ্বরী নদীর উভয় তীরবর্তী শ্যামল বৃক্ষরাজির এক অনুপম সৌন্দর্য-সম্ভার এই চিত্রটিতে আপন গরিমায় বিকশিত। চিত্রের রসাস্বাদনে চিত্ত পুলকে আকুল হয়ে ওঠে। অন্য বর্ণাঢ্য চিত্রটিতে তুলির আলিম্পনে ফুটে উঠেছে খেয়া পারাপারের দৃশ্য। এটিও পূর্ব বাংলার এক সততদৃশ্যমান চিত্র। তরঙ্গ-ক্ষুব্ধ গর্জনোন্মুখ নদী বয়ে চলেছে আপন বেগে, দুটি তরণী সেই তরঙ্গসঙ্কুল নদীর বুকে ভাসমান—তারা পারাপারের যাত্রী। চিত্রে একটি তরণীকে নিমজ্জমান অবস্থায় দেখান হয়েছে। কিন্তু অপরটি শত ঝঞ্ঝা ও দুর্যোগ অতিক্রম করে অবলীলাক্রমে যাত্রী পারাপারে ব্যস্ত। প্রথমটি পাপের নৌকা আর দ্বিতীয়টি পুণ্যের। পাপের নৌকা পরপারে যেতে ব্যর্থ হয়েছে তাই সে নিমজ্জমান। কিন্তু পুণ্যের নৌকা পুণ্যের সওদায় ভরপুর, পরপারের যাত্রায় সে অটল, কোন বাধা বিপত্তি তাকে গন্তব্য পথ হতে বিচ্যুত করতে পারে না। এই নৌকার চারটি দাঁড়ের মাথায় আরবী অক্ষরে ইসলাম ধর্মের প্রথম চারজন খালিফার নাম আবুবকর, উসমান, উমর, আলী লেখা আছে। হাল ও পালের মধ্যে যথাক্রমে লেখা আছে হজরত মোহম্মদ (দঃ) ও শাফায়াত (মুক্তি)। এ নৌকা

'ধর্মেরি বর্মে সু-রক্ষিত' সুতরাং একে ধ্বংস করার জন্যে পার্থিব সকল আয়োজন ব্যর্থকাম।

ঢাকা হ'তে চিত্রটি সংগ্রহ করে এনে জনাব আফজালুল হক এর একটি পরিচিতি লিখে দেবার জন্যে নজরুলকে অনুরোধ করেন। শ্রদ্ধেয় শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মুখে শুনেছি, যে সময় ছবিটি দিয়ে আফজালুল হক সাহেব পরিচিতি লিখে দিতে বলেন সে সময় তাঁরা সকলে একত্রে বসে চা পান করছিলেন। ছবিটি দেখে শৈলজাবাবু বললেন, 'লেখ দেখি একটা কবিতা— যেন ছবিটা না দেখেও তার মর্ম বোঝা যায়।'

চায়ে চুমুক দিয়ে নজরুল শুধালেন, 'লিখলে ?'

হাসলেন শৈলজানন্দ। বললেন, 'লিখলে বুঝব তুমি একজন সত্যকারের কবি।'

এক রকম বাজিই রাখলেন তিনি।

ছবিটি নিয়ে কবি অন্তর্ধান হলেন। অন্তর্ধান অর্থে পাশের কামরায় অর্গলরুদ্ধ হলেন।

ঘটনা যাই হোক, ছবিটি কবির খুব ভাল লেগেছিল, তাঁর মনের গহনে গভীর দাগ কেটেছিল। চিত্রটি দেখে তিনি এমনই অনুপ্রাণিত হয়ে পড়েন যে সেদিনই লিখে ফেলেন তাঁর অবিস্মরণীয় কবিতা 'খেয়াপারের তরণী'। চিত্রটির সংগে কবিতাটিও ছাপা হলো। কিন্তু সাধারণ পাঠকেরা কবিতার চিত্রের মর্ম সঠিক অনুধাবন করতে পারবে না বলে 'চিত্র পরিচিতি' সংযোজনের প্রয়োজন হলো। 'মোসলেম ভারতের' উক্ত সংখ্যার ২৮৫ পৃষ্ঠায় সৈয়দ এমদাদ আলী এই ভাবে চিত্রটির পরিচিতি লিখলেন: "ইহা একখানি ধর্মচিত্র। পাপের নদী উত্তাল তরঙ্গভঙ্গে ছুটিয়া চলিয়াছে। এই নদীতে কাণ্ডারীহীন গোমরাহীর তরণী আত্মরক্ষা করিতে না পারিয়া আরোহীসহ নিমজ্জিত হইতেছে।

তাহার হালের দিকটা মাত্র ডুবিতে বাকী আছে—তার উদ্ধারের কোনো আশা নাই। কিন্তু যাঁহারা "তওহীদের" তরণীতে আশ্রয় লইয়াছেন তাঁহারা বাঁচিয়াছেন। কারণ এই তরণীর কর্ণধার স্বয়ং হজরত মোহম্মদ (দঃ) তাঁহার চারি প্রধান আসহাব এই তরণীর বাহক। উত্তাল তরঙ্গমালার দিকে বিন্দুমাত্রও লক্ষ্য না করিয়া তওহীদের তরণী কেমন অবলীলাক্রমে চলিয়াছে। যাঁহারা এই তরণীতে আশ্রয় লইয়াছেন, তাঁহাদের কোন ভয় নাই। কারণ তাঁহাদের জন্য শাফায়াতের (মুক্তির) পাল প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে। যেদিন বিপুল বিশ্ব রেণু হইতে রেণুতে পরিণত হইয়া যাইবে, যেদিন মহাপ্রলয় সংঘটিত হইয়া মহাবিচারের দিন সমাগত হইবে সেই দিন এই পাল মুক্ত হইবে।

'তওহীদ' অবলম্বনকারীগণ সেই দিন বিনা আয়াসে 'ফানাফিল্লায়' যাইয়া পৌছাইবেন,—আত্মা সেদিন মহানন্দে পরমাত্মার সহিত মিলিত হইবে।"

সৈয়দ এমদাদ আলী সাহেব চিত্রটির যে পরিচয় দিয়েছেন তা' কেবল পরিচয়-ই, তার কোন সাহিত্যিক মূল্য নেই। কিন্তু ঐ একই চিত্রকে অবলম্বন করে নজরুল যে পরিচিতি লিখলেন তা' কলানৈপুণ্যে মহোত্তম সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হ'য়েছে। এই বর্ণোজ্জ্বল কবিতাটির মাত্র কয়েকটি পংক্তি আমরা উদ্ধৃত করলাম:

> যাত্রীরা রাত্রিরে হ'তে এল খেয়াপার,
> বজ্রেরি তূর্যে এ গর্জেছে কে আবার?...
> নাচে পাপ-সিন্ধুতে তুঙ্গ তরঙ্গ!
> মৃত্যুর মহানিশা রুদ্র উলঙ্গ!...
> তমসাবৃতা ঘোরা কেয়ামত রাত্রি,
> খেয়া পারে আশা নাই ডুবিল রে যাত্রী।
> লঙ্ঘি এ সিন্ধুরে প্রলয়ের নৃত্যে

ওগো কার তরী ধায় নির্ভীক চিত্তে।
অবহেলি জলধির ভৈরব গর্জন
প্রলয়ের ডঙ্কার ওঙ্কার তর্জন!
পুণ্য-পথের এ যাত্রীরা নিষ্পাপ,
ধর্মেরি বর্মে সু-রক্ষিত দিল সাফ!
নহে এরা শঙ্কিত বজ্র নিপাতেও
কাণ্ডারী আহমদ তরী ভরা পাথেয়।
আবু বকর, ওসমান, ওমর, আলী হায়দর
দাঁড়ী এ তরণীর, নাই ওরে নাই ডর!
কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝিমাল্লা,
দাঁড়ী মুখে সারি-গান লাশরীক আল্লাহ!...

এই সুদীর্ঘ কবিতাটি পাঠ করে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সমালোচক স্বর্গীয় মোহিতলাল মজুমদার এমনই প্রশংসার আবেগ অনুভব করেন যে তিনি 'মোসলেম ভারতে'র সম্পাদককে সঙ্গে সঙ্গে একটি সুদীর্ঘ পত্র লেখেন। সমগ্র পত্রটিতে এই অ-দেখা তরুণ কবির প্রতি তাঁর সস্নেহ আশীর্বাদ ও প্রশংসা শত ধারায় ঝরে পড়েছে। উক্ত পত্রের একাংশে কবিতাটি সম্পর্কে তিনি লেখেন :···"কাজী সাহেবের ছন্দ তাঁহার স্বতঃ উৎসারিত ভাবকল্লোলিনীর অবশ্যম্ভাবী গমন ভংগী। 'খেয়াপারের তরণী' শীর্ষক কবিতায় ছন্দ সর্বত্র মূলত এক হইলেও মাত্রাবিন্যাস ও যতির বৈচিত্র্যে প্রত্যেক শ্লোকে ভাবানুযায়ী সুর সৃষ্টি করিয়াছে, ছন্দকে রক্ষা করিয়া তাহার মধ্যে এই যে একটি অবলীলা স্বাধীন স্ফূর্তি, অবাধ আবেগ, কবি কোথাও তাহাকে হারাইয়া বসেন নাই ; ছন্দ যেন ভাবের দাসত্ব করিতেছে—কোনখানে আপন অধিকারের সীমা লংঘন করে নাই—এই প্রকৃত কবিশক্তিই পাঠককে মুগ্ধ করে। কবিতাটি আবৃত্তি করিলেই বোঝা যায় যে, শব্দ ও অর্থগত ভাবের সুর কোনখানে ছন্দের বাঁধনে ব্যাহত

হয় নাই। বিস্ময়, ভয়, ভক্তি, সাহস, অটল বিশ্বাস এবং সর্বোপরি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটা ভীষণ গম্ভীর অতিপ্রাকৃত কল্পনার সুর, শব্দবিন্যাস ও ছন্দঝঙ্কারে মূর্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই শ্লোকে মিল, ভাবানুযায়ী শব্দবিন্যাস এবং গভীর গম্ভীর ধ্বনি, আকাশে ঘনায়মান মেঘপুঞ্জের প্রলয়-ডম্বরু-ধ্বনিকে পরাভূত করিয়াছে,—বিশেষ ঐ শেষ ছত্রের শেষ বাক্য- 'লা শারীক আল্লাহ' —যেমন মিল, তেমনি আশ্চর্য প্রয়োগ! ছন্দের অধীন হইয়া এবং চমৎকার মিলের সৃষ্টি করিয়া এই আরবী বাক্য যোজনা বাংলা কবিতায় কি অভিনব ধ্বনি-গাম্ভীর্য লাভ করিয়াছে।"

কবিতাটি সম্পর্কে কবি-সমালোচকের উক্তি এতটুকুও অতিশয় নয়। বস্তুতঃ কবিতাটি আপন স্বরূপ স্বাতন্ত্র্যে নজরুলের প্রথম যুগের সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে অনন্য হয়ে আছে।

'খেয়াপারের তরুণী' মুদ্রিত হয়েছিল ১ম বর্ষের ৪র্থ সংখ্যা মোতাবেক ১৩২৭ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'মোসলেম ভারতে'। পরে কবিতাটি 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে।

॥ গুবাক তরুর সারি ॥

নজরুল-সাহিত্যের একটি মূল্যবান অংশ রচিত হ'য়েছে গিরি-নদী সমাকীর্ণ চট্টগ্রামের কোলে বসে। চট্টগ্রামে কবি এসেছিলেন দু'বার —প্রতিবারই তিনি অজস্র গান ও কবিতা রচনা করেছেন। 'সিন্ধু' (তিন তরঙ্গ), 'কর্ণফুলী', 'সাম্পানের গান', 'অনামিকা', 'গোপন প্রিয়া' ইত্যাদি "সিন্ধু-হিন্দোল" কাব্য গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি এখানেই রচিত।

চট্টগ্রামের নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কবিকে বিশেষ রূপে আকৃষ্ট করেছিল। পর্বতের শ্যামল সৌন্দর্য এবং নদীর স্নিগ্ধ জলধারা

কবিকে নিবিড় ভাবে আকর্ষণ করতো। কখনো তিনি সবান্ধবে চলেছেন পর্বতারোহণে, কখনো তিনি বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ভেসেছেন দূর নদীর বুকে ছোট্ট নায়ে—সংগে চলেছে সাম্পানের গান। আকাশে সঞ্চারমান মেঘকুঞ্জের বুকে আসন্ন সন্ধ্যার আমেজ ঘনীভূত হ'য়ে উঠছে—কবির নৌকা চলার তখনো বিরাম নেই। দামাল ছেলের মত তিনি দূর দূর কত দূরে ভেসে চলেছেন। সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে আবার বসল আড্ডা—গল্প এবং গানের মজলিস। মজলিসে কবি একাই একশ'—তিনি একাই গান এবং গেয়ে সুরসুধায় সবাইকে মাতাল করেছেন। সবাই গানে-গল্পে বিভোর হ'য়ে থাকেন, তন্ময় হ'য়ে যান। এমন করে মাতা এবং মাতানোর দুর্লভ ক্ষমতা আর কারো মধ্যে দেখা যায় নি। কী বিপুল প্রাণ-প্রাচুর্য নিয়ে যে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন!

এক সময় এই আড্ডা ভেঙ্গে যেত। রাত তখন গভীর। খাওয়া-দাওয়ার পাঠ শেষ করে এবার কবি যেন ধ্যানে বসতেন। এখন তিনি সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ—দিবসের সে প্রাণ-চাঞ্চল্য আর উন্মাদনা নেই, কবি এখন ধ্যানা-মৌনী, তপস্যায় নিমগ্ন। নিস্তব্ধ গভীর নিশীথ, চারিদিকের কোলাহল একেবারে স্তিমিত, শিথিল বিশ্ব চরাচরে রাত্রির সম্মোহন মায়া ঘন হয়ে নেমে এসেছে—মিটিমিটি প্রদীপের আলোর নিকটে বসলেন কবি, মন তাঁর সৃষ্টিব্যাকুল! কোলাহল স্তিমিত নিশীথের কথা স্মরণ করে তিনি লিখছেন 'স্তব্ধরাতে':

> 'থেমে গেছে রজনীর গীত কোলাহল,
> ওরে মোর সাথী আঁখিজল
> এইবার তুই নেমে আয়
> অতন্দ্র এ নয়ন পাতায়।'

চট্টগ্রামে কবি যতবারই গেছেন প্রতিবারই তিনি উঠেছেন বাহার-নাহারদের বাসায়। কবি যে ঘরে থাকতেন সেই ঘরের জানালার

পাশে পুকুরের কিনারায় ছিল ন'টি সুপারি গাছ। প্রতিদিনই গাছগুলিকে দেখতেন কবি, চাঁদের আলোয় স্নাত হ'য়ে মৃদু হাওয়ায় যখন তাদের চিকন পাতাগুলি চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ত খুব ভাল লাগত তাঁর। এমনি ভাবে প্রতিদিন নিরালায় দেখা-সাক্ষাতের মাধ্যমে এই 'নিশীথ জাগা সাথীদের' সঙ্গে কবির যেন একটা আত্মীয়তা গড়ে ওঠে। কিন্তু এদের ছেড়ে তো একদিন চলে আস্‌তে হবে, সে কথা স্মরণ করে তাঁর মন বেদনা বিহ্বল হ'য়ে ওঠে। সামান্য অবলম্বন, মাত্র ক'টা সুপারি গাছ, অথচ অবলম্বন করে কবি লিখলেন একটি মনোরম কবিতা—"বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি।' আসন্ন বিদায়ের ক্রমঃসঞ্চারমান বিষণ্ণতা কবিতাটির প্রতি পংক্তিতে ঘনীভূত হ'য়ে উঠেছে :

'বিদায় হে মোর বাতায়ন পাশে
নিশীথ জাগার সাথী,
ওগো বন্ধুরা পাণ্ডুর হ'য়ে
এল বিদায়ের রাতি!
আজ হ'তে হ'ল বন্ধ আমার
জানালার ঝিলিমিলি,
আজ হ'তে হ'ল বন্ধ মোদের
আলাপন নিরিবিলি।'

কবিতাটি ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী তারিখে রচিত এবং এটি ৩য় বর্ষ ১২শ সংখ্যা মোতাবেক ১৩৩৫ সালের চৈত্র সংখ্যা "কালি কলমে" মুদ্রিত হয়। পরে 'চক্রবাক' এবং 'সঞ্চিতা', কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

॥ শিশু যাদুকর ॥

সুপারি গাছকে নিয়ে কবি কবিতা লেখা সমাপ্ত করেছেন। যথা সময়ে সেটি বাহার-নাহার পরিবারের সকলের চোখে পড়েছে। এর দু' একদিন পরে কবির কাছে বসে গল্প করছিলেন বেগম শামসুন্নাহারের আম্মা—সঙ্গে ছিল তাঁর তিন মাসের দৌহিত্র, বেগম শামসুন্নাহারের শিশুপুত্র। বাচ্চা ছেলেটিকে কবি খুব আদর করতেন, তিনি যেন তাঁর সঙ্গে ছেলেমানুষী খেলায় মশগুল হয়ে যেতেন মাঝে মাঝে। শামসুন্নাহারের মা কবির সঙ্গে অনেক কথাই বলতেন, কিন্তু সেদিন বল্লেন অন্য কথা। অতি কৌশলে এই শিশুকে নিয়ে একটি কবিতা লেখার কথা উল্লেখ করে তিনি শুধালেন, 'আচ্ছা জানালার ধারের ঐ সুপারি গাছগুলো দেখতে সুন্দর, না এই শিশুটি ?'

কবি সঙ্গে সঙ্গে হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন আম্মা আমাদের থেকে অনেক বেশী বুদ্ধি রাখেন। আচ্ছা—

কবি কথা রাখলেন। পরের দিন সকালে উঠে খাতা খুলতেই চোখে পড়ল সদ্য সমাপ্ত একটি কবিতা 'শিশু যাদুকর' :

'পার হ'য়ে কত নদী, কত সে সাগর
এই পারে এলি তুই, শিশু যাদুকর।'

কবিতাটির একাংশে সরাসরি নাহারের নামোল্লেখ আছে:

'লায়লার পারে, দূর নাহারের কোল
আলো করি এ'লি কেরে পুষ্প বিভোল।

এই শিশুটির নামকরণও করেছিলেন কবি। ডাক নাম দিয়েছিলেন 'শেলী' আর ভাল নাম রেখেছিলেন 'সোহরাব'। দু'টি

নামই বীরের নাম, শেলী এবং সোহরাব দু'জনেই অকুতোভয় ছিলেন। 'রুস্তম-সোহরাব' উপাখ্যানে সোহরাবের যে বীরত্বব্যাঞ্জক চরিত্র ফুটেছে তা'তে এ নামটি কবির খুবই পছন্দ ছিল। কিন্তু এই নামটির সঙ্গে একটি সকরুণ পরিণতি জড়িয়ে থাকায় ধীরে ধীরে কবি-প্রদত্ত এই নামটি চাপা পড়ে যায়। কিন্তু সে অন্য ইতিহাস। কবি যে শিশুটির নামকরণ করেছিলেন তারও উল্লেখ কবিতাটির মধ্যে রয়েছে:

'পেলি হেথা ঠোঁট-ভরা মধু চুম্বন
আমি দিনু হাতে তোর—
নামের কাঁকন।

যাদু মোর কি দিবে
এ ভিখারী আশিষ,
সুন্দর হ'য়ে যেন ধরায় বাঁচিস।'

কবিতাটি সম্ভবতঃ কবির কোনো কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়নি। বেগম শামসুন্নাহার মাহ্‌মুদের "নজরুলকে যেমন দেখেছি" গ্রন্থের মধ্যে পূর্ণ কবিতাটির উদ্ধৃতি রয়েছে।

॥ পথের দিশা ॥

১৯২৬ সালে ২রা এপ্রিলে বাংলার আকাশে এক মহাদুর্যোগ ঘনিয়ে উঠেছিল। ঘটনা সামান্য কিন্তু তা'তে শুরু হলো দাঙ্গা—সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। রাজরাজেশ্বরীর মিছিল উপলক্ষে এই ঘৃণ্যতম দাঙ্গার সূত্রপাত। দেখ্‌তে দেখ্‌তে কলকাতা ছাড়িয়ে নিখিল বাংলা

দেশে এই কলুষিত আবহাওয়া ছড়িয়ে পড়ল। হিন্দু-মুসলিম বুদ্ধি সাময়িক ভাবে জ্ঞানশূন্য হ'য়ে প'ড়েছিল। পারস্পরিক খুন-খারাবি দেখে নজরুল মনে নিদারুণ আঘাত পেয়েছিলেন। দাঙ্গার বিষাক্ত পরিবেশে তাঁর মন ও আত্মা হাঁপিয়ে উঠেছিল। তিনি এই ঘৃণ্য আচরণের বিরুদ্ধে দৃঢ়হস্তে কলম ধরলেন।

এই সময় শ্রীশচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় একটি পত্রিকা বের করেছিলেন —নাম দিয়েছিলেন "অগ্রদূত"। এই "অগ্রদূত" পত্রিকাটির জন্য একটি লেখা চেয়েছিলেন কবির কাছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রেশ তখনো মিলিয়ে যায়নি। এই জঘন্য মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে তিনি লিখলেন একটি কবিতা 'পথের দিশা'। 'পথের দিশা'য় তিনি কেবল "অগ্রদূতে"র পথের সন্ধান বলে দেননি—গুণ্ডাবাজির পাপ-পঙ্কিলতায় যাদের আত্মা পূতিগন্ধসর্বস্ব হ'য়ে উঠেছে তা'দের সকলেরই পথের সন্ধান ছিল এ কবিতায়। তিনি লিখলেন :

চারিদিকের এই গুণ্ডা এবং
বদমায়েসির আখড়া দিয়ে
রে অগ্রদূত, চলতে কি তুই
পারবি আপন প্রাণ বাঁচিয়ে?

পারবি যেতে ভেদ করে এই
বক্র পথের চক্রব্যূহ?
উঠবি কি তুই পাষাণ ফুঁড়ে
বনস্পতি মহীরুহ?

আজকে প্রাণের গো-ভাগাড়ে
উড়ছে শুধু চিল শকুনি,
এর মাঝে তুই আলোক-শিশু
কোন অভিযান করবি, শুনি?
ইত্যাদি।

কবিতাটি প্রথমে "অগ্রদূত" পত্রিকায় প্রকাশিত হ'য়েছিল। এবং পরে কবির 'ফণি-মনসা' কাব্যগ্রন্থের প্রথম সংস্করণে সংকলিত হয়। অবশ্য দ্বিতীয় সংস্করণে 'পথের দিশা' কবিতাটিকে 'ফণি-মনসা' হ'তে বাদ দেওয়া হ'য়েছে। এখন কবিতাটি 'সঞ্চিতা'র অন্তর্ভুক্ত।

॥ খোশ আমদেদ ॥

ঢাকার মুসলিম হ'লে কামাল আতাতুর্ক সম্পর্কে একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় সমালোচক কাজী আবদুল ওদুদ। এই প্রবন্ধের এক স্থানে 'বুদ্ধির মুক্তি' কথাটি ছিল। এই 'বুদ্ধির মুক্তি' কথাটিকে মূল মন্ত্র করে জনাব আবুল হোসেন সাহেব গঠন করলেন 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'। মহা উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হ'লো। এই অনুষ্ঠানে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করা হ'য়েছিল। নিমন্ত্রণ-পত্র গেল কবি কাজী নজরুলের নিকটেও। কবি থাকেন তখন কলকাতায়। নির্দিষ্ট দিনে তিনি যাত্রা শুরু করলেন। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন-গীতি গাওয়ার ভার অর্পিত হ'য়েছিল তাঁর ওপর। নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে তিনি সভায় চলেছেন কিন্তু উদ্বোধন-গীতি কই? কী গাইবেন তিনি সভায়?

স্টীমারে যেতে যেতে তিনি লিখলেন একটি সুন্দর কবিতা—মুসলিম

সাহিত্য সমাজের প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন-গীতি, নাম দিলেন 'খোশ আমদেদ' :

আসিলি কে গো অতিথি উড়ায়ে
নিশান সোনালী,
ও চরণ ছুঁই কেমনে
দুই হাতে মাখা যে কালি ?
এল কি অলক-পথ বেয়ে
তরুণ হারুণ আল-রুশীদ
এল কি আল্ বেরুণী হাফেজ
কায়েস গাজ্জালী।...
ইত্যাদি।

কবিতাটি 'সওগাতে' মুদ্রিত (এবং সম্ভবতঃ 'শিখা'-তেও) হ'য়েছিল। পরে 'নজরুল-গীতিকা'য় সংকলিত হ'য়েছে।

॥ রবিহারা ॥

১৩৪৮ সালের শ্রাবণ মাস। কবিগুরুর অবস্থা গুরুতর। মাঝে মাঝে সংজ্ঞাহীন হ'য়ে পড়ছেন, মাঝে মাঝে ক্ষীণ কণ্ঠে প্রলাপ বকছেন। যে কোন মুহূর্তে চরম অবস্থা ঘটে যেতে পারে। বাইশে শ্রাবণ সকাল হ'তেই অবস্থা একেবারেই আশঙ্কাজনক হয়ে পড়ল।

নিখিল ভারতবর্ষ যেন কবিগুরুর অবস্থা শোনার জন্যে কান পেতে রয়েছে।

দু' চার মিনিট অন্তর অন্তর কবির বর্তমান অবস্থা বেতার মারফত দেশবাসীকে জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কবির বাসগৃহে বেতারের একটা সাময়িক অফিস বসেছে। অফিস বলতে একটি টেলিফোন, একজন

লোক আর একটি বেয়ারা। বেতারের পক্ষ থেকে কবিগুরুর বাড়ীতে রয়েছেন শ্রীনলিনীকান্ত সরকার মহাশয়। তিনি কবির সংবাদ দু' চার মিনিট অন্তর অন্তর টেলিফোনযোগে বেতার কর্তৃপক্ষকে জানাচ্ছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বেতারে সেটি বিঘোষিত হচ্ছে। মুহুর্মুহুঃ সংবাদ পেয়ে দেশবাসী স্পষ্ট বুঝতে পারছে বিশ্বকবির অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় পথে এগিয়ে চলেছে, উন্নতির কোন লক্ষণ নেই। দুপুর ১২টা ১১ মিনিটের সময় এল চরম সংবাদ, কবিগুরু আর নেই। বেতারে তখন পাশ্চাত্ত্য সংগীতের রেকর্ড বাজছিল এবং সে রেকর্ড-গুলির পরিচিতি ঘোষণা করছিলেন একজন ইংরেজ। মাইকে মুখ দিয়ে তিনি কী যেন বলছিলেন, হঠাৎ সেখানে এসে হাজির হলেন শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়। তিনি সুইচ অফ করে দিয়ে অতর্কিতে সাহেবের মুখ থেকে মাইকটা কেড়ে নিলেন। সাহেব তো হতভম্ব। তারপর অশ্রুবিগলিত কণ্ঠে কবিগুরুর মৃত্যুসংবাদ প্রচার করলেন সুরেশবাবু। কবির মৃত্যুর পর বেতারে কী প্রচার করা হ'বে তা পূর্বাহ্ণে লিখে রাখা হয়েছিল। ইংরাজী অংশটি প্রচার করলেন উক্ত ইংরেজ। ঘোষণার পর্ব সমাপ্ত করে স্টুডিও থেকে দ্রুত বার হ'য়ে এলেন সুরেশবাবু। এবার তাঁর কাজ হলো লেখক-লেখিকাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা। তিনি ফোনে সর্বপ্রথম যোগাযোগ করলেন কবি নজরুলের সঙ্গে। কবিকে তিনি জানালেন যে কবি রাজের মৃত্যু উপলক্ষে সন্ধ্যায় যে বিশেষ অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হবে তার জন্য কবিতা চাই। অবশ্য এ অনুরোধ তিনি আরো অনেকের নিকট জানিয়েছিলেন। গুরুদেবের মহাপ্রয়াণের কথা শুনে কবি বিশেষরূপে বিচলিত হয়ে পড়লেন। সেই মানসিক চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা নিয়ে তিনি লিখলেন একটি দীর্ঘ কবিতা…'রবিহারা' :

কবিতাটি বেতার মারফত প্রচারিত হয়েছিল। কেবল তাই নয়, এই দীর্ঘ কবিতাটিকে তিনি নিজ কণ্ঠে হিজ মাস্টার্স ভয়েসে রেকর্ড

করেছেন। রেকর্ড নম্বর এন-২৭১৮৮১। উৎসাহী শ্রোতারা রেকর্ডটি সংগ্রহ করে শুনতে পারেন।

কবিতাটি সর্বপ্রথম মুদ্রিত হয় ১৩৪৮ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'সওগাতে'। এতকাল কবিতাটি কবির কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়নি, সম্প্রতি আবদুল কাদির সম্পাদিত 'নজরুল রচনা সম্ভারে' কবিতাটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

॥ বিদায় ॥

কবিগুরুর তিরোধান উপলক্ষে নজরুল আর একটি গান লিখেছিলেন। মৃত্যুর অল্পকাল পরেই কবিতাটি রচিত হয়েছিল। কবিতাটির প্রতি পংক্তিতে ভক্তমনের নম্র-কোমল প্রার্থনা গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছে। গানটি এইচ. এম. ভি-তে রেকর্ড করেন স্বনামধন্য গায়িকা যুথিকা রায়। আমরা 'বিদায়' শীর্ষক এই গানটির মাত্র একটি স্তবক উদ্ধৃত করলাম:

ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবিরে
জাগায়ো না, জাগায়ো না,
সারা জীবন যে আলো দিল
ডেকে তাঁর ঘুম ভাঙ্গায়ো না।
(যে) সহস্র করে রূপ রস দিয়া
জননীর কোলে পড়িল ঢলিয়া
তাঁহার শ্রান্তি-চন্দন দাও,
ক্রন্দনে রাঙায়ো না—
ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবিরে
জাগায়ো না, জাগায়ো না।...

আমরা যতদূর জানি গানখানি আজ পর্যন্ত কবির কোনো গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় নি।

॥ অশ্রু পুষ্পাঞ্জলি ॥

রবীন্দ্রনাথকে উপলক্ষ্য করে নজরুল যতগুলি কবিতা লিখেছিলেন তাদের মধ্যে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য কবিতা 'অশ্রু পুষ্পাঞ্জলি।' রবীন্দ্র-নজরুলের সম্পর্ক নির্ণয়ে কবিতাটির একটি অসীম গুরুত্ব রয়েছে। কোনো কবিতায় কবি এত স্পষ্ট করে উভয়ের মধ্যকার হৃদ্য-সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন নি। কবিতাটি রচনার পিছনের ইতিহাস সামান্য। বিশ্বকবির অশীতিবার্ষিকী জন্মোৎসব উপলক্ষে নজরুল তাঁর গুরুদেবের পায়ে অঞ্জলি প্রদান করেছেন—অশ্রুসিক্ত পুষ্পের অঞ্জলি, গুরুর পায়ে ভক্তের দীন প্রণাম।

নজরুল তখন হুগলী জেলে—রবীন্দ্রনাথ কবির নামে উৎসর্গ করেছেন 'বসন্ত' নাটিকা। 'অশ্রু পুষ্পাঞ্জলি'তে সেই উৎসর্গীকরণের উল্লেখ রয়েছে :

"হে সুন্দর বহ্নি-দগ্ধ মোর বুকে তাই
দিয়াছিলে 'বসন্তের' পুষ্পিত মালিকা।"

'বিদ্রোহী' কবিতা প্রকাশের পর কথা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে তরবারি দিয়ে দাড়ি চাঁচার কথা বলেছিলেন এবং এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নানাজনে নানা কথা বলে থাকেন। সাধারণের বিশ্বাস এই যে, উপরোক্ত মন্তব্যের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে উপহাস করেছিলেন। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ অসত্য। প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে বলেছিলেন যে, তিনি যেন ক্ষণিকের মোহে জনগণের হাততালির লোভ না করে চিরন্তন সাহিত্য সৃষ্টির জন্যে প্রয়াসী হন। নজরুলের সাধনা হোক পুণ্যের সাধনা, অখণ্ডের সাধনা। দাড়ি চাঁচার জন্যে ক্ষুর-ই যথেষ্ট—তার জন্যে তরবারির প্রয়োজন হয়

না। তরবারির দায়িত্ব আরো বৃহত্তর ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত। সুতরাং কবিগুরুর অভিযোগ ছিল: 'তরবারি দিয়ে দাড়ি চাঁচা ঠিক নয় অর্থাৎ নজরুলের মধ্যে যে মহৎ কবি প্রতিভা রয়েছে তা' কেবল ভাষণে পর্যবসিত হবে কেন, তা' দিয়ে সৃষ্টি হোক মহৎ সাহিত্যের, চিরন্তন ভাবধারার।

কবিতাটির মধ্যে দাড়ি চাঁচার কথা এই ভাবে উল্লেখিত হ'য়েছে:

"মনে পড়ে? বলেছিলে হেসে একদিন
তরবারি দিয়ে তুমি চাঁচিতেছ দাড়ি!
যে জ্যোতি করিতে পারে জ্যোতির্ময় ধরা
সে জ্যোতিরে অগ্নি করি হ'লে পুচ্ছ-কেতু?

এর পরই কবি সেই চিরন্তনের সাধনার কথা বলেছেন:

"হাসিয়া কহিলে পরে...মধুর ভৃঙ্গারে কেন কর মদ্যপান?"

এ ছাড়াও কবিতাটির মধ্যে নজরুলের মানস পরিবর্তনের ইতিহাসও রয়েছে। তিনি বিদ্রোহাত্মক মনোভঙ্গী ছেড়ে কেমন করে ধীরে ধীরে প্রেমের সুকোমল ক্ষেত্রে নেমে এলেন তার বর্ণনা সুন্দর হ'য়ে কবিতাটির মধ্যে ফুটেছে। রবীন্দ্রনাথের ইঙ্গিতে কবির যে এই মানস পরিবর্তন সূচিত হ'য়েছে এ কথা তিনি স্পষ্ট করে স্বীকার করেছেন:'

অগ্নিগিরি গিরি-মল্লিকার
ফুলে ফুলে
ছেয়ে গেছে! জুড়ায়েছে সব
দাহ জ্বালা!
আমার হাতের সেই খর-তরবারি
হইয়াছে খরতর যমুনারি বারি!...'
অভিনন্দনের মদ চন্দনিত মধু
হইয়াছে, হে সুন্দর, তব আশীর্বাদে!"

কবিগুরুর অশীতিবার্ষিক জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে কবিতাটি রচিত হলেও উভয় কবির হৃদ্য-সম্পর্কটি যে কবিতা রচনার মূল উৎস তা বলাই বাহুল্য। নানা কারণে কবিতাটির একটি সবিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

কবিতাটি কবির "নতুন চাঁদ" গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

॥ ঝড় ॥

নজরুল থাকেন তখন হুগলীতে। সংসারে তখন চরম দারিদ্র্যের হানা। এমন অবস্থায় কবি রোগে আক্রান্ত হলেন। সকল দিক থেকেই তাঁর সংসারে যেন দুর্যোগের ঝড় উঠেছে। চিন্তাক্লিষ্ট কবির মানসিক অবস্থা তখন বিপর্যস্ত। এই সময় একদিন সত্য সত্যই ঝড় উঠল। প্রচণ্ড পশ্চিমা ঝড়, এল বৃক্ষ শাখা ভেঙে সারা পৃথিবী কাঁপিয়ে। কবি শেলীও একদিন পশ্চিমা ঝড়কে উপলব্ধি করে লিখেছিলেন "odd to the west wind." রবীন্দ্রনাথও ত্রিশে চৈত্রের 'সর্বধ্বংসী' ঝড়কে উপলক্ষ্য করে লিখেছিলেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'বর্ষশেষ।' নজরুল রোগগ্রস্ত নির্জীব অবস্থায় বিছানায় শুয়ে শুয়ে পশ্চিমা ঝড়ের প্রলয়ঙ্করী রূপ দেখলেন এবং তিনিও ভাবাবেগে অনুপ্রাণিত হয়ে সেই রোগ-জীর্ণ অবস্থায় লিখলেন 'ঝড়—পশ্চিম তরঙ্গ' কবিতাটি। কবিতাটি অবশ্য 'odd to the west wind' অথবা 'বর্ষশেষে'র মত বলিষ্ঠ ও নিটোল হয়ে ওঠেনি তথাপি শব্দ উপমা উৎপ্রেক্ষায় তিনি পশ্চিমা ঝড়ের যে স্বরূপ উদ্ঘাটিত করেছেন তা কম চিত্তাকর্ষক নয়। সমগ্র কবিতাটিতে কবির তন্মুহূর্তের মানসিক চাঞ্চল্যও ধরা পড়েছে। বহুল পঠিত কবিতাটির কোন অংশ আমি আর উদ্ধৃত করলাম না। কবিতাটি কবির অমর কাব্যগ্রন্থ "বিষের বাঁশী'র সর্বশেষ কবিতা রূপে গ্রথিত হয়েছে।

॥ যা শত্রু পরে পরে ॥

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে রাজরাজেশ্বরী মিছিল উপলক্ষে কলকাতার বুকে যে ভ্রাতৃক্ষয়ী দাঙ্গার সূচনা হয়েছিল তাতে কবি বিশেষরূপে বিচলিত হয়ে পড়েন। কিন্তু এই দাঙ্গার পিছনে যে ইংরেজদের অদৃশ্য হস্ত কাজ করছে তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। আসলে হিন্দু-মুসলিম সংঘবদ্ধ হয়ে যে ভাবে স্বাধীনতার জন্যে চাপ দিতে শুরু করেছে তাতে ইংরেজ সরকার কিছুটা বিচলিত না হয়ে পারেনি। এ ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে দাঙ্গা বিশেষ রূপে পঙ্গু করে দিয়েছিল—ফলে চিরবাঞ্ছিত স্বাধীনতা অর্জন বেশ কিছুটা পিছিয়ে গেল। কিন্তু ঠিক এই সময় ইংরেজের ঘর সামলানো কঠিন হয়ে পড়ল। বৃটেনে ব্যাপক ভাবে শুরু হলো সাধারণ ধর্মঘট। ইংরেজের সমগ্র শক্তি সে দিকে নিয়োজিত হলো। কবির কাছে এটা একটা সুবর্ণ সুযোগ বলে মনে হ'লো। তিনি জাতীয় কবির পটভূমিকায় এসে দাঁড়ালেন। তিনি হিন্দু মুসলিম উভয়কে সম্মিলিত হয়ে পরমাকাঙ্ক্ষ স্বাধীনতা অর্জনে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে আহ্বান জানালেন। তাঁর মনে হলো দাঙ্গায নিজেদের মধ্যে যে ভুল বোঝাবুঝি ও শত্রুতার সৃষ্টি হয়েছে তার এবার অবসান ঘটবে এবং পরের (বৃটিশের) উপর দিয়ে এ শত্রুতা নষ্ট হবে, নিজেরা আবার প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। বৃটেনের সাধারণ ধর্মঘট এবং হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার কথা স্মরণ করে কবি লিখলেন 'যা শত্রু পরে পরে'। কবিতাটির আমরা মাত্র একটি স্তবক উদ্ধৃত করলাম:

ঘর সাম্‌লে নে এই বেলা তোরা
ওরে ও হিন্দু মুসলেমিন!
আল্লা ও হরি পালিয়ে যাবে না,
সুযোগ পালালে মেলা কঠিন।

ধর্ম কলহ রাগ দু'দিন।
নখ ও দন্ত থাকুক বাঁচিয়া,
গণ্ডুষ ফের করিবি কাঁচিয়া,
আসিবে না ফিরে এই সুদিন।
বদনা-গাড়ুতে কেন ঠোকাঠুকি
কাচা কোঁচা টেনে শক্তি ক্ষীণ,
সিংহ যখন পঙ্ক-লীন!"...

কবিতাটি ১৩৩৩ সালের আশ্বিন মাসে বর্ধমান হ'তে প্রকাশিত 'শক্তি' পত্রিকায় প্রথম মুদ্রিত হয়। পরে এটি ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর মোতাবেক ১৩৩৩ সালের ২৫শে আশ্বিনের "গণ-বাণী"তে পুনর্মুদ্রিত হ'য়েছিল। কবির "ফণি-মনসা" কাব্য-গ্রন্থে সম্পূর্ণ কবিতাটি সংকলিত হয়েছে।

॥ হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ ॥

১৯২৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে উপলক্ষ্য করে নজরুল আরো একটি বলিষ্ঠ কবিতা লিখেছিলেন। হাল্‌কা রসিকতার মাধ্যমে কবি যেন কবিতাটির মধ্যে দুর্জয় শপথ বাক্য উচ্চারণ করেছেন। ইংরেজ-শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সময় হিন্দু মুসলিম মৃত, শক্তিহীন। তখন তাদের স্থবিরত্বে পেয়ে বসে। কিন্তু যখন ধর্মীয় কলহে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত হয়, মৃতশরীরে যেন অপরাজেয় শক্তির আবির্ভাব ঘটে—একদিকে জাগে অর্জুন অন্যদিকে বীর খালেদ। আত্মধ্বংসের এই কলঙ্কিত চিত্র কবি 'হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ' কবিতায় আপাততঃ রসিকতার মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন:

"মাভৈঃ! মাভৈঃ! এতদিনে—
বুঝি ভারতে জাগিল প্রাণ,
সজীব হইয়া উঠিয়াছে আজ—
শ্মশান গোরস্থান।
ছিল যারা চির-মরণ আহত,
উঠিয়াছে জাগি ব্যথা-জাগ্রত,
খালেদ আবার ধরিয়াছে অসি,
অর্জুন ছোঁড়ে বাণ।
জেগেছে ভারত, ধরিয়াছে লাঠি
হিন্দু...মুসলমান।"

কবিতাটি প্রথমে "ফণি মনসা"র প্রথম সংস্করণে সংযোজিত হ'য়েছিল কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে বাদ দেওয়া হ'য়েছে। বর্তমানে কবিতাটি "সঞ্চিতা"য় গ্রথিত হ'য়েছে।

॥ আগমনী ॥

পরিধানে যোধপুরী ব্রিচেস, গায়ে ময়ূরকণ্ঠী কোট, মাথায় টার্কিশ ফেজ—এই বিচিত্র পোশাকে সজ্জিত হয়ে সুবেদার শম্ভু রায়ের সঙ্গে হাবিলদার কবি এলেন বিদ্যার্থী ভবনে, মেছুয়া বাজারের ছাত্রদের এক মেসে। এই মেসেই থাকতেন সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। তিনি তখন মাসিক 'উপাসনা'র সম্পাদক।

ইতিপূর্বে 'মোসলেম ভারত'-এ নজরুলের কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। কবিতাগুলির সাবলীল প্রকাশ ভঙ্গীতে রসিক সমাজ আকৃষ্ট। সঙ্গে সঙ্গে এ প্রবাদ রটে গেল যে, নজরুল স্বভাব-কবি এবং হিন্দু শাস্ত্রে তাঁর বিশেষ অধিকার আছে। সাবিত্রীবাবুর সঙ্গে কবির প্রথম দিন হলো আলাপ, দ্বিতীয় দিন বসলো আড্ডা। অন্তরঙ্গ হতে খুব কম সময় লাগল। সেদিনও আড্ডা বসেছিল বিদ্যার্থীভবনে। হঠাৎ এক সময় সাবিত্রীবাবু প্রায় চ্যালেঞ্জ করে বসলেন কবির সঙ্গে। বললেন, তুমি তো শুনি রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী, গীতা ইত্যাদি নিয়ে বিষম পড়াশুনা করেছ আবার এ দিকে যুদ্ধ ফেরত। লেখ দেখি দেব-অসুরের যুদ্ধ নিয়ে একটা কবিতা—যুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া চাই কিন্তু। পূজো তো এসে গেল—ছাপিয়ে দিই কবিতাটা।

কবি সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। বললেন, পাবে কবিতা—পরশু।

আর একটু টিপ্পনি কাটলেন সাবিত্রীবাবু, পরশু! তা হলে কি রকম স্বভাবকবি তুমি?

আর কথা না বাড়িয়ে কবি নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন। পরদিন ভোরে আবার এলেন তিনি। কড়া নেড়ে তুললেন সাবিত্রীবাবুকে। পাণ্ডুলিপি ফেলে দিলেন সামনে, এই নাও তোমার দেব-অসুরের যুদ্ধ।

অপূর্ব কবিতা। দুর্গা আর অসুরের যুদ্ধের চিত্র ফুটেছে সর্বত্র। নাম দিয়েছেন 'আগমনী': "এ কি রণবাজা বাজে ঝন ঝন"...

সাহিত্যিক মহলে হুলস্থুল পড়ে গেল। 'আগমনী' কবিতার এ স্বাদ সকলের অজ্ঞাত ছিল। এ আর অশ্রুজলের সকাতর প্রার্থনা নয়—এ একাধারে দেবীর আগমনের আর বহ্নি উৎসবের কবিতা। কবিকে স্বাগত জানালেন সকলেই। বলাবাহুল্য এটাই হিন্দুদের দেবদেবী নিয়ে নজরুলের সর্বপ্রথম রচিত এবং প্রকাশিত কবিতা।

১৯২০ সালের জুন মোতাবেক ১৩২৭ সালের আষাঢ় সংখ্যা উপাসনায় কবিতাটি মুদ্রিত হয় এবং পরে "অগ্নিবীণা" কাব্যে সংকলিত হয়েছে।

॥ মোহান্তের মোহ অন্তের গান ॥

নজরুল তখন সবেমাত্র হিন্দুদের দেবদেবী নিয়ে কবিতা লিখতে শুরু করেছেন এমন সময় কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হলো এবং সেই সঙ্গে অন্তরঙ্গতা। মোহিতলাল কবিকে গভীর ভাবে ভালবেসেছিলেন কিন্তু দেবদেবী নিয়ে কবিতা লেখায় তিনি খুশী হতে পারেন নি। তিনি এ ধরনের কবিতা লিখতে কড়া ভাবে নিষেধ করেন। উপদেশের ছলে তিনি প্রায়ই বলতেন, "স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরোধর্মো ভয়াবহ।" তবু শেষ পর্যন্ত নজরুল মোহিতবাবুর উপদেশ রাখতে পারেন নি। তিনি অজস্র ধারায় হিন্দুদের দেবদেবী নিয়ে কবিতা লেখা শুরু করলেন। সুর একই—

বিদ্রোহ। যেখানে যত গোঁজামিল, জোড়াতালি আছে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। হিন্দু-মুসলিম এই শব্দ দু'টি বড় হয়ে তাঁর চোখের স্বচ্ছ দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন ক'রে দিতে পারে নি। ধর্ম তাঁর মানব-ধর্ম। এবং সেটাই তিনি সর্বত্র সকল ধর্মের মাঝে দেখতে চেয়েছেন। যেখানে পাননি সেখানেই বিদ্রোহ, সেখানেই আপসহীন সংগ্রামের সূচনা।

তারকেশ্বরে তখন মোহান্ত সতীশ গিরি বেশ আসর জাঁকিয়ে বসেছেন। তাঁর পাপ অনাচারে পীঠস্থান তখন পাপে পরিপূর্ণ। অথচ তিনিই সর্বেসর্বা। কিছু বলার উপায় নেই। মা-বোনেরা পূজো দিতে এসে ইজ্জত হারিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে যান। সকলেই দাঁড়িয়ে দেখে। দেশের সর্বত্র তখন ঐ মোহান্তের বিরুদ্ধে একটা চাপা অসন্তোষ ঘনীভূত হয়ে উঠছিল। এক তরুণী নববধূ চোখের জলে লজ্জা নিবারণ করতে করতে মন্দির থেকে উজ্জ্বল দিবালোকে বার হয়ে এলো, সেদিন এই উত্তেজনা চরমে উঠেছিল। সেই সকল তপ্ত অসন্তোষ ও উত্তেজনাকে একত্রিত করে নজরুল যেন তাতে আগুন ধরালেন। শুরু হলো তাঁর সংগ্রাম, ভণ্ডামির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। লিখলেন অনলবর্ষী কবিতা, "মোহান্তের মোহ-অন্তের গান" :

জাগো আজ দণ্ড হাতে চণ্ড বঙ্গবাসী।
ডুবালো পাপ চণ্ডাল তোদের বাংলা দেশের কাশী॥
মোহের যার নাইক অন্ত
পূজারী সেই মোহান্ত,
মা-বোনে সর্বস্বান্ত করছে দেবী-মূলে······
এই সব ধর্ম-ঘাগী
দেবতায় করছে দাগী,
মুখে কয় সর্বত্যাগী ভোগ নরকে বসে।
সে যে পাপের ঘণ্টা বাজায় পাপী
দেব-দেউলে পশে'।

আর ভক্ত তোরা পূজিস তারেই,

জোগাস খোরাক সেবা-দাসী।

জাগো বঙ্গবাসী ॥

কবিতাটিতে নজরুল সুর দিলেন। মিছিলের পুরোভাগে বেপরোয়া তরুণদের কণ্ঠে এই অনলবর্ষী কবিতাটি গান হ'য়ে ফিরতে লাগল। হাজার প্রচেষ্টায় যা হয়নি—তাই হলো। জনগণ উন্মত্ত হ'য়ে উঠল।

মোহান্তের মোহের অন্ত তো হয়েছিল এখন তাঁর প্রাণ বাঁচান দায় হলো। গভীর নিশীথে গুপ্তপথ দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার সকল সুযোগ বন্ধ হ'য়েছিল। তিনি তাঁরই অন্নে পুষ্ট লেঠেল সর্দার সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য নিজের গোপন কোষ্ঠে বন্দী হ'য়ে ছিলেন। পরে মামলায় তাঁর সুদীর্ঘ দশ বছরের জেল হয়। এ তথ্যগুলি শ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায় আমাকে সরবরাহ করেছেন।

এই দীর্ঘ কবিতাটি তাঁর—"ভাঙার গান" কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হ'য়েছে।

॥ অমর কানন ॥

আষাঢ় মাস, ১৩৩২ সাল।

কবি একসঙ্গে দু'টি নিমন্ত্রণ পেলেন। নিমন্ত্রণ দু'টি এসেছিল বাঁকুড়া জেলা থেকে। একটি বাঁকুড়ার যুব ও ছাত্র সমাজের তরফ থেকে, অন্যটি গঙ্গাজলঘাটি জাতীয় বিদ্যালয়ের উদ্বোধন উপলক্ষে কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে। দু'টি স্থানের দূরত্ব বেশী নয়। সুতরাং ঠিক হলো কবি প্রথমে যাবেন যুবক ও ছাত্রদের মিশনারী কলেজের বার্ষিক সভায়—পরে যাবেন গঙ্গাজলঘাটি জাতীয় বিদ্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। এই আদর্শ বিদ্যালয়টি 'অমর' নামে একজন স্বেচ্ছাসেবকের অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে উঠেছিল। তাই বিদ্যালয়টি 'অমর কানন' নামে

পরিচিত। বীর অমরের কীর্তিকলাপ শুনে কবি খুবই অনুপ্রাণিত এবং অভিভূত হ'য়ে পড়েন। এই বিদ্যালয়ের উদ্বোধন উপলক্ষে কবি 'অমর কানন' শীর্ষক গানটি রচনা করেন। গানটিতে বীর অমরের স্মরণীয় কীর্তিকলাপের সঙ্গে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর স্বপ্নের কথা বলিষ্ঠ ভাষায় আত্মপ্রকাশ করেছে।

গানটি পরে হিজ মাস্টার্স ভয়েসে রেকর্ড করা হয়েছিল। কবিতাটি কবির 'ছায়ানট' কাব্যগ্রন্থে গ্রথিত হ'য়েছে।

।। দলমাদল : শ্রমিকের গান ।।

'অমর কানন' উদ্বোধন করে কবি চললেন বাঁকুড়ার মিশনারী কলেজ প্রাঙ্গণে। এখানে অনুষ্ঠিত হ'লো বাঁকুড়ার যুব ও ছাত্র সম্মেলন। লোকে লোকারণ্য। বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মাধ্যমে সভার কার্যসূচী আরম্ভ হ'লো। বক্তৃতার শেষে কবি যখন গান ধরলেন তখন সভামঞ্চ যেন ফেটে পড়ছে। ছাত্র ও যুবক সম্প্রদায়ের মনে আগুন জ্বলে উঠলো। সকলে মনে প্রাণে যেন এটাই চাইছিল। কবির 'বিষের বাঁশী' এবং 'ভাঙার গান' তখন সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হ'য়েছিল। কিন্তু গানে গানে শ্রোতারা এমনই তন্ময় ও উত্তেজিত হয়েছিল যে সেই বাজেয়াপ্ত হওয়া বই তারা কিনতে শুরু করল। এ বই কেনা এবং কাছে রাখা বিপদের জেনেও সকলে আগ্রহভরে কিনতে লাগল। ঐ দিন প্রায় আট শত কপি বই বিক্রয় হ'য়েছিল। এই বই বিক্রয়ের ব্যাপারে শ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টা বিশেষ রূপে স্মরণযোগ্য।

অনতিদূরেই বিষ্ণুপুর। স্বাধীন রাজাদের আদিনিবাস। সম্মেলনের শেষে কবি দেখতে গেলেন বিষ্ণুপুর। এখানে তিনি স্বাধীন রাজাদের বাড়ী দেখলেন আর দেখলেন গড়। এই গড়ের নিকটেই ছিল বিষ্ণুপুর

রাজাদের কামান—বিরাট কামান। চলতি নাম 'দলমাদল', ভাল নাম দনুজমর্দন। এই বিপুলকায় কামানটিকে কবি স্বাধীনতার প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করেন। এমন কী তিনি আবেগভরে এটিকে আলিঙ্গনও করে ছিলেন। কামানের গায়ে হেলান দেওয়া কবির যে বিশেষ ছবিটি বিভিন্ন গ্রন্থে ও পত্র-পত্রিকায় মাঝে মাঝে দেখা যায় সেটি এই সময়ের তোলা। কবির 'চিত্তনামা' গ্রন্থে এই চিত্রটি বিশেষ ভাবে সংযোজিত হ'য়েছে। 'দলমাদল'কে নিয়ে কবি কোন পৃথক কবিতা লিখেছেন বলে জানা যায় নি, তবে তাঁর 'শ্রমিকের গানে' এর স্পষ্ট উল্লেখ আছে:

মোদের যা ছিল সব দিইছি ফুঁকে
এবার শেষ কপাল ঠুকে
পড়ব রুখে অত্যাচারীর বুকে রে।
আবার নূতন করে মল্লভূমে
গর্জাবে ভাই দলমাদল।
ধর হাতুড়ি তোল কাঁধে শাবল।

কবিতাটি কবির 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থে আছে।

।। বাংলার আজীজ ।।

১৯২৯ সালে কবি দ্বিতীয়বার এলেন চট্টগ্রামে। প্রথমবারে তিনি স্বদেশীগানে আর সভা-সমিতিতে সারা শহরকে মাতিয়ে দিয়ে এসেছিলেন। তাই এবারের আগমনেও পুলক-বন্যা বয়ে গেল। শুরু হ'লো গানের মজলিশ আর সভা-সমিতির অনুষ্ঠান। কখনো তিনি চলছেন চট্টগ্রামের এডুকেশন সোসাইটিতে বক্তৃতা করতে, কখনো চলেছেন চট্টলের শিক্ষাগুরু আবদুল আজীজের সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। অবসর প্রাপ্ত স্কুল-ইনস্পেক্টর মরহুম খানবাহাদুর

আবদুল আজীজ বি-এ সাহেবের স্মরণে তিনি লিখলেন "বাংলার আজীজ" কবিতাটি। সেই সমাধির পাশেই দাঁড়িয়ে আবেগ-ব্যাকুল কণ্ঠে তিনি গাইলেন :

পোহায়নি রাত, আজাজ তখনো
দেয়নি মুয়াজ্জিন,
মুসলমানের রাত্রি তখন,
আর সকলের দিন।
অঘোর ঘুমে ঘুমায় যখন বঙ্গ মুসলমান,
সবার আগে জাগলে তুমি গাইলে জাগার গান।
ফজর বেলার নজর ওগো উঠলে মিনার পর,
ঘুম টুটান আজান দিলে 'আল্লাহু আকবর।' ইত্যাদি।

খান বাহাদুর আবদুল আজীজ ছিলেন একজন সমাজহিতৈষী মানুষ। আজীবন সাধনার দ্বারা তিনি মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা করে গেছেন। তাঁর এই সুমহান প্রচেষ্টা কবির আনন্দের উৎস হ'তে পেরেছিল—'বাংলার আজীজের' প্রতি ছত্রে তাঁর এই মহৎ কর্মজীবন ও সাধনার কথাই ব্যক্ত হ'য়েছে।

কবির অল্পখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'সন্ধ্যা'য় কবিতাটি সংকলিত হ'য়েছে।

॥ 'পুণ্যময়ী'র আশীর্বাদ ॥

বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ যখন সাহিত্য সাধনা শুরু করেন তখন বাংলার নারীদের মধ্যে তো দূরের কথা পুরুষ সমাজেও এর বিশেষ প্রসার ঘটেনি। সমগ্র মুসলমান সমাজ তখন শিক্ষা-দীক্ষায় অনেক পিছিয়ে ছিল। আবার শিক্ষিতদের মধ্যে অনেকেই সাহিত্য সাধনাকে অবাস্তর ভাবতেন। এই তমসাচ্ছন্ন যুগে একজন নারীর পক্ষে সাহিত্য সাধনায় এগিয়ে আসা কম কথা নয়। নাহার সাহেবাকে একবার

এক চিঠিতে কবি লিখেছিলেন, "আমাদের দেশের মেয়েরা বড় হতভাগিনী। কত মেয়েকে দেখলাম কত প্রতিভা নিয়ে জন্মাতে, কিন্তু সব সম্ভাবনা তাদের শুকিয়ে গেল সমাজের প্রয়োজনের দাবীতে। ঘরের প্রয়োজন তাদের বন্দিনী করে রেখেছে।" কেবল এই ঘরের প্রয়োজনে নিঃশেষিত না হ'য়ে একজন মেয়েও যে সাহিত্যব্রতী হতে পেরেছে এতে কবি বিশেষ ভাবে আনন্দিত হন। তাই বেগম শামসুন্নাহারের বাংলা-রচনা 'পুণ্যময়ী'কে তিনি উদার আশীর্বাদে সিক্ত করলেন। তিনি লিখলেন :

"শত নিষেধের সিন্ধুর মাঝে অন্তরালের অন্তরীপ
তারি বুকে নারী, বসে আছে জ্বালি বিপদ বাতির সিন্ধুদীপ
...তুমি আলোকের তুমি সত্যের ধরার ধূলার তাজমহল
রৌদ্রতপ্ত আকাশের চোখে পরালে স্নিগ্ধ নীল-কাজল।
...বদ্ধ কারার প্রাকারে তুলেছ বন্দিনীদের জয়নিশান
অবরোধ রোধ করিয়াছে দেহ, পারেনি রুধিতে কণ্ঠে গান।

ইত্যাদি।

যতদূর জানি কবিতাটি কবির কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তবে সম্পূর্ণ কবিতাটি বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদের "নজরুলকে যেমন দেখেছি" গ্রন্থের শেষে মুদ্রিত হ'য়েছে।

॥ সাত ভাই চম্পা ॥

কবি তখন চট্টগ্রামে—বাহার-নাহারদের বাসায়।

একদিন কথা প্রসঙ্গে হবিবুল্লাহ বাহার বললেন, কবি ভাই বড়দের জন্যে তো অনেক কিছুই লিখলেন, এবার শিশুদের উপযোগী কিছু কবিতা লিখুন তো দেখি।

সেদিন রাতেই কবি সূচনা করলেন 'সাত ভাই চম্পা' শীর্ষক সুদীর্ঘ কবিতাটির। সাত ভাইয়ের প্রত্যেকের মধ্য দিয়ে এক একটি সংকল্পের প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন কবি। দু'টি কি তিনটি ভাইয়ের সংকল্পের কথাও তিনি লিখেছিলেন। যেমন এক ভাই হ'তে চেয়েছে 'আমি হব সকাল বেলার পাখী', অন্য ভাই 'আমি সাগর পাড়ি দেব আমি সওদাগর', আর এক ভাই 'আমি হব দিনের সহচর'। 'সাত ভাই চম্পা'র প্রত্যেকের মাঝে বিপুল রোম্যান্টিক এ্যাডভেঞ্চারের স্পর্শ রয়েছে। যৌবনবাদী কবি বুঝি শিশুদের মানস ভংগীতেও যৌবনধর্মের ছোঁয়া লাগাতে চেয়েছিলেন।

কবিতাটির সূচনা-কবিতাগুলি সত্যই সুন্দর হ'য়েছিল কিন্তু চট্টগ্রামে থাকাকালীন কবি হৈ-হুল্লোড়ে, সভা-সমিতিতে, গানে-জলসায় এমনই ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছিলেন যে সকল ভাইয়েব সংকল্পের কথা তাঁর পক্ষে আর লিখে ওঠা সম্ভব হ'য়নি। বাংলা শিশু-সাহিত্যের একটা বড় রকমের ক্ষতি হ'য়ে গেল।

কবির "সাত ভাই চম্পা" শিশু কাব্য-গ্রন্থে কবিতাগুলি মুদ্রিত হ'য়েছিল কিন্তু বইটি বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য॥

॥ কারার ঐ লৌহ কপাট ॥

যে গান গেয়ে স্বাধীনতা-কামী মানুষ একদিন পাগল হয়ে উঠত, বন্দীশালায় নির্জন জীবন যাপনের সময় যে গান অনেকের মনে অসীম উৎসাহ যুগিয়েছে, লক্ষ-কোটি মনে আগুন জ্বালিয়েছে— 'কারার ঐ লৌহ কপাট' হলো সেই গান, সেই জ্বলন্ত ঋক্-মন্ত্র। এ ভাঙার গান না গাওয়া হলে সে কালে কোন সভা সমিতিই জমে উটত না।

গানটির প্রতি পংক্তিতে বন্দীশালার বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। ফলে অনেকে ধারণা করেন যে, নজরুল জেলে

বসে গানটি রচনা করেছেন, এটি তাঁর বন্দীজীবনের রচনা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটি তা নয়। গানটি তাঁর জেলে যাবার বহু পূর্বে রচিত। "আনন্দময়ীর আগমনে" রচনার জন্যে নজরুলের জেল হয় ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারীতে, আর এ গানটি রচিত হয় ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের কবি যখন গানটি রচনা করেন তখন দেশের সর্বত্র নিরুপদ্রব অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল ঢেউ উঠেছিল। ইংরেজ সরকারও হয়ে উঠেছিল সজাগ, ফলে হাজার হাজার মুক্তিকামী মানুষ কারাবরণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। বন্দীশালাগুলি তখন পরিপূর্ণ। নামে নিরুপদ্রব আন্দোলন, আসলে মানুষের মনে তখন আগুন ধরেছে, রক্ত ফুটছে টগবগ করে। দেশের অবস্থা যখন এমন, শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ এলেন নজরুলের কাছে। লেখা চাই—'বাংলার কথা'র জন্যে চাই কবিতা। শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পরিবারের একজন। 'বাংলার কথা' ছিল দেশবন্ধুর কাগজ। নিরুপদ্রব আন্দোলনের অন্যতম হোতা দেশবন্ধু তখন বন্দী হয়ে জেলে রয়েছেন, পত্রিকার সম্পাদনা করেন তাঁর স্ত্রী সর্বজন শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী বাসন্তী দেবী। বাসন্তী দেবী নজরুলকে গভীরভাবে স্নেহ করতেন। জনাব মুজফ্‌ফর সাহেব জানাচ্ছেন যে: "বাংলার কথা'র জন্যে লেখা চাইতেই নজরুল লিখতে বসে গেলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই লেখা সমাপ্ত হলো।" লিখেছেন একটি গান, রক্তের আখরে লেখা গান, প্রতিটি ছত্র যেন আগুন হয়ে জ্বলছে। এই চিরস্মরণীয় গানের প্রথম ও শেষ স্তবক দু'টি এখানে উদ্ধৃত করলাম:

কারার ঐ লৌহ কপাট
ভেঙে ফেল কররে লোপাট
রক্ত জমাট
শিকল-পূজার পাষাণ বেদী!
ওরে ও তরুণ ঈশান!

বাজা তোর প্রলয় বিষাণ।
ধ্বংস নিশান
উড়ুক প্রাচী'র প্রাচীর ভেদি'!...
নাচে ঐ কাল বোশেখী,
কাটাবি কাল বসে কী?
দে রে দেখি
ভীম কারার ঐ ভিত্তি নাড়ি!

* * *

লাথি মার ভাঙরে তালা!
যত সব বন্দী-শালায়
আগুন জ্বালা,
আগুন জ্বালা, ফেল উপাড়ি!"

আলি আকবর খানের দ্বারা প্রভাবিত হ'য়ে কুমিল্লা থেকে কলিকাতায় আসার অল্প'দন পরেই এই অমর সংগীতটি রচনা করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে একটি মজার ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে।

নজরুল তখন হুগলী জেলে রয়েছে। খান মুহাম্মদ মইনুদ্দিন. মওলবী আফসার উদ্দীন, মোক্ষদাচরণ সামধ্যায়ী প্রভৃতি আরো অনেকেই সে সময় জেলে ছিলেন। বিকেলের দিকে বন্দীদের কিছুক্ষণের জন্য ছেড়ে দেওয়া হতো। সে সময় তাঁরা সকলেই জেল কম্পাউণ্ডে সমবেত হয়ে বসে গল্প-গান করতেন।

একদিন এক কাণ্ড ঘটল। কবির সাক্ষাতে বরিশালের কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক "কারার ঐ লোহ কপাট" গানটি গাইলো। গানটি শুনলে অনেকেই—সাধারণ কয়েদী এবং রাজবন্দী—সকলেই। সাধারণ কয়েদীরা রাজবন্দীদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতো। তাদের কেউ কেউ এমন ধারণাও করতো যে, যে-পথ দিয়ে রাজবন্দীরা যাতায়াত

করবে সেই পথের ধূলো মাখলে রোগ সেরে যাবে। জেলের মধ্যে রাজবন্দীদের প্রতি আনুগত্য ও ভক্তি ছিল অপরিসীম। কিন্তু সেদিন গানটি শোনার পর তারা সকলে যেন অন্য মানুষ হয়ে গেল, রাজবন্দীদের প্রতি এখন তাদের ঘৃণার অন্ত নেই। গানের শেষে আছে 'যত সব বন্দীশালা' পংক্তিটি—এবং ঐটিই হল তাদের ক্রোধের মূল উৎস। তাদের মধ্যে কে একজন তাদের বুঝিয়েছে যে, রাজবন্দীরা তাদের সকলকে 'শালা' বলে উপহাস করছে। সেই মহাপণ্ডিত 'বন্দী-শালার' অর্থ করেছে শ্যালক। তাই নিয়ে হুলস্থুল কাণ্ড। সাধারণ কয়েদীরা প্রতিবাদ জানিয়ে জেলারের নিকট বিহিত দাবী করল। শেষে জেলারের অনুরোধে রাজবন্দীদের তরফ থেকে মওলবী আফসার উদ্দীন এবং মোক্ষদাচরণ সামধ্যায়ী মহাশয় গিয়ে পংক্তিটির প্রকৃত অর্থ বুঝিয়ে দিতে তবে বিষয়টির একটা মীমাংসা হয়।

কবিতাটি 'বাংলার কথা'য় মুদ্রিত হয় এবং পরে কবির 'ভাঙার গান' কাব্যগ্রন্থের অন্যতম কবিতা হয়েছে।

॥ সুপার (জেলার) বন্দনা ॥

কবি এবং আরো অনেকে তখন হুগলী জেলে রয়েছেন। এদের প্রতি প্রথম প্রথম প্রচুর অত্যাচার হতো, কিন্তু শেষের দিকে অত্যাচারে কিছুটা ঢিলেমি এসেছিল। শাস্তিগ্রহণে বন্দীরা কাবু নন, স্বয়ং সুপারই কাবু হয়ে আসছেন ক্রমে। শেষে এমন হয়েছিল, বন্দীদের কেউ গুরুতর কিছু একটা না করলে তিনি আর কাউকে শাস্তি দিতেন না। কিন্তু বন্দীরা শাস্তি পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। সুতরাং কি ভাবে শাস্তি পাওয়া যায় সেটাই একটা মস্ত সমস্যা হ'য়ে দাঁড়াল। তখন সকলে এসে কবিকে ধরলেন, লিখে

দিন একটা গান—এমন গান যা শুনলে কর্তৃপক্ষের ঢিলেমি নষ্ট হয়ে।

কবি রাজি হ'লেন। কিন্তু কাগজ পাওয়া যাবে কোথায়? লেখার উপযুক্ত কাগজ যে নেই কোথাও। মোহম্মদ ওয়াজেদ আলী সাহেব বাইরে থেকে মঈনুদ্দিন সাহেবকে 'সাম্যবাদী' পত্রিকা পাঠাতেন। এই পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় অনেকখানি জায়গা খালি ছিল—কবি সেখানেই লিখছেন 'সুপার বন্দনা' গানটি। গানটি একটি প্যারডি। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গান 'তোমারই গেহে পালিছ স্নেহে তুমিই ধন্য ধন্য হে'র অনুকরণে কবি লিখলেন:

তোমারই জেলে পালিছ ঠেলে তুমি ধন্য ধন্য হে;
আমার এ গান তোমারি ধ্যান তুমি ধন্য ধন্য হে।
রেখেছ শান্ত্রী পাহারা দোরে
আঁধার কক্ষে জামাই আদরে
বেঁধেছ শিকল প্রণয়-ডোরে
তুমি ধন্য ধন্য হে।...

ইত্যাদি।

মহোৎসাহে বন্দীরা গানটি কেবল মুখস্থ করলেন না, সুর দিয়ে গেয়ে তালিম দিয়ে রাখলেন। তারপর দিন সকালে কখন সুপার জেল পরিদর্শনে আসবেন সাগ্রহে সকলে অপেক্ষা করতে লাগলেন। যথাসময়ে সুপার এলেন জেল পরিদর্শনে আর বন্দীরা অদ্ভুত মুখভঙ্গী করে সমস্বরে গানটি গেয়ে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। গান শুনে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন সুপার। তিনি বুঝেছিলেন, এ সব অপকীর্তি কে করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে কবির নিকটে এসে ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে বললেন, "ইউ ড্যাম, ফুল, সোয়াইন।" নজরুল এমন মধুর বাক্য শোনার জন্যে তৈরী হয়েছিলেন। তিনি ততোধিক জোরালো কণ্ঠে ঠিক একই কথাগুলো সশব্দে ছুঁড়ে মারলেন সাহেবের মুখে।

ফল অবশ্য পাওয়া গেল—সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত শাস্তি। জেলার অর্ডার দিলেন উচ্ছৃঙ্খল বন্দীদের সব সেলে আটক করতে। তাই করা হ'লো। কবি নিজের বিছানায় শুয়ে পড়েছিলেন কিন্তু তিনিও রেহাই পেলেন না। ওয়ার্ডারেরা তাঁকে পাঁজা কোলে করে তুলে নিয়ে সেলে বন্দী করে দিয়েছিল।

'সুপার বন্দনা' গানটি 'ভাঙার গানে'র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

॥ একটি অটোগ্রাফ ॥

সুরশিল্পী ধীরেন্দ্রনাথ দাসের সঙ্গে কবির একটি মধুর সম্পর্ক ছিল। এই সম্পর্ক নিবিড়তর হয়েছিল "হিজ মাস্টার্স ভয়েস কোম্পানি'তে কাজ করার সময়। কবির বহু গানে তিনি নিজে সুরারোপ করেছেন এবং সেই সুরে গানটিকে রেকর্ড করা হয়েছে। তা ছাড়া উভয়ে দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাসও করেছেন। তাই ধীরেনবাবুর কোন অনুরোধকে তিনি উপেক্ষা করেন নি। একদিন ধীরেনবাবু কবির নিকট একটি খাতা এগিয়ে দিয়ে বললেন, এতে এমন কিছু লিখে দিন যেটি কেবল একান্ত আমার নিজস্ব হয়ে থাকবে।

কবি মৃদু হাসলেন। তারপর খাতাখানা হাতে নিলেন। লিখলেন বার পংক্তির একটি অপূর্ব কবিতা :

> "অক্ষয় হোক তোমার রাঙা শুক্লা চতুর্দ্দশীর তিথি
> বিস্ময় লোক পার হয়ে যাও বাণীবনের লও অতিথি।
> যে সব দিয়ে তুমি চপল করলে আমার চিত্ত হরণ
> বৃন্দাবনের কিশোর রাখাল করুন তোমায় সেই সে প্রীতি।"...

কবিতাটি আজ পর্যন্ত কবির কোন কাব্যগ্রন্থে সঙ্কলিত হয় নি

॥ স্বপন মায়া ॥

কবি নিজে যাঁদের গান শিখিয়েছেন তাঁদের সংখ্যা খুব বেশী নয়। বেগম জাহানারা খান সেই বিরল সংখ্যক সৌভাগ্যবতীদের মধ্যে অন্যতমা। খান সাহেবা কবির বিশেষ স্নেহের পাত্রী ছিলেন। দীর্ঘদিন ইনি কবির সঙ্গে সঙ্গে ফিরেছেন। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের মত ইনিও নিজস্ব মূলধন করে রাখার মত একটি কবিতা চাইলেন।। গ্রীষ্মাবকাশের জন্য কবি তখন দার্জিলিং-এ রয়েছেন, জাহানারা খানও। ১৯৩১ সালের ২০শে জুন কবি 'স্বপন-মায়া' শীর্ষক কবিতাটি লিখেছিলেন জাহানারা বেগমের খাতায়:

এলে কি স্বপন মায়া আবার আমায় গান গাওয়াতে,
নিদাঘের দগ্ধ জ্বালা করলে শীতল পূব হাওয়াতে।
ছিল যে পাষাণচাপা আমার গানের উৎস মুখে,
তারে আজ মুক্তি দিলে ঐ রাঙা চরণাঘাতে।
এলে কি বর্ষারাণী নিরশ্রু মোর নয়নলোকে
বহালে আবার সুরের সুরধুনী বেদনাতে।
এসেছে ঘূর্ণি হাওয়া হয়ত বা ভুল এক নিমিষের
এসেছে সঙ্গে নিয়ে বজ্র ভরা ঝঞ্ঝারাতে।
তবু ঐ ভুল যে প্রিয় ফুল ফুটাল শুষ্কশাখে।
আকাশের তপ্ত নয়ন জুড়িয়ে গেল ঐ চাওয়াতে।
তোমার ঐ সোনার হাতের সোনার চুড়ির তালে তালে
নাচে মোর গানের শিখি মনের গহন মেঘলা রাতে।
এলে কি তারার দেশের হারিয়ে যাওয়া সুরের পরী,
শ্রান্ত বাজ-বেঁধা মোর গানের পাখীর ঘুম ভাঙাতে।

এলে আজ বাদলা শেষে ইন্দ্রধনুর রঙীন মায়া,
ছোটে সুর উজান স্রোতে, চোখ জুড়াল রূপ শোভাতে।

কবিতাটি বেগম জাহানারা খান সম্পাদিত 'বর্ষবাণী'তে প্রকাশিত হয়েছিল এবং সম্প্রতি প্রকাশিত 'নজরুল রচনা-সম্ভার' দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করেছে

॥ শাত-ইল আরব ॥

শাত-ইল আরব নজরুলের প্রথম জীবনের সাড়া জাগানো কবিতা। 'মোসলেম ভারতে' কবিতাটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বিশেষ রূপে চিহ্নিত হতে থাকেন। 'বিদ্রোহী' কবিতা তখন প্রকাশিত হয় নি—সুতরাং তখন তিনি বিদ্রোহী কবি নন। আড্ডায় সভায় সমিতিতে তিনি তখন 'শাত-ইল আরবের কবি' নামে পরিচিত। সংগীত জলসায় উপস্থিত হলে বন্ধু-বান্ধবেরা বলে উঠতেন ঐ যে শাতিল আরবের কবি এলো।

কবিতাটি সত্যই অপূর্ব। মুসলিম ঐতিহ্য নিয়ে লেখা এই কবিতাটির ধ্বনি-বৈচিত্র্য ও ছন্দ-মাধুর্য সমকালীন বাংলার অসংখ্য পাঠককে মোহিত করে ছিল। এমন কী সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার অখ্যাত উক্তি কবির এই লেখাটি পড়ে এমনই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন যে তিনি সঙ্গে সঙ্গে কবিকে স্বাগত জানিয়ে 'মোসলেম ভারতে'র সম্পাদককে একটি সুদীর্ঘ পত্র লেখেন, ..."বহুদিন কবিতা পড়িয়া এত আনন্দ পাই নাই, এমন প্রশংসার আবেগ অনুভব করি নাই।" কবিতাটি কিন্তু আকস্মিক ভাবেই রচিত হয়েছিল। এর জন্যে বিশেষ কোন পূর্ব প্রস্তুতি ছিল না।

নজরুলের নিকট 'মোসেপটোমিয়া' নামে একটি সচিত্র ইংরাজী বই ছিল। সম্ভবতঃ এ বইটি তিনি সেনানিবাসে থাকাকালীন সংগ্রহ

করেছিলেন। অথবা এমনও হতে পারে বইটি তিনি কলকাতায় অবস্থান কালেই ক্রয় করেছিলেন প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে। ও ধরনের বই তখন কলকাতার বাজারেও প্রচুর পাওয়া যাচ্ছিল যা হোক এ বইয়ের প্রথমে আর্ট পেপারে একটি অপূর্ব ছবি মুদ্রিত ছিল। ছবিটি মোসলেম ভারতের কর্ণধার আফজালুল হকসাহেবের খুবই পছন্দ হয়েছিল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তাব দিলেন যে ছবিটি মোসলেম ভারতে ছাপাবেন। প্রথমে তিনি কেবলমাত্র ছবিটিকেই নিজ পত্রিকায় মুদ্রণের বাসনা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু পরিচয়হীন একটি ছবি ছাপানোর সার্থকতা কোথায়? তাই তিনি নজরুলকে ছবিটির উপযোগী একটি পরিচিতি (কবিতা নয়) লিখে দিতে বলেন। কিন্তু নজরুল গদ্যের পরিচয়-লিপি লেখার জন্যে অনুরুদ্ধ হয়ে সকলকে চমকিত করে অতি অল্প সময়ের মধ্যে লিখে দিলেন একটি সুন্দর-অনবদ্য সুদীর্ঘ কবিতা। ধ্বনির কী দ্যোতনা, ছন্দের কী দুর্লভ ঐশ্বর্য। নাম 'শাত-ইল আরব'। এই কবিতাটি ছাড়াও উক্ত ছবির গদ্যেয় লেখা আর একটি পরিচিতি প্রকাশিত হয়েছিল। 'একজন সৈনিক' এই ছদ্মনামের অন্তরালে আত্মগোপন করে সে পরিচিতিটিও লেখেন নজরুল। আমরা সেটি এখানে উদ্ধৃত করলাম: " 'টাইগ্রীস' (দিজলা) আর 'ইউফ্রেটিস' (ফোরাত) বসরার অদূরে একজোট হয়ে 'শাত ইল-আরব' নাম নিয়েছে। তারপর বসরার পাশ দিয়ে বয়ে পারস্য উপসাগরে গিয়ে পড়েছে। এর তীরে দু' তিন মাইল করে চওড়া খর্জুর কুঞ্জ তাতে ছোট্ট শহর আর তার কূলে কূলে আঙ্গুর-লতার বিতান, বেদানা নাশপাতির কেয়ারী, এখানে এলেই অনেক পুরানো স্মৃতি জেগে ওঠে আর আপনিই গাইতে ইচ্ছা করে:

শাতিল্ আরব! শাতিল আরব!!
পূত যুগে যুগে তোমার তীর,
শহীদের লহু, দিলীপের খুন
ঢেলেছে যেখানে আরব বীর।"

কবিতাটি প্রকাশিত হবার পর অনেকের মনে এমন একটি ধারণা জন্মায় যে কবি সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে সুদূর আরব দেশ পর্যন্ত গমন করেছিলেন কিন্তু এ ধারণা আদৌ সত্য নয়। প্রকৃতপক্ষে তিনি করাচি পর্যন্তই গিয়েছিলেন—তার বাইরে নয়। তবে কবিতাটির মধ্যে আরব দেশের যে নিখুঁত বাস্তব চিত্র ফুটেছে তা তাঁর কবি-মানসেরই প্রতিফলন। স্বদেশের দুঃখ-দুর্দশাই যেন শাতিল আরবের মধ্যে আরোপিত হয়েছে। স্বদেশের বেদনাতুর কথা মনে রেখেই আরবদের দৈন্য ও বেদনার ইতিহাসকে তিনি যথাযথ রূপ দিতে পেরেছেন।

আমি অনেককে বলতে শুনেছি এবং ডক্টর সুশীলকুমার গুপ্ত তাঁর 'নজরুল চরিত মানস' গ্রন্থে লিখেছেন যে 'শাতিল আরব' কবিতাটির মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'মেবার পাহাড়' কবিতাটির প্রভাব সুস্পষ্ট। এ ধরনের উক্তি যে কী ভাবে করা যেতে পারে তা আমি ভেবে পাইনে। যে কোন রসজ্ঞ পাঠক কবিতাটি পড়লেই বুঝবেন যে এটি কবির স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টি, সাবলীল এবং অন্য প্রভাব মুক্ত। দুটি কবিতার মধ্যে একমাত্র সামান্য ঐক্য এদের ছন্দে—কিন্তু মাত্র এই তুচ্ছ মিলের উপর নির্ভর করে 'শাতিল আরব', 'মেবার পাহাড়ে'র প্রভাবে রচিত এ ধরনের মন্তব্য করা যায় কি?

শাত-ইল-আরব প্রকাশিত হয়েছিল ১৩২৭ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা মোতাবেক ১ম বর্ষের ২য় সংখ্যা 'মোসলেম ভারতে'। এর পর কবিতাটি 'অগ্নিবীণা'য় সংকলিত হয়ে স্থায়ী আত্মপ্রকাশ করে।

॥ সারস পাখী ॥

মোসলেম ভারতের প্রকাশ তখন বন্ধ। ব্যয়বহুল পত্রিকাটি দেড় বছর প্রকাশ করে তিনি প্রচুর আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেছেন। অচলাবস্থায় পত্রিকাটি আপনি বন্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু পত্রিকা প্রকাশের নেশা যাকে পেয়ে বসে, সহজে ছাড়ে না। এর কয়েক বছর পর আফজালুল হক সাহেব স্থির করলেন যে, এবার অল্প ব্যয়ে শিশুদের উপযোগী একটি আদর্শ শিশু পত্রিকা প্রকাশ করবেন। সেই পত্রিকাটির জন্য উপাদান সংগ্রহ করতে লাগলেন। প্রথম দফায় তিনি সংগ্রহ করলেন কয়েকটি চিত্র ও কয়েকটি লেখা। চিত্রগুলির মধ্যে একটি বহুবর্ণ রঞ্জিত সারস পাখীর ছবি ছিল। দীঘির কিনারায় সবুজ বনভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে একটি শুভ্র সারস পাখী—ডানাগুলি ঈষৎ বিস্তৃত, কিছুটা উড়বার ভংগীতে আঁকা। ঘন সবুজ বনাঞ্চলের মাঝে এই শুভ্র সারস পাখীটিকে একটি প্রস্ফুটিত পুষ্পের মত মনে হচ্ছিল। ঠিক শাত-ইল আরবের মত ঘটনা। ছবিটি দেখে কবি বিশেষ রূপে অনুপ্রাণিত হ'য়েছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে লিখলেন ছবিটির উপযোগী একটি সুন্দর কবিতা 'সারস পাখী'। আফজালুল হক তাঁর পত্রিকার নামকরণ করেন "শিশু মহল।" এই শিশু মহলের প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার মোতাবেক ১৩৩৪ সালের ভাদ্র সংখ্যায় আর্ট পেপারে সর্বপ্রথমে ছবিটি সংযোজিত হয় এবং তার ডান দিকের পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয় নজরুলের কবিতা। "শিশু মহলের" প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যাটি সম্পূর্ণ মুদ্রিত হ'য়েছিল কিন্তু কোন একটা কারণে পত্রিকাটী আর বাজারে আত্মপ্রকাশ করেনি। ফলে

নজরুলের এই কবিতাটী সম্পূর্ণ অপ্রকাশিত রয়ে গেছে। কবিতাটী কবির কোন গ্রন্থেও সংকলিত হয় নি। এই অপ্রকাশিত কবিতাটি সম্পূর্ণাংশ আমরা এখানে উদ্ধৃত করলাম :

সারস পাখী

(১)

সারস পাখী! সারস পাখী

আকাশ গাঙের শ্বেত কমল!

পুষ্প-পাখী! বায়ুর ঢেউ-এ

যাস ভেসে তুই কোন মহল?

তোরে ময়ুরপঙ্খী করি'

পরীস্থানের কোন কিশোরী

হালকা পাখার দাঁড় টেনে যায়?

নিম্নে কাঁপে সায়র জল।

গগন-কূলে ঘুম ভেঙে যায়

মেঘের ফেনা অচঞ্চল!

(২)

দীঘির-তীরে কুমুদ-কুঁড়ি

রাঙা চরণ মৃণাল তোর!

তুলতে এসে চমকে ওঠে

মাঠের রাখাল থল-ভোমর।

পালক-মুকুল পাঁপড়ি খুলি'

যাস উড়ে তুই লহর তুলি'

খোকা ভাবে চাঁদ উড়ে যায়

চাঁদ ভাবে তুই ফুল চকোর।

বুকেতে তোর জল ঢেলে দেয়—
নীল যমুনার মেঘ কিশোর।

(৩)

কানন-শাখার নীড়-খসা ফুল
তুলবি রে তুই কণ্ঠে কার?
দিগবালিকার মুক্তমালা
ভাদর দীঘির চন্দ্রাহার!
আকাশ খুকীর রূপার ঘুমুর!
যাস নেচে তুই ঝুমুর ঝুমুর,
তমাল ভাবে শুভ্র ময়ূর
ময়ূর ভাবে মেঘতুষার।
দিবা শেষের বিদায়-বাণী
আনন্দগান শ্বেত উষার॥

॥ চিয়াং কাইসেক বন্দনা গান ॥

চিয়াং কাইসেক ভারতে আসবেন তার সকল ব্যবস্থা ঠিক হ'য়ে গেছে। এইচ-এম-ভির ব্যবসায়ী ইংরেজের টনক নড়ল—তাঁরা কবির কাছে ছুটে এলেন, গান চাই—গান, চিয়াং কাইসেকের বন্দনা গান। নজরুল তখন অসুস্থ, বর্তমান ব্যাধির সকল লক্ষণ তখন সারা দেহে সুস্পষ্ট। সেই অসুস্থ শরীর নিয়ে কবি গানটি রচনা করলেন। রচনা সমাপ্ত হলে দেখা গেল গানটি ঠিক চিয়াং কাইসেকের বন্দনাগীতি হ'য়ে ওঠে নি, হয়েছে ভারত চীনের লক্ষ নিপীড়িত মানুষের বন্দনা গান। সর্বহারা মানুষের হৃদয়-বেদনা ও নির্যাতনের

তপ্ত শ্বাস যেন সংগীতটির প্রতিটি পংক্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। গানটির প্রথম স্তবক আমি এখানে উদ্ধৃত করলাম :

চীন ও ভারতে মিলেছি আবার শত কোটি লোক
চীন ভারতের জয় হোক ! ঐক্যের জয় হোক ! সাম্যের জয় হোক !
ধারার অর্ধ নরনারী মোরা রহি এই দুই দেশে,
কেন আমাদের এত দুর্ভোগ নিত্য দৈন্য ক্লেশে
সহিব না এই অবিচার খুলিয়াছে আজ চোখ,
চীন ভারতের জয় হোক ! ঐক্যের জয় হোক ! সাম্যের জয় হোক !

সংজ্ঞাহীন হবার পূর্বে নজরুল যে গানগুলি রচনা করেছেন এ গানটি নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে অন্যতম। এমনও হতে পারে এটি তার সজ্ঞান অবস্থায় রচিত শেষতম গান, কিন্তু সেটি আজ নিশ্চিত করে বলার কোন উপায় নেই। গানটি কবির কোন গ্রন্থে সংকলিত হয়নি তবে জনাব মুজফফর আহমদ রচিত কাজী নজরুল প্রসঙ্গে গ্রন্থে সম্পূর্ণ গানটির উদ্ধৃতি রয়েছে। শ্রী জগন্ময় মিত্র গানটি গ্রামোফোন কোম্পানিতে রেকর্ড করেন।

॥ রক্ত পতাকার গান ॥

কবি-বন্ধু জনাব মুজফ্‌ফর আহমদ জানাচ্ছেন যে 'রক্ত পতাকা'র গানটির উৎস কবি কোনো ইংরাজী গান হতে পেয়েছিলেন। 'সাম্যবাদ' রচনার সময় শ্রমিক মজুরদের ওপর ইংরাজীতে লেখা কিছু কিছু কবিতা কবি বাংলায় তর্জমা করেছিলেন। সেই সময় তিনি কোন ইংরাজী কবিতা হতে উৎস নিয়ে 'রক্ত' পতাকার গানটি রচনা করে থাকবেন :

ওড়াও ওড়াও লাল নিশান।
দুলাও মোদের রক্ত পতাকা
ভরিয়া বাতাস জুড়ি বিমান
ওড়াও ওড়াও লাল নিশান॥ ইত্যাদি।

কবিতাটি ১৯২৭ সালের ২৮শে এপ্রিলের "গণবাণী"তে প্রথম মুদ্রিত হয় পরে কবির "ফণি মনসা" কাব্যগ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে।

॥ দিল দরদী ॥

নজরুল যখন বাংলার সাহিত্যাঙ্গনে প্রবেশ করলেন তখন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রতিভা বাঙালী মানসকে বিশেষরূপে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তাঁর কবিতার অপূর্ব ছন্দ-ঝঙ্কার ও সাবলীল গতিভঙ্গীতে অনেকেই আকৃষ্ট হতেন। নজরুলও বিশেষ রূপে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কেবল আকৃষ্ট নয় তিনি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের একজন ভক্তও হয়েছিলেন। কিন্তু উভয় কবির মধ্যে তখন চাক্ষুষ পরিচয় হয়নি। নিতান্ত আকস্মিক ভাবেই সে পরিচয় পর্বের সূচনা হয়েছিল।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তখন কঠিন রোগে আক্রান্ত। বিশেষজ্ঞরা বলতেন যে কবি অতি শীঘ্র পরলোক গমন করবেন। তিনি যে রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন তাতে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণতর হয়ে আসছিল, অন্ধত্বের সকল লক্ষণ ফুটে উঠছিল ধীরে ধীরে। শারীরিক অবস্থা যখন এরূপ ভয়াবহ হয়ে উঠেছে, তখন আশ্চর্যরূপে এর প্রতিক্রিয়া তাঁর সৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। এ সময়ে দত্ত কবির অধিকাংশ কবিতাই পরম নৈরাশ্যের সুরে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। 'খাঁচার

পাখী' কবিতাটিতে বুঝি এই সুর ফুটেছিল সর্বাধিক। কবিতাটির প্রতি ছত্রে পরম নৈরাশ্যের বেদনা-করুণ ছায়াপাত ঘটেছে। ২য় বর্ষের ১ম সংখ্যা মোতাবেক ১৩২৮ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'মোসলেম ভারতে' প্রকাশিত এই খাঁচার পাখী কবিতাটির সামান্য কটি পংক্তি আমরা উদ্ধৃত করলাম :

…চোখে আমি ঝাপসা দেখি আফসোসে মরি আফসোসে,
বল্ গো তোরা বসন্ত কী জাগল ধরার হৃদ্‌কোষে?
কান্না-কোলে কাঁপছে গলা কণ্ঠে কেঁপে যাচ্ছে তান,
বল্ গো তোরা বকুল-চাঁপায় বসন্ত কী মূর্তিমান?…

কবিতাটির প্রতিটি ছত্র নজরুলের মনে গভীর আঘাত হেনেছিল। দত্তকবির রোগের কথা তিনি জানতেন। 'খাঁচার পাখীর' ম্লান সুরকে সেই পটভূমিতে বিচার করে তিনি বিশেষ রূপে বিচলিত হয়ে পড়লেন। দত্ত কবির প্রতি তাঁর অগাধ ভক্তি ছিল। হয়তো সে জন্যেই তাঁর বুকে ব্যথাটা গভীর হয়ে বেজেছিল। ছন্দে গানে একদিন যিনি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন, বাঙালীকে শুনিয়েছেন যৌবনের গান, এগিয়ে চলার গান—তাঁর কাব্যে আজ এ কী বিষণ্ণতা! কবিতাটি পড়ে তিনি এমনি মর্মাহত হয়ে পড়েন যে সেদিনেই লিখে ফেলেন একটি সুদীর্ঘ কবিতা। দত্ত কবির প্রতি সমবেদনায় কবিতাটি যেন অনন্য হয়ে উঠেছে। নাম দিলেন "দিল দরদী।" কবিতাটি প্রায় দেড় শ লাইনের— আমরা কেবল প্রথম ও শেষ পংক্তিগুলি উদ্ধৃত করলাম :

কে ভাই তুমি সজল গলায় গাইলে গজল আফসোসের?
ফাগুন-বনের নিবল আগুন লাগল সেথা ছাপ পোষের।
…বাদশা-কবি! সালাম জানায় ভক্ত তোমার অ-কবি
কইতে গিয়ে অশ্রুতে মোর কথা ডুবে যায় সবি।"

মোসলেম ভারতে প্রকাশিত কবিতাটির শেষ ছুটি ছত্র ছিল এইভাবে :

বাদশা কবি! সালাম জানায় বুনো তোমার ছোট্ট ভাই।
কইতে গিয়ে অশ্রুতে মোর যায় ডুবে হায় সব কথাই।

গ্রন্থাবদ্ধ করার সময় কবি এ ছুটি ছত্রের পরিবর্তন করেন। নজরুল সত্য কবিকে 'বাদশা কবি' বলে সম্বোধন করেছেন। এবং নিজেকে বলেছেন 'অকবি'। যা হোক কবিতাটি সত্যেন্দ্র নাথের হৃদয় স্পর্শ করে গিয়েছিল। নজরুলের সঙ্গে তাঁর চাক্ষুষ পরিচয় হয়নি—তিনি সাক্ষাতের জন্য লালায়িত হয়ে ওঠেন। নজরুল থাকেন তখন ৩/৪ সি তালতলা লেনের বাসায়, ঐ একই কামরায় থাকেন আর একজন জনাব মুজফ্ফর আহম্মদ। সত্যকবি সাক্ষাতের জন্য এমনই অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন যে, তিনি পূর্বাহ্নে সংবাদ না দিয়ে সেই অসুস্থ শরীর নিয়ে চারণ কবির তালতলা লেনের বাসায় আসেন কিন্তু দুঃখের বিষয় নজরুল বা মুজফ্ফর সাহেব কেউ তখন বাসায় ছিলেন না—ফলে তিনি নিরাশ হয়ে ফিরে আসেন। পরে অবশ্য তাঁদের বিখ্যাত 'গজেন ঘোষের আড্ডায়' দেখা হয়েছিল —কিন্তু সে ইতিহাস অন্য।

'দিল দরদী' কবিতাটি 'মোসলেম ভারতে'র ২য় বর্ষের ২য় সংখ্যা মোতাবেক ১৩২৮ সালের আশ্বিন সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। কবিতাটির শিরোনামার ঠিক নিম্নেই প্রথম বন্ধনীর ভিতর কবি লিখে দেন, "গত ভাদ্র মাসের মোসলেম ভারতে সত্যকবি শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "খাঁচার পাখী' শীর্ষক করুণ কবিতাটি পড়িয়া। কবিতাটি কবির "ফণি মনসা" কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

॥ একটি গান ॥

এর পরই এলো সেই চরম আঘাত। অকস্মাৎ ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জুন মোতাবেক ১৩২৯ সালের ১০ ই আষাঢ় শনিবার রাত আড়াইটায় সতেন্দ্রনাথ মারা গেলেন। এ সংবাদ কবির হৃদয়ে বজ্রশেলের মত বিঁধে ছিল। তি'ন শোকে প্রায় বিহ্বল হ'য়ে পড়েছিলেন কিন্তু শ্রদ্ধেয় কবির প্রতি করণীয় কাজগুলি তিনি সবই করলেন।

নজরুল তখন 'সেবকে'র সঙ্গে যুক্ত। সত্যকবির স্মরণে তিনি লিখলেন এক বিরাট ভাবপ্রবণ সম্পাদকীয়। ঐ দিন সন্ধ্যায় কলকাতা স্টুডেন্টস হলে এক শোক-সভার আয়োজন হয়—সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এইদিন সভায় এক মজার ব্যাপার ঘটেছিল। নজরুল ইসলামের উপর ভার পড়েছিল উদ্বোধনী সংগীত গাইবার। যথাসময়ে শরৎচন্দ্র এসে সভাপতির আসনে উপবেশন করলেন। টেবিলে কর্মসূচী বা আনুষ্ঠানিকা পড়েছিল। তিনি সেটিতে চোখ বুলিয়ে নিলেন একবার। তারপর এটা যে শোকসভা একথা তিনি বুঝি ভুলেই গিয়েছিলেন—অন্ততঃ তাঁর কথায় তাই মনে হলো সকলের। বিষাদ-করুণ পরিবেশের কথা মনে না রেখে তিনি বললেন, "কই হে নজরুল তোমার গান গাও।"

কিছু কিছু শ্রোতা শরৎবাবুর এ ধরনের কথাবার্তায় হয়তো কিছু আহত হয়েছিল কিন্তু নজরুল অশ্রু ভার-ভার গম্ভীর মুখে এগিয়ে এসে উদাত্ত কণ্ঠে গান ধরলেন, তখন সকলের মন হ'তে

সকল প্রকার ব্যথা-বেদনা মুছে গেল। এই উদ্বোধনী সংগীতটি তিনি ঐ দিন দুপুরে রচনা করেছিলেন :

চল-চঞ্চল বাণীর দুলাল এসেছিল পথ ভুলে,
ওগো এই গঙ্গার কূলে।
দিশাহারা মাতা দিশা পেয়ে তাই নিয়ে গেছে তুলে
ওগো এই গঙ্গার কূলে।...ইত্যাদি।

গানটি 'ফণি মনসা' কাব্যগ্রন্থে গ্রথিত হ'য়েছে।

॥ বোধন ॥

নজরুল তখন সবে মাত্র পল্টন থেকে ফিরেছেন, আস্তানা গেড়েছেন ৩২ নং কলেজ স্ট্রীটের দ্বিতলের একটী ঘরে। সেদিন রাত্রে জনাব মুজফফর আহমদ সাগ্রহে দেখলেন যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কবি যে সব জিনিসপত্তর এনেছেন তার মধ্যে রয়েছে অমর কবি হাফিজের একটি ভাল সংস্করণের 'দেওয়ান-ই-হাফিজ। মূল ফার্সীর নীচেয় উর্দু তর্জমা দেওয়া ছিল। এই দিওয়ানের একটি কবিতা বিশেষ করে সবাইয়ের ভাল লেগেছিল। কবিতাটির প্রথম পংক্তি এই : "ইউসুফ-ই-গুম্ গশ্ তা বাজ আইয়েদ ব-কিন্ আনা মখুর।" জনাব মুজফ্ফর আহমদ এবং নূর লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী মঈনুদ্দীন হোসায়েন দু' জনেই কবিতাটিকে বাংলায় অনুবাদ করার জন্যে কবিকে অনুরোধ জানালেন। কবি তাঁদের সে অনুরোধ রক্ষা করলেন। সেদিন রাতেই তিনি কবিতাটির অনুবাদ করলেন এই ভাবে : "দুঃখ কী ভাই হারানো ইউসুফ কিনানে আবার আসিবে ফিরে।" কবিতাটি ঠিক অনুরূপ ভাবেই মাসিক পত্রিকায় মুদ্রিত

হ'য়েছিল কিন্তু গ্রন্থাবদ্ধ করার সময় সমগ্র কবিতাটিই পুনর্লিখিত হয়। এই পুনর্লিখিত কবিতাটির মধ্যে কবি সুকৌশলে পরাধীন ভারতের ব্যথা বেদনার কথা ব্যক্ত করলেন এবং কবিতার শেষ ছত্রে আশাবাদী কবির উজ্জ্বল প্রত্যয় ব্যক্ত হ'লো। এবারে আর হাফিজের অনুবাদ লেখা হলো না. কবিতাটির শেষে ছোট্ট টীকা সংযোজন করে কবি লিখলেন, "অমর কবি হাফিজের ভাবাবলম্বনে।" কবিতাটির মাত্র চারটি পংক্তি আমরা উদ্ধৃত করলাম :

"অত্যাচার আর উৎপীড়নে যে আজিকে আমরা পর্যুদস্ত
ভয় নাই ভাই। ঐ যে খোদার মঙ্গলময় বিপুল হস্ত।
দুঃখ কি ভাই হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুনঃ হ'য়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে॥"

কবিতাটি প্রথমে মোসলেম ভারতের ১ম বর্ষের ২য় সংখ্যা মোতাবেক ১৩২৭ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় মুদ্রিত হয় এবং পরে কবির "বিষের বাঁশী" কাব্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হ'য়েছে।

॥ জাগরণী ॥

নিখিল ভারতবর্ষে তখন অসহযোগ আন্দোলন চলছে। বাংলায় সে আন্দোলনের ঢেউ ব্যাপক এবং প্রবলতর হয়ে দেখা দিয়েছে সর্বত্র এক অভূতপূর্ব উন্মাদনা, সর্বত্র চাই চাই রব। দেশের অবস্থা যখন এমন চরমে উঠেছে সেই সময় ইংলণ্ডের প্রিন্স অফ ওয়েলস এর ভারত পরিভ্রমণে আসার ব্যবস্থা হলো। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে নভেম্বরে তাঁর আগমন উপলক্ষে সারা দেশব্যাপী হরতালের আয়োজন করা হলো। নজরুল তখন কুমিল্লায়। ছোট্ট শহর কুমিল্লা

ত্তিইপূর্বে তিনি রক্ত ঝরা গানে কবিতায় সমগ্র শহরকে তাতিয়ে দিয়েছেন। হরতাল উপলক্ষে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় লোক এসে কবিকে ধরলেন মিছিলে গাইবার উপযোগী একটি গান লিখে দেবার জন্যে। কবি বুঝি এই চাইছিলেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে সংগীত রচনায় মেতে উঠলেন। লিখলেন জাগরণের গান—'জাগরণী'। জনগণের নিকট তিনি ভিক্ষা চাইলেন অর্থ নয়, টাকা পয়সা নয়—মানবতা :

"ভিক্ষা দাও! ভিক্ষা দাও!
ফিরে চাও ওগো পুরবাসী,
সন্তান দ্বারে উপবাসী
দাও মানবতা ভিক্ষা দাও!
জাগো গো, জাগো গো
তন্দ্রা অলস জাগো গো
জাগো রে! জাগো রে!"

সে সময় গানটির মধ্যে নিম্নলিখিত পংক্তিগুলি ছিল :

সর্বনাশ! সর্বনাশ!
আসিছে তাদেরি রাজকুমার
ওগো নির্ভীক পুরবাসী আজ খুলো না দ্বার।

অবশ্য বর্তমানে সংগীতটিতে এই ছত্রগুলি নেই।

কবি কবিতাটি কেবল রচনাই করলেন না, সুর দিলেন এবং গলায় হারমোনিয়ম ঝুলিয়ে—মিছিলের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে গাইলেন। গানে গানে সমগ্র শহর যেন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, সবাই হলো 'লক্ষ্মী ছাড়া দলের' সভ্য। কেবল এই গানটি নয়, মিছিলের উপযোগী আরো অনেকগুলি গান কবি রচনা করেছেন এবং মিছিলে গেয়েও ছিলেন। 'আজি রক্ত নিশি ভোরে, একি শুনি ওরে' এই ধরনের গানগুলির অন্যতম একটি।

'জাগরণী' গানটি কবির "ভাঙার গান" কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

॥ চল চল চল ॥

কবির বিখ্যাত গানগুলির মধ্যে নিঃসন্দেহে 'চল চল চল' গানটি অন্যতম একটি। অনেকে মনে করেন যে কবি এটি কলকাতার স্টুডেন্টস হলে ছাত্র ও যুব সম্মেলন উপলক্ষে রচনা করেন কিন্তু সে ধারণা সত্য নয়। কাজী আবুল হোসেন প্রতিষ্ঠিত ঢাকার 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠানে কবি উদ্বোধন সংগীত হিসেবে গেয়ে ছিলেন "খোশ আমদেদ" গানটি। সাহিত্য সমাজে দ্বিতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠানেও কবিকে নিমন্ত্রণ জানানো হলো। তিনি গেলেন ঢাকা সফরে—১৯২৮ সালে। দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধন সংগীত হিসাবে এবার কবি গাইলেন তরুণ দলের গান, হৃদয় মন ব্যাকুল করা গান। সহস্র শ্রোতা আবেগ ব্যাকুল উদ্বেলিত হৃদয়ে শুনল :

চল চল চল।
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণী তল
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চলরে চলরে চল।...

কেবল অপূর্ব নয়—মনোহর। এ গান শুনলে হৃদয় মন বুকের কাছটিতে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। 'মুসলিম সাহিত্যে সমাজের' দ্বিতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে রচিত এ গানটি প্রথমে কাজী মোতাহার

হোসেন সম্পাদিত দ্বিতীয় বর্ষের "শিখা"য় আত্মপ্রকাশ করে পরে এটি "সন্ধ্যা" কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কবিতাটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জনাব মুজফফর আহমদের বইতে পাওয়া যাবে।

॥ অগ্নিবীণার উৎসর্গ-কবিতা ॥

বাংলা সাহিত্যে নজরুলের বলিষ্ঠ আত্মপ্রকাশকে যাঁরা স্বাগত জানিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্নিযুগের নেতা বোমারু বারীণ ঘোষের নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষেরা ছিলেন সন্ত্রাসবাদী চরমপন্থী দলভুক্ত। নজরুল এই দলের প্রতি স্বাভাবিক কারণেই আস্থাশীল হয়ে পড়েন। কবি কোন দিন নিরুপদ্রব অসহযোগ আন্দোলনকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস এবং গ্রহণ করেন নি—তিনি চিরদিনই সশস্ত্র বিপ্লববাদে আস্থাশীল ছিলেন। সুতরাং পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে এই সন্ত্রাসবাদী দলের যে সকল সংবাদ তিনি সংগ্রহ করেছিলেন তাতে তিনি এই দলের প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। এ ছাড়াও একটি ব্যক্তিগত দিক ছিল। শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষেদের হাতে দুটি পত্রিকা ছিল 'নারায়ণ' এবং 'বিজলী'। মাসিক 'নারায়ণ' ছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কাগজ আর 'বিজলী' ছিল তাঁদের নিজেদের। কিন্তু এই দু'টি পত্রিকার সম্পাদনা এবং পরিচালনার ভার তাঁদের ওপর ন্যস্ত ছিল। এই পত্রিকা দু'টিতে প্রায়ই নজরুলের কবিতার অংশ বিশেষ পুনর্মুদ্রিত হতো। কেবল তাই নয় মুদ্রিত অংশগুলোর ওপর কর্তৃপক্ষেরা যে অপূর্ব মন্তব্য করতেন তা যে কোন লেখকের গর্বের এবং সৌভাগ্যের কারণ হতে পারত। এবং এ জন্য নজরুল বিশেষ রূপে এই দলের বিশেষ করে বারীন্দ্রকুমার ঘোষের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন।

কবির সঙ্গে বারীণবাবুর চাক্ষুষ পরিচয় হয়নি। কিন্তু উভয়েই পরিচিত হবার জন্যে উদগ্রীব ছিলেন। এই পরিচয়ের সূত্র হয়েছিল নজরুল ইসলামের একখানি চিঠি। চিঠিখানি কবি কবিতায় রচনা করেছিলেন এবং সেটি বারীণবাবুকে দেবার জন্যে শ্রী পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে অর্পণ করেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের কথা। কবি তখন জনাব মুজফফর সাহেবের সংগে ৮-এ টার্ণার স্ট্রীটের বাড়ীতে থাকতেন। যা হোক চিঠি পেয়ে বারীণবাবু কবিকে দেখার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। এর ফলে কবি নিজেই একদিন সাক্ষাতের জন্যে বারীণবাবুর বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওনা হন। বারীণ বাবুরা তখন মোহনলাল স্ট্রীটে থাকতেন। কবি দূর থেকে দেখতে পেলেন যে বাড়ীতে আলো জ্বলছে, কিছু কথাবার্তাও তাঁর কানে এসেছিল। কিন্তু তিনি যেতেই আলো নিভে গেল, কপাট বন্ধ হল, কথাবার্তাও শোনা গেল না আর। কবি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। ব্যাপার কী?

নজরুল চিন্তিত হলেন ঠিকই। কিন্তু তিনি দমবার পাত্র নন। দ্বিগুণ উৎসাহে কড়া নাড়া আর চীৎকার শুরু করে দিলেন। তাঁর হাঁকডাকে আর টুকিটাকি মন্তব্যে কর্তৃপক্ষেরা বুঝলেন যে ইংরেজ সরকারের খয়ের খাঁ নয়, দুয়ারে আজ এক দমকা আনন্দ এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বলে উঠল। রুদ্ধ দুয়ারের আগল খসে গেল— উদ্দাম আনন্দ ঘরের ভিতর প্রবেশ করে বারীণ বাবুকে প্রণাম জানালেন। মুহূর্তে সকল পরিবেশ পালটে গেল। ঘরের মধ্যে উৎসবের সূচনা হলো। হাসি গল্পে-গানে মোহনলাল স্ট্রীটের বাড়ীটাতে সেদিন যেন আনন্দের প্লাবন বয়ে গেল।

সে-ই প্রথম পরিচয়। তখন ১৯২০ সাল।

'অগ্নিবীণা' প্রকাশিত হলো ১৯২২ সালের শেষভাগে মোতাবেক ১৩২৯ সালের কার্তিকে। দেখা গেল কবি শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষকে

'অগ্নিবীণা' উৎসর্গ করেছেন এবং উৎসর্গ পত্রে কবি যে কবিতাটি ব্যবহার করেছেন সে টি ১৯২০ সালে বারীণবাবুকে লেখা সেই চিঠি। সেই চিঠিকেই তিনি উৎসর্গ কবিতারূপে গ্রথিত করেছেন। এই উৎসর্গ কবিতাটির একটি স্তবক আমরা এখানে উদ্ধৃত করলাম:

"অগ্নি-ঋষি। অগ্নি বীণা তোমায়
শুধু সাজে।
তাই ত তোমার বহ্নি-রাগেও
বেদন বেহাগ বাজে॥
দহন বনের গহনচারী
হায় ঋষি—কোন বংশীধারী
নিঙড়ে আগুন আনলে বারি
অগ্নি মরুর মাঝে।
সর্বনাশা কোন বাঁশী সে বুঝতে
পারি না যে॥...
ইত্যাদি।

এই উৎসর্গ কবিতায় 'অগ্নিবীণা' শব্দটি রয়েছে। জনাব মুজফফর সাহেব এর থেকেই অনুমান করেছেন যে কবি তাঁর কাব্যগ্রন্থের নাম অগ্নিবীণা চয়ন করেছেন।

কবিতাটি উৎসর্গ কবিতা রূপে "অগ্নিবীণা" কাব্যগ্রন্থের প্রথমে গ্রথিত হয়েছে।

॥ করুণ গাথা ॥

নজরুল তখন শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র। এই স্কুলের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন শ্রীভোলানাথ স্বর্ণকার মহাশয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি, এ, পাশ করে স্কুলের শিক্ষকতার কাজ নেন এবং শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত সুনামের সংগে শিক্ষাদানের ব্রত পালন করে গিয়েছেন।

এই ভোলানাথ স্বর্ণকার মহাশয় বিদ্যালয় ছেড়ে চলে যাবেন। সেই উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো। এই অনুষ্ঠানে ছাত্রদের তরফ থেকে কী দেওয়া হবে সেই নিয়ে কথা উঠল। শেষে ঠিক হল একটি অভিনন্দন-পত্র ছাপিয়ে এবং বাঁধাই করে দেওয়া হবে। প্রস্তাবটি সকলেই সমর্থন করলেন কিন্তু ছাত্রদের মধ্যে অভিনন্দন-পত্র লিখবে কে? লিখতেই বা পারে কে? অবশেষে ছাত্রদের তরফ থেকেই ডাক পড়ল নজরুলের, অভিনন্দন-পত্রটি লিখে দেওয়ার ভার পড়ল তাঁর ওপর। তিনি সম্মত হলেন। বিদ্যালয়ের সমগ্র ছাত্রদের তরফ থেকে অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হলেও নজরুল সুকৌশলে নিজের নামটি ঐ পত্রের মধ্যে সংযুক্ত করে দেন। অভিনন্দন-পত্রটি ছিল আটচল্লিশ পংক্তির মোট আটটি স্তবকে সমাপ্ত। এই আটটী স্তবকের প্রথম পংক্তির প্রথম অক্ষরগুলি একত্রিত করলেই কবির নাম পাওয়া যাবে। অভিনন্দন-পত্রটি দীর্ঘ—আমরা কেবল প্রতি স্তবকের প্রথম পংক্তিগুলি উদ্ধৃত করলাম: নয়ন গলিয়া বয় তপ্ত অশ্রুনীর, জলধি শুকায়ে যাও অনিল বয়ো না, রুদ্ধ বেদনা গো ছুটিছে মথিত হিয়া, ললাটে লিখন বিধি এত কি কঠোর, এতই উদার তুমি তরুণ

বয়সে, সকলি ভুলিব কালে, রহিবে কীর্তি। লাবণ্য শুকাল আজ সকলি ফুরাল, মধুর স্বপন ভাঙি স্তব্ধ নিশীথে।

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে পংক্তির প্রথম অক্ষরগুলির মধ্যে 'নজরুল এসলাম' নামটি আত্মগোপন করে আছে। এই অভিনন্দন-পত্রটি ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই তারিখে নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানে পাঠ করা হয়েছিল।

করুণ গাঁথাটি এতদিন অপ্রকাশিত ছিল। সম্প্রতি কবি বন্ধু খান মুহম্মদ মঈনুদ্দিন তাঁর 'যুগস্রষ্টা নজরুল' গ্রন্থে এটি মুদ্রিত করেছেন। পরে জনাব এম. আব্দুর রহমানের "কিশোর নজরুল" গ্রন্থে কবিতাটি পুনর্মুদ্রিত হয়। যতদূর জানা যায় কবিতাটি আজ পর্যন্ত কবির কোন গ্রন্থে সংকলিত হয় নি।

॥ অগ্রহায়ণের সওগাত ॥

নজরুল তখন সওগাতের সংগে যুক্ত হননি। নিজেদের কাগজ 'লাঙল' নিয়েই ব্যস্ত। অথচ দাবী উঠল সওগাতে নজরুলের লেখা চাই-ই চাই।

চাই তো কিন্তু পাওয়া যায় কি ভাবে। কবি থাকেন তখন কৃষ্ণনগরে—তাঁর কাছ থেকে লেখা আনার দায়িত্ব নেবে কে? আগ্রহী কর্মীর অভাব হলো না। এগিয়ে এলেন কবি বন্ধু খান মুহম্মদ মঈনুদ্দিন। সওগাত সম্পাদক নাসিরউদ্দিন সাহেবকে জানালেন যে, তিনি কবিতা আদায় করে এনে দেবেন।

খুব ভাল কথা। উত্তম কথা। খুশি হলেন নাসিরউদ্দীন সাহেব। কিন্তু দিন গড়িয়ে যায় কবিতা আর আসে না, ১৯৩০

সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'সওগাতে'র মুদ্রণ তখন দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ঠিক হয়েছিল নজরুলের কবিতা পাওয়া গেলে সেটি প্রথমে যাবে, তাই প্রথম ফর্মার কাজ বাকী রেখে দ্বিতীয় ফর্মা থেকে মুদ্রণ শুরু হয়েছিল। সওগাতের কাজ প্রায় শেষ অথচ নজরুলের কবিতার সঙ্গে দেখা নেই। মঈনুদ্দিন সাহেবকে ডেকে নাসিরউদ্দীন সাহেব বললেন, আজ একবার গিয়ে দেখুন। যদি কবিতা না পাওয়া যায় তা হলে অন্য লেখকের লেখা দিয়ে ফর্মা পূরণ করতে হবে। আর বিলম্ব করা যায় না—এমনিতেই দেরী হয়ে গেছে যথেষ্ট।

মঈনুদ্দিন সাহেব গিয়ে কবির নিকট বৃথা ধর্না দিয়ে ফিরে এসেছেন। আজ দেব, কাল দেব করে সময় নিয়েছেন অথচ লেখেন নি কিছু। খান মঈনুদ্দিনও উঠে এসেছেন আর তিনিও ভুলে গেছেন লেখার কথা। ওসব কথা কোনদিনই স্মরণ রাখতেন না নজরুল। মঈনুদ্দিন সাহেব সেদিনও আশা নিরাশায় দুলতে দুলতে 'লাঙল' অফিসে এসে হাজির। সৌভাগ্য বলতে হবে, কবিকে পাওয়া গেল সেখানে, এবং তিনি কি যেন লিখছেন। মঈনুদ্দিন সাহেব গিয়ে শুধালেন, কী লিখছেন কবি ভাই ?

কবি কোন কথা না বলে ইংগিতে বসতে বললেন। বসেই রইলেন খান সাহেব।

কতক্ষণই বা, কবি হেসে উঠে কাগজটা মঈনুদ্দিনের হাতে দিয়ে বললেন, এই নাও তোমার কবিতা। অগ্রহায়ণ সংখ্যা সওগাতের জন্যে 'অগ্রহায়ণের সওগাত'। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলুম—তোমাকে দেখেই লিখতে বসেছি।

মহানন্দে লাফিয়ে উঠলেন মঈনুদ্দিন। কপি নিয়ে ছুটলেন সুলেখা প্রেসে। সওগাত তখন ওখান থেকেই ছাপা হতো। সুলেখা প্রেস থেকে ফোন করলেন নাসিরউদ্দিন সাহেবকে। সব শুনে তিনি মহা খুশী। খুশীর আবেগ বুঝি ধরে রাখতে পারেন না। কখন প্রুফ

আসবে তবে কবিতা পড়া, অতক্ষণ ধৈর্য রাখা কঠিন। বললেন, শোনান তো কবিতাটা।

ফোনেই কবিতা পাঠ চলল :

ঋতুর খাঞ্চা ভরিয়া এল কি
ধরণীতে সওগাত ?
নবীন ধানের আঘ্রাণ আজি
অঘ্রাণ হল মাৎ।
"গিন্নী পাগল" চালের ফিরণী,
তশতরী ভরে নবীনা গিন্নী,
হাসিতে হাসিতে দিতেছে স্বামীরে
খুশীতে কাঁপিছে হাত,
শিরণী রাঁধেন বড় বিবি, বাড়ী
গন্ধে তেলেসমাত !"...
ইত্যাদি।

কপি প্রেসে দিয়ে চলে এলেন মঈনুদ্দিন।

সওগাত বাজারে বেরলে হুলুস্থূল পড়ে গেল পাঠক মহলে, হাল্কা কবিতা, তা হোক—মহাখুশী সকলে। কবিতাটির জন্যে কিছু টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল কবিকে।

'অগ্রহায়ণের সওগাত' মুদ্রিত হয় ১৩৩৩ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা সওগাতে। পরে কবির 'জিঞ্জীর' কাব্যগ্রন্থে স্থানলাভ করেছে।

॥ অঞ্জলিকে আশীর্বাদ ॥

'অঞ্জলি' পত্রিকার সম্পাদক দেখা করলেন কবির সংগে। কবিতা কবিতা শিরে নিয়ে 'অঞ্জলি' আত্মপ্রকাশ করুক এই তাঁর ইচ্ছা। কবি তখন খুব ব্যস্ত ছিলেন। সুদীর্ঘ কবিতা দিলেন না—দিলেন ছ' পংক্তির একটি আশীর্বাণী। আয়তন ক্ষুদ্র, মাত্র ছ পংক্তি, কিন্তু ঐ ছ' পংক্তিতেই বিধৃত হয়ে রইলো 'অঞ্জলি'র মর্মকথা তার পথের দিশা—রবীন্দ্রনাথ যেমন আট পংক্তিতে বেঁধে দিয়েছিলেন 'ধূমকেতু'র প্রাণবাণী :

'হে তরুণ! কোন্ অঞ্জলি দিতে এই যুগে আসিয়াছ?
কোন্ সে অসম্ভবের সাগর স্রোতে তুমি ভাসিয়াছ?
তুমি কি ঘরের? অথবা পীড়িত ভারতের তুমি কেহ?
ভোগের অথবা পরম-ভোগের তরে তব প্রাণ দেহ?
আজি ভারতের সন্ধিক্ষণে অঞ্জলি নিবেদন,
করিবে কি তব সকল শক্তি আত্মা ও যৌবন?'

কবিতাটি 'অঞ্জলি'-তে এবং ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৫ সালের 'নওজোয়ান' পত্রিকার নজরুল সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। পরে আবদুল কাদির সম্পাদিত 'নজরুল রচনা সম্ভারের' ভূমিকায়গ্রথিত হয়েছে।

॥ কোন কুসুমে তোমার আজি ॥

(একটি গান)

কবি থাকেন তখন কলকাতার মসজিদবাড়ী স্ট্রীট।

দোতলার পশ্চিম দিকের একখানা ঘর যেন পাড়াটাকে মাত করে রেখেছে। ওখানে বসেছে আড্ডা—দরবারী আড্ডা। পাড়ার

কয়েকজন এসে জুটেছেন কবির সংগে—সুতরাং আড্ডা জমজমাট। এলেন খান মঈনুদ্দিন যেমন আসেন মাঝে মাঝে। আজ আবার সংগে এনেছেন গানের খাতা—কবিকে দেখাবেন। কিন্তু আসরের পরিপূর্ণ রূপ দেখে তিনি আর কিছুই বললেন না। বসে রইলেন চুপচাপ। কিন্তু আগন্তুকের বিরাম নেই। এলেন জনাব তকরামউদ্দীন আহমদ বিখ্যাত বংশীবাদক। শিল্পীর ঘরে শিল্পীর আগমন। কিন্তু তিনি এসেও আর কিছুই বলছেন না। বলবেন কাকে? যে ভোলানাথের সঙ্গে তাঁর প্রয়োজন—তিনি দাবা পেয়ে দুনিয়া ভুলেছেন, ভুলে ভোলানাথ হ'য়ে বসে আছেন। বেকার সেখানে মাত্র একজন—খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন। সুতরাং তাঁর সঙ্গেই তিনি আলাপ আরম্ভ করলেন। বললেন, একটা গানের বড্ড দরকার পড়েছে—পারেন লিখে দিতে?

এর আগেই মঈনুদ্দীনের কয়েকটা গানের রেকর্ড হ'য়েছে। সে ভরসাতেই তকরীম সাহেব তাঁকে গান লিখে দিতে বললেন। খান সাহেব আঙ্গুল দিয়ে সোজা কবিকে দেখিয়ে দিলেন। কিন্তু তকরীম সাহেব কবিকে বলতে নারাজ। বললেন, উনি খেলায় মত্ত—আপনিই লিখুন। আর হ্যাঁ, আসল কথাটাই বলতে ভুলে গেছি—গানের শেষ শব্দটি কিন্তু হ'বে 'বল বল'। সুর আমি ঠিক করেই রেখেছি। এখন প্রয়োজন গানের।

হ্যাঁ। খান সাহেব মাথা নাড়লেন। তারপর সেখানেই গান লিখতে বসে গেলেন। গানের খাতা তো তাঁর সঙ্গেই ছিল।

কবি লক্ষ্য করলেন ব্যাপারটা। শুধুলেন, কিরে—কি হচ্ছে?

খান সাহেব বুঝি তখন ক' পংক্তি লিখেছিলেন। খাতাখানা আগিয়ে দিয়ে সব ঘটনাটা খুলে বললেন। সব শুনে কবি একটু হাসলেন। তারপর কতকটা আপন মনে বললেন, পংক্তির শেষে 'বল বল' বসাতে হ'বে নইলে গান কাজে আসবে না। আচ্ছা।

কবি যখন খাতা ধরেছেন আর ভয় কী!

নজরুল এখন অন্য মানুষ। হট্টগোল থেকে সরে এসেছেন; আড্ডা থেকে সরে এসেছেন। বোধহয় পৃথিবী থেকেও সরে এসেছেন। তিনি এখন অন্য জগতের মানুষ। ধ্যানী, তপস্বী দাবা খেলা ভেঙে যাওয়ায় চারপাশে তখন কেবল চীৎকার নয়, হাট বসে গেছে। সেই হাটের মাঝে বসে তিনি যেন ধ্যানস্থ হ'য়ে গেলেন।

কিছু পরে খাতায় কলম বসল এবং অতি অল্প সময়ে একটি অপূর্ব সঙ্গীতের জন্ম হ'লো। ভাবে এবং গঠনরীতিতে অনবদ্য সংগীত। বিন্যাসে কোন দুর্বলতা নেই, একেবারে নিটোল। গানের উপর চোখ বুলিয়ে তকরীম সাহেব তো একেবারে আত্মহারা। ঠিক হ'য়েছে যেমনটি চেয়েছিলেন:

"কোন কুসুমে তোমায় আমি পূজিব নাথ বল বল
তোমার পূজার কুসুম ডালা সাজায় নিতি বনতল॥"...

ইত্যাদি।

তকরীম সাহেব তাঁর প্রয়োজন মিটিয়ে নিলেন। এর অল্পকাল পরেই গানটি হিজ মাস্টার্স ভয়েস কোম্পানিতে রেকর্ড করা হয়। গানখানি কবির "গুলবাগিচা" গ্রন্থে স্থানলাভ করেছে।

॥ নিশি ভোর হ'ল জাগিয়া ॥

সেদিন কবি ছিলেন জেলেটোলা লেনে, বন্ধুবর শ্রীনলিনীকান্ত সরকারের বাসায়। এখানে কবি প্রায়ই আসতেন, অধিকাংশ সময় রাত কাটিয়ে যেতেন। দুই বন্ধু মিলে নানান কথা হতো— গানের কথা, কবিতার কথা, আড্ডার কথা, জলসার কথা।

বৈঠকখানায় বসেছিলেন তাঁরা। নির্জন দুপুর। পাড়াটা বুঝি মধ্যাহ্নের অলস তন্দ্রায় ঝিমিয়ে পড়েছে। গাছপালার শাখা

শুশাখাতেও তন্দ্রা ছড়ান ঢুলু ঢুলু ভাব। সেই প্রাণহীন দুপুরে হঠাৎ কোত্থেকে যেন এক ঝলক প্রাণপ্রবাহ ছুটে এল। সুরে সুরে পল্লীপথ উতলা হ'য়ে উঠেছে। সুর নয়—যেন সুধা বর্ষণ হ'চ্ছে। কী ব্যাপার। দেখা গেল দু'জন হিন্দুস্থানী গান গেয়ে চলেছে—গজল গান। একজন পুরুষ, অন্যজন নারী। তখনো তারা দূরে রয়েছে। কবি তন্ময় হয়ে শুনলেন কিছুক্ষণ। শুনে সুরের স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে গেলেন।

গলায় হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে ওরা গান গেয়ে চলেছে। নারীর লক্ষ্য পথের দিকে, পুরুষ ঊর্ধ্বমুখী। তারাও যেন স্বপ্নের মধ্যে রয়েছে। কবি বললেন, ডাক ওদের গান শুনব।

প্রথমে নলিনীবাবু বুঝি অস্বীকার করেছিলেন হিন্দুস্থানীদের ডেকে গান শোনায়। কিন্তু তাঁর আপত্তি টি'কল না। কবির আগ্রহ ক্রমেই বেড়ে চলল। শেষে তাদের ডাকা হ'লো বৈঠকখানায়। তারা এসে বসে আমেজ করে গান শুরু করল। একটা গান শেষ হয়—কবি দ্বিতীয় গানের অনুরোধ করেন। দ্বিতীয় শেষ হ'লে ফরমায়েস আসে তৃতীয়ের। এমনি করে তারা একে একে অনেকগুলো গান শোনাল। তারাও খুশী—এমন ভদ্র আর সমঝদার শ্রোতা তারা বড় একটা পায় না। গানের মাঝে মাঝে কবি আহা করে ওঠেন। চোখ বন্ধ করে তালে তালে তেহাই সারেন তক্তপোশে। গান শুনিয়ে কিছু পরে তারা চলে গেল। এবার শুরু হ'লো কবির সৃষ্টি। তিনি সেখানে বসেই সৃষ্টি-মুখর হ'য়ে উঠলেন। হিন্দুস্থানীদের গজল গানের রেশ তখন আবহাওয়াকে মধুর করে রেখেছে। কান পাতলেই শোনা যায় তাদের 'পিয়া পিয়া' গানের মধুময় হিল্লোল। গানটির সুর তখনো যেন স্পষ্ট হয়ে কানে বাজছে। কবি তখন সৃষ্টিতে তন্ময়। মাত্র কয়েকটি মিনিট—সৃষ্টি হলো প্রথম গজল গান (শ্রীনলিনীকান্ত সরকারের মতে) 'নিশি

ভোর হ'ল জাগিয়া, পরাণ পিয়া।' একই সুর, একই তাল। অপূর্ব গজল।

'নিশি ভোর হ'ল জাগিয়া, পরাণ পিয়া' গানটিই কবির প্রথম গজল গান কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কিন্তু সে যাই হোক—'পিয়া পিয়া' গানখানি যে এ গজলটির উৎস সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এর পর গজল রচনায় কবি উন্মত্ত হ'য়ে উঠলেন। তাঁর সৃষ্টিতে যেন গজলের বন্যা এলো। সুরের মায়াজালে বাংলার সংগীত জগৎ মাতোয়ারা হয়ে উঠল। কবি এখন আর বিদ্রোহী নন—বিরহী, কখনো বা প্রেম-পাগল। সমগ্র বিদ্রোহী সত্তা এখন প্রেমিক সত্তায় পরিণত। রূপ তন্ময়—স্বপ্নাচ্ছন্ন। প্রেমের সুমহান স্পর্শে গজলের প্রবহমান ধারা রইলো অক্ষুণ্ণ।

অসি ছেড়ে বাঁশী ধরায় কবির অনেক বন্ধু মনোক্ষুণ্ণ হলেন। তাঁরা এটা চান নি। অনেক চরমপন্থী রাজনৈতিক দলও ক্ষেপে গেল। তাঁরাও এটা চান নি। কিন্তু তাঁরা না চাইলে কী হবে—রসের সন্ধান যিনি একবার পেয়েছেন— তাঁকে সে পথ থেকে ফেরান কঠিন। নজরুল তখন থেকে গজলের অমৃতলোকে বাস করতে লাগলেন।

গানটি সম্ভবত 'নজরুল গীতিকা'য় স্থান পেয়েছে।

॥ পাগল পথিক ॥

নজরুল যখন সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন তখন ভারতীয় রাজনীতিতে একচ্ছত্র সম্রাট গান্ধীজী। এই অর্ধনগ্ন মানুষটির ইশারায় তখন নিখিল ভারতবর্ষ ওঠে বসে। যা বলবেন তাই হবে, কেবল মুখের কথা।

যুগটি ছিল অসহযোগ আন্দোলনের যুগ। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সে আন্দোলনকে জোরদার করে তুলছে। কবিও কিছুদিনের জন্যে হলেও এই আন্দোলনে বিশ্বাসী হয়ে পড়েন। অবশ্য অল্পকালের মধ্যে সে বিশ্বাস ভেঙ্গে যায়। কিন্তু সে অন্য কথা।

মহাত্মার নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন তখন চরম আকার ধারণ করেছে। মুক্তিকামী জনগণ উন্মত্ত। দেশবাসীর মনে হলো বহুযুগ বাঞ্ছিত স্বাধীনতা বুঝি আগত। স্বাধীনতার বাণী-শিল্পী নজরুল আশান্বিত হয়ে উঠলেন। তিনি এ আন্দোলনকে তো পূর্বেই সমর্থন করেছিলেন এখন সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করলেন।

নজরুল তখন কুমিল্লায়। এ সময় আন্দোলনটি ভয়াবহ আকার ধারণ করে। আন্দোলনের নেতা গান্ধীজীর প্রতি কবি তাঁর মুগ্ধ মনের শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। একটি অর্ধনগ্ন স্বাধীনতাকামী পাগল মানুষ যেন সারা ভারতবর্ষকে পাগল করে তুলেছে। কবি তাঁর বাসনাকে ভাষায় রূপ দিলেন। লিখলেন: পাগল পথিক:

“এ কোন পাগল পথিক ছুটে এলো বন্দিনী মার আঙিনায়.
ত্রিশ কোটি ভাই মরণ-হরণ গান গেয়ে তাঁর সঙ্গে যায়।
অধীন দেশের বাঁধন-বেদন
কে এলো রে করতে ছেদন
শিকল বেদীর দেবীর বুকে মুক্তি-শঙ্খ কে বাজায়।”

কবি কেবল এই গানটি রচনাই করেন নি, তিনি এতে সুর দিয়েছিলেন এবং কুমিল্লার কোন একটি মিছিলের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে গেয়েছিলেন।

কবিতাটি “বিষের বাঁশী”র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

॥ চরকার গান ॥

অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচীর মধ্যে প্রধান ছিল বিদেশের সকল ব্যবহার্য দ্রব্য পরিত্যাগ করা এবং তার স্থানে স্বদেশের নির্মিত দ্রব্যকে সাদরে গ্রহণ করা। স্বদেশে তৈরী জিনিস যতই খারাপ এবং নিম্নস্তরের হোক না কেন তাকে বরণ করে নিতে হবে।

বিদেশী দ্রব্যকে বর্জনের জন্য সকলে তো বদ্ধপরিকর, কিন্তু নিত্যব্যবহার্য জিনিস স্বদেশে মেলে কই। যন্ত্রাভাব প্রধান হয়ে দেখা দিল। গান্ধীজী বললেন, চিন্তা কী? আমাদের স্বাবলম্বী হতে হবে। চরকা কাট, কাপড় বানাও, হস্ত-শিল্পের প্রসার হোক। তাঁত-বস্ত্রে দেশ স্বাবলম্বী হোক।

নজরুল স্বাধীনতা চান। স্বাধীনতা ছাড়া তিনি অন্য কিছু বোঝেন না। তিনি গান্ধীজীর এ মতবাদকে স্বাধীনতার পরি-প্রেক্ষিতে বিচার করে সমর্থন করলেন। কবির সৃষ্টিতে তার স্বাক্ষর পাওয়া গেল। তিনি লিখলেন চরকার গান। চরকার শব্দে তিনি স্বরাজের আগমনী শুনতে পেলেন:

> "তোর ঘোরার শব্দে ভাই
> সদাই শুনতে যেন পাই
> ঐ খুল্ল স্বরাজ-সিংহদুয়ার,
> আর বিলম্ব নাই।..."

স্বরাজের আগমন ধ্বনি নয়, অসহযোগ আন্দোলনের সময় হিন্দু মুসলিম এক জোট হয়ে যে ভাবে এগিয়ে ছিল তাতে কবি বিশেষ রূপে আশান্বিত হয়েছিলেন। হিন্দু-মুসলিম মিলনের কামনা তাঁর তো আজীবনের। এ কবিতাতেই তিনি লিখলেন:

"হিন্দু-মুসলিম দুই সোদর
তাদের মিলন-সূত্র ডোর রে
রচলি চক্রে তোর।"...

হুগলির একটি জনসভায় (কবি-শিষ্য হুগলী নিবাসী শ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের মতে) স্বয়ং গান্ধীজী সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। লক্ষ জন সমাবেশের এই সভায় কবি হারমোনিয়ম সহযোগে 'চরকার গান' খানি সকলকে গেয়ে শোনান। গান্ধীজী বাংলা ভাল জানতেন না—তবুও তিনি গান শুনে তো মহাখুশী। কবির গান যারা শুনেছেন তাঁরা জানেন কবি যখন গান—অন্তর দিয়েই গান। এই গানখানি তিনি সেদিন হৃদয় ঢালা দরদ দিয়ে অঙ্গভঙ্গী সহকারে এমন ভাবে গেয়েছিলেন যে শ্রোতাদের মধ্যে উদ্দীপনায় অনেকের চোখই সজল হয়ে উঠেছিল। স্বয়ং গান্ধীজী এমন আবেগ-বিহ্বল হয়ে পড়েন যে নিজ কণ্ঠের মালা খুলে তিনি কবির কণ্ঠে তুলে দেন। কবি মাথা পেতে সে মহান আন্তরিকতা গ্রহণ করেন।

তবুও কিছু অতৃপ্তি বোধ করেছিলেন গান্ধীজী। গানখানির সম্পূর্ণ অর্থ তাঁর কাছে অপরিজ্ঞাত রয়ে গেল। তিনি সম্পূর্ণ গানখানির আক্ষরিক অর্থ জানার বাসনা প্রকাশ করেন। তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছিল। শান্তিনিকেতনের কোন একজন ইংরাজীর অধ্যাপক গানখানিকে অনুবাদ করে গান্ধীজীর নিকট পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। গানখানি কবির "বিষের বাঁশীর" সম্পদ হয়েছে।

॥ বারাঙ্গনা ॥

"বারাঙ্গনা" কবিতাটি প্রকাশিত হবার পর বাংলা সাহিত্যে গেল গেল রব উঠেছিল। কবিতাটিতে বারাঙ্গনাকে মা বলে সম্বোধন করেছেন, তাকে সতীসাধ্বী নারীর সমাসনে বসাতে চেয়েছেন। এই নিয়ে গোলযোগ। বারাঙ্গনা যদি মা হলো তা হলে পবিত্রতা রইলো কোথায়। গেল গেল রব তো উঠেই ছিল, বাংলা সাহিত্যের দুর্গতিতে সকলে চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে পড়লেন। স্বয়ং মোহিতলাল এগিয়ে এলেন। সাহিত্যকে এ অপবিত্রতার হাত থেকে বাঁচাতেই হবে। ১৩৩৪ সালের আশ্বিন মাসের শনিবারের চিঠিতে তিনি 'বারাঙ্গনার' বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ জানালেন, "সম্প্রতি একটি কবিতায় নব সাম্যবাদ প্রচারিত হইয়াছে। এই কবিতাটি নাকি কবির একটি উৎকৃষ্ট কীর্তি। ইহাতে এক প্রকার nihilism বা নাস্তিক্যনীতির উল্লাস আছে। ইহা বর্তমান যুগের রসপিপাসু পাঠক-পাঠিকার বড়ই আদরের সামগ্রী। কবিতাটির যতটুকু মনে আছে, তাহাতে ইহাই কবির বক্তব্য বলিয়া মনে হয় যে, জগতে সকলেই ভণ্ড, চোর ও কামুক, অতএব জাতিভেদের প্রয়োজন নাই, আইস, আমরা সকলে ভেদাভেদ দূর করিয়া মহানন্দে নৃত্য করি। এই সাম্য-মৈত্রীর আবেগে কবি বেশ্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, 'কে তোমায় বলে বারাঙ্গনা মা?' বিদ্রোহের চরম হইল বটে, কিন্তু কথাটা দাঁড়াইল কী? এই উক্তিতে সমস্ত নারী জাতীকে অপমান করা হইয়াছে, অথচ বেশ্যার মর্যাদাও এতটুকু বাড়ে নাই।"...

সমালোচনাটি সুদীর্ঘ। আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত করলাম। উদ্ধৃত অংশটুকু মনোযোগ দিয়ে পড়লেই বোঝা

যাবে এটি আগাগোড়া আক্রোশজাত। অন্ততঃ এ সমালোচনায় কবির একদা-বন্ধু মোহিতবাবু কবির প্রতি সুবিচার করেন নি। কবি বারাঙ্গনাকে মাতৃ-সম্বোধন করেন নি—তার ভিতর যে চিরন্তন মাতৃত্ব রয়েছে তাকেই মা বলে আখ্যায়িত করেছেন। তা ছাড়া কবিতাটির মধ্যে তিনি সকলকে কামুক বা লম্পট বলেন নি—মোহিত বাবু এখানে বাড়াবাড়ি করেছেন। কবির মূল লক্ষ্য এই যে, নারীর প্রতি ধর্মান্ধ পুরুষরা যেভাবে প্রতিনিয়ত অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে তার অবসান ঘটিয়ে নারীকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা। নারীর কল্যাণময়ী, মঙ্গলময়ী রূপকেই তিনি তুলে ধরতে চেয়েছেন। কবিতাটির কোন কোন ছত্রে কবিও যে কিছু কিছু অতিরঞ্জিত করেন নি এমন নয়। অবশ্য এর পিছনে কারণ ছিল : তাঁর উপলব্ধি-জাত সত্য ছাড়াও একটি প্রত্যক্ষ ঘটনা এমন তেজোদীপ্ত কবিতা রচনায় তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ঘটনাটি এই :

কলকাতার হ্যারিসন রোড আর কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে কোন দিলখুশা রেস্টুরেন্টে বসে কবি নিয়মিত চা খেতেন। চা খেতে বসে প্রায়ই তাঁর দৃষ্টি পড়তো পথে এক ভিখারিণী নারীর প্রতি। সুন্দরী যুবতী নারী পথিকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে যথেষ্ট। অথচ তাকে কোনদিন উচ্ছৃঙ্খল বা অভদ্র হতে দেখা যায় নি। মেয়েটি প্রতিদিন ভিক্ষা করতে আসে পেটের জ্বালায় অথচ তাকে দেখে পথিকেরা নানা প্রকার অশালীন কথা বলে বিদ্রূপ করতো। শত অপমানজনক কথা শুনেও মেয়েটি কিছু বলতো না, বলতে পারতো না—চুপচাপ বসে থাকত। হয়তো তাকে দেখে কিছু পরে আর একজন একেবারে অশ্লীল ভাষায় চূড়ান্ত রসিকতা করলো। কবি প্রায়ই এটা লক্ষ্য করতেন। প্রতিদিনের এ সকল ঘটনা তাঁকে বিচলিত করেছিল, তিনি বিশেষ রূপে চিন্তিত হয়ে উঠেছিলেন। নারীত্বের এ অপমান তাঁর কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। শোনা যায়, একদিন এক অভদ্র ব্যক্তিকে

অশালীন উক্তির জন্যে উপযুক্ত সাজাও দিয়েছিলেন তিনি। যা হোক প্রতিদিনের এ ঘটনাগুলি কবিতা রচনার উপাদান রূপে তাঁর মনে সঞ্চিত হচ্ছিল। একদিন তিনি সত্য সত্য সেই সঞ্চিত উপাদানগুলিকে কাব্যে রূপ দিলেন। নারীর প্রতি সমব্যথী হয়ে লিখলেন কবিতা 'বারাঙ্গনা'—ভণ্ড পুরুষদের মুখোশ তিনি এ কবিতায় একেবারে উন্মুক্ত করে দিলেন: "কে তোমায় বলে বারাঙ্গনা মা;

কে দেয় থুতু ও গায়ে?
হয়ত তোমায় স্তন্য দিয়াছে
সীতাসম সতী মায়ে।"
ইত্যাদি।

কবিতাটি ১৯২৫ সালের ২৫শে ডিসেম্বর 'লাঙ্গল'-এর ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। পরে এ টি 'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থের সম্পদ হয়েছে। 'বারাঙ্গানা' কবিতাটির জন্মেতিহাস রূপে আমি যে ঘটনার কথা উল্লেখ করলাম এটি শ্রীপ্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের মুখে শুনেছি। এই ঘটনার সময় কবির সঙ্গে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়, মণিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। এই ঘটনাটি সেকালে অনেকের বুকেই বেজেছিল। ঘটনাটি বিপুল ভাবে আলোড়ন তুলেছিল শিল্পাচার্য শ্রীভোলা চট্টোপাধ্যায়ের (ভি. সি) মনে। তিনি শিশুক্রোড়ে এই যুবতী রমণীর একটি অপূর্ব ছবি আঁকেন এবং ছবির নামকরণ করেন "মা"। এই অপূর্ব ছবিটি বিদেশে পনর হাজার টাকায় বিক্রয় হয়। এই পয়সা শিল্পাচার্য নিজে গ্রহণ করেন নি—ওই মহিলাটির পুনর্বাসনের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করে দেন। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই, শিল্পাচার্যের সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠতা ও আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায়।

'কল্লোল'। অভিনব মাসিক পত্রিকা। সত্যি, কল্লোলের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে দূরাগত সমুদ্রের কল্লোল ধ্বনি শোনা গিয়েছিল। গতানুগতিকতার মধ্যে, প্রাচীন ধারাবাহিকতার মধ্যে, কল্লোল গোষ্ঠী যেন দু' কূলপ্লাবী বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন। সাহিত্যে আঙ্গিক প্রকরণ, রীতি নীতি সকল স্তরেই এঁরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এঁদের সমবেত প্রচেষ্টায় তৎকালীন গতানুগতিক সাহিত্যের ভিত্তিমূল নড়ে উঠেছিল। সাহিত্যে নতুনত্বের সূচনা করলেন শরৎচন্দ্র, নরেশ সেনগুপ্ত। গল্পে নতুন দিগন্তের দ্বার খুলে দিলেন প্রেমেন অচিন্ত্য আর কবিতায় নজরুল একাই একশ'—সংগে বুদ্ধদেব প্রেমেনের দল, নতুনদের এ সমবেত প্রচেষ্টা বাধা দেবে কে? বুড়োদের তরফ থেকে হৈ চৈ যে ওঠে নি এমন নয়—কিন্তু সব বৃথা। 'কল্লোল' তখন আর কেবল মাত্র একটি পত্রিকা নয়— আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কর্ণধার, প্রতিভাবান সাহিত্যিকদের সকলেই সেখানে সমবেত।

এই কল্লোলের পুরোহিত গোকুল নাগ আর দীনেশ দাস। গোকুলের গানের সংগে নজরুলের সম্পর্ক কেবল বন্ধুত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, হয়তো আরো কিছু বেশী, আত্মীয়াধিক প্রাণপ্রিয়। দু'বেলা দেখা না হলে একে অপরের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েন, উদগ্র হয়ে ওঠেন। সম্পর্ক সেখানে এমন ঘনিষ্ঠ, নিবিড়—হঠাৎ দীর্ঘ দিনের জন্যে দেখা নেই গোকুল নাগের।

ব্যাপার কি?

গোকুল নাগের জ্বর হয়েছে, কঠিন জ্বর যক্ষ্মা। বাঁচবেন কিনা সন্দেহ। ডাক্তারেরা উপদেশ দিয়েছেন বায়ুপরিবর্তন চাই, তাহলে হয়তো কিছু উপকার হতে পারে। সেই বায়ু পরিবর্তনের জন্যে তিনি গেলেন দার্জিলিং-এ, সংগে চলল চিকিৎসা।

কল্লোল গোষ্ঠী এখন কিছুটা নির্জীব হয়ে পড়েছে। পবিত্রও নেই ধারে কাছে। তিনি গেছেন গোকুলের সংগে দার্জিলিং-য়ে। সেবা শুশ্রূষা করবেন খাওয়াবেন দাওয়াবেন। সবাই অপেক্ষা করছেন কবে কি সংবাদ আসে। দিন যায়। কিছু কিছু সংবাদ আসে, ভাল সংবাদ। গোকুল এখন উঠে বসছেন, আজ বারান্দায় ছাড়া পেয়েছেন, আজ বেরিয়েছেন। কল্লোল গোষ্ঠীতেও আশার সঞ্চার হয়। আশা আনন্দে সকলের মন দুলে ওঠে। নজরুল প্রায়ই এসে সংবাদ নিয়ে যান। তিনিও খুশী হন—খুব খুশী।

কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। কাঞ্চনজঙ্ঘার সোনাবরণ অপূর্ব দৃশ্য দেখতে দেখতে গোকুলচন্দ্র নাগ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণ।

সংবাদ শুনে নজরুল তো প্রায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। ভাবপ্রবণ কবি, প্রাথমিক শোক কাটিয়ে উঠে লিখলেন দীর্ঘ কবিতা 'গোকুল নাগ'। গোকুল নাগের মৃত্যুতে এই প্রথম অর্ঘ। এরপর বুদ্ধদেব বসু এক কবিতা পাঠালেন ঢাকা থেকে আর অপ্রত্যাশিত ভাবে পাওয়া গেল ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের অভিনন্দন, গোকুল অভিনন্দন।

'গোকুল নাগ' কেবল গোকুল স্মৃতি তর্পণ নয়, কল্লোল সম্পর্কে কবির উজ্জ্বল প্রত্যয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে এর মধ্যে। এই অপ্রচলিত কবিতাটির কিছু অংশ আমরা এখানে উদ্ধৃত করলাম :

"সেই পথ, সেই পথ-চলা গাঢ়
স্মৃতি,
সব আছে—নাই শুধু নিতি-নিতি
নব নব ভালবাসা প্রতি দরশনে
আদি নাই অন্ত নাই ক্লান্তি
তৃপ্তি নাই—
যত পাই তত চাই—আরো আরো
চাই,

সেই নেশা, সেই মধু
নাড়ী ছেঁড়া টান
সেই কল্লোলোকে নব নব অভিমান
সব নিয়ে গেছে বন্ধু। ..
সুন্দরের তপস্যায় ধ্যানে আত্মহারা
দরিদ্রের দর্পতেজ নিয়ে এল
যারা,
যারা চির সর্বহারা করি আত্মদান
যাহারা সৃজন করে করে না
নির্মাণ,
সেই বাণী-পুত্রদের আড়ম্বরহীন
এই সহজ আয়োজন এ স্মরণ দিন
স্বীকার করিও কবি, যেমন
স্বীকার
করেছিলে তাহাদের জীবনে
তোমার।....
দু'দিনে ওদের গড়া পড়ে ভেঙ্গে
যায়,
কিন্তু স্রষ্টাসম যারা গোপনে
কোথায়
সৃজন করিছে জাতি সৃজিছে
মানুষ
রহিল অচেনা তারা।...

১৩৩২ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'কল্লোলে' 'গোকুল নাগ' মুদ্রিত হয়, পরে কবির 'সর্বহারা' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

॥ বার্ষিক সওগাত ॥

১৯২৬ সাল।

'সওগাত তখন বাঙ্গালি মুসলিম জনগণের কাছে সওগাত হয়েই দেখা দিয়েছে। প্রতিটি সংখ্যা বার হয় আর পাঠকের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়।

সওগাত তখন আত্মনির্ভর।

সওগাতের আড্ডাও তখন জমজমাট।

আড্ডা—নিছক আড্ডা। গাল-গল্প চলে, অনেক রাজা মারা হয়—শেষে এক সময় উঠে যায় সকলেই। আড্ডা ভেঙে যায়।

কিন্তু নিছক আড্ডা থেকেই মাঝে মাঝে ভাল কিছুর জন্ম হয়, মহৎ কিছুর সৃষ্টি হয়। তাই-ই হলো। একদিন আড্ডায় বসে চা ফুঁকতে ফুঁকতে কে যেন প্রস্তাব করল—'বার্ষিক সওগাত' বার করলে হয় না।

হয়-ই তো – নিশ্চয়ই হয়। ব্যস—প্রস্তাব, সমর্থন, অনুমোদন সব কিছুই সংগে সংগে হয়ে গেল। কাজ শুরু হয়ে গেল পরের দিন। লেখা চাই, ছবি চাই, কাগজ চাই, সব চাই। কর্মীও কিছু কিছু পাওয়া গেল। মঈনুদ্দিন খান ছুটলেন নজরুলের কাছে। তাঁর লেখা চাই আগে, 'নজরুল ছাড়া বার্ষিক সওগাত বেরুবে না। বেরুতে পারে না। সওগাত গোষ্ঠীর মধ্যমণি - সুতরাং তিনি বাদ পড়লে সব কিছুই অচল।

নজরুল তখন কৃষ্ণনগরে।

কলকাতা থেকে কৃষ্ণনগর। কম কথা নয়। তবুও ছুটলেন মঈনুদ্দিন। প্রথম দিন কবিকে পাওয়া গেল বাড়িতেই। বার্ষিক সওগাত সম্পর্কে সব কিছুই বুঝিয়ে বলা হলো। সব শুনে কবি বললেন, আজ নারে আর একদিন আসিস্।

আর একদিন নয়— অনেক দিন যেতে হলো মঈনুদ্দিন সাহেবকে। অধিকাংশ দিনই পাওয়া গেল না তাঁকে। অনেক ঘোরাফেরার পর শেষে যেদিন তাঁকে পাওয়া গেল, মঈনুদ্দিন সাহেব আর ছাড়েন না, ওঠেন না। কবিতা চাই, কবিতা পেলে উঠে যাবে!

লিখতে বসে গেলেন কবি। কবিতা বা গান লিখতে তাঁর বেশি সময় লাগতো না। একবার সূত্র পেলে হয়— খস খস করে কলম এগিয়ে চলল, অবিরাম। যখন থামল—কবিতাও শেষ হয়ে গেছে তখন! অফুরন্ত ভাণ্ডার, অপূর্ব ক্ষমতা, অসাধারণ প্রতিভা।

শেষে কবিতা দিলেন একটা, নাম 'বার্ষিক সওগাত'! পরিবেশের উপযোগী, সংখ্যার উপযোগী—সুন্দর কবিতা। কবিতা নিয়ে যখন মঈনুদ্দিন ফিরে এলেন সওগাতে—বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে আনন্দের তুফান বয়ে গেল। নাসিরউদ্দিন সাহেব খুব খুশী। সান্ধ্য মজলিশে চলল চা পান আর কবিতা পাঠ। নজরুলের কবিতা 'বার্ষিক সওগাত'!

"বন্ধু গো সাকী আনিয়াছ নাকি বরষের সওগাত,
দীর্ঘ দিনের বিরহের পরে প্রিয় মিলনের রাত।
রঙিন রাখী, শিরীন শারাব, মুরলী, রোবাব, বীণ,
গুলিস্তানের বুলবুল পাখী, সোনালী রূপালী দিন।...
তাঞ্জাম ভরা আঞ্জাম এযে কিছুই রাখনি বাকী,
পুরোনো দিনে হাত বাঁধিয়াছ নতুন দিনের রাখী।...
ঢাকিও বন্ধু, তব সওগাতী রেকাবী তাহাই দিয়ে,
দিবসের জ্বালা ভুলে যেতে চাই, রাতের শিশিরে পিয়ে।"

বেদনার বাণে সয়লাব সব, পাইনে সাথীর হাত,
আন গো বন্ধু নূহের কিশ্‌তি 'বার্ষিক সওগাত।'

কবিতাটি ১৯২৬ সালের 'বার্ষিক সওগাতে', ছাপা হয়েছিল। পরে এটি জিঞ্জির কাব্য গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে।

॥ আসে বসন্ত কুমার ॥

মিস্‌ ফরিদা। নৃত্য কলায় এক বিশেষ নাম। মিশর থেকে এলেন কলকাতায়। নাচ দেখাবেন। আলফ্রেড রঙ্গমঞ্চে তাঁর নৃত্য প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। বিরাট আয়োজন। কলেজ স্ট্রীট এবং হ্যারিসন রোডের ক্রসিং-এ ছিল আলফ্রেড রঙ্গমঞ্চ। এখনো আছে কিন্তু নাম পরিবর্তিত হয়েছে।

মাত্র দুটি কি তিনটি প্রদর্শনীতেই বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হলেন মিস্‌ ফরিদা। তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র। তাঁর নৃত্য-ভংগিমায় সবাই মুগ্ধ বিস্মিত।

নজরুল এবং মঈনুদ্দিন দুজনেই তখন সওগাতে সংগে জড়িত। একদিন তাঁরাও বেরিয়ে পড়লেন রঙ্গমঞ্চের উদ্দেশ্যে। যথা সময়ে তাঁরা রঙ্গমঞ্চের মধ্যে প্রবেশ করলেন লোকে লোকারণ্য। সবার চোখে মুখেই উদ্দীপনা, এমন নাচ নাকি ইতিপূর্বে আর দেখা যায় নি।

বিচিত্র আলোক সজ্জায় রঙ্গমঞ্চ বিচিত্ররূপ ধারণ করছে। হঠাৎ এক সময় সব আলো নিভে গিয়ে স্টেজে আলো জ্বলে উঠল তার সংগে সংগে সব কোলাহল স্তব্ধ। হলে যেন একটি মাত্র মানুষ আছে—সবাই এক দেহ এক প্রাণ। ধীরে ধীরে যবনিকা উত্তোলিত হল। উজ্জ্বল আলোকমালার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে মিস্‌ ফরিদা। মিশরীয় তরুনী—যেন অপ্সরী। দেহের সংগে শোভন করে বিচিত্র সজ্জায় সজ্জিত। তারপর সুরু হলো নৃত্য। দেহের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সে গতি ভংগিমায় লীলায়িত হয়ে উঠল, মাঝে মাঝে মনে হলে তাঁর সারা দেহের ওপর দিয়ে পরপর কয়েকটি

নদীর ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। সকলের হৃদয় স্পন্দন তখন বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। এবার তিনি নৃত্যের সংগে ধরলেন গান, মিশরীয় সংগীত। সে সংগীতের অমায়িক অর্থ কেউ বোঝেন না কিন্তু অংগভংগীতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তারপর সুরু হলো প্রদীপ নৃত্য এবং সব শেষে একটি উর্দু গজল যোগে নৃত্য। উর্দু গজলটি তিনি কলকাতায় এসেই শিখেছিলেন এবং ঐ একটি মাত্র গজলই তিনি জানতেন। এই গজলের সংগে তিনি যখন তাঁর অপূর্ব নৃত্য সুরু করলেন—হল তখন পূর্বাপেক্ষাও শান্ত হয়ে এলো। তিনি যেন সবাইকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছেন। নৃত্যের কোলা এবং সুরের মায়াজাল তখন সবাইকে স্বপ্নাচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

সেই বিখ্যাত উর্দু গজলটি ছিল এই :—

কিস্‌কি খায়রো মাঁয়
সাজনে,
কবরো মেঁ দিল হিলা দিয়া,
চায়নো-সে সো রাহাথা
ম্যাঁয়,
কিসনে মুঝে জাগা দিয়া।
ইত্যাদি।

নৃত্য সহযোগে গীত-এ গজল সবার মনে দারুণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু কবি নজরুলের মনে সে কিরূপ দোলা দিয়েছিল তা সে সময় বোঝা গেল না। বোঝা গেল তার কয়েকদিন পরে। কৃষ্ণনগর থেকে তিনি একটা গজল পাঠিয়েছেন—অবিকল সেই ফরিদার গাওয়া গজলের মত। একই ছন্দ একই সুর। নৃত্য পটিয়সী মিস্ ফরিদার গাওয়া গজল আর একটি গজলের জন্ম দিল।

কবি লিখলেন :

আসে বসন্ত ফুল বনে
সাজে বনভূমি সুন্দরী।
চরণে পায়েলা ঝুমুঝুম
মধুপ উঠিছে গুঞ্জরি ॥
ফুলরেণু মাখা দক্ষিনা বায়
বাতাস করিছে বনবালায়,
বন-করবী নিকুঞ্জ ছায়
মুকুলিকা ওঠে মুঞ্জরী ॥
ইত্যাদি।

গজলটি ১৩৩৩ সালের পৌষ সংখ্যা সওগাতে ছাপা হয়েছিল

॥ সব্য সাচী ॥

গান্ধীজী পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি কবি যে কিছুটা আস্থাশীল ছিলেন সে কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। কিন্তু এই আস্থা দীর্ঘ দিন অটুট থাকে নি। এর জন্যে নজরুলের বিশেষ মানস-প্রবণতাই দায়ী। তিনি নিরুপদ্রব আন্দোলনের প্রতি কোন দিন আস্থাশীল ছিলেন না। তিনি প্রায়ই বলতেন, শরীরের কোন জায়গায় বিষাক্ত ঘা হলে তাকে পুষে রাখা বাঞ্ছনীয় নয়—অস্ত্রোপচার করে বাদ দেওয়াই শ্রেয়। তাঁর রাজনীতি এই মতের পরিপোষক হয়ে উঠেছিল। তিনি বিপ্লববাদকেই বিশ্বাস করতেন। অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন করে নজরুল যে কিছু সংখ্যক কবিতা

লিখেছিলেন সে আমরা জানি। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর কণ্ঠে এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হলো। কবিতায় ও গানে তার রেশ পাওয়া গেল। তিনি গান্ধী মতবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন।

অসহযোগ আন্দোলন তখন পুরোমাত্রায় চলছে। কিছু কিছু লোক বিপ্লবকে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছে। মেদিনীপুরের চাষীরা খাজনা দেওয়া বন্ধ করল, মোপ্‌লা এবং শিখ চাষীদের বিদ্রোহ চরম আকার ধারণ করল আর ঠিক সেই সময় চৌরিচৌরায় দেখা দিল রক্তপাত। দলে দলে লোক কারাবরণ করতে পিছপাও হলো না। কিন্তু পিছিয়ে গেলেন গান্ধীজী। সামান্য খুন জখম হতেই তিনি এই আন্দোলনকে বন্ধ করে দিলেন। ইংরেজ সরকার জনগণের ওপর তো ক্ষিপ্ত হয়েছিলই, এখন সে ক্ষিপ্ততা চরম আকার ধারণ করল। নিরীহ জনগণের ওপর চলতে লাগলো অমানুষিক নির্যাতন।—অথচ গান্ধীজী নীরব। অসহযোগ আন্দোলনকে বন্ধ করে দিয়ে তিনি নীরব হয়েই রইলেন। তাঁর কণ্ঠে কোন তেজো-দীপ্ত নতুন সুর শোনা গেল না। গান্ধীজীর এই সিদ্ধান্ত ও নীরবতাকে কবি মেনে নিতে পারেন নি। তিনি এর মধ্যে বীর্যহীন কাপুরুষতা ও ভীরুতা লক্ষ্য করলেন। চরকার শব্দে যে কবি একদিন 'স্বরাজ রাজের আগমনী' শুনেছিলেন আজ তার বিরুদ্ধে গর্জন করা ছাড়া তিনি অন্য কোন উপায় দেখলেন না। সুতো কাটলে স্বাধীনতা আসবে এই দুর্বল মতবাদকে তিনি উপেক্ষা করলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, 'গান্ধীর দল চরকা কাটে—আমরা কাটব মাথা।' নতুন রূপে তিনি আহ্বান জানালেন সব্যসাচীকে যোওয়ানদের নতুন শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করার প্রতিজ্ঞা নিলেন। লিখলেন 'সব্যসাচী' চরকার বিরুদ্ধে জ্বলন্ত প্রতিবাদ তার মধ্যে ধ্বনিত হলো:

সুতো দিয়ে মোরা স্বাধীনতা চাই,
বসে বসে কাল গুনি !
জাগো রে জোয়ান ! বাত ধরে গেল
মিথ্যার তাঁত বুনি।
ইত্যাদি।

গান্ধী মতবাদের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদমূলক কবিতাটি কবির 'ফণি-মনসা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

॥ একটি সম্পাদকীয় ॥

১৯২৪ সালের কথা।

নজরুল তখন নব পর্যায় 'নব যুগের' প্রধান সম্পাদক। দেশের রাজনীতিতে তখন একটা অজানা আশংকা মাথা চাড়া দিয়ে উঠ্‌ছে। চারিদিকেই যেন একটা থমথমে ভাব। জনগণকে সঠিক পথে পরিচালনার জন্যে যেন কেউ এগিয়ে আস্‌ছে না। সাধারণ মানুষকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্‌বুদ্ধ এবং উত্তেজিত করার জন্যে যে কণ্ঠের প্রয়োজন তা কারো মধ্যেই নেই। কোন নেতার কণ্ঠেই তেজদীপ্ত ঘোষণা শোনা যাচ্ছে না। বিশেষ করে গান্ধীজীর কণ্ঠেও কোন উত্তেজনা নেই দেখে কবি অত্যন্ত ক্ষুন্ন হলেন। জনগণ অস্থির। বহু আকাংখিত স্বাধীনতা আগত-প্রায়—অথচ নেতাদের একি নির্বীর্য ভাব। এর বিরুদ্ধে কবি রুখে দাঁড়ালেন। তিনি জ্বালা-ময়ী ভাষায় এক সম্পাদকীয় লিখলেন, লিখলেন কবিতায়। কবিতাতেও তিনি মাঝে মাঝে সম্পাদকীয় লিখতেন, এ সম্পাদকী-য়তে তিনি একেবারে সরাসরি গান্ধীজীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। লিখলেন :

…'প্রলয়কে কে বাঁধবে তোমার
বলয় পরা নর্তকী?
এ অরণ্যে সিংহ থাকে
অহিংস মহাত্মাকে
দেও গে তোমার
হরিনামের হর্তকী॥"…

এই বিখ্যাত সম্পাদকীয় নবযুগে মুদ্রিত হয়েছিল কিন্তু আজ পর্যন্ত কবির কোন কাব্য গ্রন্থে সংকলিত হয় নি।

॥ আর একটি সম্পাদকীয় ॥

এর অল্প কিছুদিন পর।

মহাত্মার স্বরূপ যেন পাল্টে গেল। তিনি আর নীরব নন। তাঁর কণ্ঠেও উদ্দামতা জেগেছে। যে উদ্দীপনাময় বাণী শোনার জন্যে নজরুল তথা দেশবাসী অস্থির হয়ে উঠেছেন তাই-ই শোনা গেল। রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের উচ্চাসন থেকে গান্ধীজী যেন গর্জন করে উঠলেন।

এই-ই তো চাই।

দেশবাসী এগিয়ে এলো।

নজরুল সন্তুষ্ট হলেন। তিনি সংগে সংগে নবযুগের পৃষ্ঠায় লিখলেন আর একটি ভাবপ্রবণ সম্পাদকীয়। 'গুর্জ্জর সিংহ' আর ব্রিটিশ সিংহ এই দুই সিংহের লড়াইয়ের কথা তাতে বর্ণনা করা হলো। স্পষ্টতঃই এ প্রবন্ধে কবি গান্ধীজীকে সমর্থন করলেন। সম্পাদকীয়ের শিরোনামা দিলেন 'গুর্জ্জর সিংহ বনাম ব্রিটিশ সিংহ'। এ প্রবন্ধে তিনি গান্ধীজীকে বিপ্লবী নায়ক রূপে চিত্রিত করলেন।

এর অল্প কয়েকদিন পর গান্ধীজী হুঙ্কার ছাড়লেন 'কুইট ইণ্ডিয়া'। স্বাধীনতা সংগ্রামের মহামন্ত্র। এ সময় সম্পূর্ণ সাময়িক ভাবে হলেও কবি গান্ধীজীকে সমর্থন করলেন।

উল্লিখিত সম্পাদকীয়টি কবির কোন গ্রন্থে সংকলিত হয় নি।

॥ শরৎচন্দ্র ॥

কথাশিল্পীর সংগে বিদ্রোহীর একটা মধুর সম্পর্ক ছিল। নজরুল গভীর ভাবে শরৎচন্দ্রকে শ্রদ্ধা করতেন আর কবির প্রতি শরৎচন্দ্রেরও ভালবাসার অন্ত ছিল না। বহুবার বহুভাবে এর প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

আনন্দময়ীর আগমনে কবিতা লিখে নজরুল তখন জেলে গেছেন এবং ঐতিহাসিক অনশন সুরু করেছেন। দেশবাসী চঞ্চল হয়ে উঠেছে, চঞ্চল হয়ে উঠেছেন শরৎচন্দ্র। একটা বিরাট প্রতিভা কী এই ভাবে মৃত্যুর কোলে ঝরে যাবে। শরৎচন্দ্র কেবল চঞ্চল নয়, বিচলিত হয়ে পড়লেন। নজরুলের প্রতি তাঁর মনোভাবটা এই সময়ের একটি চিঠিতে সুন্দর রূপে ধরা পড়েছে। চিঠিটা তিনি ১৯২৩ সালের ১৭ই মে তারিখে হাওড়ার বাজে শিবপুর থেকে প্রবাসী মহিলা সাহিত্যিক শ্রীমতি লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখেন। সংক্ষিপ্ত চিঠিখানির এক স্থানে তিনি লেখেন···হুগলী জেলে আমাদের কবি কাজী নজরুল ইসলাক উপোষ করিয়া মরমর হইয়াছে, বেলা ১টার গাড়ীতে যাইতেছি দেখি যদি দেখা করিতে দেয় ও দিলে আমার অনুরোধে যদি সে আবার খাইতে রাজী হয়। না হইলে আর কোন আশা দেখি না। একজন সত্যকার কবি। রবিবাবু ছাড়া বোধ হয় এমন কেহ আর এত বড় কবি নাই।

সংক্ষিপ্ত চিঠি, কিন্তু আন্তরিকতাটুকু লক্ষ্যনীয়।

নজরুলের সৃষ্টিতেও এমনি ভাবে শরৎচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা ফুটেছে, সুগভীর শ্রদ্ধা।

শরৎচন্দ্রের ৫২ তম জন্ম বার্ষিকী কতা ব্যক্তিদের মধ্যে বিরাট উৎসাহ উদ্দীপনা। জনগণের মধ্যেও তার প্রতিফলন সুস্পষ্ট। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা এলেন নজরুলের কাছে। একটি উদ্বোধনী সংগীত চাই। কেবল সংগীত রচনা নয় সেটা গাইতেও হবে। নজরুল হয়তো এইই চাইছিলেন। কথাশিল্পীর জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানে তিনি দূরে থাকবেন এ হতেই পারে না। তিনি সংগে সংগে রাজী হয়ে গেলেন।

সেদিন সন্ধ্যায় তিনি লিখলেন একটি সুন্দর কবিতা, 'শরৎচন্দ্র'। কবিতায় তিনি কথাশিল্পীকে 'নব ঋত্বিক নবযুগের' বলে সম্বোধন করেছেন। তাঁর সমগ্র হৃদয়ের শ্রদ্ধা যেন উপুড় হয়ে ধরা পড়ে কবিতাটিতে :—

নব ঋত্বিক নব যুগের ;
  নমস্কার ! নমস্কার !
আলোকে তোমার পেনু আভাস
  নওরোজের নব উষার।
তুমি গো বেদনা-সুন্দরের
  দরদ্-ই দিল, নীলমানিক,
তোমার তিক্ত কণ্ঠে গো
ধ্বনিল সাম বেদনা, ঋক।
        ইত্যাদি।

'শরৎচন্দ্র' কবিতাটি কবির সন্ধ্যা কাব্যগ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে।

॥ অভিমানিনী ॥

আলী আকবর খানের দ্বারা প্রতারিত হয়ে নজরুল দৌলৎপুর থেকে কুমিল্লার কান্দিরপাড়ে চলে আসেন ১৩২৮ সালের ৪ঠা আষাঢ়, সকাল বেলা। এখানে তিনি যে বিখ্যাত সেনগুপ্ত পরিবারের এক-জন হ'য়ে যান এবং বিরজা সুন্দরী দেবীকে যে মা বলে ডাকতেন সে কথা আমরা পূর্বে বহুবার উল্লেখ করেছি। বিরজা সুন্দরী দেবীর একটি মেয়ে ছিল। সে ছিল খুব অভিমানী। সামান্য কথায় অভিমান, সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতিতে অভিমান। একবার এই অভিমানী মেয়েটি কঠিন রোগে আক্রান্ত হয় এবং এই অসুখেই সে মারা যায়। কোন একটি কারণে মরবার কিছুক্ষণ আগে এই চির অভিমানী মেয়েটি অভিমান করে কথা বন্ধ করে। আর আশ্চর্য এই অবস্থায় তার মৃত্যু ঘটে। মৃত্যু রোধ করা যায় না-কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থার মৃত্যুর থেকে এ মৃত্যু অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তাই এ মৃত্যু বিরজা সুন্দরীর মনে গভীর হয়ে বেজেছিল। নজরুল ও কম আহত হন নি। শোকাতুরা বিরজাসুন্দরীর কথাগুলি বেদনাহত নজরুল সুন্দর করে কাব্যে গেঁথে তুলেছেন—সৃষ্টি হয়েছে 'অভিমানিণী' কবিতার :

ওরে অভিমানিণী!
এমন করে বিদায় নিবি ভুলেও জানিনা।
পথ ভুলে তুই আমার ঘরে দু'দিন এসেছিলি,
সকল-সহা! সকল সয়ে কেবল হেসেছিলি!
হেলায় বিদায় দিনু যারে
ভেবেছিনু ভুলব তারে হায়!

আহা ভোলা কি তা' যায় ?'

ওরে হারা-মণি ; এখন কাঁদি দিবস যামিনী ॥...

।ইত্যাদি ।

কবিতাটি কবির 'পূবের হাওয়া' কাব্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কবিতাটির অন্তর্গত তথ্যটি জনাব মুজফ ফর আহমদ তাঁর স্মৃতিকথায় বিবৃত করেছেন।

খুকী ও কাঠবেরালি

কবি নজরুল শিশুদের জন্যে খুব বেশী কবিতা লেখেন নি—কিন্তু যে ক'টি লিখেছেন তা' কেবল অনবদ্য নয়—অসাধারণ, বাংলা সাহিত্যে তার জুড়ি মেলা ভার। 'খুকী ও কাঠবেরালি' (জনাব মুজফ্‌ফর আহমদ লিখেছেন : কথ্য ভাষায় কাঠবেরালি বলা হয়, কাঠবিড়ালী নয়। নজরুলের মূল কবিতায়ও কাঠবেরালি ছিল।') শিশুদের জন্যে লেখা কবির এমনই এক অনবদ্য কবিতা। কবিতাটির জন্মের একটি সুন্দর ইতিহাস আছে। কবি ঘটনাটি জনাব মুজফ্‌ফর আহমদকে বলেছিলেন—আমি এখানে সেটি বিবৃত করলাম।

আলী আকবর খানের দ্বারা প্রতারিত হয়ে আহত নজরুল এসে উঠলেন কুমিল্লার কান্দিরপাড়ে—বিখ্যাত সেনগুপ্ত পরিবারে। এই পরিবারের ছোট বড় ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে কবি একেবারে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। বিরজা সুন্দরী দেবীর ছয় বছরের এক শিশু কন্যা—নাম অঞ্জলি সেন। ডাক নাম জুটু। একদিন কবি দেখলেন এই অঞ্জলি ওরফে জুটু একা একা নির্জনে দাঁড়িয়ে এক কাঠবিড়ালীর সঙ্গে কথা বলছে। বেশ চমৎকার দৃশ্য। মেয়েটি

তাঁর সঙ্গে ভাব জমাতে চায় আর বনের নির্বাক ক্ষুদ্র প্রাণীটি লেজ ফুলিয়ে পুটুস-পাটুস চোখে তাকায়, তার কথা শোনে। দৃশ্যটি নজরুলের খুব ভাল লাগল—তিনি হৃদয় দিয়ে ব্যাপারটি উপলব্ধি করলেন। এর পরই তিনি রচনা করলেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'শিশু ও কাঠবিড়ালি' :

কাঠবেরালি। কাঠবেরালি! পেয়ারা তুমি খাও?
গুড়-মুড়ি খাও? দুধ-ভাত খাও? বাতাপি লেবু? লাউ?
বেরাল-ছানা? কুকুর-ছানা? তাও?—
ডাইনী তুমি হোঁৎকা পেটুক,
খাও একা পাও যেথায় যেটুক!
বাতাবি-লেবু সকল গুলো
একলা খেলে ডুবিয়ে নুলো!
তবে যে ভারি ল্যাজ উঁচিয়ে পুটুস পাটুস চাও?
ছোঁচা তুমি! তোমার সঙ্গে আড়ি আমার! যাও!
ইস খেয়ো না মস্তপানা ঐ সে পাকাটাও!
আমিও খুবই পেয়ারা খাই যে! একটি আমায় দাও।
কাঠবেরালি! তুমি আমার ছোড়্‌দি হবে? বৌদি হবে? হুঁ
রাঙাদিদি? তবে একটা পেয়ারা দাও না! উঃ! ইত্যাদি।

এই কবিতাটিতে যে সকল আত্মীয়ের কথা উল্লেখিত হ'য়েছে জনাব মুজফ্‌ফর আহমদের মতে 'এই কবিতার 'রাঙা দা' হ'চ্ছেন শ্রীবীরেন্দ্র কুমার সেনগুপ্ত, বৌদি তাঁর স্ত্রী, আর ছোড় দি বীরেন সেনের বোন কমলা দাশগুপ্তা। 'রাঙাদিদি' মানে প্রমীলা সেনগুপ্ত, পরে নজরুল ইসলামের স্ত্রী।'

এই বিখ্যাত কবিতাটি প্রথমে 'ঝিঙেফুল' নামক কাব্য গ্রন্থে মুদ্রিত হয়। পরে এটি কবির শ্রেষ্ঠ কাব্য গ্রন্থ 'সঞ্চিতায়'য় সংকলিত হয়েছে।

অন্তরঃ ন্যাশানাল সঙ্গীত

"কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা" গ্রন্থে জনাব মুজফফর আহমদ 'অন্তর-ন্যাশানাল সঙ্গীতের' উৎস ভূমির একটি মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন। আমি এখানে তার সারমর্ম উদ্ধৃত করলাম:

ইন্টারন্যাশানাল সঙ্গীতের একটি বিশেষ তাৎপর্য এই যে এই সঙ্গীতে নিখিল বিশ্বের মজুর-কিষাণের মধ্যে যে ঐক্য ও সঙ্ঘবদ্ধতা আছে তা' প্রকাশ পায় এবং সঙ্গীতটি সারা পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় একই সুরে গাওয়া হয়। ফলে বিভিন্ন শতাধিক ভাষায় যদি গানটি একই সঙ্গে গাওয়া হয় তা হলে, সুরের ঐক্যের জন্যে বোঝাই যায় যে গানটি এতগুলি ভাষয় একই সঙ্গে গাওয়া হচ্ছে। একজন ফরাসী মজুর সর্বপ্রথম গানটি রচনা করে পরে বিশ্বের কম বেশী সকল ভাষায় এর অনুবাদ প্রকাশিত হ'য়েছে।

বাংলা ভাষায় এর অনুবাদ ছিল না। তাই—১৯২৬ সালে এটির একটি তর্জমার জন্যে কবিকে অনুরোধ করেন মুজফফর সাহেব। কিন্তু গানটির কোন ইংরাজী কপি সংগ্রহ করা যায় নি আপ্টন সিংক্লেয়ারের হেল্ (Hell a verse Drama) নামক নাটিকায় এই সঙ্গীতটির একটি আমেরিকান অনুবাদ ছিল--সেটি দেখেই নজরুল এর অনুবাদের জন্যে উদ্যোগী হন। কিন্তু অনুবাদের প্রধান অসুবিধা দেখা দিল এর স্বরলিপি নিয়ে। স্বরলিপি পাওয়া গেলে এবং সেই সুরের সীমানার মধ্যে বাংলা অনুবাদটি হ'লে সবদিক দিয়ে সুবিধে হয়। কিন্তু বহু চেষ্টার পরও স্বরলিপি পাওয়া গেল না। ১৯২৭ সালে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন ইউরোপে ছিলেন তখন তাঁকে এর স্বরলিপি পাঠানোর জন্যে অনুরোধ করা

হয়। কিন্তু তিনি তা পাঠান নি। যাক—নজরুল স্বরলিপি ছাড়াই ১৩৩৪ সালের ১লা বৈশাখে এর অনুবাদ করেছিলেন—নাম দিয়েছিলেন 'অন্তর ন্যাশনাল সঙ্গীত'। পরে এই অনুবাদটি ১৯২৭ সালের ২১শে এপ্রিলের "গণবাণী"তে প্রকাশিত হয় এবং পরে 'ফণি মনসা' কাব্যগ্রন্থে স্থান লাভ করে। এই প্রসিদ্ধ আন্তর্জাতিক সঙ্গীতটি পরে 'সঞ্চিতার মধ্যে সংকলিত হয়েছে কিন্তু 'সঞ্চিতার মধ্যে যে সঙ্গীতটির যে পরিবর্তন করা হয়েছে তাতে বিশেষ রূপে এর সৌন্দর্য হানি ঘটেছে।

॥ কয়েকটি ইসলামি সংগীত ॥

উর্দুতে গজলগান ও ইসলামী সংগীতের অসংখ্য রেকর্ড থাকলেও বাংলা ভাষায় ইস্‌লামী সংগীতের একখানি রেকর্ড ও ছিল না। এ ব্যাপারে প্রথমে তৎপর হয়ে ওঠেন আব্বাসউদ্দিন। নজরুলের বাণী এবং আব্বাসউদ্দীনের কণ্ঠ—দু'য়ে মিলে নিখিল বাংলায় ইস্‌লামী সংগীতকে একটি অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট দান করেছিল।

গায়ক আব্বাসউদ্দীন আহমদ বাংলা ভাষায় ইসলামী সংগীত রচনার একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। এ কথা ঠিক, ইসলামী সংগীত হল সমগ্র নজরুল-সংগীতের মধ্যমনি। এই দুর্লভ সংগীতগুলি সমগ্র নজরুল-সংগীতের মধ্যে একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। কবি কেমন ভাবে ইসলামী সংগীত রচনায় উদ্বুদ্ধ হলেন সে ইতিহাসটুকু আব্বাসউদ্দীনের বর্ণনায় সুন্দর রূপে ফুটে উঠেছে। বর্ণনাটি দীর্ঘ—তবুও এই ঐতিহাসিক ব্যাপারটি যথাযথ রক্ষার জন্যে আমি সমগ্র প্রয়োজনীয় অংশটি এখানে তুলে দিলাম :

…"কাজিদার লেখা গান ইতিমধ্যে অনেকগুলো রেকর্ড করে ফেললাম। তাঁর লেখা 'বেণুকার বনে কাঁদে বাতাস বিধুর,' 'অনেক ছিল বলার যদি দু দিন আগে আসতে', 'গাঙে জোয়ার এলো ফিরে তুমি এলে কৈ', 'বন্ধু আজো মনেরে' পড়ে আম কুড়ানো খেলা' ইত্যাদি রেকর্ড করলাম।

একদিন কাজিদাকে বললাম, "কাজিদা, একটা কথা মনে হয়। এই যে পিয়ারু কাওয়াল, কাল্লু কাওয়াল এরা উর্দু কাওয়ালী গায়, এদের গানও শুনি অসম্ভব বিক্রী হয়, এই ধরণের বাংলায় ইসলামী গান দিলে হয় না। তারপর আপনি তো জানেন। কি ভাবে কাফের কুকুর ইত্যাদি বলে বাংলার মুসলমান সমাজের কাছে আপনাকে অপাংক্তেয় করে রাখার জন্যে আদা-জল খেয়ে লেগেছে একদল ধর্মান্ধ। আপনি যদি ইসলামী গান লিখেন তাহলে মুসলমানের ঘরে ঘরে আবার উঠবে আপনার জয়গান।"

কথাটি তাঁর মনে লাগল। তিনি বললেন, আব্বাস, তুমি ভগবতী বাবুকে বলে তাঁর মত নাও, আমি ঠিক বলতে পারব না"

আমি ভগবতী ভট্টাচার্য অর্থাৎ গ্রামাফোন কোম্পানীর রিহার্স-ইন-চার্জেকে বললাম। তিনি তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন, "না না না ও সব গান চলবে না। ও হতে পারে না।"

মনের দুঃখ মনেই চেপে গেলাম। এর প্রায় ছ' মাস পরে। একদিন দুপুরে বৃষ্টি হচ্ছিল, আমি অফিস থেকে গ্রামোফোন কোম্পানীর রিহার্সেল ঘরে গিয়েছি। দেখি একটা ঘরে বৃদ্ধা আশ্চর্যময়ী আর বৃদ্ধ ভগবতীবাবু বেশ রসাল গল্প করছেন। আমি নমস্কার দিতেই বৃদ্ধ বললেন, "বসুন, বসুন," আমি বৃদ্ধের রাসাল্পুত মুখের দিকে চেয়ে ভাবলাম, এই-ই উত্তম সুযোগ। বললাম—যদি কিছু মনে না কর তা হলে বলি। সেই যে

বলেছিলাম ইসলামী গান দেবার কথা, আচ্ছা একটা এক্সপেরিমেন্টই করুণ না, যদি বিক্রী না হয় আর নেবেন না, ক্ষতি কি?" তিনি হেসে বললেন, "নেহাতই নাছাড়বান্দা আপনি, আচ্ছা আচ্ছা করা যাবে।"

শুনলাম পাশের ঘরে কাজীদা আছেন। আমি কাজীদাকে বললাম যে ভগবতীবাবু রাজী হয়েছেন। তখন সেখানে ইন্দুবালা কাজিদার কাছে গান শিখেছিলেন। কাজিদা বলে উঠলেন, "ইন্দু তুমি বাড়ী যাও, আব্বাসের সাথে কাজ আছে।" ইন্দুবালা চলে গেলেন। এক ঠোংগা পান আর চা আনতে বললাম দশরথকে। তারপর দরজা বন্ধ করে আধঘণ্টার ভিতরই লিখে ফেললেন, "ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ।" তখুনি সুর-সংযোগ করে শিখিয়ে দিলেন। পরের দিন ঠিক এই সময় আসতে বললেন। পরের দিন লিখলেন, "ইসলামের ঐ সওদা লয়ে এলো নবীন সওদাগার"

গান দু'খানা লেখার ঠিক চার দিন পরেই রেকর্ড করা হ'ল। কাজিদার আর ধৈর্য মানছিল না। তাঁর চোখে মুখে কী কী আনন্দই যে খেলে যাচ্ছিল। তখনকার দিনে যন্ত্র ব্যবহার হতো শুধু হারমোনিয়ম আর তবলা। গান দু'খানা আমার তখন মুখস্থও হয় নি। তিনি নিজে যা লিখে দিয়েছিলেন, মাইকের পাশ দিয়ে হারমোনিয়মের উপর ঠিক আমার চোখ বরাবর হাত দিয়ে কাজিদা নিজেই সেই কাগজখানা ধরলেন, আমি গেয়ে চললাম। এই হল আমার প্রথম ইসলামী রেকর্ড। দু'মাস পরে ঈদুল ফেতর। শুনলাম গান দু'খানা তখন বাজারে বের হবে।

ঈদের বাজার করতে একদিন ধর্মতলার দিকে গিয়েছি। বি. এন. সেন অর্থাৎ সেনোলা রেকর্ড কোম্পানীর বিভূতিদার সাথে দেখা। তিনি বললেন, "আব্বাস আমার দোকানে এসে।" এক ফটোগ্রাফার ডেকে নিয়ে এসে বললেন, এর ফটোটা নিন তো।

আমি তো অবাক। বললাম, "ব্যাপার কি ?" তিনি বললেন "তোমার একটা ফটো নিচ্ছি, ব্যস আবার কি ?"

ঈদের বন্ধে বাড়ী গেলাম। বন্ধের সাথে আরো কুড়ি পঁচিশ দিন ছুটি নিয়েছিলাম। কলকাতা ফিরে এসে ট্রামে চড়ে অফিস যাচ্ছি। ট্রামে একটি যুবক আমার পাশে গুন গুন করে গাইছে, "ও মন রমজানের ওই রোজার শেষ।" আমি একটু অবাক হলাম। এ গান কি করে শুনল ? অফিস ছুটির পর গড়ের মাঠে বেড়াতে গিয়েছি, মাঠে বসে একদল ছেলের মাঝে একটি ছেলে গেয়ে উঠল ··ও মন রমজানের ওই রোজার শেষে। তখন মনে হ'ল এ গান তো ঈদের সময় বাজারে বের হবার কথা। বিভূতিদার দোকানে গেলাম। আমাকে দেখে তিনি একদম জড়িয়ে ধরলেন। সন্দেশ, রসগোল্লা, চা এনে বললেন, "খাও"। আমার গান ছুটো এবং আর্ট পেপারে ছাপানো আমার বিরাট ছবির একটা বাণ্ডিল সামনে রেখে বললেন, "বন্ধু-বান্ধবদের কাছে বিলি করে দিও। আমি প্রায় সত্তর আশী হাজার ছাপিয়েছি, ঈদের দিন এসব বিতরণ করেছি। আর এই দেখ ছু'হাজার রেকর্ড এনেছি তোমার।"

আনন্দে খুশীতে মন ভরে উঠল। ছুটলাম কাজিদার বাড়ী। শুনলাম তিনি রিহার্সেল রুমে গেছেন। গেলাম সেখানে। দেখি দাবা খেলায় তিনি মত্ত। দাবা খেলতে বসলে ছুনিয়া ভুলে যান তিনি। আমার গলার স্বর শুনে একদম লাফিয়ে উঠে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, "আব্বাস তোমার গান কি যে—।" আর বলতে দিলাম না, পা ছুঁয়ে তাঁর কদমবুসি করলাম। ভগবতী বাবুকে বলাম "তা হ'লে এক্সপেরিমেন্টের খোপে টিঁকে গেছি, কেমন ? তিনি বললেন, "এবার তা' হলে আরো ক'খানা এ ধরনের গান···।" খোদাকে দিলাম কোটি ধন্যবাদ।

এরপর কাজীদা লিখে চললেন ইসলামী গান। আল্লা রসুলের গান পেয়ে বাংলার মুসলমানের ঘরে ঘরে জাগল এক নব উন্মাদনা। যারা গান শুনলে কানে আংগুল দিত তাদের কানে গেল, "আল্লা নামের বীজ বুনেছি", "নাম মোহাম্মদ বোল রে মন, নাম আহমদ বোল।" কান থেকে হাত ছেড়ে দিয়ে তন্ময় হয়ে শুনল এ গান। আরো শুনল, "আল্লাহ আমার প্রভু আমার নাহি নাহি ভয়।" মোহররমে শুনল মর্সিয়া, শুনল "ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এলো রে দুনিয়ায়।" ঈদ নতুন করে শুনল, 'এলো আবার ঈদ ফিরে এলো আবার ঈদ, চল ঈদগাহে।' ঘরে ঘরে এলো গ্রামোফোন রেকর্ড, গ্রামে গ্রামে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল আল্লা-রসুলের নাম।"

॥ মোর প্রিয়া হবে এসো রাণী ॥

এক উৎকৃষ্ট আধুনিক গানের জন্মেতিহাসের যে কৌতুককর বিবরণ জনাব আব্বাসউদীন আহমদ তাঁর 'আমার শিল্পী-জীবনের কথা"য় দিয়েছেন সেটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

একদিন গ্রামোফোন কোম্পানিতে আব্বাসউদ্দীন এবং তৎকালীন অন্যান্য অনেক খ্যাতনামা গাইয়ের দল বসে খোশ-গল্পে মেতে উঠেছিলেন। এমন সময় একটা প্রশ্ন উঠল: "লটারীতে যদি সবাই লাখ খানেক করে টাকা পাও তবে তোমরা তোমাদের প্রিয়া বা স্ত্রীকে কে কি ভাবে সাজাতে চাও।" প্রশ্ন করলেন কাজী কবি। কলরব বন্ধ হ'ল। কিন্তু ক্ষণিক। একটু পরেই মতামত বর্ষাতে লাগল অবিরল ধারায়। কেউ বললে, "আমি এখনই চলে যাব কমলালয় ষ্টোর্সে," কেউ বা বললে, "ওয়াসেল মোল্লা"য়। নানা জনের আরো নানা কথা, মন্তব্যের শিলাবৃষ্টি। এবার কবি এগিয়ে এলেন। হারমোনিয়াম নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হ'ল তাঁর প্রিয়াকে

সাজানোর কাজ। বলাবাহুল্য গগনচারী উদ্দাম কল্পনার সাহায্যেই তিনি বিনা পয়সায় সাজালেন তাঁর অনন্ত প্রিয়াকে। সৃষ্টি হ'ল বাংলার আধুনিক সংগীতের একটি নিত্যকালীন সম্পদ :

মোর প্রিয়া হ'বে এসো রাণী, দেব খোঁপায় তারার ফুল।
কর্ণে দোলাব তৃতীয়া তিথির চৈতী চাঁদের দুল।

কণ্ঠে তোমার পরাবো বালিকা
হংস সারির দোলান মালিকা
বিজলী জরির ফিতায় বাঁধিব মেঘ রং এলো চুল॥
জোছনার সাথে চন্দন দিয়ে মাখাব তোমার গায়।
রামধনু হ'তে লাল রং ছানি আল্‌তা পরাব পায়।
আমার গানের সাত সুর দিয়া
তোমার বাসর রচিব যে প্রিয়া
তোমারে ঘিরিয়া গাহিবে আমার কবিতার বুল বুল॥

গান শেষ হ'লে কবি বললেন, "কী মহারথীর দল, ক' টাকা লাগল প্রিয়াকে সাজাতে?"

কিছুটা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য! কোন রকম পূর্বপ্রস্তুতি না নিয়ে নিছক আড্ডায় বসে বাজি রেখে অনর্গল কবিতা লেখার মত দুর্লভ স্বাভাবিক কবি-প্রতিভা নজরুলের মত আর দ্বিতীয় ব্যক্তির ছিল বিনা সন্দেহ। সজনীকান্ত দাসের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে তিনি বহুবার তার প্রমাণ দিয়েছেন। এবং এ জন্যেই তিনি ফরমায়েসী সংগীত রচনায় আশ্চর্য দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। হিজ মাস্টার্স ভয়েস কোম্পানিতে কাজ করার সময় শিল্পীদের চাহিদা অনুযায়ী একই সঙ্গে তিনি লিখেছেন ইসলামী সংগীত, শ্যামা সংগীত, পল্লীগীতি, ভাটিয়ালি, প্রেমসঙ্গীত, আধুনিক গান, ভাওয়াইয়া, জারি, সারি, মুর্শেদী ও গজল গান। বলা বাহুল্য এ সকল সংগীত রচনায় তাঁর কোন রকম পূর্ব প্রস্তুতি ছিল না। ভাবনা-চিন্তা বা প্রস্তুতির তিনি কোন রকম

অবকাশই পেতেন না। তাঁর এই স্বাভাবিক কবি-প্রতিভার আশ্চর্য বিকাশ ঘটেছে অটোগ্রাফ দানের সময়। এক সময় নিখিল বাংলায় নজরুল অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। এ সময় অসংখ্য অটোগ্রাফ সংগ্রহকারী তাঁর চার পাশে এসে ভিড় জমাতেন। বহুজনের বহু খাতায় তাঁর অটোগ্রাফ ছড়িয়ে আছে। আর অটোগ্রাফের সঙ্গে আছে কিছু মনোরম কবিতা বা কবিতার পংক্তি। এগুলির কিছু সংগ্রহ করে আমরা নিম্নে প্রকাশ করলাম।

অধ্যাপিকা বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ তখন লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজের সঙ্গে যুক্ত। তাঁরই মুখে কয়েকজন ছাত্রী জানতে পারলেন যে কবি ক্রমেই অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। বর্তমান ব্যাধির প্রকাশ ঘটছে ধীরে ধীরে। অতি কষ্টে কবি বসতে উঠতে ও লিখতে পারেন। ছাত্রী ক'জন সেদিনই কবিকে দেখতে গেলেন। কথা বার্তার মাঝেই একজন ছাত্রী তাঁর খাতাখানি আগিয়ে দিলেন অটোগ্রাফের আশায়। কম্পিত হস্তে কবি কলম তুলে নিয়ে লিখে দিলেন ছ' পংক্তির একটি সুন্দর কবিতা—জাগ্রত নারী শক্তির অনবদ্য প্রশস্তি :

আঁধার হেরেমে তোমরা দিব্য দীপ্তি সঞ্চারিকা,
রোজা অবসানে খুশীর ঈদের হেলালের ললাটিকা।
ফিরদৌসের গুলরুখ এলে শিশির-নেকাব খুলি,
এতদিনে শিশ মহলের দ্বার খুলিয়াছে বুলবুলি।
আনন্দ-প্রজাপতি এলে মেলি চিত্রাঙ্গদ পাখা
নূতন আকাশ দেখিলাম আমি নব রামধনু আঁকা।'

২০।৯।৪১ নজরুল ইসলাম।

'কৃষক' পত্রিকার সম্পাদকের খাতায় কবি যে দু পংক্তির শ্লোক লিখে দিয়েছিলেন সেটি তাঁর নিজের জীবনে আশ্চর্যরূপে সত্য হয়ে

উঠেছে। সত্য-দ্রষ্টা কবি যেন নিজের জীবন পরিণতিকে উপলক্ষ করেই এটি লিখেছিলেন। ১৯৪০ সালের ১৩ই অক্টোবরে লেখা সেই অবিস্মরণীয় পংক্তি দুটি এই :

'শক্তি-সিন্ধু মাঝে রহি হায় শক্তি পেল না যে
মরিবার বহু পূর্বে, জানিও মরিয়া গিয়াছে সে'।

কবির আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে বিশেষ কোনো আলোচনা হয়নি। হলে দেখা যেত আশৈশব হতেই তাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিকতার প্রতি তীব্র আকর্ষণ রয়েছে। অটোগ্রাফ দানের সময় মাঝে মাঝে—হয়তো কবির নিজের অজ্ঞাতসারে—এই আধ্যাত্মলোকের কথা সুন্দর রূপে ব্যক্ত হয়েছে। ১৯৩৩ সালে বাণী চিত্রের প্রথম যুগের অভিনেতা মোহন ঘোষালের স্ত্রী শ্রীমতী মালশ্রী ঘোষালের খাতায় কবি লিখে দেন :

রূপের তীর্থে তীর্থ পথে যুগে যুগে
আমি আসি,
ওগো সুন্দর বাজাইয়া যাই তোমার
নামের বাঁশী।

করুণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের খাতায় অটোগ্রাফ দানের কবি সময় যে কবিতাটি লিখে দেন সেটিতে সম্পূর্ণ আধ্যাত্মলোকের কথাই বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। কবিতা হিসেবেও পংক্তি কয়টি অপূর্ব :

সুন্দর তব ধ্যানের কমল ফুটিবে যবে
তোমার নয়নে সেদিন আমার প্রকাশ হবে।
লীলা-চঞ্চল প্রাণ মম রবে স্তব্ধ হ'য়ে,
মৌনী তোমার ধেয়ানের নীরে আকুল স্তবে।

নজরুল ইসলাম,

১৯শে মার্চ, ১৯৩৩

১৩৩৫ বঙ্গাব্দের ৭ই আষাঢ়ে শ্রীমতী রাণু সোমের খাতায় কবি যে কবিতাটি লিখে দেন সেটিও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় :

শ্রীমতী রাণু সোম কল্যাণীয়াসু—

মাটির ঊর্ধ্বে গান গেয়ে ফেরে স্মরগের যত পাখী,
তোমার কণ্ঠে গিয়াছে তাহারা তাদের কণ্ঠ রাখি।
যে গন্ধর্বলোকের স্বপন হেরি মোরা নিশিদিন—
তুমি আনিয়াছ কণ্ঠ ভরিয়া তাদের মুরলি বীণ।
'তুমি আনিয়াছ শুধু সুরে সুরে ভাষাহীন আবেদন,
যে সুর-মায়ায় বিকশিয়া ওঠে শশীতারা অগণন।
যে সুরে স্বরগে স্তব-গান গাহে সুন্দর সুরধুনী
অসুন্দর এই ধরায় তোমার কণ্ঠে সে গান শুনি॥

বনগ্রাম, ঢাকা — 'কবিদা।'

৭ই আষাঢ়, ১৩৩৫

কবি নিজে যাঁদের গান শিখিয়েছেন তাঁদের সংখ্যা বিরল। বেগম জাহানারা খান সেই বিরল সংখ্যক সৌভাগ্যবতীদের মধ্যে অন্যতমা। ইনি কবির বিশেষ স্নেহের পাত্রী ছিলেন। দীর্ঘদিন ইনি কবির সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন—সুতরাং যখনই সুযোগ হয়েছে জাহানারা খান তাঁর অটোগ্রাফের খাতাখানি এগিয়ে ধরেছেন কবির সম্মুখে। কবি সঙ্গে সঙ্গে ক' পংক্তি কবিতা রচনার পর স্বাক্ষর দান করেছেন। শ্রদ্ধেয়া জাহানারা খানের অটোগ্রাফের খাতায় অনেকগুলি কবিতা আছে—আমি তার থেকে মাত্র দুটি উদ্ধৃত করলাম :

সুন্দর তনু, সুন্দর মন, হৃদয় পাষাণ কেন ?
সেই ভুলে যাওয়া অবহেলা এলে সুন্দর রূপে যেন।
নারী কি দেবতা ? কেবলি কি তারা পাষাণ নির্বিকার ?
পদতলে তার পূজার অর্ঘ্য নিতি হয়ে ওঠে ভার।

কত সে হৃদয় দলিয়া চরণে আলতা পরেছ রাণী ?
ধরা নাহি দিলে, তোমারে খুঁজিছে কত সে কবির বাণী ?
আমার গানের—একা তরণীতে আজো আছে আছে ঠাঁই,
তোমার পরশে সোনা হয়ে যাবে, এড়ায়ে চলিছ তাই ?
আমার সুরের শতদলে তবে চরণ রাখিলে কেন,
না ছুঁতেই যদি চলে যাবে দূর ভুলে-যাওয়া লোকে হেন ?
নয়নের জল থাকুক আমার—সে মোর বন্ধু প্রিয়,
থাক মোর গান—যদি মনে লাগে গানেরে ভালোবাসিও।

দার্জিলিং, ১৬-৬-১৯৩১

এ ধরনের আরো বহু কবিতা বহু বিদগ্ধ জনের অটোগ্রাফের খাতায় জমা আছে। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁরা এগিয়ে এলে কবিতাগুলি সংগ্রহ করা সহজ হবে। এ বিষয়ে আমরা সকলের আন্তরিক সহানুভূতি কামনা করি।

॥ নদীর নাম সই অঞ্জনা ॥

নজরুল-সংগীতকে যাঁরা জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ রূপে প্রচলিত ও প্রিয় করেছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নাম—সুরশিল্পী আব্বাসউদ্দীন আহমদ। আব্বাসউদ্দীনের কণ্ঠেই নিখিল বাংলায় নজরুল-গীতি অনন্যসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বিশেষ করে ইসলামী সংগীত আর পল্লীগীতিগুলি শিল্পীর কণ্ঠের আকুতি ও আন্তরিকতায় চাষী-চাকুরে সবার কাছে জল-হাওয়ার মত একান্ত আপন হ'য়ে উঠেছিল।

মেগাফোন কোং-এর রিহার্সালরুমে একদিন আব্বাউদ্দীন আহমদ (ইনি ১৯৫৯ খ্রীঃ ৩০শে ডিসেম্বর, বুধবার, সকাল ৭-২০ মিঃ পরলোকগমন করেছেন।) পূর্ববঙ্গের একটি ভাওয়াইয়া গানের

সংবিশেষ সুর-সহযোগে গেয়ে অবসর বিনোদন করছিলেন। গানের কলিটি এই :

"নদীর নাম সই কচুয়া
মাছ মারে মাছুয়া
মুই নারী দিচোং ছেকাপাড়া"—

ভাওয়াইয়া হ'ল পল্লীগীতি। এর সুরের একটি বিশিষ্টতা আছে। সুরটা কাজী কবির অত্যন্ত ভাল লেগেছিল। আব্বাসউদ্দীন গল্প থামাতেই তিনি এসে বললেন—"আমি যতক্ষণ না তোমাকে থামতে বলি - ততক্ষণ তুমি একটানা গেয়ে যাও গানটা।" আব্বাসউদ্দীন বুঝলেন ব্যাপারটা। তিনি গেয়ে চললেন একটানা। হঠাৎ এক সময় কবি বললেন "থাম"। হাতে তাঁর পাণ্ডুলিপি। বললেন, "এবার অবিকল ঐ সুরে গেয়ে যাও এই গানটি"। ক' মিনিট-ই বা, কবি ইতিমধ্যে রচনা করেছেন তাঁর সেই বিখ্যাত পল্লীগীতি :।

নদীর নাম সই অঞ্জনা
নাচে তীরে খঞ্জনা
পাখী সে নয় নাচে কালো আঁখি।
আমি যাব না আর অঞ্জনাতে
জল নিতে সখী লো
ঐ আঁখি কিছু রাখিবে না বাকী।"

গানটি পরে আব্বাসউদ্দীন রেকর্ড করেন।